তিনটি উপন্যাস একত্রে

সাজ বদল

বকুল

সবুজ চিঠি

মনোজ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

॥ এক ॥

গ্রাম দুধসর, পোস্টাপিস সুজনপুর, থানা জাগুলগাছি।

গাঁ-গ্রাম তো কতই, আমাদের দুধসরের মতো আর একখানা গ্রাম কোথায় আছে দেখান। নেই কি এখানে? ইঞ্জিনিয়ার আছেন, সাবজজ আছেন, রায়সাহেব আছেন। ডাকসাইটে উকিলও ছিলেন একজন—সিংহ-গর্জনে কলকাতা শহরের মহামান্য হাইকোর্ট প্রকম্পিত করে বেড়াতেন। রিটায়ার করে এখন ঘোরতর সাধু।

এর উপরে আরও এক তাজ্জব বস্তু এসে পড়ল—

দু-দুটো পাশ-করা শিক্ষিত মেয়ে কাঞ্চনমালা। শৈলধর ঘোষের ছোট মেয়ে কাঞ্চন। মা নেই। মা মারা গেলেন, কাঞ্চন তখন দশ বছরেরটি। আর শৈলধরের একমাত্র ছেলে বেণুর বয়স চোদ্দ।

মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে মামা এসে পড়লেন। জগন্নাথ চৌধুরি, মস্ত মানুষ তিনি। শৈলধরকে বললেন, দিদি চলে গেলেন, আপনার তো এই অবস্থা ঘোষজা মশাই। বেণুধর একমাত্র ছেলে আপনার, তার সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি নে। কাঞ্চনকে দিয়ে দিন আমায়। তিনটে মেয়ের বিয়ে আপনি দিয়েছেন, কাঞ্চনের দায়ভার আমার উপরে। উপযুক্ত রকমে মানুষ করে কলকাতা থেকেই বিয়েথাওয়া দিয়ে দেব। আপনাকে ঝামেলা পোয়াতে হবে না।

জগন্নাথের ছেলেপুলে নেই। টমাস ব্রাইটন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার তিনি, অঢেল রোজগার। পাহাড় প্রমাণ টাকা জমেছে—শৈলধর ও বহুজনের অনুমান। খরচ করে হালকা হবেন, সেজন্য ছটফট করছেন অনেক বছর ধরে। কাঞ্চনের মা থাকতেও একবার কথাটা উঠেছিল।

কী একটা যোগ উপলক্ষে শৈলধর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে জগন্নাথের বাড়ি উঠেছিলেন। গঙ্গাস্নান করবেন, এবং শহর কলকাতা দেখবেন। কাঞ্চন একেবারে শিশু তখন। জগন্নাথের স্ত্রী জ্যোৎস্না বন্ধ্যা, ফাঁকা ঘর-সংসার। ফুটফুটে মেয়েটাকে তাঁর বড় ভাল লাগল, ননদিনীর কাছে চেয়ে বসলেন। শৈলধর নিমরাজী, কিন্তু কাঞ্চনের মা আগুন হলেন: গর্ভের সন্তান বিলি করে দেবো, টাকার দেমাকে এত বড় কথা মুখের উপর বলতে পারল।

এর পরে কুটুম্ববাড়ি একটা দিনের বেশি কিছুতেই তাঁকে রাখা গেল না।

বোন গত হলে সংবাদ পেয়ে জগন্নাথের মতো মানুষ নিজে দুর্গম দুধসর গাঁ অবধি এসে চড়লেন পুরনো প্রস্তাব নিয়ে। বুদ্ধিটা জ্যোৎস্নার, তিনিই ঠেলে ঠুলে পাঠালেন স্বামীকে: চলে যাও। দুঃসময়ে তোমার নিজে গিয়ে পড়া উচিত। এবারে কথা তুললে ঘোষজা মশায় আর আপত্তি করবেন না।

কিন্তু কায়দায় পেয়েছেন শৈলধর, অত সহজে তিনিই বা ছাড়বেন কেন? মেয়ের সঙ্গে ছেলে বেণুধবকেও জুড়ে দিলেন : নেবে তো দুটিকে একসঙ্গে নিয়ে যাও। নয় তো থাক। সেই সেই ভিটে পাহারা দেবো, দুপুরে রাত্রে হাঁড়ি চড়াবো, কাঞ্চন গিয়ে তবে আমার সুরাহাটা কি? বাপ-ছেলের চলে তো মেয়ে নিয়েও অসুবিধে হবে না।

বেশ তো, বেশ তো। জগন্নাথ এককথায় রাজী : এর চেয়ে আনন্দের কথা কি। সবেধন-নীলমণি আপনার, যদি কাছছাড়া না করতে চান—বেণুর কথা সেইজন্য জোর করে বলিনি। তা বেশ, ছেলেমেয়ে দুটিই চলুক আমার সঙ্গে।

ভাই বোন উভয়ে বড়লোক মামার বাড়ি চলে গেল। শৈলধর একা। তিন-তিনটে মেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরের ঘর করছে, পিতা শৈলধরের অতএব ভাবনা কিসের? বড়মেয়ের বাড়ি একমাস, মেজমেয়ের বাড়ি একমাস, সেজমেয়ের বাড়ি একমাস—পালা করে এমনি চলল। বছরে মাস ব'রোটার বেশি নয়—চারবার এই নিয়মে কুটুম্ববাড়ি গেলেই হল।

দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছে শৈলধরের। কলকাতায় মামাবাড়ি ছেলেমেয়ে দুটো সুখেই আছে, লেখাপড়া করছে। আশ্চর্য মেধাবিনী কাঞ্চন, টপাটপ দুটো পাশ করে ফেলল। বেণুধর এমনি বেশ ভাল হলেও লেখাপড়ার ব্যাপারে কেমন যেন। বার দুই-তিন ফেল হয়ে গড়াতে গড়াতে ম্যাট্রিকটা পাশ করল। চেষ্টাচরিত্র করে জগন্নাথ তাকে একটা মেশিন-টুল ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দিলেন—কাজ-কর্ম শিখবে, পকেট খরচাও পাবে কিছু কিছু। শিখে নিতে পারলে বি. এ, এম এ. পাশের চেয়ে অনেক বেশি রোজগার। চাই কি আলাদা কারখানা করে এম এ. পাশ কেরানী মাইনে করে রাখতে পারবে—সমর গুহর মতোই এম. এ. পাশ-করা ছেলে।

আর কাঞ্চন? রূপ যেন ফেটে পড়ছে। নাম কাঞ্চন তো সত্যি সত্যি বুঝি কাঞ্চন দিয়ে গড়া। চোখে হারান তাঁরা মেয়েটাকে—জগন্নাথ-জ্যোৎস্না দুজনেই।

জগন্নাথ বলেন, পড়াব ওকে, যতদূর খুশি পড়বে। কলেজ খুলে গেলে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়্ কাঞ্চন।

জ্যোৎস্না বলেন, বিয়ে দিয়ে দেব। মেয়ে থুবড়ো করে রাখতে নেই। জামাই আসা যাওয়া করবে, জামাই নিয়ে আমোদ মচ্ছব করব, বড্ড ইচ্ছে আমার।

স্বামী-স্ত্রীতে কিছু তর্কাতর্কির পর সন্ধি হয়ে গেল : দুই রকমই হতে পারে—বাধা কি? বিয়ে হবে, পড়াও চালিয়ে যাবে কাঞ্চন।

ঘটক-ঘটকী আসছে রকমারি সম্বন্ধ নিয়ে। এর মধ্যে একটি ছেলের আনাগোনা শুরু। সমর। কোন ঘটকের সংগ্রহ নয়, এমনিই এসে পড়েছে।

শিক্ষিত হয়েও ছেলেটির ব্যাপার-বাণিজ্যে মতি। চায়ের বাক্স সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে অফিসে আসে। আসত গোড়ার দিকে ক্যাশিয়ার শ্যামকান্তর কাছে। ক্রমশ ম্যানেজার জগন্নাথ অবধি পৌঁছে গেল। জগন্নাথই একদিন সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। বাড়ির ছেলের মতোই সে এখন।

নজরে ধরবার মতো ছেলে। দোহারা ফর্সা চেহারা, মধুর কথাবার্তা। ইকনমিকসে এম. এ., স্মার্ট চালচলন—

জ্যোৎস্না কতবার বলেছেন, দিব্যি ছেলেটি, এইখানে তবে পাকাপাকি করা যাক। যে বেশি বাছতে যায়, তার শাকেই পোকা।

ছেলে ভাল—জামাই করবার মতন ছেলে, সন্দেহ কি। জগন্নাথ খুবই টানেন সমরকে। প্রায় একচেটিয়া কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে সে এখন, তাই নিয়ে অফিসে কথাও উঠেছে। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গে উৎসাহ দেখান না জগন্নাথ। ভালর উপরেও ভাল থাকে। পাকাকথা দিলে আর ফেরানো যাবে না। কাঞ্চনের বর কত উৎকৃষ্ট হবে, ভেবে তিনি দিশা করতে পারেন না।

জ্যোৎস্না হেসে বলেন, তুমি পাকা না করলে কি হবে। কোন্ দিন দেখবে, জোড়ে এসে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করছে। কাঞ্চনই পরিচয় করিয়ে দেবে: ম মা, তোমাদের জামাই—

জগন্নাথ উড়িয়ে দেন: কিছু না, কিছু না। কাঞ্চন সে মেয়ে নয়। বয়সটা খারাপ বলে চোখের নেশা। আজকালকার মেয়ে ওরা—আরও ভাল পাত্তর জুটিয়ে আনো, লহমার মধ্যে সেইদিকে মন ঘুরিয়ে নেবে।

অতএব ঘটকের কাজ আরও জোরদার চলল। ভাল ভাল সম্বন্ধ আনছে, জগন্নাথের মন ভরে না: আরও দেখুন ঘটকমশায়রা। মেয়ে দেখেছেন, পাত্রও তেমনি নিখুঁত চাই। সকল দিক দিয়ে—শিক্ষায় চেহারায় আচরণে। টাকাকড়ি আছে না আছে বড় কথা নয়, মেয়ে আমাদের খালি হাতে যাবে না।

জ্যোৎস্না জোর দিয়ে বলেন, টাকাকড়ি বেশি থাকলে তেমন সম্বন্ধ বাতিল। বড়লোকের বড্ড দেমাক। টাকা না থাকলে জামাই মেয়ের অনুগত থাকবে—উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। কুটুম্বিতে বেশি জমবে আমাদের সঙ্গে।

এমনি মনোভাব স্বামী-স্ত্রী দুজনের, উদ্যোগ-আয়োজন চলছে সেইভাবে। হঠাৎ সমস্ত বানচাল হয়ে গেল বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মতো। কোম্পানির কী সমস্ত কালোবাজারি বেরিয়ে পড়ল অফিসের কাগজপত্র শিল করে পুলিস মোতায়েন হল। ডিরেক্টর গ্রেপ্তার হলেন এবং জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে জগন্নাথও।

ডিরেক্টর তারপরে কোন্ কৌশলে ছাড় পেয়ে গেলেন, ঈশ্বর জানেন এবং এনফোর্সমেন্ট বিভাগও নিশ্চয়)। যাবতীয় দায় বর্তাল একলা জগন্নাথের উপর। বরখাস্ত হলেন এই প্রবীণ বয়সে, তাঁর চেয়ারে নতুন

ম্যানেজার বসে কোম্পানি চালাচ্ছে। বাইরের কোন নতুন মানুষ নয়—শ্যামকান্ত ক্যাশিয়ার ছিলেন, তাঁরই পদোন্নতি।

জগন্নাথ জামিনে খালাস আছেন। চিরকালের সম্মান-প্রতিপত্তি কয়েকটা দিনে রসাতলে তলিয়ে গেল। তদ্বিরের জন্য টাকার আবশ্যক। আইনসঙ্গত তদ্বির এবং গোপন তদ্বির—যার নাম ঘুষ। সে টাকার লেখাজোখা নেই। আপৎকালে দেখা গেল, জগন্নাথের রোজগার যেমন অঢেল ছিল খরচও তেমনি। জাঁকজমকে থাকা মানুষ, টাকা পোকার মতো গায়ে কামড়ায়, খরচা করে ফেলে নিরুপদ্রব হতেন। সঞ্চয় কিছুই নেই শুধু বাড়িখানা ছাড়া। বাড়ি এবং যাবতীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে দিলেন। সমস্ত ঘুচিয়ে নগদ টাকা নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে কোন এক বস্তির চালায় আত্মগোপন করবেন, মরে গেলেও ঠিকানা জানতে দেবেন না কাউকে। চেনা লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা। শুধুমাত্র কাছারি-আদালত ও সরকারি কোন কোন বিভাগে অবরে-সবরে আত্মপ্রকাশ করবেন।

বেণুধর ইতিমধ্যেই মেসে গিয়ে উঠেছে। বলে, এদিকে এই কাণ্ড হয়ে গেল—তার উপর বাবা বাড়ি থেকে কেবলই চিঠি লিখছেন, সংসার অচল। মাসে মাসে তাঁকে টাকা পাঠাতে হবে। সামান্য হাত-খরচায় চালাব কি করে মামা, ফ্যাক্টরির শিক্ষানবিশি ছেড়ে ওদের অফিসের কেরানী হয়ে গেলাম।

আর কাঞ্চন ?

চলে যাক সে ভুধরের বাপের কাছে। তাছাড়া অন্য কোন্ উপায় ? চোখের জল মুছে জগন্নাথ বললেন, আমার সাজানো সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। হিংসুটে লোকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছে। আমি ছাড়ব না। জীবন পণ করে লেগে পড়ে রইলাম। সামলে উঠব ঠিকই, দিন ফিরবে। সবাই তখন আবার একসঙ্গে জমব। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস হয়েছিল, আমাদেরও তাই। তোর, বেণুর, আমার, তোর মামীর—এবাড়ির সকলের।

ভুধরের পৈতৃক ভিটায় শৈলধর ইদানীং স্থায়ী হয়ে আছেন। বয়স হয়ে শরীর একেবারে ভেঙেছে—পালা বেঁধে মেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পেরে ওঠেন না। তাছাড়া মেয়ে-জামাইয়ের উপর শ্বশুর-ভাসুররা সব আছেন—দিনকাল খারাপ, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, নিয়মিত কুটুম্বটির সম্বন্ধে আজকাল তাঁরা বড্ড খিটখিটি করেন। নাকি বলাবলি হচ্ছে, ঘর-জামাই জানা আছে—জামাই শ্বশুরবাড়ির পোষ্য হয়ে থাকে। এমনধারা ঘর-শ্বশুর কোনকালে কেউ দেখেনি বাবা—জামাইদের শ্বশুরকে পুষতে হয়।

বাপের সম্বন্ধে মেয়েরা এই সমস্ত কুচ্ছোকথা শোনে। বড়মেয়ে এক দিন তো মুখের উপর স্পষ্টাস্পষ্টি বলল, বাবা তুমি এসো না আর এদের বাড়ি।

শৈলধর খিঁচিয়ে উঠলেন : আসতে হয় প্রাণের টানে। মেয়ে তোরও আছে—বিয়েথাওয়া হয়ে পরঘরি হোক, কেন আসি সেই দিন বুঝতে পারবি।

মেয়ে জেদ ধরে বলে, তা হোক, আসবে না তুমি আর কখনো। এ বাড়িতে যদি দেখতে পাই—বিষ খাব, নয়তো গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

অন্য দুই মেয়ের কথাও প্রায় এমনি। হেন অবস্থায় কী করে তাদের বাড়ি যাতায়াত চলে! অগত্যা দুধসরের বাড়িতেই চেপে বসতে হল।

হাত পুড়িয়ে কোন রকমে দুবেলা দুটো চাল নিজের জন্য সিদ্ধ করে নিচ্ছিলেন, এর উপর কাঞ্চন এসে পড়ল। যেমন তেমন নয়, শহরের পথে জুতো খুটখুট করে-বেড়ানো বাবুমেয়ে। বিপন্ন হয়ে গাঁয়ে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু সাজপোশাক ঠাটঠমক কিছুই ছেড়ে আসে নি। কত রকমের বায়নাক্কা নিয়ে এসেছে কে জানে। বেণুধর দশ টাকা করে পাঠায়, সম্বলমাত্র নেই। আর কিছু ক্ষেতের ধান। চোখে অন্ধকার দেখছেন শৈলধর।

কাঞ্চনেরও তাই। অন্ধকার চতুর্দিকে। শৈশবটা দুধসরে কেটেছিল, তারপর থেকে গাঁয়ের কিছু জানে না যে। গাঁয়ের নামে শিউরে ওঠে মামা-মামী। আসতে দেন নি কখনো। মা নেই, বাপের ঐরকম বাউণ্ডুলে দশা—এসে উঠতই বা কোথা? শৈলধর একবার দুবার গিয়েছেন কলকাতায়, কিন্তু বড়লোকের বাড়ির বাঁধা নিয়মকানুনে পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছেন। জগন্নাথও তাই চান—ঐ রকম চেহারা ও আচরণের মানুষ ভগ্নিপতি পরিচয়ে ঘোরাফেরা করবেন, এতে তাঁর ইজ্জতহানি হয়।

সেই মেয়ে গাঁয়ে চলল। যাচ্ছে চলে চুপিসারে। তবু যার কানে যায় সে-ই হা-হুতাশ করে। সকলের বড় বান্ধবী মঞ্জুলা—

বিদায় দিতে এসে সে বলে, হৈ-চৈ ছাড়া থাকতে পারিসনে। অজজঙ্গি জায়গায় কথার দোসরই মিলবে না তোর।

কাঞ্চন ছল-ছল চোখে বলল, দুনিয়ার মধ্যে কোনখানে আমার ঠাঁই নেই ঐ গ্রামটুকু ছাড়া।

তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে মঞ্জুলা প্রবোধ দিয়ে বলে, একদিক দিয়ে ভালই—নতুন এক ধরনের জীবন দেখে আসবি। এসে যাবি আবার দু-পাঁচ মাসের ভিতর, ভাবনা কিছু নেই।

কাঞ্চন বলে, চাকরি? কত কত বিদ্বান গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমার মতো আধামুখ্যুকে ডেকে কে চাকরি দিচ্ছে?

আবার কত কত আকাট-মুখ্যুও ভাল চাকরি করছে, খোঁজ নিয়ে দেখ। মিনিস্টার অবধি হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হয়ে কত রকম সুবিধে!

সুর বদলে মিটিমিটি হেসে মঞ্জুলা আবার বলে, চাকরি না-ই বা হল—কোন্ দুঃখে চাকরি নিতে যাবি, বিয়ে করতে চলে আসবি। খবর টের পায়নি তাই—তুই গেছিস বলে কত জনার বুক-ফাটা নিশ্বাস উঠবে, ছুটে চলে যাবে সেই গ্রাম অবধি তোকে বন্দী করে আনার জন্য।

ঠেস দিয়ে কার কথা বলে মঞ্জুলা ? আবার কে—সমর ছাড়া। সমরকে নিয়ে জলুনি আছে মনে মনে। ক্যাশিয়ার শ্যামকান্তর ভাইঝি মঞ্জুলা—ইদানীং নতুন ম্যানেজার যিনি। একদা সমরের বেশি রকম যাতায়াত ছিল ওদের বাড়ি। তারপরে মন কষাকষি—শোনা যায় ঝগড়াঝাটিও হয়ে গেছে মঞ্জুলার সঙ্গে।

কী কান্না কাঁদল কাঞ্চন যাবার দিনে। সকল স্বপ্ন গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মামী আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছিয়ে দেন। যত মোছেন, আবার জলে ভরে যায়।

বেণুধর বোনকে নিয়ে পৌঁছে দেবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধীর হয়ে উঠল —বিদায়-পর্ব সমাধা হয় না কিছুতে। বিরক্ত কণ্ঠে বলে, কান্নার কি আছে রে ? যাচ্ছিস নিজেদের বাড়ি, যাচ্ছিস বাবার কাছে। ভাবখানা বনবাসে চললি যেন তুই।

জ্যোৎস্না বকে ওঠেন বেণুকে : গাঁ-ঘরের কথা মনে আছে নাকি ওর ? বাপকেই বা চিনল কবে ভাল করে ? সত্যি সত্যি বনবাসে যাওয়া। অমন করে তাড়িয়ে তুলিস নে বেণু। কাঁদে তো কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে খানিক হালকা হোক।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : আমরা গুহাবাসে চললাম, মেয়ে চলল বনবাসে।

আঁচলে চক্ষু মার্জনা করে কাঞ্চন তাড়াতাড়ি বলে, তোমরা কোথায় গিয়ে উঠবে, আমায় অন্তত ঠিকানাটা দাও। আমার যাবার তো উপায় রইল না, গ্রাম থেকে চিঠিপত্তর দেবো এক-আধখানা।

আমি জানিনে মা, ঠিকানা উনি আমাকেও বলেন না। কি বলেন জানিস। পর্বতের গুহায় থেকে হাইকোর্টের তদ্বির হয় না, তাহলে সত্যি সত্যি সেখানেই আস্তানা নিতাম। তা শহরের উপরেই সেইরকম গুহা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মুখ দেখাবেন না লোকের কাছে। পেয়েছেন একটা যদ্দুর জানি। তুই যাচ্ছিস। দু-চার দিনের মধ্যে আমরাও চলে যাব আমাদের সেই জায়গায়।

গোপাল সামন্ত পুরনো আরদালি। তার উপরে মামার সবচেয়ে বিশ্বাস—বোধকরি মামীর চেয়েও। গোপালকেও কাঞ্চন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছে। না, সে কিছু জানে না। পাকাপাকি হয়নি সম্ভবত। আর গোপালের জানা মানে তো ঘরের এই দেয়ালটা কি ঐ আলমারিটার জানা—টু-শব্দটি বেরুবে না তার মুখ দিয়ে।

কাঞ্চনকে জ্যোৎস্না সাজিয়ে দিচ্ছেন। হাল আমলে বেশি গয়না মেয়েদের অপছন্দ। যে ক'খানা আছে সমস্ত পরিয়ে দিলেন তিনি।

সজল চোখে হেসে কাঞ্চন বলে, শাড়িও যত আছে, একের পর এক জড়িয়ে দাও মামী।

সত্যিই তাই আমার ইচ্ছে করছে। একটা শাড়ি পরে এসে দাঁড়ালি। বদল করে আবার একটা পরে আসবি। ফের আবার। যাবার আগে সমস্তগুলো শাড়ি পরিয়ে এক একবার দেখে নেবো।

সারা দিনমান কেটে যাবে মামী, আজকে আর যাওয়া হবে না। কালও নয়। চল্লিশটা মেয়ে নিয়ে সেই যে ফ্যাশান-প্যারেড করেছিল, আমার একলাকে দিয়ে তাই হবে।

জিনিসপত্র দিয়ে:তারপর ট্যাক্সিতে উঠল। স্যুটকেশই পাঁচটা—

বেণুধর বলে, উঃ, মহারাণীও এমন হয় না রে। গাঁয়ের মানুষের চোখ ঠিকরে যাবে।

কেন?

এত সাজসজ্জা কোন জন্মে তারা দেখেছে নাকি? ভাবতে পারে না, একটা মানুষের জন্য এত সব লাগে।

॥ দুই ॥

খান দুই খোড়োঘর নিয়ে শৈলধরের বাড়ি। নড়বড়ে বেড়া, ঝড় বাতাসে খড়ের ছাউনি খানিক খানিক উড়ে গেছে। বৃষ্টি হলে টপ টপ করে ঘরের মধ্যে জল পড়ে, জিনিসপত্র এদিক-ওদিক নাড়ানাড়ি করতে হয়। বাইরের বৃষ্টি থেমে যায়, ঘরের বৃষ্টি তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। মেরামতের উদ্যোগ নেই শৈলধরের। টাকাই বা কোথা? মেয়েদের শ্বশুরবাড়িগুলো বিগড়ে যাওয়ার আগে ঘরের কোন প্রয়োজন ছিল না—কুটুম্বর ঘরে দিব্যি আরামে কাটত।

সেই ভাঙাঘরে শহরের ঝকমকে মেয়ে কাঞ্চন।

গ্রামসুদ্ধ রটনা হল, গ্রামের বাইরেও গেল কথাটা— ভপোশাক কাকে বলে, দেখে এসো শৈলধরের বাড়ি গিয়ে। হেন তাজ্জব কাণ্ড, শহরে যাদের যাতায়াত তাদের দেখা থাকতে পারে, কিন্তু গ্রাম নিয়ে যারা পড়ে আছে তাদের চোখে নতুন। ঘন ঘন কাপড়-জামা বদলায়—দিনের মধ্যে শতেকবার। কখনো আকাশের রং, কখনো রক্তের রং, কখনো ছাইয়ের রং, কখনো বা সর্ষেফুলের রং।

সানু-দি টিপ্পনী কাটেন: বিকারের রোগির ওষুধ বদল করে ডাক্তারে—সকালে লাল অষুধ, সন্ধ্যেয় গোলাপি অষুধ, দুপুরে সাদা অষুধ—সেই জিনিস আর কি!

বিজয় সরকার কলকাতার আমদানি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব উকিল নিয়ে গ্রামের গর্ব—তাঁরই কনিষ্ঠ সন্তান। বাপের সঙ্গে তারাও সব দুধসরের ঘরবাড়িতে এসে উঠেছে। অভাব-অনটন নেই—খায়দায়, কাজকর্মের অভাবে ডাম্বেল-মুগুর নিয়ে শরীরচর্চা করে, এবং ফুলের বাগানে মাটি কোপায়। তার কানে পৌঁছল কথাটা।

স্বভাবতই ফুলের উপমা মনে এসে যায় বিজয়ের। কাঞ্চনের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে: আমিও কলকাতার—

তাই বুঝি। সেইজন্যে কাছাকাছি এগিয়েছেন। আর যত আছে, সামনে পড়লে সরে যায়। শতেক হাত দূর থেকে জুল-জুল করে দেখে। যেন মানুষ নই আমি। জিজ্ঞাসা করবেন তো কি দেখে অমন করে তাকিয়ে—বাঘ-ভালুক, অপ্সরী-কিন্নরী নাকি পেত্নী-শাকচুন্নি?

আর বলে কি জানেন? হাসতে হাসতে বিজয় সানু-দির কথাটা শুনিয়ে দিল।

কাঞ্চন রাগে না, হেসেই খুন।

বিজয় এবারে নিজের কথা শোনায়: আমি ফুলের তুলনা দিলাম। সকালবেলা গোলাপ আপনি, দুপুরে বোগেনভেলিয়া, সন্ধ্যায় হাসনুহানা—

ফুলের শখ বুঝি আপনার? কিন্তু রাগ করবেন না, আপনার উপমা মামুলি। ওদের উপমায় নতুনত্ব আছে।

হাসিখুশির মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলল। বনবাসের মধ্যে এতদিনে মানুষ পেয়ে গেল একটি। শহরের মানুষ, কাঞ্চনের আপন মানুষ।

কৈফিয়ত দিচ্ছে কাঞ্চন: কি করব বলুন, এক-কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনে। অস্বস্তি লাগে, গা ঘিনঘিন করে।

থাকতে যাবেনই বা কেন? এদের কথার ভয়ে? মাছি-পিঁপড়ে জ্ঞান করবেন এদের। পায়ে জুতো পরেন, তা-ও এদের চোখে নতুন। তাই নিয়েও কথা।

কাঞ্চন বলে, মাটিতে ব্যথা লাগে পায়ে—অভ্যাসদোষ। পাখনা নেই যে, তা হলে উড়ে উড়ে বেড়াতাম।

বড়বাড়ির জিমনাস্টিক-করা ছেলে—কাঞ্চনের কাছে শুনে এসে বিষম তড়পাচ্ছে: অসভ্য বর্বর যত। সাতজন্মে যেন মেয়ে দেখেনি। জুল জুল করে তাকিয়ে অপ্সরী-কিন্নরী দেখে। জুতিয়ে মুখ থেঁতলে চোখগুলো ভোঁতা করে দেবো, দাঁড়াও—

তারাপদ-গোমস্তা চুপিচুপি মন্তব্য করে: গ্রামসুদ্ধ কানা না করে একজনকে সামলানোই তো সোজা।

শৈলধর মেয়েকে বলেন, বেরোবার কি দরকার তোর শুনি? ঘরের কাজকর্ম নিয়ে থাকবি—

ওদের ভয়ে? হেসে কাঞ্চন উড়িয়ে দেয়: আমি তো উল্টোটাই ভাবছি বাবা। বেশি করে ঘুরব, যত খুশি দেখুক। দেখলে গা-হাত-পা ক্ষয়ে যাবে না।

এর পরে কাঞ্চন সেজেগুজে জুতো খুটখুট করে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেশি করে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ায়।

আলোচনা আরও তুমুল হয়ে ওঠে। মেয়েটার সুঠাম চেহারা নিয়ে, তার কাপড়চোপড় নিয়ে, গাত্রবর্ণ নিয়ে। শহরের উপর আরামে থেকে দুধ-ঘি আঙুর-আপেল খেলে খেঁদি-পেঁচিরও চেহারা খুলে যায়। দামী কাপড়-চোপড় বড়লোক মামা জুগিয়ে এসেছে—সে চাকে মধু ফুরিয়ে গেছে এখন। যেগুলো নিয়ে এসেছে পুরনো হয়ে ছিঁড়েছুটে যাক, তারপরে আমাদেরই মতন কস্তাপেড়ে শাড়ি ধরবে। কৌটো কৌটো মলম ঘষে আর এসেন্স ছিটিয়ে গায়ের বর্ণ, গায়ের গন্ধ। খরচা করে এই তদ্বির কদ্দিন আর বজায় রাখবে—দু-মাস ছ'মাস যেতে দাও, প্রতিমার জৌলুষ গিয়ে খড়মাটি বেরিয়ে পড়বে তখন।

একটা মানুষ শোনা যাচ্ছে আত্মহারা একেবারে। সে হল নিরঞ্জন। কাঞ্চনের দুর্দশায় বড় আনন্দ তার। হেসে হেসে নিরঞ্জন নাকি বলে বেড়াচ্ছে, দিব্যি হল, শৈল-কাকা ঘরদোর সেরে নিন। আমরাই সাথেসঙ্গে থেকে করে দেবো। সোমত্ত মেয়ে ভর করেছে, বাপে-মেয়েয় দুটিয়ে সংসারধর্ম করুন একত্তরে গ্রাম ছেড়ে কোন দিন আর যেন নড়ার মতলব না হয়।

এর মুখে তার মুখে কাঞ্চনের কানেও গিয়ে পৌঁচেছে। মেয়ে-লোকে নিন্দেমন্দ করে, সে জিনিস বোঝা যায়। বিড়াল আর মেয়ে—এই দুটো জাতের স্বভাব এক অন্যকে দেখতে পারে না। কিন্তু পুরুষছেলের মুখে এহেন কথা—শুনে অবধি কাঞ্চন রাগে ফুঁসছে।

কে বলো তো লোকটা ?

শৈলধর জবাব দেন : গাঁয়ের ছেলে। ইংরেজি সই বাংলা সই দু-রকমই করতে পারে। ভেরেণ্ডা ভেজে বেড়ায়। এর বেশি কোন পরিচয় নেই।

নিরঞ্জনের পরম বশম্বদ শাগরেদ নীলমণি। শৈলধরের ঐ পাড়ায় বাড়ি। কাঞ্চন একদিন তার উপর গিয়ে পড়ে : কী রকম মানুষ তোমার নিরঞ্জনদা।

একগাল হেসে নীলমণি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, মানুষ বড্ড ভাল গো দিদিমণি —অমন মানুষ হয় না। দুধসরের সবাই ভালবাসে, আলাপ-পরিচয় করো তুমিও ভালবেসে ফেলবে।

কথার কি শ্রী। হায় ভগবান, থাকতে হবে এদেরই একজন হয়ে!

কড়া সুরে কাঞ্চন বলে, মানুষ বলাই ভুল হয়েছে আমার। পরের কষ্টে স্ফূর্তি পায়, কখনো সে মানুষ হতে পারে না। মানুষের চেহারায় পশু একটা। আলাপ-পরিচয় করতে বয়ে গেছে—দেখা পেলে আচ্ছা করে একবার শুনিয়ে দেবো।

গালিটা নিরঞ্জনের উদ্দেশে। কিন্তু নীলমণির মুখ পাংশু বেদনা-বিহ্বল। তারই বুকের উপর যেন মুগুরের ঘা পড়ল। কৈফিয়তের ভাবে তাড়াতাড়ি বলে, ভুল শুনেছ দিদিমণি। স্ফূর্তি হয়েছে মানি—তার হয়েছে, আমারও হয়েছে। কিন্তু কষ্ট দেখে নয়। দুধসর গাঁয়ে একটা মানুষ বাড়ল সেইজন্য।

ফলাও করে খোশামুদির ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছে, যেমন তেমন মানুষ নয়—

সে মানুষ হলে তুমি। পাশ-করা মেয়েমানুষ। তল্লাটের হিসাব নিচ্ছিলাম আমি আর নিরঞ্জনদা। দুটো থানার ভিতর সমস্তগুলো গাঁ-গ্রাম চষে ফেলে ও-জিনিস বেরুবে ছ'টা কি সাতটা। তার মধ্যে আমাদের দুধসরের ভাগে পড়ে গেল একটা—তুমি। দুধসরে পাশ-করা মেয়ে, সুজনপুরে ফক্কা। তুমি এসে কায়েমি হয়ে উঠলে, সেই দিন থেকে জাঁক করে আমরা ইতরভদ্র সকলকে শুনিয়ে বেড়াচ্ছি—আর সুজনপুরের মানুষ লজ্জায় হেঁটমুণ্ড হয়ে আছে। স্ফূর্তি তবে আসে কিনা বলো বিবেচনা করে।

গাঁয়ে এসে কাঞ্চন বিস্তর আজব জিনিস দেখছে—তার মধ্যে একটা এই গ্রামভক্তের দল। মঞ্জুলাকে চিঠি লিখল :

বাঙালি বললে প্রাদেশিকতার দোষ অর্শায়, ভারতীয় বলাও সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়, বিশ্বনাগরিক আজ আমরা। এমন দিনেও এরা কূপমণ্ডূক হয়ে পড়ে আছে। গ্রাম দুধসর আর গ্রাম সুজনপুরে পাল্লাপাল্লি। সেই যা প্রভাত মুখুজ্জের গল্পে পড়েছিলাম। বিশ্বাস করতাম না, ভেবেছি গল্পই শুধু। এবারে চোখের উপর দেখছি অবিকল সেই জিনিস। জীবনে আর কোন উপভোগ নেই, এই সব নিয়েই আছে হতভাগ্যেরা। আমার নির্জন কারাবাস—পুরো একগ্রাম মানুষ চতুর্দিকে, তবু নিতান্ত নিঃসঙ্গ আমি। আলাপ করব কার সঙ্গে—আমার কথা ওরা বুঝবে না, ওদের বুলিও আমি জানিনে। যেন মাঠের ভিতর একপাল পশুপাখী পরিবৃত হয়ে আছি। কবে মুক্তি পাব জানিনে। কতজনকে লিখছি, যেমন তেমন একটা চাকরি কলকাতার উপর—

সেই নিরঞ্জনকে কাঞ্চন একদিন সামনাসামনি—একেবারে বাড়ির উপরে পেয়ে গেল। ছোট্ট গ্রামের মধ্যে ইতিপূর্বেও যে দেখেনি তাকে, তা নয়। এগিয়ে কথা বলতে গেলে মান দেখানো হয়, সেজন্য বলেনি কখনো কিছু। বেড়ানো সেরে আজকে কাঞ্চন উঠানে পা দিয়েছে—দেখে, নিরঞ্জন আর শৈলধর সেই সময়টা দাওয়া থেকে নামছেন।

কাঞ্চন বলে, আপনার সঙ্গে কথা আছে নিরঞ্জনবাবু।

নিরঞ্জন বলে, শুনেছি বটে নীলমণির কাছে। কিন্তু বাবু বলছ কেন, আমার মধ্যে বাবু দেখলে কোন্‌খানটা ? জামা নেই, জুতো নেই, পায়ে এক-হাঁটু ধুলো, ক্ষৌরি হয়নি আজ দশ-বারো দিন। শহরে না-ই থাকি, বাবু, কিছু কিছু দেখা আছে বই কি।

ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। আবার বলে, সামনের উপর খাতির করে বাবু বলছ, নীলমণিকে বলেছ তো উল্টো কথা। নরাকারে পশু একটি আমি।

শৈলধর লজ্জায় তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন : না, কখনো নয়। বাজে কথা, মিথ্যে কথা। ওসব কেন বলতে যাবে, বিশেষ করে তোমার মতন ছেলের নামে।

কিন্তু মেয়ের মুখে তাকিয়ে প্রতিবাদে জোর আসে না। থেমে পড়লেন।

কাঞ্চন বলে, বাড়ির উপর আজ কি মতলবে? শহরের বাস ছেড়ে কোন সুখে আছি, চোখে দেখতে বুঝি? দেখে মজা লাগে?

নিরঞ্জন কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগে শৈলেশ্বর ধমকে ওঠেন: আমি খবর দিয়ে এনেছি। তুই ক্যাট-ক্যাট করবার কে রে? বাড়ি আমার না তোর?

চুপ হয়ে গেল কাঞ্চন। ঘাড় নেড়ে শৈলেশ্বরের কথায় সায় দিয়ে নিরঞ্জন পরম তৃপ্তিতে উপভোগ করছে।

শৈলেশ্বর বলছেন বেণু দশ টাকা করে পাঠায়, আমার ওষুধে আফিঙেই প্রায় তা লেগে যায়। ক্ষেতের চাট্টি ধান, দু-দুজন লোকের এ-বাজারে তার উপরে নির্ভর করে থাকা চলে? তারই একটা ব্যবস্থা দেখছি। বুড়োবয়সে না খেয়ে মরব, তা-ই কি চাস তুই?

নিরঞ্জন একগাল হেসে সঙ্গে সঙ্গে সুসংবাদ দিল: বালিকা-বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস হয়ে যাচ্ছ যে তুমি—

অবাক হয়ে কাঞ্চন বলে, বালিকা-বিদ্যালয় আপনাদের এই গাঁয়ে? কোথায় বিদ্যালয়—দেখিনি তো। কানেও শুনিনি।

নেই এখনো। তবে তুমি এসে পড়েছ, হতে কি আর বাকি থাকবে?

সগর্ব দৃষ্টি তুলে বলতে লাগল, তোমায় পেয়ে গেছি, দস্তে তৃণ ধরিয়ে ছাড়ব এবার সুজনপুরকে। পোস্টাপিস নিয়ে ওদের বড্ড দেমাক। পোস্টাপিস আপাতত পেরে উঠছিনে—পিওনমশায় যদ্দিন আছেন বর্তমান আছেন। বালিকা বিদ্যালয়ে এবং পোস্টাপিসের শোধ তুলে নেবো।

কাঞ্চন ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কদিন থাকি আপনাদের গাঁয়ে দেখুন। কলকাতা ছেড়ে এসেছি, কিন্তু কত আপন লোক সেখানে আমাদের—কাজকর্ম কিছু না কিছু হবেই। হলে যেখানকার মানুষ সেখানে চলে যাব।

একটু থেমে নিরঞ্জনের মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে কি দেখল। বলে, বাবাকেও নিয়ে যাব, গাঁয়ে একলা পড়ে থাকতে দেব না। দাদাকেও মেস থেকে সরিয়ে সকলে একসঙ্গে বাসা করে থাকব। এ বাড়ির দরজায় তালা ঝুলবে।

নিতান্ত সে ভয়-দেখানো কথা, তা ও মনে হয় না। পিওনমশায়ের পেট-মোটা ব্যাগই তার প্রমাণ। হাটবারের দিন সুজনপুর থেকে ব্যাগ ভরতি একগাদা চিঠি নিয়ে আসেন। আবার নিয়েও যান এক গাদা চিঠি ডাকে ফেলবার জন্য। কাঞ্চন গাঁয়ে আসবার আগে এর অর্ধেক বোঝাও পিওন মশায়কে বইতে হত না।

পিওনমশায়ও ঠিক এমনি বলেন, চিঠি মেয়েটার নামে আসে যেমনি লেখেও নিজে তেমনি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর এই বড় দোষ—কাজকর্ম নেই তো লেখ বসে বসে চিঠি। বিয়ে হয়ে ও-মেয়ে যাদের ঘরে

যাবে, চিঠি লিখে লিখেই তাদের ফতুর করে দেবে।

পিওনমশায়ের কথা আগে নিরঞ্জন নিস্পৃহ ভাবে শুনে যেত। আজকে কাঞ্চনের কথাবার্তা শোনার পর আতঙ্ক হল রীতিমতো।

নিরীহ চিঠি নয় সে-সব। কলকাতার আপন-লোকদের কাছে চিঠি লিখে লিখে পালানোর ষড়যন্ত্র।

কাঞ্চন স্পষ্টাস্পষ্টি কলহ করে: গাঁয়ের নরককুণ্ডে পড়ে থেকে আমি জীবন খোয়াব? কখনো না, কখনো না। আমি সে মেয়ে নই। হেডমিস্ট্রেস তো করেছেন, তার জন্য মত নিয়েছেন আমার?

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বলে. ও শৈল-জেঠা, আপনার মেয়ে বলে কি শুনুন। আপনি বলে দিয়েছেন, তাতে নাকি হয়নি। উনি মস্ত বড বুদ্ধদার হয়েছেন, ওঁর মতামতও চাই।

গ্রামের নিন্দেয় চটে গেছে, কৌতুক-হাসি হেসে নিরঞ্জন তারই শোধ নেয়। বলে, এদ্দিন মামার বাসায় ছিলে, মামা মতামত দিতেন। এখনবাবার কাছে আছ, মত তারই কাছে নিতে এসেছি। ভাইয়ের কাছে যদি থাক, সে মত দেবে। বিয়ে হওয়ার পরে শ্বশুর বাড়িব মতামত। মেয়েলোকের নিজের বুদ্ধি বিবেচনা থাকে নাকি যে ঘটা করে মত চাইতে আসব? বারো হাত শাড়ি পরেও কাছা দেবার বুদ্ধি আসে না, তার আবার মত।

বলতে বলতে অভিমান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: জানো না বলেই দুধসরকে তুমি নরককুণ্ড বলে দিলে। এইটুকু গ্রাম অতবড সুজনপুরের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে যাচ্ছে। ওদের মুন্সেফ আছে, আমাদের সাবজজ। ওদের ডাক্তার, আমাদের তেমনি ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের রায়সাহেব তো ওদের দারোগা—কোন্‌টা বড, তুমিই বিবেচনা করে দেখ। উকিল-মোক্তার দুরকম আছে সুজনপুরে। আমাদের ছিল শুধু উকিল—কিন্তু সে হল হাইকোর্টের উকিল, সুন্দরবনের আসল মানুষখেকো। একজনেই দুয়ের ধাক্কা নিলেন। শুধু এক পোস্টাপিস নিয়ে জিতে রয়েছে—পিওনমশায় শাপশাপান্ত দেবেন, সেই ভয়ে ওদিকটা কিছু করতে পারিনে। তারই শোধবোধ এবারে—বালিকা-বিদ্যালয়। দুটো পাশ-করা হেডমিস্ট্রেস তুমি—সুজনপুর এ জিনিস পাবে কোথায়? শিক্ষিত মেয়ে চাইলেই তো আর মেলে না।

চিন্তিতভাবে বলে, পিওনমশায়ের মেয়েটাকে সদরে নিয়ে পড়াচ্ছে। সুজনপুরের মধ্যে ঐ এক শিবরাত্রির সলতে। পডছে ম্যাট্রিক। সে মেয়ে জানা আছে আমার। পিওনমশায়ের ছেলের সঙ্গে খাতির-ভালবাসা—একফোঁটা বয়স থেকে ভাইবোন দুটোকেই জানি। মেয়ের মাথার মধ্যে গোবর, ইহজন্মে পাশ হতে হবে না।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, পাশ যদি করেও তবু আমাদের নিচে। দুধসরের মেয়ে দু-দুটো পাশ, সুজনপুরের কুল্যে একটা। তুমিও এই ফাঁকে আরও একখানা দুখানা পাশ সেরে নিও, ধরে ফেলতে না পারে

তার উপরে এই যে এক মজার কল বানানো হল—বালিকা-বিদ্যালয়। পাশ-করা মেয়ে তোমাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে আরও বিস্তর আসবে। বিদ্যালয়ে তার বীজ পোঁতা হল। আক্কেলগুড়ুম এবার সুজনপুরের, মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

সাগরেদ নীলমণি ইতিমধ্যে দুই তিন বার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গেছে। কি জানি, কী দরকার। বাইরে থেকে আবার এখন ঐ হাতছানি দিচ্ছে। সাগরেদ বটে নীলমণি, সেই সঙ্গে গুপ্তচরও। জরুরী খবর নিশ্চয় কোন রকম। অতএব কথাবার্তায় আপাতত ইস্তফা দিয়ে হন হন করে নিরঞ্জন শৈলধরের বাড়ি থেকে বেরুল।

নিভৃতে এসে নীলমণি বলে, এক কাণ্ড হল নিরঞ্জনদা। বাঁশতলায় উকিলমশায় ফটিক-বেহারার সঙ্গে ফুসফুস-গুজগুজ করছিল। আমায় দেখে চুপ। চোখ টিপে দিল বোধহয় উকিলমশায়, ফটিক সর্দার বাঁশবন ভেঙে তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে পড়ল। উকিলে বেহারায় অত কি কথা, তখন থেকে তাই ভাবছি।

নিরঞ্জন বলে, বিজয়ের বিয়ের নাকি একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে। কনে নিজে দেখতে যাবেন, তাই বোধ হয় পালকি-বেহারার বন্দোবস্ত করছিলেন।

তা বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে কেন? আমায় দেখে ছুটেই বা পালায় কেন ফটিক? ধরেছি তারপর ফটিককে তার বাড়ি গিয়ে: উকিলমশাই তোকে কি বলছিলেন? আমতা আমতা করে জবাব দেয়: এই শরীরগতিকের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন আর কি?

নিরঞ্জনের মনে তখন বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্যা। অন্য প্রসঙ্গের ঠাঁই নেই। অন্যমনস্কভাবে বলল, তাই একটা কিছু হবে। নয়তো কি আর ফটির বেহারার সঙ্গে দেওয়ানি ফৌজদারি আইনের বিচার হচ্ছিল?

ঘাড় নেড়ে নীলমণি বলে, তা বলে উকিলমশায় ডাক্তারও নন যে অতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরীরগতিকের কথা হবে।

একটু থেমে আবার বলে, আমার সন্দ হয়, কনে দেখা-টেকা নয়—উকিলমশায় কোন একখানে পাকাপাকি পালাবার তালে আছেন। চিরকাল শহরে কাটিয়ে গাঁয়ে আর টিকতে পারছেন না।

উকিলমশায় মানে পুরঞ্জয় সরকার—ভূতপূর্ব হাইকোর্টের উকিল। দুধসর যাঁদের নিয়ে জাঁক করে, তাঁদের মধ্যে প্রধান একটি। নিরঞ্জনের কথায় সুন্দরবনের মানুষখেকো।

রীতিমত পশারওয়ালা উকিল পুরঞ্জয়, দুহাতে রোজগার করতেন বাড়ি দুধসর তো বটেই—বাল্যকালটাও নাকি এখানেই কাটিয়েছেন। কিন্তু কৃতী হবার পর গ্রামে কোনদিন আসেননি। নিরঞ্জন তা বলে ছাড়বার পাত্র নয়। প্রতিবছর বিজয়া-দশমীর পর তাঁকে এবং অন্য সকলকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখে এসেছে। জবাব আসেনি, অতবড় মানুষের কাছে প্রত্যাশাও নেই

তার। এবং চিঠি শুধু নয়, কলকাতায় গেলে তুধসরের গৌরব উকিলমশায়ের বাসায় যাবেই সে একবার। এক কাপ চা হয়তো কখনো কখনো এসেছে, তার উপরে নয়।

চলছিল এমনি। বছর তিনেক আগে থেকে অবস্থা একেবারে বিপরীত। উকিলমশায়ের ঘোরতর বৈরাগ্য এসে গেল। চিরজীবন মিথ্যা আচরণে কত শত অসৎ মক্কেল বাঁচিয়েছেন, পাপের সহায়তা করেছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, দিন ফুরিয়ে পারের ঘাটে বসেছেন এবার, অবশিষ্ট পরমায়ুর মধ্যে জীবনের পাপ-অন্যায় যথাসম্ভব মেরামত করে নেবেন। প্র্যাকটিশ, মক্কেল-মুহুরি, কলকাতার বাসা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তুধসরে এসে উঠেছেন, জপতপ ধর্মকর্ম ছাড়া কিছু জানেন না। অসুবিধা বিন্দুমাত্র নেই। মেয়েরা সুপাত্রে পড়ে শ্বশুরঘর করছে। বড় ছেলে অজয়ের বিয়েথাওয়া হয়ে নাতি-নাতনি দেখা দিচ্ছে। ছোট ছেলে বিজয়ের বিয়ে এখনই হতে পারে—গাদা গাদা সম্বন্ধ আসছে। গিন্নির দাবিদাওয়ার জন্যে সামান্য আটকে রয়েছে। তুধসরের পৈতৃক বাড়ি আগাগোড়া মেরামত করে দোতলার উপর তিনটে নতুন কুঠুরি দিয়ে নিয়েছেন নতুন সম্পত্তি ও কিনেছেন আরও কয়েকটা। নিলাম ডেকে খেয়াঘাট ইজারা নিয়েছেন। এই সমস্ত নেড়েচেড়ে তুটির দিব্যি কেটে যাবে; চাকরি-বাকরি ব্যাপার-বাণিজ্য কোন কিছুই করবার আবশ্যক হবে না। হেন অবস্থায় যদি পুরঞ্জয় পরকাল নিয়ে মেতে থাকেন, কারো কিছু বলবার নেই।

হচ্ছেও তাই বটে। সর্বক্ষণ শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুজোআচ্চা নিয়ে আছেন তিনি। সংসারে সকলের মধ্যে থেকেও পুরোপুরি অধ্যাত্ম-রাজ্যে বাস। আবার ঈশ্বরে যদি কখনো অরুচি আসে, মুহূর্তে সংসারে চলে পড়বেন, তার ব্যবস্থাও হাতের কাছে রয়েছে। কিন্তু এত থেকেও নাকি পোষাচ্ছে না। চিত্ত বিচলিত। সংসার এবং তুধসর গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য ফটিক-বেহারার সঙ্গে শলাপরামর্শ—

হবে না সেটা আমি থাকতে। নিরঞ্জন খিঁচিয়ে উঠল: যেতে হলে এই বয়সে শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও নয়। তার জন্য ফটিক-বেহারা লাগে না—চালিতে শুয়ে লোকের কাঁধে চেপে চলে যাবেন। চিতেয় গিয়ে শোবেন। আর এক হতে পারে ভস্ম মেখে বিবাগী হয়ে শ্মশানে গিয়ে ওঠা। তাতে আপত্তি নেই, গ্রামের মধ্যেই শ্মশান। তার জন্যেও কিন্তু পালকি লাগে না, পায়ে হেঁটে ড্যাং-ড্যাং করে চলে যাবেন।

নীলমণির বাজে সন্দেহ নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে এবারে আসল সমস্যায় আসে: বালিকা-বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত সারা। মাস্টার ঠিক হয়ে গেছে। এক মাস্টার আপাতত ঐ কাঞ্চন। শৈল-ঠেঠার মত পেয়ে গেছি।

নীলমণি বলে, তোমার ইস্কুল যে বসবে, জায়গার ঠিক হয়েছে? চেয়ার-বেঞ্চি? মেয়ে যারা সব পড়তে আসবে?

হাত নেড়ে অবহেলার ভঙ্গিতে নিরঞ্জন বলে, আসবে সব পরে পরে। ঘোড়া হলে চাবুকে আটকায় না রে! আসলটাই হয়ে গেল—ইস্কুলের মেয়েমাস্টার। সুজনপুর আর সব পারবে, মাথা খুঁড়ে বের করুক দিকি এই জিনিস একটা। সে আর হতে হয় না। মেয়েমাস্টার মুড়িমুড়কি নয় যে দোকান থেকে কিনে আনলাম। পিওনমশায়ের মেয়ে ললিতা—তার বেরিয়ে আসতে অনেক দেরি। গাধা মেয়ে, পাশই করতে পারবে না দেখিস।

নীমলণি মনের পুলক ধরে রাখতে পারছে না। ছ-মাইল দূরের সুজনপুরে তখনই চলে যেতে চায়। বলে, ওদের বাজারখোলায় বসে গল্প করে আসিগে। গ্রামময় চাউর হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। হিংসেয় ছটফট করবে।

সে সব পরে। না বললেও টের পেয়ে যাবে তারা। মাথায় যে মস্ত দায় নিয়ে এলাম, সেই ভাবনা ভাব নীলমণি। মাস্টারের মাইনে পনের টাকা। মাইনের চুক্তি পাকা করে নিয়ে শৈল-জেঠা তবে মত দিয়েছে—ওর থেকে সিকিপয়সাও গ্রামসেবায় চাঁদা বলে কাটা চলবে না। কাটতে চাও তো বিশটাকা মাইনে—পাঁচটাকা তাই থেকে চাঁদা বাবদে বাদ। শৈল-জেঠা ঘড়েল কি রকম বোঝ। মাস্টার নিযুক্ত হয়ে গেল— কাঁটা ঘুরতে লেগেছে আজকের তারিখ থেকেই। মাস গেলে নীট পনের টাকা কোথায় পাওয়া যায় বল্।

ভেবে নিয়ে আবার বলে, সানুদি আছেন তাঁর কাছে কর্জ চাওয়া যায়। আর আমার নিজের যা ছিল, গিয়ে টিয়ে এখনো আছে বোধহয় বিঘে ছয়েক ধান-জমি—

নীলমণি ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি করে: সাবজজ উকিল রায়সাহেব দুধসরের এতসব রয়েছে—বিধবা বেওয়া-মানুষে সানুদির ঘাড়ে গিয়ে পড়া কেন? তোমার নিজের ছ-বিঘে নিয়েই বা উদ্বেগ কিসের? এর পরেও কতবার কত দায় ঠেকাতে হবে তোমার—

উপায় বাতলে দে তবে—

।। তিন ।।

জানে না নীলমণি—পাকা উপায় ইতিমধ্যে বাতলানো হয়ে গেছে। বাতলে দিয়েছে সে-ই। ঐ পুরঞ্জয় উকিলমশায়ের বৃত্তান্ত। নিরঞ্জন কানে নিল না বটে, কিন্তু ফিসফিসানির রকমটা নিজ চোখে দেখে সেই থেকে নীলমণির মোটেই ভাল ঠেকছে না।

তক্কে তক্কে আছে নীলমণি। প্রহর খানেক রাত্রে ফটিক সর্দারের বাড়ি উঁকি দিয়ে দেখল, উঠানে পালকি। পালকি এমনি এমনি থাকে না, কোন খানে রওনা হবার মুখে ভাড়া করে নিয়ে আসে। নাঃ, ঘুমিয়ে পড়ে থাকলে হবে না—ব্যাপার যা-কিছু, সুনিশ্চিত এই রাত্রের মধ্যেই।

ঠিক তাই। শেষরাত্রে নীলমণি নিরঞ্জনের দরজায় এসে পড়ল: শিগগির

ওঠো নিরঞ্জনদা। সর্বনাশ হল, মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে।

নিরঞ্জন লাফিয়ে উঠে বলে, বলিস কি রে?

দেখ গিয়ে কী কাণ্ড চলেছে বাঁশবাগানের অন্ধকারে। উকিলমশায় চললেন—চালি চেপে যাচ্ছেন না, পায়ে হেঁটেও নয়। দস্তুরমতো পালকি-বেহারা হাঁকিয়ে।

বয়সে বুড়ো তায় এত বড সম্ভ্রান্ত মানুষ, কী শয়তানি তাঁর দেখ। ফটিক বেহারার সঙ্গে ষড়যন্ত্র হয়েছে—পালকি এনে তারা নামিয়েছে বাড়িতে নয়, রশিখানেক দূরে বাঁশবাগানের ভিতর। বাড়ির লোকে ঘুণাক্ষরে যাতে টের না পায়। টের পেলে ঝগড়া দেবে। পূবের দিককার সর্বশেষ কামরায় পুরঞ্জয় পুঁথিপত্র, পূজোব সরঞ্জাম এবং ঠাকুরদেবতা নিয়ে নিরিবিলি থাকেন—জিনিসপত্র বেঁধে তৈরি হয়েই ছিলেন। ফটিক এসে বোঁচকা মাথায় তুলে নিল, হন হন করে তিনি ফটিকের পিছু পিছু চললেন। এই অবস্থায় আবছা মতন দেখতে পেয়ে নীলমণি ছুটতে ছুটতে এসেছে: একটা চোর-ছ্যাঁচোড়কেও ছাড়তে চাও না নিরঞ্জনদা, আর এমন হাঁকডাকের মানুষটা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এক্ষুনি চল, আটকানোর ব্যবস্থা লহমার মধ্যে করে ফেলতে হবে। নয়তো বড্ড লোকসান।

বাঁশতলায় ঢুকল দুজনে। পালকি সেই মুহূর্তে বাঁশবাগান ছেড়ে মাঠের উপর নামল, মাঠ ধরে তীরের বেগে ছুটেছে। ব্যবস্থা সেই রকম। একদল ডাকাত যেন মহামূল্য ধনসম্পত্তি বগলদাবায় পুরে রাত্রিশেষে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন গেল দুজনে পুরঞ্জয়ের বাড়ি। উঠানে এসে সর্বপ্রথম নজরে পড়ল, পূবের কামরার খোলা-দরজা হাঁ-হাঁ করছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার: ঘুমোচ্ছ তোমরা অজয়-বিজয়। সর্বনাশ হয়ে গেল তোমাদের—

পুরঞ্জয়ের দুই ছেলে—অজয় আর বিজয়। তারা এবং বাড়িসুদ্ধ সকলে বেরিয়ে পড়েছে।

কি, কি?

সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে সর্বনাশটা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারে না। বিহ্বল হয়ে এদিক-সেদিক তাকায়।

পূবের কামরায় আঙুল দেখিয়ে নিরঞ্জন হাহাকার করে ওঠে: কী কাল ঘুমরে বাবা! দরজা খুললেন, জিনিসপত্তোর একের পর এক বের করে দিলেন, জলজ্যান্ত মানুষটা তারপর বিবাগী হয়ে চিরকালের মতো চলে গেলেন—এত কাণ্ড হয়ে গেল, একবাড়ি মানুষের মধ্যে কারো একটু হুঁশ হল না!

পাড়ার মানুষ ছুটোছুটি করে আসছে। বিষম হৈ চৈ, ভিড় দস্তুরমতো। গিন্নি জয়মঙ্গলা পূবের কামরায় শূন্য খাটে কাঠের উপরে মাথা ভাঙাভাঙি করছেন: ওরে নিমকহারাম মানুষটা, সারা জন্ম এত সেবা করলাম, মুখের কথাটা বলে যাওয়ারও পিত্যেশ হল না? কুলজির শিবদুর্গাই কেবল তোমার

আপন হল, আমরা কেউ নই—ঠাকুব-ঠাকরুনকে বোঁচকায় ভরে নিয়ে চোরের মতন সরে পড়লে ?

স্বামী বিচ্ছেদের হা-হুতাশে সকলের চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। ছোট ছেলে বিজয় কেবল বাপেব দিক হয়ে কথা বলে : যথার্থ মহাপুরুষ মা, কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। অকথা-কুকথা বলতে নেই। ধর্মের নামে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেছিলেন, বাবাও করলেন। সংসার অসার—বুদ্ধদেব সেটা কাঁচা বয়সেই ধরে ফেললেন। এব কিছু সময় লাগল সর্বরকম গোছগাছ হয়ে যাবার পর। সে তো ভালোই—কারো অনুযোগের কারণ রইল না।

এত লোকের এত বকম বাদবিতণ্ডার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা কেবল নিরঞ্জনেব। বিচার করছে : মাঠ ভেঙে পালকি-বেহারা উত্তর মুখো ছুটল। যেতে পারে কোথায় ? খুব সম্ভব দোমোহনার ঘাটে। সেখানে নৌকো ঠিক করা আছে। কে করে এসব বন্দোবস্ত ? ঐ ফটকে-বেহারা ছাড়া কেউ নয়। শলাপরামর্শ হচ্ছিল, নীলমণি স্বচক্ষে দেখেছে। নৌকা দোমোহনী থেকে রেলস্টেশনে নিয়ে তুলে দেবে। রেলে একবার চড়তে পারলে দুনিয়া তখন পায়ের তলায়—থুড়ি চাকার তলায়। সাগরদ্বীপে গিয়ে তপস্যায় বসেন কিম্বা হিমালয়ের গুহায় ঢুকে যান, কেউ আর তখন পাত্তা পাবে না।

বিচার সকলেরই মনে ধরল।

নিরঞ্জন বলে, আমি আগে আগে ছুটলাম। গিয়ে সামলাইগে। আসল যুদ্ধের আগে বাগযুদ্ধ—সেই জিনিস হতে থাকবে খানিকক্ষণ। দল জুটিয়ে তার মধ্যে তোমরা সব এসে পড়ো। দেরি হয় না যেন খবরদার। দোমোহনীর ঘাটে অনেক নৌকো, বিস্তর মাঝিমাল্লা। মাঝিতে মাঝিতে সাট থাকে, দরকার হলে বৈঠা উঁচিয়ে একজোট হয়ে দাঁড়ায়। যদ্দূর পার দল জুটিয়ে চলে এসো। বুড়োহাবড়া বাচ্চা-ছেলে অবশ্য রমণী নয়—বাছা বাছা জোয়ান-মরদ। নিরস্ত্র কেউ যাবে না—যা পাও, হাতে নিয়ে চলে এসো।

পাথুরে জোয়ান নিরঞ্জন নিজেই, গায়ে অসুরের বল। দোমোহনী পর্যন্ত দু মাইল পথ একটানা দৌড়েছে, মুহূর্তকাল জিরোয়নি। পালকি অল্পক্ষণ ঘাটে পৌঁছেছে, পালকি থেকে নেমে পুরঞ্জয় তখনো নৌকোর মধ্যে জুত হয়ে বসতে পারেননি। এমনি সময় ঝড়ের বেগে নিরঞ্জন গিয়ে পড়ল।

গাছের সঙ্গে কাছি দিয়ে নৌকো বাঁধা। ছুটে এসে নিরঞ্জন সব অগ্রে সেই কাছি দু-হাতে জড়িয়ে ধরল : কার ক্ষমতা কাছি খুলতে আসে, রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে তার আগে। পুরঞ্জয়ের দিকে কটমট চোখে তাকায়। গ্রাম ছেড়ে যে মানুষ চলে যেতে চায়, হোন না হাইকোর্টের উকিল, তাঁও সঙ্গে আর খাতির কিসের ? এক নম্বরের শত্রু তিনি।

বলে, রাতে রাতে বেরুনো হল, দুধসরের কেউ টের না পায়। কাজটা হয়ে দাঁড়াল পুরোপরি চোরাই বৃত্তি—ধর্ম-ধর্ম করা হয় তবে কি জন্যে ?

পালকি থেকে বোঁচকাবুঁচকি দু-হাতে ঝুলিয়ে ফটিক-বেহারা এই সময়টা নৌকোয় এনে তুলছিল। নিরঞ্জন ছুটে গিয়ে ঠাস করে তার গালে এক চড়। চড় মেরে মুহূর্তে ফিরে এসে যথাপূর্ব কাছি এঁটে ধরেছে।

পুরঞ্জয় গর্জন করে ওঠেন: এই নিরঞ্জন, বড় যে আস্পর্ধা! সর্দার-বেহারার গায়ে তুই হাত তুললি। আমারই চোখের উপর। ফৌজদারির কারণ ঘটেছে, জানিস সেটা? আমি সাক্ষ্য দিয়ে তোকে জেলে পুরতে পারি।

নিরঞ্জনও সমান তেজে জবাব দেয়: এই বেটাই হল আসল সিঁধেল। দুধসরের মানুষ রাতের বেলা চুপিসারে সরাচ্ছে। চোর মারলে ফৌজদারি হয় না। সরাচ্ছে তা ও আপনার মতো মানুষ—হাইকোর্টের উকিল বলে যাঁর নামে এত বড় জাঁক আমাদের। ঘটিচোর বাটিচোর-নয় বেটা একেবারে মণিমাণিক্যের ঘরে সিঁধ দিয়েছে। আমি একলা বলে কি—গ্রামবাসী যে হাতের মাথায় পাবে সে-ই তো ঠেঙাবে ওকে।

মগের মুলুক পেয়েছে-না? ঠেঙাক না বুঝি কত বড় সব বাপের বেটা! আমি যেন অস্থাবর মাল, একজন কেউ সরিয়ে নিচ্ছে। সংসারের নরককুণ্ডে থাকব না, স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীরে সংসার ত্যাগ করে যাচ্ছি।

নিরঞ্জন বলে, তা পালকি না চড়ে হিল্লিদিল্লি না করলে বুঝি সংসার ত্যাগ হয় না? গাঁয়ের উপর অত বড় জাগ্রত মহাশ্মশান—জটাজুট ধারণ করে ভস্ম মেখে কত কত মহাপাতকী সেখান থেকে তরে গেল। বলি, জীবন ভোর কত মহাপাতক করেছেন, যে দেশ-দেশান্তর না ছুটলে সে পাতকের ক্ষয় হবে না?

বাগযুদ্ধ ইচ্ছে করেই লম্বা করছে। বলছে, আর পথের দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকাচ্ছে। আসে কই নীলমণি আর অজয়-বিজয়েরা দলবল জুটিয়ে নিয়ে? করছে কী তারা এতক্ষণ ধরে? তর্কাতর্কি থামলে সঙ্গে সঙ্গেই তো জোর-জবরদস্তির কথা উঠবে। নিরঞ্জন একা, আর ও-তরফে ফটিকেরা আট বেহারা আর দাঁড়ি-মাঝিও জন ছয়েক। ঘাটের অপরাপর নৌকোর কথা ছেড়ে দাও।

পুরঞ্জয় বলেন, যাচ্ছি কাশীধামে। ওরে মুখ্যু, গরীব তপস্বী যারা ভাড়ার পয়সা জোটাতে পারে না গেঁয়ো-শ্মশানে পড়ে তারাই গুলতানি করে। কাশী হল শিবস্থান—চোখ বুজলেই শিবলোক-প্রাপ্তি। জপতপ কিছু লাগে না—স্রেফ গঙ্গাস্নান, ক্ষীর-মালাই সাপটানো, আর হল বা সাঁঝের বেলা একটিবার বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন।

নিরঞ্জন সুর নামিয়ে বলে, বেশ। দুধসর কানা করে চলে যাচ্ছেন, ক্ষতিটা পুষিয়ে দিয়ে যান। তাহলে আর কিছু বলব না।

ভোর হয়ে আসে, মানুষজন এক্ষুনি জেগে পড়বে। মজা দেখতে মানুষ এসে জমবে। তার আগে গোলমালটা চুকিয়ে ফেলা যায় যদি। আশান্বিত

হয়ে পুরঞ্জয় বলেন, কি চাস তুই বল, অসাধ্য না হলে দিয়ে দিচ্ছি। নিয়ে থুয়ে নৌকোর কাছি ছাড। পরমার্থিক কাজে বাগড়া দিতে নেই রে। ঈশ্বর চটে যান।

নিরঞ্জন বলে, আমার জন্যে কি—আমার নিজের কিছু নয়। তুধসর গাঁয়ের দাবি। হাইকোর্টের উকিল আছেন এমন কথা বুক ফুলিয়ে আর বলা যাবে না। তার বদলে বলব বালিকা-বিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যালয়ের সাহায্য দিয়ে যেতে হবে আপনাকে। নইলে ছাড়াছাড়ি নেই।

পুরঞ্জয় অবাক হয়ে বলেন, বালিকা-বিদ্যালয় আবার কোথা? আমি তো জানিনে—

আছে ঠিকই। মাস্টার অবধি নিযুক্ত হয়েছে—একদিনের মাইনে আট আনা পাওনাও হয়ে গেছে তার। আপনাদের জানবার অবস্থায় আসেনি এখনো। তারই কিছু ব্যবস্থা করে যেতে হবে। তবে ছাড় পাবেন।

পুরঞ্জয় তাকিয়ে আছেন নিরঞ্জনের দিকে। বিস্মিত হয়ে পড়ছেন। আরও একটু ভেবে নিয়ে নিরঞ্জন বলে, খেয়াঘাটের যে নতুন ইজারা নিলেন, তার উপস্বত্ব বালিকা-বিদ্যালয়ে দান করে যান। মাসে মাসে মাস্টারনির মাইনে, আর দশ রকমের খরচ-খরচা অনেকখানি সঙ্কুলান হয়ে যাবে। খেয়াঘাটের আয় আগে ছিল না, ধরে নিন এখনো নেই।

হুঁ-হুঁ গোছের একটা অস্পষ্ট আওয়াজ পুরঞ্জয়ের মুখে, মানে তার কিছুই দাঁড়ায় না।

নিরঞ্জন রেগে গেল: এই সামান্য মুনাফাটা ছাড়তে পারেন না, আপনি আবার সংসার ছেড়ে ভগবান নিয়ে থাকবেন। ফিরে তো এলেন বলে। কাশীর রিটার্ন-টিকিট কাটবেন, গাড়িভাড়ার দিক দিয়ে সাশ্রয় হবে। কিন্তু আমিও বলে দিচ্ছি, সাহায্য দিলেন আর না-ই দিলেন, পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয় আমাদের চলবেই।

পুরঞ্জয় বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, আবার পুরঞ্জয় জুড়ে দিয়েছিস বিদ্যালয়ের সঙ্গে? নামের ঘুষ দিয়ে টাকা নেওয়ার ফিকির। তবে আমি এক পয়সাও দিচ্ছিনে। লোকে বলবে, সৎকর্মে দেয়নি—নামের লোভে দিয়েছে। ভবসংসারে বিতৃষ্ণা, ওরে, নামের লোভ কি দেখাস আমায়! পুরঞ্জয় নাম তুলে দে, বিবেচনা করে দেখব।

নিরঞ্জন বলল, নাম থাকবে, পয়সাও দেবেন। না দিয়ে কেমন করে পারেন দেখি।

কলহ রীতিমত। ভোর হয়ে গেছে, বাছুর হাম্বা-হাম্বা করে কাদের গোয়ালে। নিরঞ্জন কাছি দু-হাতে ধরে বীরমূর্তিতে দাঁড়িয়ে।

সহসা কলরব কানে আসে—এসে পড়ল এইবার তবে তুধসরের দল। আর নিরঞ্জনকে পায় কে! গলার জোর আরও চাড়িয়ে বলে, পুরঞ্জয় জুড়ে দিয়েছি আপনার খাতিরে নয়, আমার গ্রামের গরজে। পুরঞ্জয়টা যে কে—

—এদেশ-সেদেশের মানুষ জিজ্ঞাসা করবে। কিনা, হাইকোর্টের উকিল—দুধসরের মানুষ। অনেক ভেবে কায়দাটা বের করেছি, এক ঢিলে দুই পাখি বধ—বালিকা-বিদ্যালয় হল, সেই সঙ্গে হাইকোর্টের উকিলও থেকে গেল।

দলবল ঘাটে এসে পড়েছে। পুরঞ্জয়ের দুই ছেলে তার মধ্যে। অবলা রমণী বাদ দেবার কথা—তবু একজন এসে পড়লেন, পুরঞ্জয়ের স্ত্রী জয়মঙ্গলা। মোটা থলথলে শরীর—পাকা চুলের মধ্যে সিঁথি ভরা সিঁদুর। এই মানুষের পক্ষে এত দূরপথ পায়ে হাঁটা—দুই ছেলে দু-পাশ দিয়ে মায়ের হাত ধরেছে, কী ভাবে যে চলে এসেছেন নিজেই ভাবতে পারেন না এখন। নীলমণি পরে একদিন এই প্রসঙ্গে বলেছিল, রমণী হতে পারেন, কিন্তু অবলা কে বলে সরকার-গিন্নিকে? এসে ভালই হয়েছিল। নিরঞ্জনের দোসর পাওয়া গেল একজন। রণের মাঝে দুই সেনাপতির দু-রকম কায়দা।

গিন্নি গর্জন করে এসে পড়লেন: বারো বছর বয়সে শ্বশুরঘর করতে আসি, সেই থেকে একটা দিনও কাছছাড়া হইনি। অন্তিম বয়সে আজকে গাঁটছড়া খুলতে চাও তো এত সহজে হবে না সে জিনিস। ঈশ্বরে নিতান্তই যদি টেনে থাকেন, উচিত ব্যবস্থা করে তারপরে বেরুবে। ছেলে আর বউয়ের হাত তোলা হয়ে থাকতে পারব না। আবাগির বেটি তো চিঁড়ের মতন দাঁতে ফেলে আমায় চিবাতে চায়।

বলতে বলতে জয়মঙ্গলা চেপে বসলেন নৌকোর খোপে: কার কত ক্ষমতা আছে, কে নড়াতে পারে দেখা যাক।

আর নিরঞ্জন ওদিকে কাছি ধরে চেঁচাচ্ছে: পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্যে খেয়া ঘাটের মুনাফা। দুধসর এত দরের একজন বাসিন্দা হারাচ্ছে, তার ক্ষতিপূরণ।

বড়ছেলে অজয় কেটে কেটে বলে, ছেলে-বউ নাতিপুতি ভাসিয়ে দিয়ে দরের মানুষ রাত্তিরবেলা পোঁটলা নিয়ে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ে, এমন তো দেখিনি বাবা। ধর্ম কেবল মুখে মুখে, বজ্জাতি বুদ্ধি ষোল আনা আছে। এককাঁড়ি ভূসম্পত্তি বিলি-বন্দোবস্তে পড়ে রইল, আবার এই খেয়াঘাটের আবদার উঠেছে—মরি আমরা হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে, মামলা করে করে লয় পেয়ে যাই।

বিজয়ও বাপকে ফেরাতে চায়, কিন্তু তার উল্টো সুর: [illegible] ইজারা ইস্কুলের নামে লেখাপড়া দিয়ে তবে যেও বাবা। [illegible] গোলমাল [illegible]।

এবং মাথার মধ্যে এখনো বুদ্ধের কথা ঘুর[illegible] অজয়ের দিকে ভ্রূকুটি [illegible] বলে, বুদ্ধদেব তো কত বেশি দরের মানুষ। [illegible] গৃহ-ত্যাগটাও ভেবে দেখ। তিনি কি দিনদুপুরে যাত্রামঙ্গল পড়ে বেরিয়ে [illegible]ছিলেন?

অজয় খিঁচিয়ে ওঠে: এই একটা [illegible] হল নাকি? বুদ্ধের মাথার উপরে ছিলেন শুদ্ধোধন—আমাদের বাবার [illegible] আর একটা বাবা [illegible] দাও, তাহলে কিছু বলব না। ধর্মপথে যাচ্ছেন, তাতে [illegible]।

তার আগে মায়ের ব্যবস্থা হোক, বোন-ভাগনে-ভাগনিরা এসে পড়বে, তাদের কি দেবেন দিয়েথুয়ে যান। বউটা প্রাণপাত সেবাযত্ন করে, সে-ও কি আর ছিটেফোঁটার প্রত্যাশী নয়? এর পর সকলে আমাদের সন্দেহ করবে—বলবে, শলা করে দু-ভাই আমরা সমস্ত সম্পত্তি মেরে বসে আছি।

দোমোহনী থেকে পুরঞ্জয়ের ফিরতে হল অতএব। ফিরলেন হাঁটা-পথে। পালকিতে জয়মঙ্গলা।

বিষয়ী মানুষের বিবাগী হতে গেলেও বিস্তর ঝঞ্চাট। স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় বস্তুর বিলিব্যবস্থা ও লেখাপড়ায় অনেক দিন কাটল। নিরঞ্জন মাঝে মাঝে শাসিয়ে যায়: খেয়াঘাট যাচ্ছে তো ইস্কুলের নামে? ঘাট থেকে নইলে কিন্তু আবার ফিরতে হবে।

খেয়াঘাটের ব্যাপার নিয়ে আবার অজয় বিজয়ে বিরোধ। বিজয় বলে, দিয়ে দাও বাবা শিক্ষা-বিস্তারের কাজে। বালিকা-বিদ্যালয়ের অজুহাতে একটা শিক্ষিত মেয়ে গ্রামে থেকে যাবে, সে জিনিসও বড় কম নয়। তার আদর্শে আর দশটা মেয়ের চাড় হবে। টাকার অভাবে মাইনেপত্তর না পেলে কলকাতায় ফিরে যাবে আবার। বালিকা বিদ্যালয় উঠে যাবে—গ্রাম অন্ধকার।

ভাইয়ের কথা শুনে অজয় ভ্রূভঙ্গি করে: হুঁ, বুঝেছি। শিক্ষা নিয়ে বড্ড মাথাব্যথা।—বাল, নিজের বেলা ছিল কোথা? তিন তিনবার ফেল হয়ে এলি। বলতে পারিস, পুরুষ-শিক্ষা নয়—স্ত্রীশিক্ষা। ফুটফুটে মাস্টারনি তাহলে গাঁয়ের উপর থেকে যায়, গাঁ থেকে চাই কি আমাদের দালানে এসে ওঠে শেষ পর্যন্ত। ঘাস খাইনে, বুঝি রে বুঝি ভিতরের মতলব।

বাপের কাছে গিয়ে অজয় ঘোরতর আপত্তি জানায়: ... খাওয়া দিয়েছ, বাচ্চার পর বাচ্চা এসে দিনকে-দিন খরচ বাড়ছে না। ... আমার—এর পর বিজয়েরও আসবে। খেয়াঘাটের উপস্বত্বে হাট বাজারটা তবু চলবে। নাম দিতে দিয়েছ বাবা, সেই তো ঢের। তার উপরে আর কিছু দিতে হবে না, নাম ভাঙিয়ে যা পারে করে নিক।

যুক্তিতে যাই হোক, নিরঞ্জনের দলটাকে চটাতে সাহস হয় না। ভয় দেখিয়েছে, ত্রিমোহনীতে যতবার নৌকোয় উঠবেন, কাছি টেনে আটকাবে। যে রকম ষণ্ডামর্ক, কাছি টেনে নৌকো চড়চড় করে ডাঙার উপরে তুলে ফেলাও বিচিত্র নয়। তা ছাড়া আরও এক বিবেচনা—নাম জুড়ে দিয়েছে, বালিকা-বিদ্যালয় উঠে গেলে সেটা ... ঞ্জয়ের মৃত্যুর শামিল। বুড়ো হয়েছেন, মরবেন তো শিগগিরই। এটা হবে দ্বিতীয় মৃত্যু।

খেয়াঘাটের ইজারা অতএব বালিকা-বিদ্যালয়ের কমিটির নামে লেখাপড়া করে দিতে হল। ছেলেমেয়ে নাতিপুতি সকলেরই যথা-যোগ্য ব্যবস্থা হয়েছে। এর পরে পুরঞ্জয় কাশীধামে যান আর কুম্ভীপাকে যান, কারো বিশেষ আপত্তি নেই। বিলিবন্দোবস্তে মাস দুই কাটল, তার পর একদা

দিনদুপুরে সমারোহ করে সকলের চোখের উপর দিয়ে পুরঞ্জয় কাশীধামে চললেন। মেয়েরা সব ছেলেপুলে নিয়ে এই উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে। ঢিব ঢিব করে একের পর এক পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। পুরঞ্জয় একখানা করে পাঁচ টাকার নোট জন প্রতি মিষ্টি খেতে দিয়ে যাচ্ছেন।

সর্বশেষে জয়মঙ্গলা। পায়ের ধুলো নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেন, যেতে লাগো, আমিও আসছি পিছন ধরে। বিজয়ের বিয়ে দিয়ে চলে যাব। এখন গেলে বিনি পণে কোন হাড়হাবাতের মেয়ে এনে তুলবে। মাস্টারনি হয়ে একটা তো চোখের উপরেই ঘুরঘুর করছে। আমি থাকতে হতে দিচ্ছিনে। বড়বউয়ের হাড়-জ্বালানো কথা শুনেও পড়ে আছি তাই। বিজয়ের বউকে সংসারে বসিয়েই চলে যাব আমি। বাসা ঠিক গঙ্গার উপরে চাই কিন্তু—দশাশ্বমেধ-ঘাটের আশেপাশে। ঘর যেন উপরতলায় না হয়, সিঁড়ি ভাঙতে বুক ধড়ফড় করে। গোছ গাছ করতে লাগো গিয়ে, বছর খানেকের বেশি আমার দেরি হবে না।

॥ চার ॥

মাস্টারনির মাইনে যোগাড় হয়ে গেল এবারে ঘর। বালিকা বিদ্যালয় বসবে যেখানটা।

নিরঞ্জন বলে, সাবজজ আছেন দুরসরে, ইঞ্জিনিয়ার আছেন, রায়সাহেব আছেন—আমারে আবার ঘরের ভাবনা। বাইরে বাইরে চাকরি ও দেশ, বাড়িতে ইঁদুর-চামচিকের আড্ডা। চামচিকে তাড়িয়ে ইস্কুল বসাব।

সাবজজ বাবুর দালান আয়তনে দিব্যি বড়, ইস্কুলের কাজের ক্ষেত্রে চমৎকার। খালি বাড়ির পাহারায় একজন গোমস্তা—নীলমণি সকাল সকাল খেয়ে ছিপ সুতো নিয়ে তার কাছে হাজির: বিলের কুয়োয় পুঁটিমাছ টানে টানে উঠছে। চলুন যাই গোমস্তামশায়।

মাছ মারায় গোমস্তার বড় পুলক। কাজও নেই হাতে। ধানের মরশুমে ভাগচাষীর কাছ থেকে হিসাবপত্র বুঝে ধান আদায় করা, বাকি সময় শুয়ে-বসে কাটানো। ছিপ নিয়ে নীলমণির সঙ্গে গোমস্তা বিলে বেরিয়ে পড়ল।

খালুই ভরা মাছ নিয়ে সন্ধ্যাবেলা মহাস্ফূর্তিতে ফিরল। নীলমণি নিজের বাড়ির দিকে বাঁক নিয়েছে। একা গোমস্তা দালানের দরজার সামনে এসে অবাক—সাইনবোর্ড ঝুলছে: পুরঞ্জয় বালিকা-বিদ্যালয়। এর বাড়ি তার বাড়ি থেকে বেঞ্চি চেয়ার এনে ঘরের সমস্তখানি ভরে ফেলেছে।

কী সর্বনাশ!

নিরঞ্জন ভিতরেই ছিল, হাসি-হাসি মুখে বেরিয়ে আসে: ভালই তো হল। বিদ্যাস্থান—পুণ্যের জায়গা।

বাবু কিছু জানলেন না—পণ্যস্থান অমনি হলেই হল। আমার যে

কে দেখতে যাচ্ছে! নিজের গাঁয়ের দায় হলে করতেন ঠিক তাই।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে : ইচ্ছে করে নীলমণি, ডাকাতি করে পিওনমশায়ের চিঠির ব্যাগ ছিনিয়ে নিই। নেবো ঠিক একদিন—

নিয়ে দেখবে কী রহস্য কাঞ্চনের ঐসব চিঠিপত্রে। দুধসরের নিন্দেমন্দ যদি থাকে, চিঠির লেখিকা ও বৃদ্ধ পিওন কাউকে রেহাই করবে না। কিন্তু বিপদ হয়েছে পোস্টাপিস হল গবর্নমেন্টের, পিওন মশায় সরকারি লোক—হাঙ্গামা করতে গেলে সেটা রাজবিদ্রোহের ব্যাপার দাঁড়িয়ে যাবে।

দুধসরে পোস্টাপিস নেই, বসানোর চেষ্টাও হয়নি ওই পিওন-মশায়ের খাতিরে। এই একটা ব্যাপারে সুজনপুরের কাছে হার। সুজনপুর সাব-পোস্টাপিসের অধীনস্থ দুধসর গ্রাম। হপ্তার মধ্যে রবি মঙ্গল আর বিষ্যুৎবারে দুধসরের হাট। হাটের নামডাক আছে, মাছ তরকারি বেশ ভাল আমদানি হয়। পিওনমশায় হাট করতে এসে চিঠি বিলি করে যান। ডাকবাক্সে যত চিঠি পড়ে, ব্যাগে ঢুকিয়ে নেন—পরেরদিনের ডাকে চলে যাবে। এবং খাম-পোস্টকার্ড- টিকিটও হাটে বসে বিক্রি করেন মাছ-তরকারির মতো।

এই অটল পিওন আজকের মানুষ নন। চিরকাল ধরে এই নিয়মে চিঠি বিলি হয়ে আসছে। হাটের তিন দিন ভোরবেলা সুজনপুর থেকে বেরিয়ে পড়বেন। পথ তিন ক্রোশ, কিন্তু পৌঁছুতে বেলা দুপুর। সোজাসুজি এসে গেলেই হল না, পথের এধারে ওধারে গ্রামগুলো বিটের মধ্যে পড়ে। উভয় দিকে সারতে সারতে এলেন।

দুপুরবেলাটা দুধসরে স্থিতি, গ্রামের মেয়েপুরুষ সবাই তাঁর আপনার। এক একদিন এক বাড়ি সেবা। আগের তারিখে বলে গেছেন, মঙ্গলবারে তোমাদের ওখানে। রাঁধাবাড়া সেরে গামছা তেলের বাটি সাজিয়ে সে বাড়ির লোক বসে আছে। আকাশে বরঞ্চ সূর্য ওঠার ভুল হতে পারে, কিন্তু অচল পিওন যথাকালে বাড়ির সামনে এসে হাঁক দেবেন : এসে গেছি বউমা।

কারো যদি খেয়াল না থাকে—পিয়নমশায়ের গলা শুনে মনে পড়ল, দুধসরের হাট আজকে, সন্ধ্যায় হাটে যেতে হবে। এখন আর পিওনমশায়ের একতিল সময় নষ্ট করার জো নেই—মাথায় এক থাবড়া তেল দিয়ে পুকুরে পড়ে ঝুপঝুপ করে ডুব সেরে, নাকে-মুখে চাট্টি ভাত গুঁজে এক-ছুটে গিয়ে পাশায় বসে পড়া।

আশ্চর্য পাশা খেলেন পিওনমশায়। লিকলিকে রোগা মানুষটি—কিন্তু গলায় শঙ্খের আওয়াজ। হাঁক দিয়ে পাশার দান ফেললেন—শুকনো হাড়ের বস্তু হয়েও পাশা বুঝি ভয় পেয়ে যায়। কচ্চেবারো বললেন তো পাশায় ঠিক তাই পড়েছে, ছ-তিন নয় বললেন তো তাই। দুধসরেও মুরুব্বি পাণ্ডে আছেন ক'জন, একসঙ্গে সকলের জমে ভালো। হাটবারের দুপুরের জন্য উভয় পক্ষ মুকিয়ে থাকেন।

গাছের আগায় রোদ উঠেছে, আসন্ন সন্ধ্যা। পাশার ছক-গুটি তুলে ফেলে

এইবারে হাটে রওনা। দস্তুরমতো বড হাট, অমন বিশখানা গাঁয়ের মানুষ এসে জোটে। হাটে এসে অটল পিওন সকলের আগে নিজের হাটবেসাতি সেরে নেন। তারপর এক দোকানের ভিতর জায়গা ঠিক করা আছে—ল্যাম্পো জেলে সেখানে বসে পড়লেন। চারিদিক থেকে লোক এসে ভিড করে: আমাদের কি আছে দিয়ে দাও পিওনমশায়। গোটা গ্রামের চিঠি অটল হালদার একজনের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন। সে কিছু ভারী জিনিস নয়—কোন গ্রামে হয়তে সাকুল্যে একখানা চিঠি, কোন গ্রামে কিছুই নেই। ঐ সঙ্গে খাম-পোস্টকার্ডও পাতান দিয়ে বসেছেন, যার যা দরকার নিয়ে নিতে পার।

ডাক বিলি ও খাম-পোস্টকার্ড বিক্রির কাজ শেষ করে সাথী খুঁজে নিয়ে সারাদিনের পর অটল পিওন এবারে সুজনপুর ফিরলেন। সাথী বিস্তর. হাট করতে সব এসেছে, ধামা-ভরতি হাট-বেসাতি কাঁধে হাতে নিয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দল বেঁধে গল্প করতে করতে সব যাচ্ছে। পিওনমশায় তাদের মধ্যে ভিড়ে যান।

ডুধসরে পা দিয়েই কলকাতার পড়ুয়া মেয়ে কাঞ্চন ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, কী জায়গা রে বাবা। খবরের কাগজ আসে তিন দিনের বাসিপচা খবর দিয়ে। একখানা পোস্টকার্ড কিনবে তো কবে হাটবার হা-পিত্যেশ করে থাকো। এই গ্রাম নিয়ে আবার দেমাক। তবু ভাগ্য, হাট হপ্তায় একদিন না হয়ে তিনটে দিন।

অটল পিওন যতদিন বর্তমান আছেন পোস্টাপিসের উদ্যোগ করবে না, মোটামুটি এইরকম ঠিক আছে। কিন্তু মেয়েমানুষের এ হেন অপমানের পরে সে হুজুগে বজায় রাখা দায়। নিরঞ্জনের রোখ চেপে উঠল: তবে তো লাগতে হয় রে নীলমণি। ডুধসরের বাঘাভালকো মানুষ সব আছেন—অঙ্গুলিহেলনে যাঁরা পোস্টাপিস তো পোস্টাপিস লাট সাহেবের বাড়ি তুলে এনে বসিয়ে দিতে পারেন।

পিওনমশায়ের কানে উঠে গেল. পোস্টাপিস বসাবে এবার ডুধসরে। নিরঞ্জনকে বললেন. কী কথা শুনতে পাচ্ছি বাবা? দু'দান পাশা খেলে যাই, সেই পথে কাঁটা দিতে চাও?

ডুধসরে পোস্টাপিস হলেও আপনার আসতে বাধা কিসের? এসে খেলবেন পাশা।

অটল পিওন বলেন, কাজকর্ম না থাকলে চাকরিতে কি জন্যে রাখবে? ছেলেও সেইটে চায়। সদরের উপর বাসা করে বউমাকে নিয়ে গেছে, বোনকে নিয়ে পড়াচ্ছে। বুড়োবুড়ি আমরা ভিটেয় পিদদিম দিচ্ছি সেটা চক্ষুশূল ওদের ভাই-বোনের। তক্কেতক্কে আছে, নিয়ে তুলতে পারলে হয়। চাকরি নেই শুনলে একটা দিনও আর গাঁয়ে তিষ্ঠোতে দেবে না।

কাতর হয়ে বলেন, শহরে গিয়ে তুললে আমি তো বাবা ধড়-ফড়িয়ে

মরে যাব।

সেটা বোঝে নিরঞ্জন। এই বয়সে নিজের ভিটে ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসত করা—সে যেন বুড়ো গাছ উপড়ে তুলে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে বসানো। সে গাছ বাঁচে না, পাতা ঝরে দুদিনে শুকিয়ে যায়। নিরঞ্জনের কাঁচা বয়স—সে-ও তো পারে না দুধসর ছেড়ে অন্য কোথাও আস্তানা নিতে। কোনদিন পারবে না।

অটল পিওন কাকুতিমিনতি করছেন, নিরঞ্জন চেপে গেল আপাতত। চিরকাল একনিয়মে তিনি চিঠি বিলি করে আসছেন। কেউ বলে, কলিযুগের গোড়া থেকেই, মারা পড়বেন কলি কাবার হবে যেদিন। কেউ বলে, অত নয়—চাকরি ও র বছর চল্লিশের এবং আরো ক চল্লিশটা বছর চালাবেন না? তা সে যা-ই হোক, ঠোঁট উল্টে কাঞ্চন যাচ্ছে-তাই বলুক, পিওনমশায়ের খাতিরে সবুর না করে গত্যন্তর নেই।

॥ পাঁচ ॥

অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। কাঞ্চনের চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া দিনকে দিন বাড়ছে। ভাব চলে না, প্রতিবিধান একটা না করলেই নয়। মেয়েটা অত কি চিঠি লেখে—চিঠিতে থাকেই বা কি? সে স্টাম্প এই কারণে অন্তত হাতের মধ্যে চাই।

একদিন ভালমানুষের ভাবে নীলমণি কথাটা জিজ্ঞাসা করল। নিরঞ্জনের শেখানো। অশিক্ষিত নাকবোকা মানুষটাকে তাচ্ছিল্য করে যদি কাঞ্চন কিছু ফাঁস করে।

নীলমণি বলল অত চিঠি কাকে লেখো দিদিমণি? অত সব মানুষ তোমার চেনা?

ফোঁস করে গভীর এক নিশ্বাস ফেলল কাঞ্চন: সারা কলকাতার আমার বয়সি যত মেয়ে তার অন্তত অর্ধেকগুলো বন্ধু আমার। লেখাপড়া যা করেছি, তার দুনো তেদুনো হৈ হেল্লা করেছি। দুধসর তো জেলখানা—রাতদিন শয়নে স্বপনে আমি কলকাতার কথা ভাবি। চিঠি লিখি তাদের। তারাও জবাব দেয়। আজেবাজে কথা—তাই লিখেই আনন্দ আমার। চিঠির মধ্য দিয়ে কলকাতা শহরে খানিকটা ঘোরা হয়ে যায়।

একটা চিঠি দৈবাৎ একদিন নীলমণির হাতে পড়ল। পিওনমশায়ের কাছ থেকে, যেমন হয়ে থাকে, একগাদা নিয়ে কাঞ্চন বাড়ি ফিরছে। পড়তে পড়তে যাচ্ছে একটা—সে চিঠি শেষ করে খামের মধ্যে ভরে আর একটা খুলল। পড়-চিঠিটা অসাবধানে রাস্তায় পড়ে গেছে। পড়বি তো পড় নীলমণির চোখের সামনে।

টুক করে তুলে নিয়ে নীলমণি নিরঞ্জনের কাছে চলে যায়: দেখ তো কী লেখা—আমায় কাঞ্চন সত্যি না মিথ্যে বলেছিল।

পয়লা নজরেই তো ডাহা মিথ্যে একটা ধরা পড়ে। যে মানুষ লিখেছে তার নাম সমর—রাণীশঙ্করী লেনের সমর গুহ, খামের উপরেই প্রেরকের নাম-ঠিকানা। কলকাতার যে অর্ধেকগুলো মেয়ে কাঞ্চনকে চিঠি দেয়, এই ব্যক্তি তার বাইরে। শহরে মেয়েরা, এবং মেয়ে মাত্রেই, সমরে পারদর্শিনী বটে, কিন্তু নাম কোন মেয়ের সমর হয় না। চার পৃষ্ঠা ঠাসাঠাসি করে যা-সব লিখেছে—লেখককে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য নিরঞ্জনের হাত নিশপিশ করে।

নমুনা দু চার ছত্র:

কী করে যে তোমার বনবাসের ঠিকানা যোগাড় করেছি—এই কর্মে পাকা ডিটেকটিভ ঘোল খেয়ে যাবে। তোমার মামার-বাড়ি গিয়ে দেখি, নতুন ভাড়াটে। কেউ কিছু বলতে পারে না। উদাস হয়ে পথে পথে ঘুরি। পথ কোথা মরুভূমির তপ্ত বালুকা। একটা মানুষ বিহনে শহর কলকাতা সাহারা হয়ে গেছে শুধুমাত্র একটি মেয়ে আলো ঝলমল এত বড় কলকাতা ফুৎকারে নিভিয়ে অন্ধকার করে দিতে পারে, সে আজ স্বচক্ষে দেখছি। দৈবক্রমে মঞ্জুলাকে পেলাম, তাকে তুমি চিঠি দিয়েছ। মঞ্জুলা চিঠি পায়, অথচ আমি পাইনে। জীবন এক মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে গেল গঙ্গার পুলের উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। বিষম শীত পড়েছে, হিমেল হাওয়া। কনকনে জলে ঝাঁপ দেওয়া হল না, বাড়ি ফিরে এই চিঠি লিখছি। জবাব পাই কি না পাই দেখি। গঙ্গা তো শুকিয়ে যাচ্ছে না, আর ইতিমধ্যে ফাল্গুন মাস পড়ে শীতও কমে আসবে—

অসহ্য অসহ্য। সমর নামে সেই নচ্ছার মানুষটা দুধসর স্বচক্ষে দেখেনি, সোনার গ্রামকে তবু বন বলেছে। এখানে থাকা মানে বাস। আরও বিস্তর নিন্দেমন্দ। পড়তে পড়তে নিরঞ্জনের হাত নিশপিশ করে—হাতের মাথায় পেলে দিত তার গালে মহাথাপ্পড় কষিয়ে। নেই যখন, মানুষটার চিঠির উপরে শোধ তোলে। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে। যেন সমর গুহ-ই হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে, চুলের গোছা টেনে টেনে ছিঁড়ছে। এমনিও সামাল দেওয়া যায় না কাঞ্চনকে, তার উপরে মন উড়ুউড়ু-করা এই সব চিঠি।

কাঞ্চন কি জবাব দেবে পরোয়া না করে নিরঞ্জন নিজে এক জবাব লিখে ফেলল। লিখছেন যেন শৈলধর ঘোষ, কাঞ্চনমালার বাবা: আমার কন্যার নামে বারংবার চিঠি পাঠাইলে তোমার নামে ফৌজদারি সোপর্দ করিব। অধিকন্তু এখান হইতে একদল ঠ্যাঙাড়ে পাঠাইব, তাহারা তোমাকে বস্তাবন্দি করিয়া পুলের উপর হইতে গঙ্গার কনকনে জলে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিয়া কার্য করিবে। ইতি। নিত্যাশীর্বাদক শ্রীশৈলধর ঘোষ।

এর পর প্রতি হাটবারে নিরঞ্জন তীক্ষ্ণ নজর রাখে। বুড়ো অটল পিওন কোন এক বাড়ি হন্তদন্ত হয়ে এসে তেল মাখতে বসেছেন, সেই মুখে কাঞ্চন ঠিক এসে দাঁড়াবে। এবং কোন দিনই পিওনমশায় বঞ্চিত করেন না—খাম-

পোস্টকার্ডের চিঠি গুচ্ছের হাতে দেবেন। খামই বেশি—না জানি কত বিষ ভরতি হয়ে এসেছে ঐসব আঁটাখামের ভিতরে।

দূর থেকে নিরঞ্জন দেখে, আর রাগে গবগর করে। দোষ গবর্নমেন্টের—একপয়সা কি দুপয়সা টিকিটের মূল্য নিয়ে কাঁহা-কাঁহা মুলুকের বৃত্তান্ত হাজির করে দেয়। দোষ ঐ অটল পিওনের—চল্লিশ বছরের মধ্যে একটা হাটও বোধহয় কামাই নেই, পাশার নেশায় দুধসরে এসে পড়ে ঘরে ঘরে সর্বনাশ বিলি করেন। পোড়া রোগপীড়া এমন বুড়োথুখুড়ে মানুষটা চোখে দেখতে পায় না। গতিক যে রকম দাঁড়াচ্ছে, ক্রোধে জ্ঞানহারিয়ে নিরঞ্জনই হয়তো ঠ্যাঙে বাড়ি মেরে কোন একদিন পিওনকে শয্যাশায়ী করবে, উঠে যাতে না আসতে হয় কাঞ্চনের চিঠিপত্র পৌঁছে দেবার জন্য।

বড় একান্ত মনে চেয়ে ছিল বোধহয়—যা চেয়েছে ঠিক তাই। চৈত্রমাসের এক দুপুরে পথের উপর মাথা ঘুরে পড়ে পিওনমশায় সত্যি সত্যি শয্যাশায়ী। দিন সাতেক পড়ে থাকতে হল। সরকারি ডাক সেজন্য বন্ধ থাকে না, চিঠি জমে জমে স্তূপাকার। ছেলে আর মেয়ে শহর থেকে অবিরত লিখছে : ভারি তো চাকরি আর করতে দেওয়া হবে না তোমায়, শুয়ে বসে আরাম করো। সারা জীবন ধরে তো খাটলে, আর কেন?

অটল স্ত্রীকে বলেন, বোঝ ব্যাপার। কারো সর্বনাশ, কারো পোষমাস। ওরা ভেবেছে, এই মওকায় বাবাকে বাসায় নিয়ে তুলি। গরম আর কদ্দিন, বর্ষা তো পড়ে গেল বলে। ঠাণ্ডার দিনে তখন আর মাথা ঘোরার ভয় থাকবে না।

কিন্তু বর্ষাতেও বিপদ। চিঠি বিলি করতে গিয়ে একদিন অটল পা পিছলে কাদার মধ্যে পড়লেন। এইবারে ঘাবড়ে যাচ্ছেন—আগে কখনো এমনধারা হয়নি। অতিরিক্ত বুড়ো হয়ে গেছেন বোঝা যাচ্ছে, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিরজীবন ভূতের খাটনি খেটে এসে এবারে জবাব দিচ্ছে। যে ক'দিন জীবন আছে, ঘরে পড়ে থাকতে হবে—এ গ্রাম সে-গ্রাম করা যাবে না। ছেলে-মেয়ে ওই যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছে—শুয়ে বসে শুধুই আরাম করা।

দেহে যদিই বা কুলায়, ওরা আর খাটতে দেবে না। ছেলে রাখাল রাজ আর মেয়ে ললিতা। সেই সঙ্গে বউমাটিও আছেন। রাখাল-রাজ ইতিমধ্যে বাড়ি এসে বসেছে। সদরের হেড-অফিসে ছিল, তদ্বির করে সে এখন সুজনপুর সাব-অফিসের পোস্টমাস্টার। আর একটা বছর হলে ললিতা পাশ দিতে পারে, তাকে হস্টেলে দিয়ে এসেছে সেজন্য। কষ্টেসৃষ্টে বোনের খরচ চালিয়ে যাবে। এদিকে বাপকেও আর চিঠির ব্যাগ ঘাড়ে তুলতে দেবে না। ছেলের পাকা-দালানে বসে অফিসের কাজ আর বুড়ো বাপ রোদে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করে বেড়াবেন, এটা কখনো হতে পারে না। মরে গেলেও হতে দেবে না রাখালরাজ।

অবসরের দরখাস্ত নিজেই লিখে বাপের সই নিয়ে পোস্টাল-সুপারিন্-টেণ্ডেন্টের অফিসে পাঠাল।

চল্লিশ বছর চাকরির পর বিশ্রাম। যা বলেছিল, সেই জিনিস করে তবে ছাড়ল। শুয়ে বসে থাকা ছাড়া অটল হ'লদারের অন্য কাজ নেই। এক ছোকরা পিওন অটলের জায়গায় বহাল হয়েছে। তাকে নিয়ে মুশকিল—একবর্ণ ইংরাজি পড়তে পারে না। ইংরাজি ঠিকানা হলে এখানকার চিঠি ওখানে নিয়ে হাজির করবে। তবে ভরসা দিয়েছে এ অবস্থা থাকবে না। ফার্স্ট বুক কিনে মুখস্থ করতে লেগেছে, অটলের কাছে এসে এসে পাঠ নিয়ে যায়। চাকরি পাকা হবার মধ্যেই ইংরেজিটা রপ্ত করে নেবে।

পিওনমশায় যখন রইলেন না তবে আর চক্ষুলজ্জা কিসের? লাগাও পোস্টাপিস। প্রয়োজনও বটে—কাঞ্চনের নামের যে সবনেশে চিঠি নীলমণি এনে দেখাল। বালিকা-বিদ্যালয় হয়েছে, এর উপর পোস্টাপিস বসে গেলে পায় কে ঠাকে? কি বলিস রে নীলমণি? সুজনপুরের তখন তো মুখ ঢেকে বেড়াতে হবে দুধসরের কাছে।

নিরঞ্জনের অতএব আহার-নিদ্রা নেই। কাকে ধরলে কি হয়, সর্বক্ষণ সেই তদ্বির। পোস্টাপিসের প্রয়োজন জানিয়ে দরখাস্ত লেখা হয়েছে—দুধসর এবং আরও গোটা পাঁচেক গ্রাম ঘুরে ঘুরে শ আড়াই সই যোগাড় করল। বাংলাতে রকমারি কায়দায় লিখে সই আরও শ তিনেক বাড়ানো গেল। দরখাস্ত চলে গেল উপরে। আশা পাওয়া গেছে জুলাই থেকে দুধসরে পোস্টাপিস। গোড়াতেই পাকা পোস্টাপিস নয়—এক্সপেরিমেন্টাল পোস্টাপিস, অস্থায়ী জিনিস।

এই বাবে সকলের বড় বিপদ। টাকা জমা দিতে হবে সরকারে। দশটাকা বিশটাকা নয়, দস্তুরমতো মোটা অঙ্ক। সাধারণের দরখাস্তের উপর পোস্টাপিস বসানো—যদি দেখা যায় লোকসান হচ্ছে, পোস্টাপিস তুলে দিয়ে জমা টাকা থেকে খরচখরচা কেটে নেবে। চালু হয়ে গেল তো সম্পূর্ণ টাকা ফেরত পাবে কোন একদিন।

গাঁয়ের লোকে কী আর দিতে পারে। দুধসরের গৌরব-স্থলেরা সব বাইরে। নিরঞ্জন অতএব গায়ে জামা পায়ে জুতো হাতে ছাতা এবং মনিব্যাগে আপাতত কলকাতার ট্রেনভাড়া সম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কলকাতায় বেণুধরের মেসে সবাগ্রে। কাঞ্চনের বড়ভাই বেণু। মামার বাসায় উঠবার আগে শৈশবে দুধসরে থাকত, তখন নিরঞ্জনের সাগরেদ ছিল সে। বেণুধরের চেয়ে বেশি জোরের জায়গা আর কোথা?

সন্ধ্যাবেলা। অফিস থেকে ফিরে বেণু নিচের তলায় স্যাঁতসেঁতে আধ-অন্ধকার ঘরে সিটের উপর বসে তেলমুড়ি খাচ্ছিল। নিরঞ্জনকে দেখে কলরব

করে ওঠে : কী কাণ্ড, তুমি যে বড কলকাতায়। গ্রাম ছেড়ে চলে এলে—কলকাতা শহরের ভাগ্য।

ভৃত্যের উদ্দেশে হাঁক পাড়ছে : আমার দাদা এসেছে, কাটলেট কচুরি আর রসগোল্লা নিয়ে আয়। ছুটে চলে যা। আর কি আনবে বলে দাও নিরঞ্জনদা।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে ওঠে : আমি যেন মন্বন্তরের দেশ থেকে এলাম। বসতে বললি নে, কেমন আছ ভাল আছি সে সব কিছু নয়, পথের উপর থেকেই কাটলেট—

বেণুও সমান তেজে বলে, তুমি যেন বাইরের মানুষ—পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে বসতে বলব। কেমন আছ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি ভাল আছি. সে-ও দেখছ। অন্য সকলের কথা—আজকেই কাঞ্চনের চিঠি পেলাম তোমার কাছে. আলাদা করে কি শুনতে যাব?

বাইরের মানুষ না-ই যদি ভাববি, কাটলেট-কচুরির হুকুম কেন দিলি রে হতভাগা? তেল-মুড়ি আমার যেন মুখে ওঠে না। কী ঠাউরেছিস—মুড়ি না কাটলেট—কোনটা খেয়ে থাকি আমি? আসুক না তোদের চাকর, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলব।

বেণু হেসে উঠল : ভাল হবে, আদাড়ে-আস্তাকুড়ে যেলো না, ঘরের মধ্যে ফেলো আমি খেয়ে নেবো। মুড়ি খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, ভাল জিনিসে লোভ হয়। কিন্তু বিবেক বাগড়া দিয়ে পড়ে : ওরে বেণু, তোর বুড়ো বাপের এত কষ্ট, সোমত্ত বোনটার আজও বিয়ে দিতে পারলিনে, তুই এখানে কাটলেট ওড়াচ্ছিস? আসকে অজুহাত আছে : দাদার জন্যে এনেছিলাম, না খেলে কি করব? পয়সার জিনিস ফেলে তো দেওয়া যায় না।

পরক্ষণে বলে, কাজের কথা হোক নিরঞ্জনদা, বিনি কাজে গ্রাম ছেড়ে আসার মানুষ তুমি নও। বলো।

নড়েচড়ে চৌপায়ার উপর বেণু ভাল হয়ে বসল। কান পেতে বসেছে।

নিরঞ্জন বলে, পোস্টাপিস হবে।

কাঞ্চনও সেই রকম লিখছে। শিবনমশায় রিটায়ার করে চিঠির খুব গোলমাল হচ্ছে নাকি। কাঞ্চনের অনেক চিঠি মারা গেছে।

নিরঞ্জন রাগ করে বলে, চুলোয় যাকগে চিঠি। চিঠির জন্যে পোস্টাপিস নাকি? তোর বোন চিঠি পেল না পেল, বয়ে গেছে আমার। না পেলে বরঞ্চ ভালো। শাসন করে দিস, মেয়েমানুষে অত চিঠি লিখবে কেন—রকমারি চিঠি আসবেই বা কেন তার নামে?

একটু চুপ করে থেকে নিরঞ্জন রাগ সামলে নেয়। তারপর অন্য সুরে কথা : এই একটা ব্যাপারে সুজনপুরের কাছে হেঁটমাথা হয়ে ছিলাম, এদ্দিনে সুরাহা হচ্ছে। সাব জজ আছেন, রায়সাহেব আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন—

পোস্টাপিস তো দস্যি আমাদের পক্ষে। তাঁদেরই কাছে যাব বলে বেরিয়েছি।

বেণুধর বলে, চাঁদা ?

চাঁদা তো বটেই, আর আছে চিঠি লেখার ব্যাপার। সেই জিনিসটা ভাল করে তালিম দিয়ে আসব। গাঁ থেকে আমাদের যত লিখতে হয়, সে আমরা লিখে যাব। কিন্তু বাইরে থেকে ওঁরা যদি হেলা করেন, পোস্টাপিস কিছুতে রাখা যাবে না। বছরে দু'বার মোটে। কেন পারবেন না ? ঠিক সময়ে খেয়াল করিয়ে দেব আমি।

ধাঁধাঁর মতো শোনাচ্ছে। বাইরে থেকে যারা লিখবে, বেণুধরও তাদের একজন। তাকেও অতএব বুঝিয়ে দিতে হয়। এমনি চিঠি লেখো না লেখো যায় আসে না। না লেখাই বরঞ্চ ভালো। সেই পয়সায় গণতির সময়ে বেশি করে লিখবে। হেড-অফিস থেকে দশ দিন করে চিঠি গণতি করে—বছরে দু'বার। গড় হিসাব করে তাই থেকে পোস্টাপিসের আয় নির্ণয় হয়। সেই ক'টা দিন গাঁয়ের মানুষ চাঁদা তুলে এর নামে ওর নামে চিঠি ছাড়বে। তেমনি আবার বাইরের নানা স্থান থেকে চিঠি এসে পৌঁছানোর দরকার। যেখানে যাবে নিরঞ্জন এই জিনিসটার তালিম দিয়ে আসবে। বেণুধরকেও লিখতে হবে—রোজ অন্তত খান আষ্টেক।

কথার মাঝে বেণু বলে ওঠে, চাঁদার কথাটা তো বলছ না যে আমায় ?

আহত স্বর, আবার বলে, আমি সাব-জজ নই, ইঞ্জিনিয়ারও নই, পুঁচকে এক কেরানি। আমার চাঁদা তাই বুঝি বাদ ?

নিরঞ্জন বলে, বলা কি ফুরিয়ে গেল রে ? ছুৎসরের মাছিটা অবধি চাঁদা দেবে। কেউ বাদ নেই।

হাত বাড়িয়ে বলল, দিয়ে দে। তোর থেকেই চাঁদার সূচনা হোক।

পুলকিত বেণু তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে একখানা দশটাকার নোট নিরঞ্জনের হাতে দিল।

নিরঞ্জন গর্জন করে ওঠে : দেখ চাল দেখাতে আসবিনে। মাইনে যা পাস আমার জানা আছে।

বেণু জবাব দেয়, মাইনে কম, খরচা যে আরও কম। কাঞ্চনের কলেজের মাইনে দিতে হত, উল্টে সে-ই এখন রোজগার করে বাবাকে দিচ্ছে। বাবার হাতখরচা একমাস দু'মাস না পাঠাতে পারলেও বিনা আফিঙে তিনি থাকবেন না।

তাই বলে দশ ? দশটাকা চাঁদার যুগ্যি মানুষ তুই ?

এবারে বেণুধর রেগে গেছে। ফস করে নোট ছিনিয়ে নিয়ে বাক্স খুলছে রেখে দেবার জন্য। বলে, অত কথার কি ! আমি সামান্য মানুষ—গ্রাম আমার নয়, পোস্টাপিসও নয়। আমি কেউ নই তোমাদের। পয়সাও দিচ্ছি নে, হল তো ?

অভিমানে বেণুর গলা থমথম করে। নিরঞ্জন নরম হয়ে বলে, থাকগে,

আধাআধিতে রফা হয়ে যাক—পাঁচটাকা। দাদা হই আমি তোর—বলি আমার একটা খাতির রাখবিনে?

ব্যথিত কণ্ঠে নিরঞ্জন আবার বলে, মেসে ফিরে বিকালে তেল-মুড়ি খেতিস, তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। যাকগে, শুনবিনে যখন কিছুতে—

বেণু হেসে বলে, তার জন্যে ভাবনা নেই, মুড়িওয়ালী ধার দেয়। দাম দু-মাস পরে দিলেও কিছু বলবে না। কিন্তু তুমি যে লম্বা পাড়ির মতলব নিয়ে বেরিয়েছ যাচ্ছ-সাবজজ-সাহেব অবধি—

নিরঞ্জনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মনিব্যাগ বের করে ফেলে। নিরঞ্জন হাঁ-হাঁ করে: করিস কি, আমার ব্যাগে তোর কি গরজ?

ব্যাগ খুলে ততক্ষণে বেণু উপুড় করে ফেলেছে। একটাকা আর গোটা কতক পয়সা। হেসে উঠে বলে, কী রাজভাণ্ডার নিয়ে বেরিয়েছ, সে তো অজানা নেই আমার। টাকা দেবো না তো কি পায়ে হেঁটে যাবে সাবজজ-সাহেবের জলপাইগুড়ি অবধি?

দুধসর গ্রামের গৌরব সাবজজ-সাহেবের বাসাবাড়ি। গেলেই দেখা হয় না এসব মানুষের সঙ্গে, স্লিপে নামধাম ও প্রয়োজন লিখে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। দুধসর নামটা নিরঞ্জন খুব বড় করে লিখল। আরদালিকে বলে, নিয়ে যাও তো দেখি। এতেই হবে। গাঁয়ের নাম ধরে বছরের পর বছর বিজয়ার প্রণাম পাঠিয়ে আসছি।

মনের চাঞ্চল্যে বসতে পারে না। ঘণ্টা দুই পরে ট্রেন, সেই ট্রেনে ফিরবে। অনেক কাজ, ফিরতি-পথে তিন-চার জায়গায় নামবে। সাহেবগঞ্জে তো নিশ্চয়ই। রেলের কোয়ার্টারে থাকে তিন তিনজন—সামান্য লোক তারা, তবু গ্রামবাসী তো বটে। কেউ বাদ না পড়ে যায়। বাদ হলে দুঃখ করবে পরে কোনদিন যখন দেখা হবে। ওই বেণুধরের মতো।

আরদালি বেরিয়ে এলে নিরঞ্জন বলে, কি হল?

সাহেব কাজে ব্যস্ত। স্লিপ রেখে এসেছি, দেরি হবে। আপনি বসুন।

বয়ে গেছে নিরঞ্জনের বসতে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। চোখ তুলে সাবজজ-সাহেব উষ্ণকণ্ঠে বলেন, কি চাও।

পোস্টাপিসের টাঁদা। দুধসর থেকে আসছি। কী আশ্চর্য, আমায় না-ই চিনলেন; নিজের গ্রাম তো চিনবেন।

প্রণাম করবে, কিন্তু টেবিল ও সেল্ফের ব্যূহ ভেদ করে সাহেব অবধি পৌঁছানো বড় শক্ত। ফলাও করে পরিচয় দিচ্ছে: আমি নিরঞ্জন। ফি বিজয়া দশমীর পরে বরাবর চিঠি পেয়ে আসছেন, সেই মানুষটা আমি। আপনাকে নিয়ে দুধসর গাঁয়ের কত দেমাক। গাঁয়ের গরজে আজ নিজে হাজির দিয়েছি।

বক বক করে নিরঞ্জন বলে চলেছে। সাবজজ ঘাড় গুঁজে পাতার পর

পাতা লিখে চলেছেন—খুব সম্ভব এজলাসের কোন মামলার রায়। নিরঞ্জনের কথা দুটো হয়তো কানে যায়, পাঁচটা যায় না। নিঃশব্দ শ্রোতা পেয়ে নিরঞ্জনের ভারি স্ফূর্তি, মন খুলে বলে যাচ্ছে। সাবজজ ইঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব এমনি সব ভারিক্কি বাসিন্দা দুধসর গাঁয়ের, দুধসরের সঙ্গে সুজনপুর পারবে কেমন করে? শেষ মারটা হচ্ছে এইবারে—এ পোস্টাপিসের প্রতিষ্ঠা।

আরও খানিক পরে চেয়ার ছেড়ে উঠে সাবজজ-সাহেব ভিতরে চললেন।

নিরঞ্জন বলে, টাকাটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিনগে। বসে রইলাম। দুপুরের গাড়িতেই রওনা হব। অনেক জায়গায় যেতে হবে তো—যাঁর কাছে না যাব, তিনিই চটে যাবেন : দেখেছ, আমায় হেলা করল, আমি যেন গ্রামের কেউ নই।

সাবজজ-সাহেব কিন্তু দুধসর গ্রাম কিছুতে মনে করতে পারছেন না। মা বেঁচে আছেন, একেবারে থুনথুনে-বুড়ি। তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, পল্লীগ্রামে কবে নাকি আমাদের বাড়ি ছিল, তুমি কিছু বলতে পার মা? গিয়েছ সেখানে? সেই ধাপধাড়া জায়গা থেকে চাঁদার জন্য চলে এসেছে—বোঝ একবার! বাপ রে বাবা! পুজোর চাঁদা থিয়েটারের চাঁদা দারিদ্রভাণ্ডারের চাঁদা বলে চাইলে বুঝতাম, পোস্টাপিসের চাঁদা কখনো তো শুনিনি।

মা উদার কণ্ঠে বললেন, পিরথিম-জোড়া নাম করে ফেলেছে বাবা, নাম শুনে এত দূরে এসে পড়ল। দাও কিছু, যখন এসে ধরেছে। না হয় অপাত্রেই যাবে। দুধসরে আমিও কখনো যাইনি, আমার শাশুড়ি থাকতেন শুনেছি। তোমার পিতৃপুরুষের গাঁ থেকে এসেছে, অত শত বিচার না-ই করলে। দিয়ে দাও দুটো টাকা।

সাবজজ-সাহেব মায়ের কথায় আবার গিয়ে নিরঞ্জনকে দর্শন দিলেন। পৃথিবী-জোড়া নাম হয়ে বিপদ হয়েছে—দুটো টাকা হাতে করে দিতে শরমে বাধল। পাঁচ টাকার নোট দিয়ে দিলেন একটা। সে-কথা বললেনও তিনি খুলে : মা দু-টাকা দিতে বললেন, কিন্তু গাড়িভাড়া করে তুমি অত দূরের জায়গা থেকে এসেছ—

কাজ করতে বেরিয়ে নিরঞ্জনের কিছুতে রাগ হয় না। সকৌতুকে বলে, সেই গাড়িভাড়াটা কত বলুন তো—

সাবজজ বলেন, আমরা ফার্স্টক্লাসে যাই, তোমাদের ক্লাসের ভাড়া কেমন করে বলি।

তর্কাতর্কি না করে টাকা পাঁচটা মনিব্যাগে ভরে নিরঞ্জন উঠে পড়ল।

এর পর কলকাতা ফিরে বেণুধরের মেসে এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। বেণু বলল, টাকা মুখের উপর ছুঁড়ে বেরিয়ে এলে না কেন নিরঞ্জনদা।

নিরঞ্জন বলে, তাঁর কিছু লোকসান ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে খুঁটে নিয়ে তুলেপেড়ে রাখতেন। মুশকিল আমারই হত—বিনা-টিকিটে গাড়ি চেপে পথের মাঝখানে হয়তো নামিয়ে দিত। সাহেবগঞ্জে পৌঁছতেই কত দিন

লেগে যেত ঠিকঠিকানা নেই। জুলাইয়ের গোড়ায় পোস্টাপিস বসাব, এদিকে সাব্যস্ত করে বেরিয়েছি।

॥ ছয় ॥

সাবজজ-ইঞ্জিনিয়ার-কানুনগো এবং কেরানি-মাস্টার-মোটর ড্রাইভার—চাঁদার জন্য বড-ছোট বিস্তর জায়গায় ঘোরাঘুরি করে নিরঞ্জনের এবার বুঝি খানিকটা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। বেনুধরের মেসে দু-দুটো দিন ধকল সামালাতে গেল। তিন সিটের ঘর—শনিবার বলে অপর দুই মেম্বার অফিস অন্তে সরাসরি দেশের বাড়ি চলে গেছে। পাশা-পাশি দুই চৌপায়ায় দুজনা। খেয়েদেয়ে দরজায় খিল দিয়েছে।

এত বকবক করে বেণু, সন্ধ্যা থেকে আজ কথাবার্তা যেন গুনে গুনে বলছে। যে ক'টি কথা নিতান্ত নইলে নয়।

নিরঞ্জন বলে, হল কি তোর ?

ধরেছ ঠিক নিরঞ্জনদা। মন বড খারাপ। বাবা গালমন্দ করে চিঠি দিয়েছেন। চিঠি যখনই দেন, তার মধ্যে গালি। আজ একেবারে যাচ্ছেতাই করে লিখেছেন।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বলে, তোর মতন ছেলে হাজারে একটা হয় না। কোন ছুতোয় তোকে গালি দেন শুনি।

কাঞ্চনের বিয়ের কিছু করতে পারছিনে।

একটু থেমে আহত স্বরে বেণু বলতে লাগল, কী আমার রোজগার, বাবার কিছু অজানা নেই। মেয়ের বিয়ের মবলগ খরচ, অত টাকা পাই কোথা আমি।

পেলেও দিবিনে বিয়ে। নিরঞ্জন সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, বিয়ে দিসনে—খবরদার, খবরদার। গাঁয়ের ঐ এক শিক্ষিত মেয়ে—আমাদের শিবরাত্রির সলতে। বিয়ে হলে ড্যাংড্যাং করে বরের ঘরে যাবে। এত কষ্টের বালিকা বিদ্যালয় উঠে যাবে মাস্টার বিহনে।

তাই বলে বোন আমার চিরকাল বুঝি ধিঙ্গি হয়ে বেডাবে!

আলবৎ। দুধসরের খাতিরে। শিক্ষিত মেয়ে আর একটা পেয়ে যাই, বিয়ের কথাবার্তা তারপরে। সে তো পাবই। বাইরে থেকে না পাই, বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েও তো পাশ করে বেরুবে।

বেণুধর হেসে উঠল।

চটে গিয়ে নিরঞ্জন বলে, হাসির কি হল শুনি ? বিদ্যালয়ে সারাটা দিন বসে বসে তবে কি ঝালমশলা বাটবে ?

হাসতে হাসতে বেণু বলে, এত বুদ্ধি ধরো দাদা, কিন্তু দুধসরের স্বার্থে সব তোমার তালগোল পাকিয়ে যায়। গাছমুখ্যু যত মেয়ে এতগুলো ক্লাস সারা করে পাশ হয়ে বেরুবে, সে কত বছরের কথা বলো দিকি হিসাব করে।

বিয়ের বয়স পেরিয়ে ততদিনে কাঞ্চনের যে চুল পেকে যাবে।

বলে ফেলে নিরঞ্জনেরও সেটা খেয়ালে এসেছে। মনে মনে অন্য পন্থা ভাবছিল। বলে, গাঁয়ের ভিতরের পাত্র পেলে সব দিক রক্ষে হয়ে যায় কিন্তু। হাতের কাছে আছেও একটা মজুত। বিজয় সরকার—

উৎসাহ ভরে বলতে থাকে, দিয়ে দে বিজয়ের সঙ্গে। তা-না না-না করিসনে। বড় ভাল সম্বন্ধ রে। বাপ হল হাইকোর্টের উকিল পুরঞ্জয় সরকার —বুক ফুলিয়ে আমরা তাঁর নাম করি, বালিকা বিদ্যালয় সেই মানুষের নামে।

রেণুধর বলে, বাবার ঝোঁক বিজয়ের উপরেই তো। হচ্ছে না বলে রাগারাগি। হবে কেমন করে—খাঁই বিস্তর। আমায় দশবার বিক্রি করলেও পণের টাকা হবে না। সরকার গিন্নি ওত পেতে রয়েছেন, টাকা বাজিয়ে নিয়ে তবে বউ ঘরে তুলবেন। টাকা থাকলেও কিন্তু অমন চশমখোরের ঘরে আমি বোনের বিয়ে দিতাম না। কাঞ্চন ওদের কাছে সুখী হবে না।

হঠাৎ বলে ওঠে, একটা কথা বলি নিরঞ্জনদা। হাসতে পারবে না কিন্তু।

হাসব না।

রাগ করতেও পারবে না। কথা দাও।

আচ্ছা, রাগ করব না।

কাঞ্চনকে তুমিই বিয়ে করো নিরঞ্জনদা—

নিরঞ্জন হেসে গড়িয়ে পড়ে: তোকে ধরে ঠেঙাবো। হাসি নয়, রাগও নয় এর ওষুধ ঠেঙানি দেওয়া।

রেণুও সমান তেজে বলে, অন্যায় কিছু বলিনি। বয়স হয়েছে, বিয়ে কেন করবে না শুনি। কাঞ্চনের বড়ভাই হিসাবে আমি মত দিয়ে দিচ্ছি। আর বাবা। হয়েছে—অরক্ষণীয়া মেয়ে কাঁধ থেকে নেমে গেলেই হল। গাঁয়ের মধ্যে চোখের উপরে থাকতে পারবে, বিষয়-সম্পত্তিও আছে তোমার। বাবার অমত হবে না।

নিরঞ্জন হেসে বলে, আর কাঞ্চন? তার মত নিতে যাবিনে? আমায় কাঁচকলায় খায় যে। বাড়ির উপরে পেয়ে ফোঁস করে একদিন ছোবল মারতে এসেছিল—

রেণুধর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, কাঞ্চন যাতে রাজী হয়ে যায়, তার ব্যবস্থা আমি করব। সে আমার অবুঝ বোন নয়।

নিরঞ্জন রাগ করে বলে, আমি রাজী নই—

কেন, বোন আমার খারাপ? চোখের উপর এদ্দিন ধরে দেখছ, কি দোষ পেয়েছ বলো। বলতে হবে।

নিরঞ্জন আমতা আমতা করে বলে, চোখে কিছু ধরতে পারিনি, কিন্তু মারাত্মক দোষ আছে ঠিক—নয়তো তোদের বিষনজর কেন এত? নয়তো গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে মারবার ষড়যন্ত্র কি জন্যে? কাঞ্চনের পাশে আমি বর হয়ে দাঁড়াব, গলায় পাথর বেঁধে গাঙে ছুঁড়ে দেওয়া তার চেয়ে অনেক ভাল।

বেণু কানেই নেয় না। বিনয় বশে লোকে নিজেকে ছোট করে বলে, নিরঞ্জনের কথা যেন তাই। আগের সুরেই বলে যাচ্ছে, বিয়ে হলে তোমার বালিকা বিদ্যালয় নিয়েও চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত। মাইনে দাও আর না দাও, মাস্টারনী হাতছাড়া হবার উপায় রইল না।

নিরঞ্জন বলে, আমার সঙ্গেই যদি বিয়ে দিবি, বোনকে লেখাপড়া শিখতে দিলি কেন রে হনভাগা? ঐ মেয়ে বিয়ে করতে হলে ওর উপর দিয়ে যেতে হবে। দুটো পাশ করে বসে আছে—ওর যে বর হবে, তিনটে পাশ চাই অন্তত তার।

হেসে উঠে বলে, আজ থেকেই যদি লেগে যাই, তিন পাশে পৌঁছুতে এ জন্মে কুলাবে না। তোর বোনাই হবার কোন উপায় নেই। তার চেয়ে তুই বরঞ্চ একটা পাশ-করা মেয়ে বিয়ে করে ফেল বেণু! ইস্কুলের উপকার হবে।

বেণু হেসে বলে, বলেছ ভাল। সেয়ানা বোনের বিয়ে হচ্ছে না, নিজের বিয়ের পুলক—ক্ষেপে গিয়েছি বলবে লোকে। তখন আর চিঠির উপরে নয়—লাঠি হাতে বাবা আমার মেস অবধি তেড়ে আসবেন।

নিরঞ্জন সেই এক সুরে বলে যাচ্ছে, দুটো পাশ না-ই হল, একটা পাশওয়ালা দেখে বিয়ে করে ফেল তুই। বিয়ে করে দুধসর পাঠাবি—সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়ের চাকরি। বিয়ে হয়ে কাঞ্চন তখন হিল্লিদিল্লি যেখানে খুশি চলে যাক, তাকিয়েও দেখব না। তাকে আর গরজ কি তখন?

সকৌতুকে বেণুধর বলে, তোমাদের গরজ না থাকলে হিল্লিদিল্লি নিয়ে যাবার মানুষটা পাই কোথা? কে বিয়ে করছে?

আছে কত মানুষ! জলে পড়তে চায়, আগুনে পুড়তে চায়। এই কলকাতা শহরেই কত পড়ে আছে, খোঁজ নিয়ে দেখিস। পোস্টাপিস ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক, প্রমাণ সহ তখন আমিই খোঁজ দিতে পারব।

চকিতে একটু ভেবে নিয়ে নিরঞ্জন আবার বলে, মাইনর-ইস্কুলের হেডমাস্টারমশায় কাজ ছেড়ে দেবেন বলছেন। বয়স হয়েছে, পেরে ওঠেন না। উপযুক্ত হেডমাস্টার কেউ এসে কাঞ্চনকে বিয়ে করুক না। বিয়ে করে সে মানুষ দুধসরে থাকবে। মাইনর-ইস্কুল বালিকা-বিদ্যালয় দুটো ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত তখন।

ঐ মতলব এখন মাথায় পাক দিচ্ছে। বলে, রানীশঙ্করী লেন কোথায় কতদূরে ভাল করে বুঝিয়ে দে দিকি আমায়।

রাতটুকু পোহাতেই—যা দেরি। খুঁজে খুঁজে নিরঞ্জন রাণীশঙ্করী লেনে সমর গুহর বাড়ি বের করল। চাকরে দেখিয়ে দেয়: ঐ যে দাদাবাবু।

ইনিয়ে বিনিয়ে এই ছোকরা কাঞ্চনকে প্রেমের চিঠি লেখে। হোক তবে প্রেমের পরীক্ষা।

চা ও সিগারেট সহ গুলতানি হচ্ছে সমবয়সি পাঁচ-ছজন মিলে! অকুতোভয়ে

নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিরক্ত দৃষ্টি তুলে সমর বলে, কাকে চাই আপনার?

আপনাকেই। উঠে আসুন, আড়ালে বলব।

সমর বাইরে এলো: কি?

একমুখ হেসে নিরঞ্জন বলে, চাকরির খবর নিয়ে এসেছি। করবেন?

সমর বলে, চাকরির জন্য আমি উতলা হয়ে আছি, এ খবর আপনাকে কে দিয়েছে?

নিরঞ্জন সেকথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, দুধসর এম-ই ইস্কুলে হেডমাস্টারি।

আচ্ছা মানুষ তো মশায়। উপকার না করে কিছুতেই ছাড়বেন না? ইস্কুল-মাস্টারি আমি করব না।

কিছু ঘাবড়ে গিয়ে নিরঞ্জন বলে, ভাল করে কানে নিলেন না বোধহয়। জায়গাটা হল দুধসর।

দুধসর হোক আর দইক্ষীর হোক, কলকাতা ছেড়ে এক-পা আমি কোথাও যাচ্ছিনে। লাট সাহেবের চাকরি হলেও না।

তিতবিরক্তি হয়ে নিরঞ্জন ফিরল। শহুরে প্রেমের এই নমুনা। বিরহে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরবে, কিন্তু সেটা কলকাতার গঙ্গায়। শহরের সীমানার বাইরে অন্য কোন জায়গা হলে হবে না।

আরও ক'দিন এখানে সেখানে ঘুরে নিরঞ্জন দুধসর ফিরল। ঘোরাঘুরি সার। চাঁদা যা উঠেছে, ট্রেন-ভাড়াতেই খেয়ে গেল। হাত প্রায় শূন্য।

নীলমণি শুষ্কমুখে বলে, টাকা জমা দেবার তারিখও তো এসে যাচ্ছে। উপায়?

উপায় সানুদি। ক'দিন ধরেই ভাবছি। বাইরের মানুষ বিস্তর নেড়ে-চেড়ে দেখে এলাম। গাঁয়ের মানুষের বেলাও কিছু ইতরবিশেষ হবে না। মানুষ সই দিয়েছে দেদার—পোস্টাপিস চাই তাদের। পয়সা চাইতে যাও, সেই তারাই তখন আর কানে শুনতে পাবে না। যত ভাবছি, সানুদি ছাড়া অন্য কাউকে মনে পড়ে না।

নীলমণি বলে, দুটাকা পাঁচটাকার তেজারতি সানুদির—অত টাকা দিতে যাচ্ছেন উনি। পাবেনই বা কোথা?

দেবেন কি আর উনি? আমাদের দরকার—পেতে হবে কায়দা-কানুন করে।

সেই কায়দাকানুনের আন্দাজ পেয়ে নীলমণি শিউরে উঠল—কী সর্বনাশ!

নিরঞ্জন বলে, সেকালে স্বদেশি ছেলেরাও এই পথ নিয়েছিলো। বোমা-রিভলভারের দাম যোগাড় হত ডাকাতি করে। লোকে ভাল মনে ইচ্ছে করে না দিলে উপায়টা কি? আমরা সামান্য লোক, ছোটখাট কাজ—স্বদেশ বলতে

এই দুধসর আমাদের। আমাদের ডাকাতি নয়, চুরিতেই হয়ে যাবে।

নীলমণি সকাতরে বলে, বিধবা-বেওয়া মানুষ—তোমার জন্যে কী না করেন উনি। ওঁকে রেহাই দাও।

চটে গিয়ে নিরঞ্জন বলে, কুলে এসে ভরাডুবি হোক, সেইটে চাস তুই? রেহাই দেবো বলেই তো দেশদেশান্তরে বেরিয়েছিলাম। বড বড মানুষ দেখে এলাম— বড়র নাম নিয়ে ঢাক বাজাতেই ভাল। কাজে আসে না, তারা কেবল কথার সরবরাহ দেয়।

পরক্ষণে সান্ত্বনা দেয় নীলমণিকে: সানুদির টাকা মারা যাবে না, পোস্টা-পিস চালু হলেই জমা টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। আর চালু না হয়ে যাবে কোথা? কোন দিন আমরা হেরেছি, বল্ নীলমণি?

নীলমণিও জোর দিয়ে বলে, চালু হবেই। এতখানি এগিয়ে এসে পোস্টাপিস যদি না হয়, সুন্দনপুরের লোক তিষ্ঠাতে দেবে না আমাদের—ঠাট্টা তামাশায় অস্থির করবে। হতেই হবে চালু।

সানুদি অনেক কাল থেকে নিরঞ্জনের সংসারে। বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ি টিকতে পারছিলেন না। নিরঞ্জনের মা তখন আশ্রয় দিলেন। আত্মীয় সম্পর্ক আছে কি না আছে, কিন্তু মেয়ে বলে পরিচয় দিতেন তিনি সকলের কাছে। মা চলে যাওয়ার পর সানুদি সংসারের সর্বময়ী এখন। কুটোগাছটি ভাঙে না নিরঞ্জন, দশ-কাজে সময় কখন তার? সানুদি না থাকলে এতদিন ভেসে যেত কোথায়। আঁচলে চাবি বেঁধে ঘরে-বাইরে তিনি অহরহ চোখ ঘুরিয়ে বেড়ান। বর্গাদার ধান মেপে দেবার সময় চিটা মিশিয়েছে, তার জন্য ঝগড়া করছেন। আবার এদিকে নিরঞ্জনের কয়েকটা হেঁচকি উঠেছে—একটা ছোঁড়াকে গাছে তুলে কচি-ডাব পাড়াচ্ছেন তার জন্য।

এই মানুষ সানুদি। মানুষের দুটো চোখ থাকে, সানুদির বোধ-করি পিছন দিকেও আর দুটো চোখ। সেই চোখের উপর দিয়ে বিধবার সম্বল হেলেহার ছড়া গাপ করে নিরঞ্জন ভোরবেলা নীলমণিকে এসে ডাকছে: গঞ্জে চল যাই।

উঠে চোখ মুছতে মুছতে নীলমণি বলে, এত সকালে গঞ্জে কেন?

টাকার যোগাড়ে যেতে হবে না? পোদ্দারের কাছে কর্জ করব। জমা দেবার শেষ তারিখ আর তিনটে দিন পরে। খেয়াল আছে?

পোদ্দারের সঙ্গে নিরঞ্জনের কি বিশেষ খাতির—নীলমণি বুঝতে পারে না। পথেও নিরঞ্জন কোন কথা ভাঙল না। এমন একটা বিশ্রী কাজ করে এসেছে, কী জানি কি বলে! মুখে যা খুশি বলুক কিন্তু বিধবা মানুষের নামে করুণার্দ্র হয়ে পথের উপর বেঁকে না দাঁড়ায়!

গঞ্জে গিয়ে সোজা পোদ্দারের দোকানে। ন্যাকড়ায় বাঁধা হেলেহার পোদ্দারের হাতে দিল: জিনিস রেখে দেড়শটি টাকা দাও পোদ্দারমশায়। কারবারি মানুষ—মুখে না বলেও মনে মনে বুঝতে পারছ, কী দামের জিনিস।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি দেখ—ঠুকনি পাথরে ঠোকর দাও, নিক্তিতে চড়াও।

নীলমণি অবাক হয়ে বলে, গয়না কে দিল নিরঞ্জনদা।

কলিকালের মানুষ—ভালোকাজে আপোষে কে দেবে বল্। চুরি করেছি। চুরিতে যেমন পাপ, দশের কাজে তেমনি পুণ্য। পাপে পুণ্যে কাটাকাটি, লোকসান মোটের উপর নেই।

কৌতূহলী নীলমণি প্রশ্ন করে: গয়না কার? সানুদিরই বুঝি?

বাড়ি ছেড়ে বাইরে চুরি করতে যাব, এত পাকা-চোর ঠাউরেছিস আমায়! ধরলে যা ঠেঙানি দেয়।

নীলমণি রাগারাগি করল না। শুধু বলে, ঠেলাটা বুঝবে সানুদির। সে জিনিসও ঠেঙানির বড় কম হবে না।

নির্ভয়ে হেসে নিরঞ্জন বলে, কিছু না, কিছু না। দিদি নন তিনি আমার? কায়দা জানা আছে। কিছু হবে না, দেখে নিস।

পোদ্দার ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়ে গণেগেঁথে টাকা নিয়ে এলো। নিরঞ্জন বলে, একটু ভুল হয়েছে পোদ্দার মশায়। আরও তিনটে টাকা দিতে হবে। দেড়শ নয়, একশ-তিপ্পান্ন।

বাড়ি ফেরে না তারা। গঞ্জ থেকে ঐ পথে অমনি সদরে চলল। সদরের হেড-অফিসে টাকা জমা দিয়ে তবে সোয়াস্তি। চুপসরে ফিরল গভীর রাত্রে। নিরঞ্জন চুপিসারে দাওয়ায় উঠেছে, নীলমণি উঠানের একদিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গতিক বুঝে নিচ্ছে।

দরজায় ঘা দিতে হল না, পায়ের শব্দেই সানুদি রে-রে করে উঠলেন: কে রে, কে তুই?

এই রাত্রি অবধি জেগে বসে আছেন নিরঞ্জনের অপেক্ষায়। খিল খুলে বেরিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন: তোরই কাজ—তুই ছাড়া অন্য কেউ নয়। ঘরের শত্রু ছাড়া কেউ এমন পারে না। মায়া নেই, দয়াধর্ম নেই।

নিরঞ্জন তাড়া দিয়ে ওঠে: হয়েছে কি বলবে তো সেটা—

সানুদি বলেন, ক্যাসবাক্স ভেঙে আর হার বের করে নিয়েছিস। নিয়ে গুষ্ঠির শ্রাদ্ধ করতে সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছিলি।

নিশিরাত্রে চারিদিক নিঃসাড়। তার মধ্যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। পুত্রশোকেও এমন করে কাঁদে না লোকে: ওরে হতভাগা, হার না নিয়ে আমার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিয়ে গেলিনে কেন।

মুণ্ডু বন্ধক রেখে কি টাকা দিত সানুদি

হাসছে নিরঞ্জন। সানুদিকে ঠাণ্ডা করার মন্ত্র জানে সে সে সত্যি সত্যি। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, বন্ধক দিয়েছি তোমার জিনিস, বিক্রি করিনি। তাই নিয়ে কান্নাকাটির কি হল, বুঝতে পারিনে। জিনিসটা পড়ে পড়ে জং ধরছে —বলি, পয়সা কিছু আনুক না রোজগারপত্তোর করে। তোমার ক্যাসবাক্সে ছিল, গিয়ে এখন পোদ্দারের আলমারিতে উঠল। পোদ্দার টাকা ধার দিল—

তুমিও ধরে নাও হেলেহার ধার দিয়েছ আমাদের। ধার আমি একলা নিইনি—পোস্টাপিস সর্ব-সাধারণের, গ্রামসুদ্ধ খাতক তোমার।

সানুদি একেবারে চুপ। গ্রামসুদ্ধ মানুষের উত্তমর্ণ হবার আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করছেন বোধকরি মনে মনে। নিরঞ্জন আরও পুলকিত করে তাঁকে : পোদ্দার সুদ নেবে। তোমাকেও মাসে মাসে সুদ দিয়ে যাবো যতদিন না ফেরত দিতে পারছি। নিয়ে নাও আগাম একমাসের সুদ! তেজারতি করছ কম দিন হল না—ক'টা খাতক আগাম সুদ দেয় শুনি?

দুটো টাকা নখে বাজিয়ে টুং-টুং আওয়াজ তুলে নিরঞ্জন সানুদিকে দিয়ে দিল। চোখে যে অশ্রুচিহ্ন ছিল, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সানুদি আঁচলে মুছে ফেললেন। ভিন্ন সুরে বলেন দু'টাকা সুদ বড্ড কম হয়ে যায়। ভারীসারি জিনিসটা আমার—চারটাকা। যাক গে যাক—সাধারণের কাজ —তার মধ্যে আমিও তো একজন। তিন টাকার কমে কিছুতে হবে না।

পোদ্দারের কাছ থেকে পরে আবার তিন টাকা চেয়ে নেওয়ার রহস্য এতক্ষণে বোঝা গেল। উঃ, কত বুদ্ধি ধরে নিরঞ্জন—ব্যাপারটা আদ্যন্ত কেমন মনে মনে ছকে রেখেছে।

এই এক স্বভাব—তেজারতির টাকা খাটাতে পারলে সানুদি আর কিছু চান না। সুদের লোভ দেখিয়ে কত লোকে যে তাঁকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়—

দু'টাকা কর্জ দাও সানুদি, দু-আনা সুদ মাসে মাসে।

দু-আনা নয়, চার আনা। পয়লা মাসের সুদটা আগাম।

উঁহু, চার আনা হলে যে গলায় ছুরি দেওয়া হয়। তোমার কথা থাক, আমার কথাও থাক—তিন আনা কেটে নিয়ে এক টাকা তের আনা দাও আমায়।

সানুদির সুদের হার বড চড়া। সুদ নিয়ে তর্কাতর্কি দর-কষাকষিও করতে হয়। খাতকে তবু ছাড়ে না। গণেগেঁথে ঐ যে এক টাকা তেরো আনা নিয়ে গেল, আর কখনো এ-বাড়ি পা দেবে না পারতপক্ষে। সানুদিরও সেজন্য মাথাব্যথা নেই। ঐ যে একবার আগাম সুদ পেয়ে গেছেন, তাই নিয়ে মশগুল।

দেখা হলে বিপদও আছে। খাতকের নয়, সানুদির।

রাগ করে সানুদি তেড়ে ওঠেন : সুদ টুদ দিসনে, ভেবেছিস কি তুই। আজকেই চাই আমি—সুদ শোধ করে দিয়ে তবে যাবি।

খাতক বলে, কত?

এইখানে সানুদির মুশকিল। হিসাবপত্র মাথায় ঢোকে না। কিছু নরম হয়ে বললেন, সে আমার খাতায় লেখা রয়েছে। কিন্তু তুই অন্যের টাকা ধেরে খেয়েছিস, তোর তো বেশি করে মনে থাকবে। কত হয়েছে, তুই বল সেটা।

খাতক লোকটা অম্লান বদনে বলে, আট আনা—

আট আনা না আরো-কিছু। বারো আনার এক পয়সা কম নয়।

লোকটা চটে উঠল : হিসাবে আমি কারচুপি করছি বলতে চাও ? বেশ, তোমার খাতা তবে বের করে আনো সানুদি।

সানুদি বলেন, তাই বলে এত কম কিছুতে হতে পারে না। কত মাস হয়ে গেল—বারো আনা না-ই দিস, নেহাত পক্ষে দশ আনা তো দিবি। দিয়ে দে তাই।

লোকটা আরও গরম হয়ে বলে, দেবো কি গাছ থেকে পেড়ে ? কর্জ দাও, তবে তো দেবো। তিনটে টাকা বের করো—সে টাকার আগাম সুদ যা হয়, আর পুরনো হিসাবের ঐ দশ আনা কেটে রেখে বক্রি আমায় দিয়ে দাও। উঃ কাবুলিয়ালা হার মানালে তুমি সানুদি।

সুদ আদায়ের খাতিরে সানুদিকে পুনশ্চ আবার কর্জ দিতে হল। তাহলেও সুদটা পেয়ে গেছেন, এই বড় তৃপ্তি।

আজকেও সুদের বাবদ নগদ তিন তিনটে টাকা পেয়ে সানুদির আনন্দের অবধি নেই। নিরঞ্জনকে বলেন, ভাত বাড়তে যাচ্ছি। হাত পা ধুবি তো শিগগির সেরে আয়। রাত কাবার হয়ে এলো।

উঠানের দিকে নজর পড়ল : ওটা কে রে—নীলমণি বুঝি ? ভূতের মতন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন ? আসতে বল ওটাকে, ভাত কি ওখানে দাঁড়িয়ে খাবে ?

।। সাত ।।

গ্রাম দুধসর, পোস্টাপিস দুধসর, থানা জাগুলগাছি——

পোস্টাপিস বসে গেল গ্রামে। অস্থায়ী অফিস এখন—পাকা-পাকি থাকবে না তুলে দেওয়া হবে, এক বছর পরে বিবেচনা। ততদিন অতি-সতর্ক থাকতে হবে। নিরঞ্জনের আটচালা ঘরের একটা দাওয়া বাঁশের বেড়ায় মজবুত করে ঘিরে দিল। অফিস সেখানে। রানার নীলমণি, পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন। জিনিসটা পুরোপুরি মুঠোর মধ্যে। এখন এই অবস্থা চলুক, পোস্টাপিস পাকা হয়ে গেলে তখন মুঠো ঢিলে করা যাবে। গ্রামের লোকেরও সেই মত। চার টাকা মাইনের পোস্টমাস্টার—চার টাকার জন্য কে অত ঝামেলা পোহাতে যাবে একমাত্র এই নিরঞ্জন ছাড়া ?

প্রথম কয়েকটা দিন কী উত্তেজনা মেয়েপুরুষ সকলের। কাজের মতন কাজ দেখালে বটে নিরঞ্জন—দুধসর গ্রামে গভর্নমেন্টের খাস অফিস। বাংলা-গভর্নমেন্ট নয়—খোদ ভারত গভর্নমেন্ট, সাসমুদ্র-হিমাচলব্যাপ্ত যার শাসন। কত বড় ইজ্জত ! সুজনপুরের দর্পচূর্ণ—দুধসরের উপর শেষ মাতব্বরিটুকুও খসে গেল।

রানার নীলমণি সিল-করা ডাকের ব্যাগ সুজনপুর সাব-অফিসে পৌঁছে দিয়ে সুজনপুরের ব্যাগ দুধসর নিয়ে আসে। নিরঞ্জন আপিসের ভিতরে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। আসে না কেন এখনো নীলমণি—না-জানি কী সব

জিনিস ব্যাগের ভিতরে বয়ে এনে আজ হাজির করবে! খামের চিঠি, পোস্ট-কার্ডের চিঠি, মনিঅর্ডার। হয়তো বা রেজিস্ট্রি-পার্শেল। সেই সব চিঠি-পার্শেলে কত কি রহস্য—আগে থাকতে কিছু বলবার জো নেই। উত্তেজনায় নিরঞ্জন পোস্টাপিসের আটচালা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দুপুরের কড়া রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে গ্রাম-সীমানায় মাঠের ধারে দাঁড়ায়, দূরের পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। রানারকে এগিয়ে নিয়ে আসবে।

অবশেষে এক সময় দেখতে পাওয়া গেল—মোড় ঘুরে নীলমণি দেখা দিয়েছে। ঘরব্যাভারি সে নীলমণি আর নেই—সরকারি চাকরে, নতুন সজ্জা তার এখন। বাদামি চামড়ার চাপরাসের মাঝখানে ঝকঝকে পিতলের পাতের উপর খোদাই-করা 'মেল-রানার'। রোদের জন্য গায়ের চেক-কাটা চাদর মাথায় জড়িয়ে দিয়েছে—যেন রাজমুকুট। খাটো আকারের বল্লম কাঁধে, বল্লমের গলায় ঘণ্টি—অন্য প্রান্তে ডাকের ব্যাগ। ভারত গভর্নমেন্টের মেলরানার বীরমদে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে দ্রুত চলে আসছে। ঘণ্টি বাজছে ঠুনঠুন করে—পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও সব—সামাল, সামাল!

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পোস্টাপিসের দরজার সামনে ব্যাগসুদ্ধ ছুঁড়ে দিয়ে নীলমণি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়: জল দাও সানুদি, বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেছে।

পিওনমশায়ের আমলে এই দুঃসময়ে দেখা গেছে—কারো হাতে চিঠি গুঁজে দিলেন, মানুষটা গল্প করছে তো করছেই, চিঠিখানা উল্টে-পাল্টে দেখারও আগ্রহ নেই। গাঁয়ের নিজস্ব পোস্টাপিস হওয়া অবধি বিষম উৎসাহ সেই সব মানুষের—দরজা ঘিরে ভিড় করে দাঁড়ায়। চিঠিপত্র যদি থাকে, হাতে হাতে নিয়ে নেবে। চার টাকা মাইনের পোস্টমাস্টার নিরঞ্জনকে পিওনের কাজটাও সেরে দিতে হবে অবসর মতো, অস্থায়ী পোস্টাপিসে আলাদা পিওনের খরচ দেওয়া হবে না। এবং পোস্টাপিসের প্রয়োজনে যাবতীয় বাজে খরচার দায়িত্বও তার উপরে—ঐ চার টাকা মাইনের ভিতর থেকে।

তাহলেও সরকারি চাকরি, সে মাহাত্ম্য যাবে কোথায়? মাটির মানুষ নীলমণি, চিরদিন আজ্ঞে-আজ্ঞে করে কথা বলে এসেছে, মেলব্যাগ ঘাড়ে তুললেই সঙ্গে সঙ্গে তার যেন দুনিয়া অগ্রাহ্য করা ভাব। নিরঞ্জনও তেমনি পোস্টাপিসের টুলের উপর বসলে ভিন্ন একজন হয়ে যায়।

কাঞ্চন এসেছে এই ডাকের সময়টা। অন্যদিন বালিকা-বিদ্যালয়ে থাকতে হয়, রবিবার বলেই আজ আসতে পেরেছে। সরে গিয়ে সকলে কাঞ্চনের জন্য দরজা খালি করে দিল। স্লিপারের আওয়াজ তুলে কাঞ্চন ঢুকে পড়তে যায়—কিন্তু সাধ্য কি পোস্টমাস্টার অফিসের মধ্যে হাজির থাকতে! নিরঞ্জন হুমকি দিয়ে ওঠে: নো, নো—নোটিশ তো পড়ে দেখবে আগে—

চৌকাঠের উপরে ইংরেজি ও বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড: নো অ্যাডমিশন—ভিতরে আসিও না। আঙুল বাড়িয়ে নিরঞ্জন সরকারি আদেশ দেখিয়ে

দেয়। খাতির-উপরোধ নেই এ ব্যাপারে। কাঞ্চন মুখ লাল করে থমকে দাঁড়ায়, তারপর ফরফর করে চলে গেল।

আপিস না ঢোকা যাক, বাইরে দাঁড়াতে মানা নেই। চপাচপ সিল পড়ে চিঠির উপর—এক দুই তিন চার···বাইরে থেকে উৎসাহী দু-তিন জনে গণে যাচ্ছে। আঠারো হয়ে গেল। দুশমন পোস্টাপিসে এত চিঠি—এত সব চিঠি লিখবার মানুষ কোথায় ছিল রে এদ্দিন ঘুমিয়ে?

চিঠিপত্র আসে, মনিঅর্ডারে টাকাকড়িও আসতে লেগেছে। ইংরেজি মাসের চার তারিখে বেণুধরের টাকা আসে বাপ শৈলধরের নামে। ছুটিছাটা না থাকলে চার তারিখেই সুনিশ্চিত। পুরা দমে চলছে পোস্টাপিস। ঠুন ঠুন করে ঘণ্টি বাজিয়ে চতুর্দিকে জানান দিয়ে মেলব্যাগ কাঁধে নীলমণি সগৌরবে ছোটে। শ্রীগঞ্জ গ্রাম পার হয়ে মাঠে পড়ল এবার। চাষীরা নিড়ানি দিচ্ছে। নীলমণির খাতির সর্বত্র—আগেও ছিল, সরকারি লোক হয়ে বেড়ে গেছে। ক্ষেত থেকে ডাকছে: এসো নীলমণি ভাই, তামাক খেয়ে যাও। আলের উপর মেলব্যাগ নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাতের মুঠোয় কলকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দু'টান টেনে নিল নীলমণি। পথ-সংক্ষেপের জন্য এবারে মুচিপাড়ার পথ ধরে। দুর্ধর্ষ চোর-ডাকাত এই মুচিরা—সেই প্রসঙ্গ যদি কেউ তোলে নীলমণি চাপরাস দেখিয়ে দেয়: রাজার মাথার মুকুট আর আমার কোমরের আমার কোমরের চাপরাসে তফাত এমন-কিছু নেই। দেখুক না বেটারা ছুঁয়ে। শুধু আমাদের জাঙ্গলগাছি থানা নয়, কলকাতার লাট-সাহেবের বাড়ি অবধি টনক নড়ে যাবে।

চাপরাসের মহিমা মুখে মুখে মুচিদেরও কান অবধি পৌঁছে গেছে। টাকা-কড়ির কত চলাচল ব্যাগের ভিতরে—সাহস করে চোখ খুলে কেউ তাকাবে না রানার নীলমণির দিকে।

চাষীপাড়ার ভুবন সর্দার একদিন এসে বলে, পোস্টাপিস কত করে?

পোস্টকার্ডে কথাবার্তা লিখে ডাকবাক্সে ছাড়লে কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে যায়, এ বিষয়ে সর্বশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানোদয় হয়েছে। তবে বলতে গিয়ে নামের হেরফের হয়ে যায়—পোস্টাপিস বলে বসে পোস্টকার্ডকে। দু-পয়সা দাম শুনে ভুবন বলে, আমি বাবু এক জোড়া নিচ্ছি, তিন পয়সার বেশি দেবো না কিন্তু—

নিরঞ্জন বুঝিয়ে বলে, ভারত গভর্নমেন্ট দর বেঁধে দিয়েছে—

ভুবন সর্দার বিশ্বাস করে না। বেজার হয়ে বলে, দিন না দর বেঁধে—তাই বলে একটা খাতির থাকবে না! একসঙ্গে দুখানার খদ্দের—পাইকারি দরও তো থাকে সব জিনিসের।

নিরঞ্জন বলে, পোস্টকার্ডে কি লিখতে হবে, তাই বলো। আমি গুছিয়ে-গাছিয়ে লিখে দিচ্ছি। কিন্তু দামের কম বেশি করবার উপায় নেই ভুবন। আমি কোন ছার—খোদ লাটসাহেব হলেও পারবেন না।

আধ ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি, ভুবন কিছুতে বুঝল না। অবশেষে বলে, তিন পয়সার বেশি নেই আমার কাছে। এক পয়সা বাকি থাকল তবে। যখন পারি, দিয়ে দেবো।

একা ভুবন নয়, অনেকের সঙ্গেই ব্যবস্থা এমনি। পাকা খাতা তৈরি করতে হয়েছে ধারবাকি লিখে রাখবার জন্য। চার টাকার পোস্টমাস্টারের বাড়তি কাজ চিঠি বিলি শুধু নয়, খাতা ধরে হাটে-ঘাটে এই সব পাওনা তাগিদ করে বেড়ানো। দিতে চায় না, ওয়াদা করে ঘোরায়। নিরঞ্জন এক এক সময় হতাশ হয়ে পড়ে: নাঃ, হাল খাতা করব এবার পোস্টাপিসে। গণেশপুজো আর বাজনা-বাদ্যি হবে—ধারবাকি তখন যদি দিয়ে দেয়।

এ সমস্ত যা-হোক এক রকম চলে যাচ্ছে, মারাত্মক কিছু নয়। ফ্যাসাদ হয়েছে ইনস্পেক্টর নিয়ে। হরবখত তিনি আসতে লেগেছেন। হাজির থেকে শলাপরামর্শ দেবেন নতুন পোস্টাপিস চড়চড় করে যাতে জাঁকিয়ে ওঠে। খুঁটিয়ে কাজকর্ম দেখবেন নাকি। দেখেন তো কচু। এসেই নিরঞ্জনের আটচালা-ঘরে ঢুকে ধবধবে তোষক-চাদরের বিছানায় গড়িয়ে পড়বেন। এটা খাবো ওটা নেবো, নিরন্তর বায়না। রোদের জোর কমলে আসন্নসন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়েন, দ্রুতপায়ে গ্রাম চক্কোর দিয়ে বেড়ান। হাটবার হলে হাটে যান কখনো-সখনো। দুপুরের সাংঘাতিক একপ্রস্থ আয়োজন নিঃশেষিত হবার পর দানুদি এদিকে সান্ধ্য জলযোগের জন্য ক্ষীরের ছাঁচ বানাতে বসে গেছেন। রান্নাঘর থেকে বেরুনোর ফুরসত হল না সারা দিনমানের মধ্যে। নীলমণি ওদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পাঁঠা এনে হাজির করল। ভ্যা-ভ্যা করছে উঠানের উপর, ডালসুদ্ধ কাঁঠালের পাতা এনে খেতে দিচ্ছে। রাত্রিবেলা পাঁঠার হাঙ্গামায় কাজ নেই, শুভ পদার্পণ যখন ঘটেছে ত্রিরাত্রি-বাস তো নির্ঘাৎ। পাঁঠার ঘাড়ে কাল সকালে কোপ পড়বে।

ভ্রমণ থেকে সন্ধ্যাবেলা হেলতে দুলতে ইনস্পেক্টর ফিরে এলেন। নিরঞ্জন মুকিয়ে ছিল। বলে, কী জিনিস নীলমণি জুটিয়ে এনেছে, একটি বার চোখে দেখে যান। কালো কুচকুচে, গায়ের উপরেই তেল পিছলে পড়ে যেন—ঠিক রাজপুত্তুর।

ইনস্পেক্টর উদাসীন। তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, পাঁঠা বই তো নয়। নিরামিষ পাঁঠা খাইয়ে খাইয়ে অরুচি ধরিয়ে দিলেন মশায়। পাখি মেলে না—আবার যখন আসব রামপাখির ব্যবস্থা রাখবেন নিরঞ্জনবাবু।

আবার আসবেন—সে কিছু অনিশ্চিত দূরভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। এই যাচ্ছেন—আবার তো এলেন বলে। এ মাসের ভিতর না-ই হল তো পরের মাসে। এসে রামপাখি অর্থাৎ মোরগের সেবা নেবেন, ফরমাশ হয়ে রইল। বড় একটা মানকচু দেওয়া হল এবারে, না-না করতে করতে সাইকেলের পেছনে বেঁধে নিলেন। বললেন, হাটে নলেনগুড় উঠছে, চিনি ফেলে লোকে নাকি সেই

গুড় খায়। কিনে রাখবেন তো এক ভাঁড়, দাম দিয়ে নিয়ে নেবো।

পোস্টাপিস বসানো চাট্টিখানি কথা নয়। এক মচ্ছব সারা হতে না হতে পরবর্তীর আয়োজনে লেগে যেতে হয়—ওরে নীলমণি, শুনলি তো সব নিজের কানে? লেগে যা। রামপাখি আর নলেনগুড়।

নীলমণিও তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে। বেজার মুখে বলে, নলেনগুড় হাটে উঠেছে, কোন চোখ দিয়ে উনি দেখলেন? ক্ষেতেলের ঘরেও নেই এখন, ফড়েরা কিনে চালান করেছে। কারো গুদোমে দু-এক ভাঁড় পড়ে থাকতে পারে। পিলে-চমকানো দর হাঁকবে। সে তো গুড় খাওয়া নয়, কড়মড় করে পয়সা চিবিয়ে খাওয়া।

পয়সাটা যে পরের, তাই চিনি ফেলে গুড় খেয়ে নেবে। মুখ ফুটে বলেছে, দিতেই হবে। ওর এক কলমের খোঁচায় পোস্টাপিসের মরণ-বাঁচন।

নীলমণি গজর-গজর করে: এই তো চলেছে একনাগাড়। এসেই মুখ ফুটে এক একখানা ছাড়বেন, আর আমি বেটা মুলুক চুঁড়ে মরি। ঐ যে মানকচু সাইকেলে তুলে নিলেন—গাঁয়ে মিলল না তো ন' পাড়ার হাটে গিয়ে মানকচু কিনতে হয়। আসতেও লেগেছেন চাঁদে চাঁদে। আরও কত পোস্টাপিস কত দিকে—যে সব জায়গায় ন-মাসে-ছ-মাসে একবার যান। তোয়াজ নেই, কোন সুখে যাবেন? গেলে তো হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কখন দশটা বাজবে, পোস্টমাস্টার এসে চাবি খুলবেন।

নিরঞ্জন বলে, যাদের পাকা-পোস্টাপিস তাদের ভয়টা কিসের, তারা কেন তোয়াজ করতে যাবে? দিন আসুক ঐ ইনস্পেক্টরকে পুরো বেলা উঠানে দাঁড় করিয়ে রাখব। ঘড়ি ধরে আপিসের তালা খুলব তখন।

সে সৌভাগ্যের দিন কবে আসবে, ঠিকঠিকানা নেই। মরিয়া হয়ে নিরঞ্জন একদিন সুজনপুরে রাখালরাজের কাছে গিয়ে পড়ল। অটল পিওনের ছেলে রাখালরাজ সাব-পোস্টমাস্টার হয়েছে, সে হিসাবে নিরঞ্জন উপরওয়ালা। আশৈশব অন্তরঙ্গও বটে, উপরে বসেও রাখালরাজ পুরনো সম্পর্ক ভোলেনি।

নিরঞ্জন বলে, ইনস্পেক্টর সামলাও ভাই, তোমাদের সঙ্গে দহরম-মহরম—কায়দাকানুন করো একটা কিছু। আমি আর পেরে উঠছিনে, ফতুর হয়ে যাবার জোগাড়।

সবিস্তারে রাখালরাজ শুনল। হাসছে টিপে টিপে, রঙ্গ, দেখছে। বলে, দীনেশ পেটুক বড্ড, কিন্তু মানুষটি ভাল। পেটেই খাবে, ক্ষতির কাজ কিছু করবে না। অন্য লোক হলে গলদ বের করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেত, ফন্দিফিকিরে যাতে নগদ রোজগারও হয়। নতুন মানুষ তুমি, এ লাইনে একেবারে কাঁচা। একটু চেষ্টা করলেই বিস্তর গলদ বেরুবে।

ঠিক বটে, এদিকটা নিরঞ্জন ভেবে দেখেনি। বলে, মেজাজে মানুষ উনি সত্যি। কাগজপত্র যেন বাঘ, তাকিয়েও দেখেন না। ঘুরে ঘুরে ক্ষিধে বাড়ান

শুধু। ঘুমানো, ঘোরাঘুরি আর খাওয়া। যাবার মুখে খানকয়েক কাগজে সই মেরে খালাস।

তবে দেখ, সরকারি মানুষ হয়েও কতদূর ঋষিতপস্বী। এমন অস্থায়ী-পোস্টাপিস পরিদর্শনে যে মানুষ আসবে, সে-ই খাবে। দীনেশ তো মাছ-মাংস মিষ্টি-মিঠাই খায়, অন্য কেউ এলে শকুনির মতো তোমার যথাসর্বস্ব খুবলে খুবলে খেয়ে যেত।

নালিশ করতে এসে নিরঞ্জন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, খাওয়ার জন্যে ঠিক নয়। যখনই আসবেন, যথাসাধ্য খাওয়াবো। মাইনে পাই সাকুল্যে চার টাকা, অত ঘন ঘন না যদি আসেন—

আসে কি পোস্টাপিস দেখতে? অন্য কারণে আসে। থাকে আমাদের বাড়ি। সেই সময় একবার দুবার গিয়ে পোস্টাপিস দেখে আসে সরকার থেকে রাহা-খরচ আদায় করবে বলে। খাইয়ে-মানুষ—তোমার আয়োজন দেখে লোভ সামলাতে পারে না।

বোন ললিতা এখন বাড়িতে। দাদার কাছে এই সময়টা সে এসে পড়ল, কথাবার্তার মধ্যে এক পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। রাখালরাজ মুখ টিপে হেসে তাকে বলে, কাণ্ড শুনলি দীনেশের। দুধসরে গিয়ে ধুন্দুমার লাগায়। এমন হাঁউ-মাউ-খাউ এ জায়গায় চলে না, আমাদের বাড়ি কিছুতেই তাই খেতে যায় না।

হেসে ললিতা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এতক্ষণে নিরঞ্জন তাকে ভাল করে দেখল। দেখে চোখ কপালে উঠে যায়। অনেক দিন দেখেনি ললিতাকে—এত বড় হয়ে গেছে। মেয়েরা যেন কি—একটা বয়সে পৌঁছলে কলাগাছের মতন রাতারাতি বড় হয়ে ওঠে।

বলে, এ সময়ে বাড়িতে যে তুমি? ইস্কুল তো খোলা।

উত্তর দিল ললিতা নয়, রাখালরাজ। বলে, টেস্ট দিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। মিছে হস্টেলের খরচা টানি কেন? বাড়ি বসে পড়াশুনো করছে, একমাস পরে ফাইন্যাল। কি রে ললিতা, দরকার আছে কিছু?

ললিতা বলে, দু তিনটে অঙ্ক বুঝে নিতে এসেছিলাম। থাক এখন।

থাকবে কেন রে, কী রাজকার্যে আছি? লজ্জা হল নাকি তোর? কী সর্বনাশ, চিনতে পারিসনি—দুধসরের নিরঞ্জন।

ললিতা বলে, চিনব না কেন? তোমার যেমন কথা।

চেনার যদি কিছু মুশকিল হয়ে থাকে, সে তো নিরঞ্জনেরই। বিধাতা যেন ভেঙে আবার নতুন করে গড়েছেন ক'বছর আগেকার ডিগডিগে মেয়েটাকে। একটা কথা সকলের আগে ছাঁৎ করে নিরঞ্জনের মনে ওঠে—দুধসরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুজনপুরও যদি বালিকা-বিদ্যালয় খুলে বসে, ললিতার সেখানে মিস্ট্রেস হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব হবে না।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে: পাশ-টাশ করে কি করবে ললিতা? কলেজে

পড়বে তো?

পরম শুভার্থীর মতো জোর দিয়ে বলে, : নিশ্চয় পড়বে। আরম্ভ যখন করেছ, থামাথামি নেই। হয়ে যাক তিনটে চারটে পাশ, কলকাতার মেয়ে-কলেজে প্রফেসার হবে তখন।

কেন আর ওঁকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ? রাখালরাজ বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নাড়ে: কলেজে পড়ানোর অবস্থা কি আমাদের? সরকারি বাসা পেয়ে সদরে থাকতে হল, কপালে ছিল একটু বিদ্যে—এই অবধি হয়েছে।

ললিতা জেদ ধরে বলে পড়বই আমি দাদা। না পড়ে ছাড়ছি না। কাজকর্ম নিয়ে নেবো একটা প্রাইভেটে পড়াশুনো করব।

অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে নিরঞ্জনের। কাজকর্মের মতলব মাথায় ঢুকে গেছে। সেই কাজ কী হতে পারে? সুজনপুর বালিকা-বিদ্যালয়ে মাস্টারি—বাড়ি থেকে মাস্টারির সঙ্গে সঙ্গে দাদার কাছে পড়াশুনাও হতে পারবে। সুজনপুর বেশ খানিকটা খাটো হয়ে আছে—বালিকা-বিদ্যালয়ের কথা মাতব্বরেরা কি আর ভাবছে না? এমন তৈরি মাস্টার হাতের কাছে পেয়ে ইস্কুল খুলতে কিছুমাত্র দেরি করবে না।

হেসে রাখালবাবু প্রসন্ন মুখে বলে দেন: আবার ভাবনা কি ললিতা, কাজ তো মজুত রয়েছে তোমার জন্যে। [illegible] কাজ দেবার জন্য [illegible] ধর্না করে বেড়ায় [illegible] পাশ ফেল [illegible] একটা হেস্তনেস্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করবেন। [illegible] সেখানে গিয়ে ছেলে [illegible] মারবি—আর [illegible] কি করে [illegible]।

মুখ [illegible] হেসে রাখালরাজ [illegible] দিকে সকৌতুকে চেয়ে বলে, তোমার [illegible] তখন। [illegible] পাস করবার এত [illegible] তখন আর ইনস্পেক্টরবাবুরা থাকবেন না।

[illegible] কালে গেলাম আর কি। এবার তাড়াবে ফিরে ফিরে আসব দাদা

বলতে বলতে ললিতা লজ্জা পেয়ে ভিন গাঁয়ের মানুষটির সামনে থেকে পালিয়ে যায়।

॥ আট ॥

একদিন এক দুরন্ত হাসির ব্যাপার। ডাকের ব্যাগের সিল-মোহর-করা দড়ি কেটে উপুড় করতেই বেরিয়ে পড়ল ডুমুর একটা।

ডুমুর কেন রে নীলমণি, চিঠিপত্তোর কোথা?

নীলমণি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে: পোস্টমাস্টার মস্করা করেছেন তোমার সঙ্গে। চিঠি একখানাও নেই। বললেন, এই কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে খালি ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাবি কেন রে, একটা ফল দিয়ে দিই। গাছ থেকে একটা ডুমুর

ছিঁড়ে দিয়ে বললেন, চিঠির বদলে আজ ফুলো-ডুমুর। ভারি আমুদে মানুষ উনি।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে ওঠে: সর্বনাশের জোগাড—আর তুই আমোদ পেলি এর মধ্যে। ইনস্পেক্টরের তোয়াজ কিসে কমানো যায়—রাখালরাজেব কাছে আমি সেই ব্যবস্থায় গিয়েছিলাম। তোয়াজ যে এখনো দুনো-তেদুনো করতে হবে। ছ-মাইল পথ ভেঙে খালি মেলব্যাগ আনলি—তাই নিয়ে কেমন করে তোর হাসি আসে, বুঝতে পারিনে।

সদুঃখে বলে, যা কিছু আমি করতে যাই কোনটাই জমতে চায় না। বালিকা-বিদ্যালয়ে গোড়ায় গোড়ায় মেয়ে কুড়ির উপর উঠে গিয়েছিল। বাড়বে কোথা দিনকে দিন, দৃষ্টান্ত দেখে ঘরে ঘরে সবাই ইস্কুলে মেয়ে পাঠাবে—তা নয়, কমতে কমতে এখন ছ'সাতটায় ঠেকল। সেখানেও এমনি ফুলো-ডুমুরের দশা—হয়তো খালি বেঞ্চিগুলোকেই কাঞ্চনের পড়িয়ে যেতে হবে। পোস্টাপিস খুলে কতবড় আশা, খাম-পোস্টকার্ডে পয়লা দিনই আঠারোখানা এলো—

সেই গৌরব-দিনের কথা নীলমণিরও সুস্পষ্ট মনে আছে। সে জুড়ে দেয়: গিয়েছিল এখান থেকে বত্রিশখানা। তার উপরে রেজিস্ট্রি দুটো, মনিঅর্ডার একটা দশ টাকার—

নিরঞ্জন বলে, উঠে-পড়ে না লাগলে উপায় নেই রে নীলমণি। ইস্কুলের ব্যাপারে কাঞ্চনকেও বললাম সেই কথা। এমনি চললে পোস্টাপিস-ইস্কুল দুই-ই উঠে যাবে, সুজনপুর স্ফূর্তিতে বগল বাজাবে। চিঠির বদলে দু-এক দিন ডুমুর এলে তেমন মারাত্মক হয় না, কিন্তু রেজেস্ট্রি-প্যাকেট, মনিঅর্ডার এ সবের হিসাব থাকে। শ্রীগঞ্জের পোলের ধারে তবলদাররা এসে নাকি বাসা করেছে, তাদের কাছে গিয়ে খবরাখবর নে নীলমণি। একশো টাকা পাঠালে কমিশন দু-আনা ছাড় পাবে।

খেজুরগুড়ের অঞ্চল—খেজুররস জ্বাল দেবার জন্য শীতকালে কাঠকুটোর প্রয়োজন পড়ে। প্রকাণ্ড আকারের কুড়াল নিয়ে এই সময়ে কটক ও পুরী জেলা থেকে কাঠ চেলা করবার মানুষ আসে। তবলদার বলে তাদের। বিস্তর রোজগার করে তারা এক এক মরশুমে, দেশেঘরে টাকা পাঠায়। একশো টাকা পাঠাতে ডাকখরচা এক টাকা—নীলমণি গিয়ে তদ্বির করছে, টাকাটা দুধসর পোস্টাপিসের মারফতে পাঠালে টাকার জায়গায় চোদ্দ আনা কমিশন নেওয়া হবে। বাকি দু-আনার পূরণ দেবে পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন মাইনে ঐ চারের ভিতর থেকে। নতুন পোস্টাপিস বাঁচাবার এই সমস্ত প্রক্রিয়া।

শুধুমাত্র নীলমণির উপর নির্ভর না করে নিরঞ্জন নিজে চলল ভিন্ন এক খানে—কাবুলিওয়ালাদের ডেরায়। কম্বল-আলোয়ান নিয়ে ফি বছর শীতকালে আসে তারা, গরম-কাপড় ধারে বিক্রি করে। ও-বছরের টাকা এ-বছর

উসুল করে, আদায়ি টাকাকড়ি কলকাতায় আত্মজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সকলের সব টাকা একত্র করে তারা কাবুলরাজ্যে চালানের বন্দোবস্ত করে। সেই ডেরা সুজনপুর পোস্টাপিসের এলাকার মধ্যে, তবু নিরঞ্জন তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ে: আমার ওখান থেকে টাকা পাঠাও খাঁ-সাহেব। সবই সরকারি আপিস—যেখান থেকে পাঠাও ঠিক গিয়ে পৌঁছবে। দুঃসব পোস্টাপিস উপরন্তু এই দু-স্থানার সুবিধা দিচ্ছে।

কোথাও কিছু নয়, হঠাৎ কাঞ্চন একদিন মনি-অর্ডারের ফরম পূরণ করে নিয়ে এলো পনের টাকা পাঠাচ্ছে কলকাতার মঞ্জুলা নামে মেয়ের কাছে। আর এক খামের চিঠি ঐ মঞ্জুলার নামে। বলে, এ চিঠি ডাকে গাফ করবেন না। পাঠাবেন।

নিরঞ্জন আকাশ থেকে পড়ে: কোন চিঠি আমি না পাঠাই? টিকিট মেরে ছাড়লেই বাপ-বাপ বলে পাঠাতে হবে। টিকিট না থাকলেও বেয়ারিং করে পাঠাই আইনের দস্তুর।

তিক্তকণ্ঠে কাঞ্চন বলে, সে আইন ভারতবর্ষ জুড়ে। কেবল আমার দুঃসরে এসে পৌঁছয়নি। সে থাকগে—হাতে-নাতে যেদিন ধরতে পারব, তখন সে কথা। কিন্তু এই চিঠি ঠিক মতো যেন গিয়ে পৌঁছায়। পোস্টাপিসের স্বার্থে। এত করে কেনই বা বলি—সব চিঠি খুলে পড়েন, এ চিঠি পড়ে নিজেই সেটা বুঝতে পারবেন।

নিরঞ্জন জিভ কেটে বলতে যায়, পরের চিঠি খুলে পড়ি—কী সর্বনেশে কথা বলছ তুমি!

কিন্তু বলছে এসব কার কাছে! জবাবের প্রত্যাশা না করে চিঠি ও মনি-অর্ডার রেখে কাঞ্চন হনহন করে ওই ইস্কুলের দিকে চলল। ইস্কুল করতে করতেই পোস্টাপিসের কাছে এসেছিল।

এমন বলে আরও বেশি কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে গেল। চিঠি যদিই বা না দেখত, এখন আর না দেখে কোনক্রমে পারা যায় না। বাটি ভরা জল পাশে নিয়ে নিরঞ্জন পোস্টাপিসে কাজে বসে। খামের মুখে জল দিয়ে খুলতে হয়। রাস্তাপথে যেমন লোকের চলাচল, ডাকের পথে তেমনি মনের চলাচল। ক্ষুদ্র এক ডাকঘর নিরঞ্জন আপনমনে বসে আছে দায়িত্ব বিষম বই কি। হাতের উপর দিয়ে কী ধরনের কত রকম ভাবনাচিন্তা যায় আসে, দেখে-শুনে বুঝে-সমঝে তারে সেগুলো ছাড়তে হয়। এই দিক দিয়ে পোস্টাপিসের এক মাহাত্ম্য, আগে কিন্তু মাথায় আসেনি—পোস্টমাস্টারের টুলে বসে এখন সব বুঝছে। গ্রামে গ্রামে পোস্টাপিস হওয়া উচিত, এবং দায়িত্বশীল এক একজনে পোস্টমাস্টার হবেন। আগেকার দিনের সমাজপতির মতন। অথবা অন্তর্যামী দেবতার মতন। দেবতা গোটা বিশ্বভুবনের অন্তরের খবর রাখেন, পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন শুধুমাত্র দুঃসরের। অতএব ছোট মাপের দেবতা।

কাঞ্চন চিঠি দিয়ে গেল কলকাতার মঞ্জুলা নামে একজনকে। বান্ধবী, সেটা বোঝা যাচ্ছে। আদ্যন্ত পড়ে নিরঞ্জন মুগ্ধ হয়ে যায়। বদমেজাজি মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এমন, বাইরে দেখে কিছুমাত্র বোঝা যায় না। মঞ্জুলাকে লিখেছে, এই পনের টাকা হাতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে সে আবার মনিঅর্ডার করবে কাঞ্চনের নামে। কমিশনের খরচা মঞ্জুলারই—তাদের দুঃসময় পোস্টাপিসের দরুন চাঁদা। টাকা ফেরত পেয়ে কাঞ্চন আবার পাঠাবে, এবং তার পরে মঞ্জুলাও। অনন্তকাল ধরে চলল। টাকা ছুটোছুটি করছে, মনিঅর্ডার আসা-যাওয়ার হিসাব বাড়ছে পোস্টাপিসে। ভারি সাফ মাথা কাঞ্চনের। গ্রাম ছাড়ব-ছাড়ব করে, কিন্তু ভাবেও তো খুব গ্রামের কথা। নিরঞ্জনের মতোই ভাবে। ভেবে ভেবে এই তাজ্জব বুদ্ধি বের করেছে।

চিঠি না পড়ে একখানাও বিলি হয় না, ব্যাপারটা ক্রমশ চাউর হয়ে পড়েছে। এই নিয়ে একদিন বিষম হৈ-চৈ।

নিরঞ্জন সন্ধ্যার মুখে পুরঞ্জয়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে, অজয় ডাকে: কে যায়, পোস্টমাস্টার নাকি? শুনে যাও এদিকে।

ভারী গলা। নিরঞ্জনের মনে পাপ রয়েছে, ডাকের ধরনটা ভাল বলে মনে হল না। পায়ের জোর বাড়িয়ে দেয়।

বিজয়ও সেখানে, সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল: দাদা ডাকছেন, তোমার বুঝি কানে গেল না?

নিরঞ্জন বলে, চিঠি ক'খানা বিলি করে আসি ভাই। ফেরার সময় দেখা করে যাব।

এক্ষুনি এসো বলছি—

গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ বিজয়—মুখের তাড়নায় শেষ হয় না, ছুটে বেরিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল।

অজয়ও চলে এসেছে। দু-ভায়ের মধ্যে গলা কারো খাটো নয়। মানুষ জমছে মজা দেখবার জন্য। এক কথায় দুকথায় পথের উপরেই তুমুল হয়ে-উঠল।

সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে অজয় বলে, ভোররাত্রে হারাধন ধাড়ার বাড়ি পেয়াদা নিয়ে অস্থাবর ক্রোক করতে গিয়েছিলাম। কি করব, চার বছরের মধ্যে ধাড়ার-পো খাজনাকড়ি উপুড়হস্ত করে না।

নিরঞ্জন নিরীহ ভাবে মন্তব্য করে: ভারি অন্যায় তো।

তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না দিয়ে অজয় বলছে, আদায় নেই এক পয়সা। উল্টে একগাদা খরচা করে ডিক্রি করলাম, ডিক্রি জারি করে অস্থাবর ক্রোকের পরোয়ানা বের করলাম, পনের-বিশ জন লোক জুটিয়ে শীতের মধ্যে তুরতুর করে কাঁপতে কাঁপতে ধাড়ার বাড়ি গিয়ে উঠলাম—

কৌতূহল আর দমন করতে পারছে না—তেমনি ভাবে নিরঞ্জন বলে,

তারপর ?

অজয় বলে যাচ্ছে, গিয়ে দেখি ভোঁ-ভোঁ। গোয়ালে গরু নেই, রান্না-ঘরে থালাবাসন নেই, ঘরে চৌকিতক্তাপোষ অবধি নেই। থাকবার মধ্যে ছেঁড়া-মাদুর আর মাটির হাঁড়ি-কলসি গোটা কতক। জিনিসপত্র এর বাড়ি তার বাড়ি সরিয়ে দিয়ে শ্মশানবাসী ভোলানাথ হয়ে আছে।

নিরঞ্জন বলে, ভারি শয়তান তো।

বিজয় এতক্ষণ চেপেচুপে ছিল, দাদা বলছে তার মধ্যে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যায়নি। এবারে গর্জন করে উঠল : শয়তান তুমি—

কঠিন হাতে নিরঞ্জনের কাঁধ চেপে ধরল : আমাদের সঙ্গে কি শত্রুতা বলো। এককথায় বাবা অমন খেয়াঘাটের ইজারা দান করে গেলেন, আমরা কেউ টু-শব্দটি করলাম না। তারই শোধ দিচ্ছ এমনি করে ?

হাত সরিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন বিস্ময়ের ভান করে বলে, কি করলাম, বলবে তো সেটা খুলে।

ক্রোকের পরোয়ানা বেরিয়েছে, পেয়াদা দু-এক দিনের মধ্যে গিয়ে হাজির হবে—মুহুরি চিঠি লিখেছিল আমাদের। সেই চিঠি খুলে পড়ে হারাধনকে তুমি বলে এসেছ। বাড়ি সে একেবারে সাফসাফাই করে রেখেছে। তুমি ভিতরে আছ, তা ছাড়া হতেই পারে না এমন।

অজয়ের কি মনে হয়েছে, ছুটে গিয়ে মুহুরির সেই চিঠি এনে সকলকে দেখায় : যা বলছি, ঠিক কিনা হাতে নিয়ে দেখুন। ডাকের সিলটা দেখুন একবার নিরিখ করে।

খামের এক পাশ ছিঁড়ে এরা চিঠি বের করেছে। কিন্তু তার আগে সন্তর্পণে খাম যে একবার খোলা হয়েছিল, তাতে কে সন্দেহ নেই : জোড়ের মুখে ডাকের সিল পড়েছে—সিলের দুই খণ্ড এক হয়ে মেলেনি, মাঝে কিঞ্চিৎ ফাঁক। অর্থাৎ পাঠাতে আটবার সময়টা অতদূর নিরঞ্জন খেয়াল করতে পারেনি।

এই তো সঙ্গিন অবস্থা—তার উপর কাঞ্চন এসে পড়ল রঙ্গস্থলে। আগ বাড়িয়ে সাক্ষি দেয় : হ্যাঁ, পড়েন ইনি সমস্ত চিঠি। আপনাদের চিঠি তবু তো এসে পৌঁচেছে, আমার চিঠির অর্ধেকগুলো লোপাট হয়ে যায়। ঝাড়ু-মারি গাঁয়ের পোস্টাপিসে—সুজনপুর থেকে চিঠি দিয়ে যেত, সে অনেক ভালো ছিল। আবার তাই হোক, উঠে যাক আপদবালাই।

নিরঞ্জন এবার রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েছে। বলে, কোন চিঠি কবে লোপাট হল, বলো এই দশের মুকাবেলা। আজামোজা কলঙ্ক দিলে হবে না।

কাঞ্চনও সমান তেজে বলে, অনেক—অনেক। একখানা দুখানা নয়। আমি সব টের পাই। কলকাতায় রাণীশঙ্করী লেনের একটা বাড়ি, মামাদের বন্ধু তাঁরা সব, আমি যে বাড়ি মেয়ের মতো—এত দিনের মধ্যে তাঁরা একখানা চিঠি লেখেননি, কক্ষনো তা হতে পারে না। সুজনপুরের আমলে

হপ্তায় হপ্তায় পেয়েছি। আপনি চিঠি নষ্ট করে ফেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে, জায়গাটাও গাছতলা। মেয়েটার চোখের জল এসে পড়েছে কিনা ঠাহর হয় না, কিন্তু ভিজে-ভিজে গলা।

ঘাড় নেড়ে নিরঞ্জন প্রবল প্রতিবাদ করে : লেখেনি তাঁরা চিঠি। লেখেনি-লেখেনি। না লিখলে আমি নিজে লিখে বেনামিতে পাঠাব?

ঝগড়াঝাঁটি অন্তে নিরঞ্জন একসময় বাড়ি ফিরল।

নীলমণি বলে, পরের চিঠি পড়া পাপ। কেন যাও নিরঞ্জনদা, ওইসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে? যেমন চিঠিপত্তোর এলো বিলি করে দিলে। ল্যাঠা চুকে গেল।

দেখব না শুনব না—কেন রে, টিনের ডাকবাক্স নাকি আমি। নিরঞ্জন তম্বি করছে : খুলে থাকি আমি চিঠি, বেশ করি। একশোবার খুলব। ছেলেপুলে নিয়ে হারাধন উপোস করে মরছে, পেয়াদা এনে ওরা তার ঘটি-বাটি গরু-বাছুর নিয়ে নিলামে চড়াত। ভাগ্যিস খুলেছিলাম চিঠি, এ-যাত্রা ধাড়ার পো বেঁচে গেল। লোকের ভাল করব, জুলুম ঠেকাব, নইলে এসব পাবলিক-কাজের মানেটা কি?

তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, এমনি তো কাঞ্চন পোস্টাপিসের জন্য কত করে, ক্ষেপে গিয়ে সে-ই আজ দশের মধ্যে পোস্টাপিস উঠে যাওয়ার কথা বলল। মুখ দিয়ে বের হল এমন কথা। সমর গুহ চিঠিপত্তোর লেখে না, সে যেন আমার দোষ।

গলা খাটো করে বলে, শোন তবে নীলমণি, ঐ সমরের বাড়ি অবধি চলে গিয়েছিলাম, রাণীশঙ্করী-লেনে। তুহসর গ্রাম বলতে যে-মানুষ চিনতেই পারে না, সে আবার লিখবে চিঠি।

নিজেরই মনে যেন সাহস সঞ্চয় করছে। বলে, মরুক গে যাক। দীনেশ যতদিন ইনস্পেক্টর, বেকায়দায় ফেলতে পারবে না কেউ। রাখালবাজের খাতিরের লোক—জোনাই হবে তার, ললিতার সঙ্গে বিয়ে হবে। রামপাখি আর নলেনগুড় তো সামান্য বস্তু, আকাশের চাঁদ চেয়ে বসলে তাই পেড়ে দিতে হবে রে নীলমণি। আবার করে এসে পড়ে—ভাল মোরগ ঠিক করে রাখ, ছাগল-ভেড়ার উপর দিয়ে যায় এমনি সাইজের মোরগ। আর গুড়ের ভাঁড়ের কথা বলে গেছে—ভাঁড় নয়, কলসি। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন খুঁজে নিয়ে আসবি—দেখি কোন বেটা কি করতে পারে আমাদের পোস্টাপিসের।

বেশি দেরি হল না। নতুন মাস পড়তেই খবর এসে গেল, ইনস্পেক্টর আসছেন পরিদর্শনে। সুজনপুর সাব-অফিসে এসে গেছেন, সে খবরও এলো।

দেখবি রে নীলমণি, রামপাখির কথাটা কোন ক্রমে চাউর না হয়।

রান্নাঘরে ও জিনিস উঠবে না। সানুদি টের পেলে রান্না করা ম্লেচ্ছ তরকারিতে গোবরের তাল ছুঁড়ে দেবেন। যজ্ঞি নষ্ট হবে। খাইয়ে-লোকের ভোজনে বিপাক ঘটলে দায় হয়ে উঠবে পোস্টাপিস বজায় রাখা।

যোগাড় কেষ্টকুট নীলমণি তৈরী মাংস নিয়ে এসেছে। সানুদিকে নিরঞ্জন বলে, কড়া পেঁয়াজ রশুন দিয়ে কোরমা খেতে চেয়েছেন ইনস্পেক্টর, সে জিনিস তোমার হাতে হবে না। আমি নিজে রান্না করব—জিজ্ঞাসাবাদ করে আর রান্নার বই পড়ে রপ্ত করে নিয়েছি।

বাড়ির বাইরে গোয়াল। গোমাতার বসতিস্থান, সে জায়গা কোনক্রমে অশুচি হয় না। ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে মাটির কড়াইয়ে সেই আমিষ কোরমা চাপানো হয়েছে। কিন্তু শুরুতেই গোলমাল—উনুন বেয়াড়াপনা করছে। ফুঁ দিতে দিতে দু চোখ জলে ভরে গেল। অতিথি কখন এসে পড়ে, ঐ বুঝি সাইকেলের কিড়িং-কিড়িং—মনের উদ্বেগে প্রাণপণ শক্তিতে যত ফুঁ পাড়ে ধোঁয়াই কেবল বাড়ছে, আগুনের চিহ্নমাত্র নেই।

এমন সময় হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে কাঞ্চন। নিরঞ্জনের দুর্গতি মজা করে উপভোগ করতে এসেছে। হাসছে টিপিটিপি। শুকনো নারকেল পাতা আনা হয়েছে, সমস্তগুলো উনুনে ঠেসে দিল, প্রচুর রসদ পেয়ে খুশী হয়ে উনুন যদি ধরে যায় এবার।

কাঞ্চন ভালমানুষের ভাবে বলে, কাঠ-পাতার হাঙ্গামা কেন? কাগজ তো ভাল জ্বলে যায়—চিঠিপত্তোর নেই?

চিঠি?

পুড়িয়েই তো থাকেন—

ঝগড়ার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে। হয়তো বা ইনস্পেক্টরের কানে তুলবে, তার মহড়া দিয়ে নিচ্ছে। নিরঞ্জন ক্ষেপে গেল: উঃ, কত চিঠি আসে কিনা ডাকে। তাই মানুষকে দেবো আবার উনুনে ঢোকাবো। সে বড় সুজনপুরের সাব-পোস্টাপিস— বস্তা বস্তা আসে, তারা পারলেও পারতে পারে।

কথার মধ্যে কাঞ্চন [illegible]। ধাক্কা দিল নিরঞ্জনকে: সরুন দিকি—

নিরঞ্জনকে সরিয়ে জায়গা করে নিয়ে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে ফুঁ দিচ্ছে। এক ফুঁয়েই উনুন দপ করে জ্বলে উঠল।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বলে, কী আশ্চর্য, যেন মন্ত্রের ব্যাপার। আমি এতক্ষণ ধরে এত চেষ্টা করছি—

সকলে সব জিনিস পারে না, যার যে কাজ।

এর ভিতরেও খোঁটার কথা এসে পড়ল। কাঞ্চন বলে, ডাকের চিঠি যত আঁটাই থাক, আঙুল বুলিয়ে আলগোছে আপনি খুলে ফেলেন। আমরা অমন পারব না। সে-ও লোকে বলতে পারে মন্ত্রের ব্যাপার।

ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে নিরঞ্জন যাবে না। বিশেষ করে এই সময়টা—

ইনস্পেক্টর আসার মুখটায়। সহজ ভাবে বলে, শহরে ছিলে তো তুমি। উনুনের কায়দা-কানুন জানলে কি করে?

শহরের মানুষও উনুন ধরিয়ে ভাত রেঁধে খায় নিরঞ্জনদা। শহরের ভাত আকাশ থেকে পড়ে না।

নিরঞ্জন নিরীহ ভাবে বলে, কী জানি। শহরের আলো দেশলাই জ্বেলে ধরাতে হয় না, শহরের জল কলসি ভরে আনতে হয় না; কল টিপলে আপনা-আপনি সব এসে যায়। আমি ভাবতাম, ভাতেও বুঝি তেমনি আগুন-উনুন-চাল-জল কিছু লাগে না, কল টিপলেই থালার উপর ঝুরঝুর করে পড়ে। শহরের মানুষ আমাদেরই মতন উনুন ধরিয়ে রাঁধে—ভারি আশ্চর্য তো!

শহরের মানুষ মোরগের কোরমা কেমন রাঁধে তা-ও দেখিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ-রসুন কুচিয়ে রেখেছেন—এতে হবে না, বেটে ফেলুন শিল পেতে।

পরম আপ্যায়িত হয়ে নিরঞ্জন বলে, বেশ তো বেশ তো, দেখিয়ে বুঝিয়ে দাও, কতটা কি লাগবে।

বাড়ির ভিতরে ইঙ্গিত করে নিরঞ্জন চুপি চুপি বলে, মোরগ নয় কিন্তু কাঞ্চন, খাসিছাগলের নামে চলেছে। মোরগ টের পেলে সানুদি আমাদেরই জবাই করবে।

হোক না ছাগল। রান্নার সেজন্য ইতর বিশেষ হবে না। কিন্তু এটা কি—খাসিছাগলের পাখনা দুটো একেবারে যে আস্ত রয়ে গেছে।

বাটনার দিকে চেয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বলে, পেঁয়াজ বেশ চন্দনের মতো করে বেটেছেন—বাঃ বাটনায় দিব্যি হাত তো আপনার!

বলে, ধনে জিরেমরিচ বেটে দিন এইবার—

সেটা হতে না হতে—এই যাঃ, আদা বাটনাও নেই যে। বাটুন, বাটুন—ছিবড়ে থাকলে কিন্তু হবে না। আপনি খাসা বাটেন।

বলে, জল ফুরিয়েছে—জল আনুন এক ঘটি।

স্থির হয়ে এক লহমা বসতে দেবে না। বলে, কুচোকাঠ খানকতক কুড়িয়ে আনুন দিকি। মাংস ধীর-আঁচে হবে। বড়-কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলে, ওতে হবে না।

নিরঞ্জন বলে, আমি বরঞ্চ রান্না করি। তুমি এই সমস্ত জোগান দাও।

অত সহজ নয় রান্না—

এক জায়গায় বসে বসে হুকুম-হাকাম ছাড়া—কঠিন বলেও তো মনে হয় না। ইচ্ছে করে তুমি খাটাচ্ছ।

বলতে বলতে নিরঞ্জন মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়ে কাঞ্চনের দিকে। গাঢ়স্বরে বলে, এত ভালবাসা দুধসরের উপর—দায়ে-বেদায়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ো, ডাকতে হয় না। কমিশন-খরচা করে মনি-অর্ডার করো পোস্টাপিসের আর দেখানোর জন্য। ছটফটানি তবে আর কি জন্যে শুনি। গ্রাম ছেড়ে

কখনো যাবে না, এই রকমটা ভেবে নিয়ে মনেপ্রাণে কাজকর্মে লেগে যাও।

আপনাকে বিয়ে করে—কেমন?

থতমত খেয়ে নিরঞ্জন হঠাৎ জবাব দিতে পারে না।

শহুরে মেয়ে বিয়ে করবার বড্ড লোভ, উঁ?

নিরঞ্জন আমতা-আমতা করে বলে, শহুরে হলেই কি মন্দ হয়? এই যেমন তুমি। পিঁড়ি পেতে বসে দিব্যি তো রান্নাবান্না করছ। গাঁয়ে শহরে তফাত কি তবে রইল? তবে ঝাঁজটা কিছু দেখা যায় তোমার। বিছের ঝাঁজ। ও আর ক'দিন? গাঁয়ে মধ্যে থাকতে থাকতে ফুরিয়ে যাবে। সত্যি কাঞ্চন তোমার বাদ দিয়ে আমাদের চলবার উপায় নেই।

আর যাবে কোথা? কাঞ্চনের কণ্ঠস্বর মুহূর্তে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ফুটন্ত পদ্মের ভিতর থেকে ফোঁস করে সাপ বেরুনোর মতো বলে, দাদার সঙ্গে সেই ষড়যন্ত্র। কলকাতায় গিয়ে দাদাকে জপিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেক চিঠিতে দাদার ঐ একমাত্র কথা। দাদাকে নিশ্চয় আপনি উসকে দিয়ে যাচ্ছেন।

আজকেই বেণুধরের চিঠি দিয়ে এসেছে, কাঞ্চন ফস করে চিঠি বের করল: চিঠি পড়ে খুশি হলে তবেই সে চিঠি বিলি হয় নয় তো গাপ করে ফেলেন আপনি। রাণীশঙ্করী লেনের চিঠি আসে না দাদার চিঠি ঠিক-ঠিক এসে যায়। জানেন যে দাদাকে কষ্ট দিতে চাইনে, দাদার কথা বড্ড মানি আমি—

ইনস্পেক্টর আসছে, এ সময়টা নিরঞ্জন কিছুতেই গণ্ডগোলে যাবে না। ভাব রেখে চলবে। সহাস্যে বলে, তবে আর কি। যে রকম লিখছে করে ফেল তাই তাড়াতাড়ি। পাঁজি দেখে তুমিই না হয় তারিখ ঠিক করে লিখে দাও। তোমার লজ্জা করে তো আমি লিখতে পারি। ছুটি নিয়ে বেণু চলে আসুক।

কঠিন কণ্ঠে কাঞ্চন বলে, আপনাকেই যে অপছন্দ আমার।

তাচ্ছিল্যের সুরে নিরঞ্জন বলে, সেটা উচিত বটে। গাঁয়ে পড়ে আছি, লেখাপড়া জানিনে, চাকরি-বাকরি করিনে—উঁহু, ভুল বললাম—চাকরি বাকরি বই কি। খোদ ভারত গবর্নমেন্টের চাকরি। তবে মাইনে হল চার টাকা। মাইনের কথা শুনে সব মেয়েই নাক সিঁটকে তুলবে। তা হলেও সাধুসন্ন্যাসী নই, মাইনে চার টাকা হোক আর চার পয়সাই হোক বিয়ে কোন একটা মেয়েকে করতেই হবে—

কাঞ্চনও বুঝি কৌতুক পেয়ে গেছে। কিম্বা লজ্জা পেয়েছে মুখের উপর অমন কথাটা বলে ফেলে। বলে, অপছন্দের বিয়ে—ঝগড়-ঝাঁটি হবে, জীবনে শান্তি থাকবে না যে।

বিয়ে করব আর ঝগড়াঝাঁটি করব না, তাই কখনো হয় নাকি। পছন্দের

বিয়েও দেখেছি। হাতের কাছে আমাদের কালী চকোত্তি মশায়ের ছেলে সমীরণ। বাপের অমত বলে রেজেস্ট্রি বিয়ে করে এলো, নিয়মদস্তুর দুজনের 'সখি আমায় ধরো ধরো' ভাব গোড়ার কয়েকটা দিন, তার পরেই নিজমূর্তি বেরুল। বউ কিল ঝাড়ছে, বর খুসি ঝাড়ছে। শেষটা আদালতে। কালী চক্কোত্তির বেটা এখন মাসে মাসে পনের টাকা খোরপোষ গণে যাচ্ছে। আমাদের ঘরবাভারি অপছন্দের বিয়েয় ঝগড়াঝাঁটি গালিগালাজ চড়টা-চাপড়টা হয়, এতদূর শুনিনে কখনো।

একটুখানি থেমে আবার বলে, ঝগড়া হল তো বয়ে গেল। ও কাজটায় দুজনের কেউ আমরা অপারগ নই। তুমি না, আমিও না। ঐ সঙ্গে লাভের দিকটাও খুঁজে দেখতে হবে তো।

কি লাভ শুনি?

রোজগার-করা মেয়ে তুমি। বালিকা-বিদ্যালয় চিরকাল কিন্তু এমন থাকবে না, যে রকম উঠে পড়ে লেগেছ ইস্কুল তো বড় হয়ে গেল বলে। ছাত্রী বাড়বে, তোমারও রোজগার বাড়বে। তার উপরে মাংস রান্নায় এমন ওস্তাদ তুমি। সানুদি নিরামিষটা রাঁধেন ভালো। ছোট বয়সে বিধবা—মাছ মাংস কদিন আর খেয়েছেন। ও জিনিসে বড় ঘৃণা। বেণুর মা তোমায় লিখেছে, সে জিনিস ঘটে গেলে খাওয়ার দিক দিয়েও জুত বড্ড।

কাঞ্চন বলে, রান্না করা আর মাস্টারি করা ছাড়া আর কিছু বুঝি দেখতে পেলেন না আমার মধ্যে?

নিরঞ্জন বলে, আছে নিশ্চয় অনেক। আপাতত এই দুটো মনে এলো। বাইরে বাইরে থেকে এসেছ—আমি আর কতটুকু দেখেছি বলো তোমায়।

নিরতিশয় তুচ্ছ এই গ্রাম্য মানুষটার সম্পর্কে অভিমান আসে কাঞ্চনের। গায়ের রঙে নাকি তপ্তকাঞ্চনের আভা ঠাকুরমা সেজন্য কাঞ্চন নাম রেখে-ছিলেন। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছে, সমর গুহ সেই সময় দেখে। দেখে পাগল হল। চোরের মতন অলক্ষ্যে পিছু নিয়ে মামার বাড়িটা আবিষ্কার করল, আলাপ জমিয়ে নিল মামার সঙ্গে। সুযোগও জুটল ব্রাইটন কোম্পানির নানা রকম ঠিকেদারি কাজ করে সমরের কোম্পানি। বিলের টাকার জন্য ধর্না দিতে হয় মামার অফিসে এসে। এরই সুবাদে সমর কাকা-বাবু কাকাবাবু করে জমিয়ে নিল মামার সঙ্গে। কাকাবাবুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। বেশি রকম জমে যাওয়ার পর কাকাবাবুর সঙ্গে কাকীমা এবং তাঁদের ভাগনিটিকেও নিমন্ত্রণ করে। দীর্ঘকাল ধরে অতি দুশ্চর সাধনা। সমরই একদিন বড় আবেগের মুখে কাঞ্চনের কাছে বলে ফেলেছিল।

এবং শুধুমাত্র সমর একলা একজন নয়। ঘটক সম্বন্ধ জুটিয়ে আনত—পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীকে নিয়ে কোন দিন কোন কথা ওঠেনি। এক

কথায় মেনে নিয়েছে, রূপে সুন্দরী বটে। পছন্দ-অপছন্দ পাত্রেরই সম্পর্কে শুধু। এতকাল পরে এই একটা মানুষ পাওয়া গেল, কাঞ্চনের গায়ের জলুস যে তাকিয়ে দেখেনি। তবে ভরসা করা যায়, দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে কোন এক সময় নজরে পড়ে যেতেও পারে।

মাংস সম্বরা দিল কাঞ্চন এইবার। ঘি কড়া হয়ে গিয়েছিল, কড়াইয়ের উপর দপ করে এক ঝলক আগুন। তারপর টগবগ করে ফুটতে লাগল। হঠাৎ কাঞ্চন বলে, একটা কথা বলি। দিনকে-দিন মর্মান্তিক হয়ে উঠছে। পোস্টাপিস টিকিয়ে রাখা সত্যিই মুশকিল হবে। পেরে উঠবেন না আপনি।

নিরঞ্জন বলে, অজয় বিজয় ওরা দু ভাই বড় ক্ষেপেছে। তুমি থাকো আমাদের দিকে, কেউ কিছু করতে পারবে না।

আমিই তো সকলের বড় শত্রু—

হেসে নিরঞ্জন বলে, তাই বুঝি। নমুনাও দেখছি বটে, কলকাতায় মঞ্জুলা দেবীকে মনিঅর্ডার করা, তাকে এই মাসে গাঁয়ে এসে বসা—

সে কথা কানে না নিয়ে কাঞ্চন বলে চলেছে, সব চেয়ে বেশি রাগ লেগেছেন আপনি আমার উপরে। দাদার চিঠিটা তবু দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। বিস্তর চিঠি গাপ করেন—একটা দুটো নয়, অনেক। সে সব চিঠি আপনার পছন্দসই নয় বলে।

নিরঞ্জন প্রবল প্রতিবাদ করে, মিছে কথা। প্রমাণ দেখাও।

পিওনমশায়ের আমল কলকাতা থেকে কত খানের চিঠি আসত।

এখনো তো আসে। কালকেই দিয়েছি বেগুনবেড়ের চিঠি। কালও দিয়েছি। মাঝে কদিন বাদ গেছে, তার আগেও কত চিঠি দিয়েছি। কিছু মনে করো না কাঞ্চন, তোমার লোকের অভাব নেই। দেশ বিদেশ থেকে চিঠি আসে সব কটা তোমায় দিলে পরে বোধহয় খুশী হও।

কাঞ্চন বলে চিঠি যেন দয়া করে দান দিচ্ছেন উনি আপনিই। যে চিঠি আসে, প্রায়ই তো বাজেবাজে দরকারী চিঠিগুলো মারা যায়।

(সে কি আর বুঝিনে আমি মশায়। যে চিঠি তোমার কাছে কাজের দরকারি নয়। সে চিঠি কোনদিন আসবে না—ভাববে বিনাশ হলে ফল হবে তার কেমন করে।)

নিরঞ্জনের হাসি পাচ্ছে কাঞ্চনের কথা শুনে। সত্যি সত্যি হেসে না ফেলে। কাঞ্চন তো ইনিয়ে বিনিয়ে কত লেখে—আগে বিস্তর লিখত, জবাব না পেয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। রূপ গ্রামে ও আমার বাপ খাতিরে—কংস নামটাই যে পাজি মানুষ কোনক্রমে মনে আনতে পারল না, কাঞ্চনের বাপ-ভাইয়ের গ্রাম, কাঞ্চন নিজে সেখানে থেকেছে, এমন কোন খাতিরেই নয়—তার নামের চিঠি কোনদিন ফুলহরের পোস্টাপিসে থেকে মেলব্যাগে উঠবে না। তা কাঞ্চনমালা, যতই তুমি কোমর বেঁধে ঝগড়া করো না কেন।

সাইকেল বাজিয়ে ইনস্পেক্টর এসে পড়তে ঝগড়া বন্ধ করে কাঞ্চন সরে

গেল। রাস্তা অবধি ছুটে গিয়ে নিরঞ্জন খাতির করে। সাইকেলটা নিয়ে নিরঞ্জন যথারীতি দাওয়ার উপর তুলে রাখছে, দীনেশ না-না করে উঠল: উঠোনেই থাকুক। কাজ সেরে আবার তো এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়ব।

অবাক কাণ্ড। আসা-যাওয়া ইনস্পেক্টরের এই প্রথম নয়, এমন ব্যাপার কোনদিন হয়নি। সাইকেল অন্তত পক্ষে একটা দিনটা ছুটি ভোগ করবেই, এই রীতি। ঠারেঠোরে নিরঞ্জন মনে করিয়ে দেয়: যা বলে গিয়েছিলেন, কোরমা রান্না হয়ে গেছে। গরম আছে, তাড়াতাড়ি চা করে নিন।

হেসে বলে, বুঝতেই পারছেন, রাঁধাবাড়া গোয়ালে। কাঞ্চন এসে রান্না করল। ওদের কলকাতার রান্নার কায়দাই আলাদা। খেড়ে হয়েছে, বড় সুন্দর বাস বেরিয়েছে। কিন্তু দীনেশ রাতারাতি নির্লোভ পরমহংস হয়ে গেছে। বলে, আপনারা খাবেন, আমার আজ সময় হয়ে উঠবে না। তালা খুলুন অফিসের—কাজের জন্য এসেছি, তাই হোক।

তালা খুলতে গিয়ে ঠাহর হল, হাত কাঁপছে নিরঞ্জনের—চাবি ঠিক মতো তালার ভিতর ঢুকছে না। পা দুটোও কাঁপছে বোধহয়। অজয়দের প্রভাব-প্রতিপত্তি টাকাপয়সা আছে, হামেশাই সদরে যাতায়াত, পোস্টাপিসের বিরুদ্ধে তারা গোলমাল পাকিয়ে এসেছে, ইনস্পেক্টর সেইজন্যে আজ খাতিরে ভিড়ছে না।

না, মিথ্যা আশঙ্কা। খাতাপত্র এগিয়ে দিতে একটুখানি উলটে-পালটে ঠিক অন্যান্য বারের মতোই দীনেশ খসখস করে সই মেরে দিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই উঠে পড়ে বলে, চললাম পোস্টমাষ্টারবাবু।

নিরঞ্জন কুণ্ঠিতভাবে বলে, বেলা অনেক হয়েছে। বড্ড আশা করে জিনিসটা তৈরী করলাম। সমস্ত হয়ে গেছে ভাত বেড়ে দিতে যেটুকু দেরি।

দীনেশ অপাঙ্গে একবার গোয়ালঘরের দিকে তাকিয়ে বলে, উপায় নেই মাস্টারবাবু। রাখালদার নেমন্তন্ন, ওঁদের ওখানে খেতে হবে।

এ বেলাটা কেন নেমন্তন্ন নিলেন? ভুলে গিয়েছিলে বোধহয়। মুখের জিনিস ফেলে যেতে নেই। ওদের বাড়ির খাওয়াটা রাত্রিবেলা না হয় হবে।

উঁহু, অপেক্ষা করছেন তাঁরা—

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দীনেশ ব্যস্ত হয়ে সাইকেলে চাপল।

অতএব বোঝা যাচ্ছে, রাখালরাজ আর ললিতা ভাইবোন দুয়ে মিলে কারসাজি করেছে। রাখালরাজের কাছে নিরঞ্জন দুঃখ করে বলেছিল, রাখাল ঘোরপ্যাঁচের মানুষ নয়—বোন ললিতা এসে পড়ে শুনে নিল। খাইয়ে-মানুষকে মুখের সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত করা—নরহত্যার পাপ এতে অর্শায়। পাষণ্ডী ললিতা সত্যি সত্যি তাই করল জেঠকে সামনে রেখে। ভাবীবর বলে বোধহয় প্রাণে অপমান বেজেছে ললিতার—কতদূর কি বলেছে, কে জানে। রিপোর্ট করে পোস্টাপিসের সর্বনাশ না ঘটায়।

সকাতরে নিরঞ্জন বলে, ভাল নলেনগুড়েরও সন্ধান হয়েছে। ভাঁড় নয়, কলসি। নীলমণি আনতে গেছে। সুজনপুরে দুপুরে যখন আছেন, গুড়ের কলসি নীলমণি ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দীনেশ আকাশ থেকে পড়ে: সে কি কথা! জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গুড় পাওয়া যায় কিনা? শুধু একটা জিজ্ঞাসা। আপনারা ধরলেন, গুড় চেয়েছি আপনাদের কাছে। সরকারি কাজে আসি, সরকার মাইনে দিয়ে রেখেছে, কাজকর্ম সেরে চলে যাব। এরপর দেখছি এক গ্লাস তেষ্টার জলও এখানে খাওয়া চলবে না। কিছু নেওয়া যেমন দোষ, কিছু দিতে চাওয়াও দোষ তেমনি আপনাদের পক্ষে। তার জন্যে প্রসিকিউশন হতে পারে।

বলতে বলতে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে ইনস্পেক্টর চক্ষের পলকে অদৃশ্য হল।

॥ নয় ॥

একদিন সাংঘাতিক ব্যাপার। ঠুনঠুন আওয়াজ তুলে নীলমণি ডাক এনে যথারীতি পোস্টাপিসে ফেলল। ব্যাগের সিলমোহর ভেঙে চিঠি বের করে পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন টপাটপ সিল মেরে যাচ্ছে। তার পরেই একেবারে চুপ।

ডাকের ব্যাগ ফেলে নীলমণি বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে গিয়েছিল। খাওয়া সেরে মাদুরে গড়িয়ে বেশ খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে হেলতে-দুলতে আবার পোস্টাপিসে এসেছে। দেখে নিরঞ্জন চুপচাপ একভাবে টুলের উপর বসে আছে। পাষাণ হয়ে জমে গিয়েছে সে যেন।

নীলমণি ডাকে: অমনধারা বসে কেন নিরঞ্জনদা, কি হল?

নিরঞ্জন চোখ খুলে তাকাল। দু-চোখে জল টলমল করছে। কথা বলতে গিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

বলে, তুই ঠিক বলেছিলি নীলমণি, পরের চিঠি পড়া পাপ। পাপের শাস্তি পেতে হয়। আজকে আমার তাই হল। কিন্তু এত বড় শাস্তি আমি ভাবতে পারিনি রে!

স্তম্ভিত নীলমণি। হৈ-হল্লা হাসিস্ফূর্তি করে বেড়ায় মানুষটা, সে আজ হাপুস নয়নে কাঁদছে। নীলমণি ভাবে অন্য কথা—কোনো সাংঘাতিক গোলমাল উঠেছে বোধহয় পোস্টাপিস নিয়ে। সান্ত্বনা দিচ্ছে: মুসড়ে গেলে কেন? যায় যাক পোস্টাপিস উঠে। আগে তো ছিল না, সে বরং নির্ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। ভালভাবে চিঠি পত্তোর তুমি পড়ো, মজা দেখবার জন্যে নয়। লোকে বুঝল তো যাকগে চুলোয়—

বলতে বলতে থমকে গেল। যা সব বলে যাচ্ছে, সে জিনিস নয়। চিঠি একখানা নিরঞ্জনের চোখের সামনে—একখানা পোস্টকার্ড। অত ছোট

সামান্য জিনিসটা কোন শাস্তি বয়ে নিয়ে এলো যার জন্য নিরঞ্জন ছেলেমানুষের মত কাঁদছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে নীলমণি—পড়বার বিদ্যে নেই, কুচি কুচি কালো লেখাগুলো শতপদ সরীসৃপের মতো বীভৎস দেখাচ্ছে।

কি লেখা আছে নিরঞ্জনদা?

জবাব দিতে যায় নিরঞ্জন। কথা বেরোয় না, গলার ভিতরে আটকে থাকে। তারপর যেন ধাক্কা দিয়ে চরম দুটো কথা বের করে দিল: বেণু নেই।

চড় চড় করে আকাশ ফেটে বজ্রপাত যেন। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নিরঞ্জন বলে, কলেরায় মারা গেছে। আসল এশিয়াটিক। শেষরাত্রে হয়েছিল, দুপুরের মধ্যে শেষ। সৎকার সমিতি ডেকে শেষকাজ করিয়েছে। মেস বদল করে চলে গিয়েছিল বেণু—এখানকার মেম্বাররা দুপসবের ঠিকানা জানত না। খুঁজে পেতে ঠিকানা জোগাড় করে খবর দিয়েছে।

থেকে থেকে বেণুর কথা বলে নিরঞ্জন। তার মেসে গিয়ে উঠেছিল—এই নতুন মেসে নয়, আগে যেখানটা থাকত। পোস্টাপিসের চাঁদা চাওয়া হয়নি বলে অভিমান করল, চাঁদা বলে দশ টাকা দিয়ে দিল। আর জলপাইগুড়ি অবধি গিয়ে কত ঝঞ্ঝাট করে সাবজজবাবুর কাছে আদায় হল পাঁচটা টাকা। টাকা থাকলেই হয় না, অন্তঃকরণ চাই। দুধসর গাঁয়ের খাঁটি ছেলে ছেলে একটি। খাঁটি বলেই বিপদ—ভগবান অমন ছেলেকে বেশিদিন ধুলোমাটির জগতে থাকতে দিলেন না। নিজের কাছে টেনে নিলেন।

পোস্টমাস্টার আর রানারে নিভৃত কথাবার্তা। চোখ মোছে দুজনে। সহসা নিরঞ্জন বলে, আমার পাপের শাস্তি—বুঝলি রে নীলমণি?

নীলমণি ঘুণাক্ষরে জানল না, চুপিসারে নিরঞ্জন পাপ করে বসল—এটা কেমন করে হয়? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে সে। পাপ নিরঞ্জন করতে পারে না। সমস্ত পারে, ঐ জিনিসটাই শুধু অসাধ্য তার পক্ষে।

নিরঞ্জন বলে, তুই সত্যি কথা বলেছিলি নীলমণি। পরের চিঠি পড়তে নেই। পড়া পাপ। তারই ফলভোগ হচ্ছে আমার। পিওনমশায় সুজনপুর থেকে এসে যার নামের চিঠি তাকে ছুঁড়ে দিয়ে পাশায় গিয়ে বসতেন। আমায়ও ঠিক তাই এবার থেকে। চিঠিতে কি খবর, আমার তা নিয়ে গরজটা কি? চিঠি পড়ে কে কি করবে, সে ভাবনা আমি কেন করতে যাব? আমার কোন দায় পড়েছে?

নীলমণি রাগ করে বলে, তা বই কি। গাঁয়ের লোকের ভালমন্দ দেখবে না, চার টাকা মাইনের চাকরির জন্যেই তবে কি পোস্টাপিস গড়েছ?

ডাকের চিঠি পড়ার জন্য নীলমণি বরাবর ঝগড়া করে এসেছে, তারই মুখে আজ উল্টো কথা: পিওনমশায়ের কথা তুললে নিরঞ্জনদা, তিনি হলেন সুজনপুরের লোক, দুধসর বলে মায়াদয়া কিছু নেই, তাঁর ছিল কেবল চাকরি। তিনি যা করতেন, নিজের গাঁয়ের ব্যাপারে তুমি তা কেমন করে পারবে?

হাতে করে গ্রামবাসীদের কোন জিনিসটা দিচ্ছ—বিষ কি অমৃত—না দেখে পরখ না করে কক্ষনো দেওয়া যায় না।

তাই করতে গিয়েই সর্বনাশ। হাঁপানি টান টানেন শৈলজেঠা। যমের সঙ্গে দড়ি-টানাটানি—কে জেতে, কে হারে। আত্মারাম কোনরকমে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছেন। এ চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে পড়বেন। একটি তো গেছে, আবার একজন যাবেন চলে। বিষ আমি কেমন করে জেঠার হাতে তুলে দিই?

কেন দেবে? দেখি—

দেশলাই-বিড়ি নীলমণি সবদা গাঁটে নিয়ে বেড়ায়। পোস্টকার্ডটা টেনে নিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিল।

বলে, চিঠি পোড়াও বলে লোকে তোমায় বদনাম দেয়। সেই কাজ আমি আজকে সত্যি সত্যি করলাম। অন্তর্যামী ঠাকুর দেখছেন, কাজটা ভাল কি মন্দ। বুড়োমানুষটা এমনিও তো যাবেন, সামনের বর্ষা কিছুতে কাটবে না। কিন্তু তোমার হাত দিয়ে সেটা হতে পারবে না নিরঞ্জনদা—তুমি কেন খুনে হতে যাবে?

এরপর থেকে দুজনে সতর্ক হয়ে আছে, বেণুর মৃত্যুসংবাদ কোন-ক্রমে চাউর না হয়। অন্তত বর্ষাকাল অবধি—যে সময়টা শৈলধরের হাঁপানির এবং সেইসঙ্গে জীবনের অবসান আশা করা যাচ্ছে।

কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বেণুধর মাসে মাসে টাকা পাঠায় বাপের নামে, তার কোন উপায় হবে?

নিশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন বলে, বেণুর মতো ছেলে হয় না। সত্যযুগের ছেলে। নিজের যত কষ্টই হোক, টাকা ঠিক এসে যাবে মাস চার কি পাঁচ তারিখে। তার ওদিকে কিছুতে নয়। শৈল-জেঠা কত যে আহ্লাদ করেন টাকা ক টা হাতে পেয়ে। কত যে আশীর্বাদ করেন।

নীলমণি চিন্তিত ভাবে বলে, বড় মুশকিল। চিঠি আসবে না, টাকাও বন্ধ। তখন তো বেশি করে ছেলের খোঁজ পড়বে। চেপে রাখা যাবে না খবর।

টাকা বন্ধ হলে শৈল-জেঠারই বা চলবে কেমন করে? বেণুর টাকাটা তাঁর দুধ-আফিমের খরচা। আফিমের অভাবেই তো মারা পড়বেন, বর্ষাকাল অবধিও টিকবেন না।

মুহূর্তকাল ভেবে মনস্থির করে নিয়ে নিরঞ্জন দৃঢ় কণ্ঠে বলে, টাকা আসবেই. বেণুধর ঠিক ঠিক পাঠিয়ে যাবে। যেমন নিয়মে চলছে—আমি গিয়ে মনি-অর্ডার বিলি করে আসব।

নীলমণি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। নিরঞ্জন এবার ফলাও করে বুঝিয়ে দেয়। মনিঅর্ডারের অসুবিধা কি? বুড়োমানুষ ওঁর মনিঅর্ডারে গরজ নেই, গরজ হল টাকার। আমাদের পোস্টাপিস থেকেই বেণুর নাম

দিয়ে একটা ফরম পূরণ করে এদিক-সেদিক পাঁচ সাতটা সিল মেরে আমি নিয়ে শৈল-জেঠার কাছে বিলি করে আসব। কাঞ্চনটা শয়তান, সে ফাঁকি ধরে ফেলবে। তার নজরে কিছুতে পড়া হবে না।

বুঝেছি এইবারে। নীলমণি ঘাড় নেড়ে বলে, আহা-মরি চাকরি তোমার নিরঞ্জনদা। এমনি তো শতেক দায় পোস্টাপিসের—খরচ-খরচার অন্ত নেই। তার উপরে নতুন এই দশ টাকা এসে চাপল। মাইনে তো চার টাকা—বাড়তি টাকাটা কোথায় পাবে? আছে সানুদি বেওয়া-বিধবা মানুষ, তার বাক্স ভেঙো। আবার কি!

নিরঞ্জন প্রবোধ দেয়: শৈল-জেঠা কি আর চিরকাল থাকবেন। তিনটে চারটে মাস বড় জোর, শ্রাবণ ভাদ্রের ওদিকে তিনি থাকতেই পারেন না। হাঁপানির শ্বাস টানতে টানতে চোখ উল্‌টে পড়বেন, দেখিস।

বিপন্ন কণ্ঠে সহসা বলে ওঠে: এ ছাড়া উপায়ই বা কি, বলতে পারিস? পোস্টাপিসের ভার নিয়েছি বলে তো নরহত্যা করতে পারিনে। ঐ চিঠি শৈল-জেঠার হাতে দেওয়া মানে বুড়ো মানুষটার বুকে ছোরা বসানো। কসাই নই আমি, সে আমি পারিনে।

বালিকা-বিদ্যালয়ে কাঞ্চন পড়ানোর কাজে মেতে আছে—ভাল রকম খোঁজখবর নিয়ে নিরঞ্জন সেই সময়টা শৈলধরের মনিঅর্ডার বিলি করে আসে। কাজ নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে যাচ্ছে। আফিম ও দুধের জোরে যমরাজের সঙ্গে লড়ালড়ি করে শৈলধরও বর্ষাকালটা মোটামুটি বিনা বিঘ্নে পার করে দিলেন। এবং শরৎও পার হয়ে যায়—

বিপদ অন্যদিকে—সানুদিকে নিয়ে। দশটাকার নতুন খরচা বৃদ্ধির জন্য সানুদির সুদের টাকা বাকি পড়ে যাচ্ছে। যখন তখন সেই সুদের তাগাদা। সর্বক্ষণ কলহ।

ধৈর্য হারিয়ে নিরঞ্জন একদিন ব্যাপারি ডেকে নিয়ে এলো। ধান বিক্রি করে সুদের দেনা শোধ করবে। গোলার চাবি খুলতে যাচ্ছে, সানুদি ঝঙ্কার দিয়ে এসে পড়েন: ধান বেচে দিয়ে সম্বৎসর খাবে কি শুনি?

উপোস করব। তোমার কালো মুখ আর দেখতে পারিনে সানুদি। উপোস করে মরে যাবো—সে বরঞ্চ অনেক ভাল।

নীলমণি এসে পড়েছে কখন। সে এখন সানুদির পক্ষে। রাগ করে বলে, তুমি মরলে পোস্টাপিসও কিন্তু যাবে, সেটা খেয়াল রেখো। পোস্ট-মাস্টার বিহনে উঠে যাবে। চার টাকার চাকরি নরলোকে অন্য কেউ নেবে না।

নিরঞ্জন খিঁচিয়ে উঠল: বেশ—বেচব না ধান, উপোসও করব না। অন্য উপায় তবে বাতলে দে।

উপায় নীলমণি ইতিমধ্যেই ভেবে নিয়েছে। সানুদিকে বলে, রাগারাগি কিসের? সুদের টাকা তো শোধবাদ করে দিয়েছে নিরঞ্জনদা—

সানুদি অবাক হয়ে বলেন, ওমা, কবে? টাকা হাতে পেলাম না—মুখের কথা বলে দিলেই হল বুঝি?

হাতে পাবে কেমন করে? সে টাকা সঙ্গে সঙ্গে আবার নিরঞ্জনদাকে কর্জ দিয়ে দিয়েছ। ধরে নাও না তাই। টাকা বাক্সে পুঁজি করে মুনাফা নেই, যত খাটাবে তত লাভ। তোমার তাই হয়েছে সানুদি, সুদের টাকা খাটছে। হাতে পৌঁছানোরও ফুরসত হল না।

সুদের টাকারও সুদ হবে তাহলে?

অকূল সাগরে কূল দেখতে পেয়ে নিরঞ্জন বলে উঠল, আলবৎ। কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে নিও তুমি, একটি পয়সাও ছাড় কোরো না। এই বলা রইল।

একটু ভেবে নিয়ে সানুদি সংশয়ের সুরে বলেন, যা কাণ্ড তোর! ওই সুদই দিতে পারিসনে। সুদের সুদ হলে তখন আরো তো মোটা অঙ্কের হবে। দিবি কেমন করে?

নিরঞ্জন দরাজ ভাবে বলে, না দিতে পারি সুদের সুদেরও সুদ বাড়বে তখন। চক্রবৃদ্ধি হারে চলবে। মজা তোমার সানুদি, সুদের পাহাড় জমে যাবে।

পাহাড়ের মালিক হবার সম্ভাবনায় সানুদি চুপ করে যান।

সানুদিকে নিরস্ত করা গেল, কিন্তু উদ্বেগ বাড়ছে শৈলধরকে নিয়ে। শরৎকালও যায় যায়, শীত পড়বে এইবার। বর্ষার মধ্যেই চোখ উলটে পড়বেন আন্দাজ করা গিয়েছিল। ক্রমশ বিপরীত অবস্থা এসে যাচ্ছে। গৃহ-ছায়ায় বিনা কাজে অনড় হয়ে বসে থাকা এবং আফিমের অনুপান হিসাবে সেরখানেক করে খাঁটি গোদুগ্ধ পান করা—উভয় কারণে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়ে ভুঁড়ির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আরও কত বর্ষা কত শীত পার করবেন আন্দাজে আসে না।

কী মুশকিল রে বাবা! পোস্টমাস্টার রানার দুজনেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মৃত্যুসংবাদ কতদিন চেপে রাখা যাবে? দিনের ব্যাপারও নেই আর এখন—কত মাস, কত বছর? এবং যত মাস যত বছরই হোক, মাসো-হারার টাকা মাসে মাসে জুগিয়ে যেতে হবে। অব্যাহতি নেই।

নীলমণি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, কামারের হাপরের মতো দিনরাত্তির সাঁ-সাঁ করে শ্বাস টানছেন। কোন সুখে বেঁচে থাকেন, বুঝিনে বাবা। দেখা যাক মাঘ অবধি। অত শীতেও যদি না মরেন ল. র ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে আসব। তবু তো পুত্রশোক পেতে হবে না বুড়োমানুষটার।

বেণুধর চিঠি লেখে না, শৈলধরের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মাঝে মাঝে মনিঅর্ডার পেয়ে তিনি তৃপ্ত। ছেলে নিশ্চয় ভাল আছে এবং ভাল ভাবে কাজকর্ম করছে। নয় তো ঘড়ির কাঁটার মতো এমন নিয়মিত মনিঅর্ডার করে কি করে।

কিন্তু কাঞ্চনের রকম আলাদা। তার চাই চিঠি। টাকা না-ই পাঠাল বেণুধর—সে কাঞ্চন যেমন করে হোক চালিয়ে নেবে। চিঠি দেয়নি দাদা তাকে কতকাল!

নিরঞ্জন যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে বেড়ায়, মুখোমুখি পড়তে চায় না। তবু একদিন দেখা হয়ে গেল। বড় বড় চোখ দুটো তুলে কাঞ্চন কটমট করে নিরঞ্জনের দিকে তাকায়।

টাকা ঠিক এসে যাচ্ছে, চিঠি আসে না কেন দাদার?

হেন অবস্থায় থতমত খাওয়া চলে না। নিরঞ্জন একেবারে উড়িয়ে দেয়: আমি তার কি জানি?

জানেন সমস্ত। আমিও জানি কি জন্য চিঠি আসে না।

কলকাতায় কত চেনাজানা, আসল ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলা অসাধ্য নয় কাঞ্চনের পক্ষে। তবু কতদূর কি জেনেছে ও-ই বলুক, নিরঞ্জন চুপ করে রইল।

কাঞ্চন বলে, আজকাল দাদা যা লিখছে সে জিনিস আপনার অপছন্দ। মতামত আমাদের জানতে দিতে চান না, চিঠি তাই গাপ করে ফেলেন।

সবরক্ষে রে বাবা। আন্দাজি ঢিল ছুঁড়ছে। অতএব নিরঞ্জনেরও তেজ দেখাতে বাধা নেই। বলে, হুঁ, অনেক জিনিস জানো তুমি দেখছি। আমার চেয়ে অনেক বেশি।

চিঠিতে দাদা কি লেখে, তা-ও জানি। বিজয় সরকারের সঙ্গে বিয়ের এদ্দিনে মত দিয়েছে। মা-বুড়ি কাশীবাসী হল, বরপণের ল্যাঠা চুকেবুকে গেছে, এখন আর কোন অজুহাতে বাবাকে ঠেকাবে? কিন্তু বড় লোকের বাড়ি বউ হয়ে যাবো, হিংসে যে আপনার। চিঠি পুড়িয়ে ফেলেন, দাদার মতামত যাতে বাবার হাতে না পড়ে। এমনি করে যদ্দিন দেরি করানো যায়।

বলে যাচ্ছে কাঞ্চন। একেবারে নতুন খবর এসব। গাঁয়ের মধ্যে থেকে ও নিরঞ্জন কিছু জানে না। অথচ গাঁ নিয়ে এত তার দেমাক। খবর তাজ্জব বটে—বিজয় উৎকট রকম প্রেমে পড়েছে।

অসুস্থ শৈলধরের খোঁজখবর নেবার অছিলায় প্রায় সর্বক্ষণ বিজয় তাঁর কাছে পড়ে থাকে। ঠাকুর দেবতার কাছে হত্যে দেবার মতন। শৈলধরকে দিয়ে একপাতা চিঠি লিখিয়েছে কলকাতায় বেণুধরের নামে। কথা একটি মাত্র: কাঞ্চনে আর বিজয়ে বিয়ে দিতে চাই, আনন্দে তুমি সম্মতি দাও। মা জয়মঙ্গলা কাশীবাসী হয়েছেন, নিজের অভিভাবক বিজয় এখন নিজেই, অতএব পরম সুযোগ এসেছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে ধনে-জনে ওরাই সকলের সেরা। কুটুম্বিতা হলে মস্ত বড় সহায় হবে আমাদের—ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা মোটের উপর এই একটি।

এমন চিঠি সম্পর্কে নিরঞ্জনকে বিশ্বাস করা চলে না। বিজয় তাই সুজন-

পুর অবধি গিয়ে সেখ নকার ডাকবাক্সে নিজ হাতে ফেলে এসেছে। কিন্তু কোনো চিঠির জবাব নেই।

বলতে বলতে কাঞ্চন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিরঞ্জনের উপর : চিঠি না হয় সুজনপুর হয়ে দাদার কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু জবাব তো আপনার হাত দিয়ে আসবে। পোস্টাপিসে আপনি থাকতে কোনোদিন জবাব আসে না। আসে না বলেই তো আরো নিঃসন্দেহ, দাদার এখনকার মতটা কি।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে শোনে। অজয়ের বউয়ের সঙ্গে শাশুড়ি জয়মঙ্গলার বনিবনাও নেই। কর্তা কাশীবাসী হওয়ার পর যখন তখন জোর কলহ বাধে, বউ যাচ্ছেতাই শোনায়, দ.ম পুলায় না বলে বুড়ি শাশুড়ি সমুচিত শোধ দিতে পারেন না। শেষটা একদিন জয়মঙ্গলা ঈশ্বর ও স্বামী সঙ্গ লাভের জন্য কাঁদতে কাঁদতে কাশী রওনা হয়ে গেলেন। সাধ ছিল, বিজয়ের বিয়ে দিয়ে বরপণ বাসজ্জা এবং আপাদমস্তক গয়নাগাঁটিতে-সাজানো বউ ঘরে তুলে ছোট ছেলের স্থিতি করে দিয়ে যাবেন—সেই অবধি সবুর করতে দিল না বড়বউ, যেন তাড়িয়ে বের করল।

সকলে যেমন, নিরঞ্জনও বৃত্তান্ত জানে এই অবধি। তার পরেও ভিতরে ভিতরে এত চলছে—শৈলধরের কাছে বিজয়ের তদ্বির, এত সমস্ত চিঠিচাপাটি মৃত বেণুধরের নামে—

কাঞ্চন বলে, চৈল, চিঠির জবাব দাদা যদি রেজিস্ট্রী করে পাঠায়, আপনার হাত থেকে তবেই ছাড় পাবে। সেইটে ওঁরা কেন যে এদ্দিন বাতলে দেননি তাই ভাবি।

বিজয় সরকারের সম্পত্তি ও টাকাকড়ি আছে কিন্তু বিয়েয় তো নিরঞ্জনেরই দোসর। কমই যাবে, বেশির দিকে কদাপি নয়। শহরের অভ্যাস, টাকা ওড়াতে পেলেই এরা খুশি। তবু একটু বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে নিরঞ্জনের। বলে, বিজয় রাজী, শৈল-জেঠা এক-পায়ে খাড়া। আর মেনে নিলাম, বেণুরও মত ঘুরে গেছে। কিন্তু তুমি তো দশঘরের আর দশটা মেয়ের মতন নও। তোমার নিজের একটা মতামত আছে, জাহির করে বেড়াও—

কাঞ্চন বলে, আছেই তো। মত না থাকলে ঝগড়া করতে আসব কেন? ভাল খাব ভাল পরব, কোঠাঘরে গদির বিছানায় থাকব। মত কেন হবে না বলতে পারেন, এর বেশি মেয়েরা কি চায়? কলকাতায় বাপের সঙ্গে থাকত বিজয়, শহুরে গন্ধও গায়ে খানিকটা আছে—

সহসা প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা আপনার মতটা কি শুনি। সম্বন্ধ অন্য কিছু মনে আসে তো বলুন।

মেয়েছেলের বেহায়াপনায় নিরঞ্জন হকচকিয়ে যায়। ভাল মন্দ জবাব দেয় না। নাছোড়বান্দা কাঞ্চন বলে, আহা বলুন না। পাত্র হিসাবে বিজয় সরকার কি খারাপ? ভাল কে আছে তবে গাঁয়ের মধ্যে?

নিরঞ্জন মিনমিন করে জবাব দেয় : না, খারাপ কেন হতে যাবে?

ভাল বই কি—

একটু ভেবে নিয়ে জোর দিয়ে বলে, খুব ভাল। বালিকা-বিছালয় নিয়ে আর ভয় রইল না। বিজয় এমন-কিছু লেখাপড়া জানে না যে কাজকর্মের দায়ে বাপের মতন শহরে গিয়ে বাসা করবে। বউ হয়ে তুমি এই দুধসরেই থাকবে চিরকালের মতন। কলকাতার ভূত কাঁধ থেকে নেমে পালাবে।

সচকিত হয়ে কাঞ্চন বলে, ভূত কাকে বলছেন?

দুধসরের মেয়ে। কলহ করুক গালি দিক দুধসরের মানুষ বলেই নিরঞ্জনের অতি-আপন। তাকে সতর্ক করা উচিত বই কি। বলে, চেহারায় কাপড়চোপড়ে রাজপুত্তুর, কিন্তু মানুষ হিসাবে অতি ছ্যাঁচড়া।

কঠিন স্বরে কাঞ্চন প্রশ্ন করে কার কথা বলছেন, খুলে বলুন।

একজন দুজন তো নয়—

এমনি বলে নিরঞ্জন পাশ কাটাবার তালে ছিল। আবার ভাবল, কিসের পরোয়া। নিজের স্বার্থেই কাঞ্চনের জেনে বুঝে রাখা উচিত। বলে, কত দিকের কত জনা আছে। একটার কথা জানি, রানী-শঙ্করী লেনের ভূত—

আর যাবে কোথা! কেউটেসাপের মতো ফণা তুলে ওঠে যেন কাঞ্চন। গর্জন করে উঠল: তবে, তবে? আপনি জানলেন কি করে রানীশঙ্করী লেনের কথা? তবে যে চিঠি খুলে পড়েন না, নষ্ট করেন না চিঠি। দাদার চিঠি, আর কলকাতা থেকে আরও যত চিঠি আসে সমস্ত আপনি গাপ করেছেন। ভেবেছেন কি মনে মনে—জেলের কয়েদির-মতো আটক করে রেখে যা-ইচ্ছে তাই করবেন? তেমনধারা প্যানপেনে মেয়ে পাননি আমায়।

বলতে বলতে কণ্ঠরোধ হয়ে যায়—হয়তো বা কান্নায়। ঝড়ের মতো কাঞ্চন ছুটে বেরুল। ভূত ছেড়ে যায়নি তবে তো? ভূতেই করাচ্ছে।

॥ দশ ॥

পিওনমশায়দের বড় বিপদ। মা-শীতলার অনুগ্রহ। সুজনপুরে নিজের বাড়িতেও নয়—শ্বশুরবাড়ি, ভিন্ন মহকুমার এক গণ্ডগ্রামে। শালার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে বাড়িসুদ্ধ সেখানে চলে যান। রাখাল-রাজের কাঁধে পোস্টাপিসের দায়িত্ব, বিয়ের দিনটা এবং পরের দিন বরকনে বিদায়ের সময় পর্যন্ত কাটিয়ে সে সুজনপুর ফিরে এলো। কাগজপত্রে সই করে গিয়েছিল—কেরানিবাবু এবং নিরঞ্জনের উপর দুটো দিনের কাজকর্ম দেখে দেবার ভার। নিরঞ্জন ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে আবার এখানকার চেয়ারে বসেছে, বাড়ি পাহারা দিয়ে ঐ দুটো রাত্রি সুজনপুর কাটিয়ে গেছে।

রাখালরাজ ফিরল, অন্য সকলে রয়ে গেলেন। দীর্ঘকাল পরে—প্রায় অন্তিম বয়সে অটলের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া—ললিতারও ইতিমধ্যে মামীদের সঙ্গে খুব ভাব জমে গেছে। অটলের কাছে এসে তারা ধরাধরি করে:

শাশুড়ি ঠাকরুন নেই—তা ক'টা দিন থেকেই দেখুন না, আমরা আদরযত্ন করি না ঠেঙার বাড়ি মারি।

থেকে যেতে হল অতএব। দিন দশ-পনের কাটিয়ে ঘরের মানুষদের ঘরে ফেরবার কথা—সে জায়গায় দিনের পর দিন কেটে যায়, মাসের পর মাস। মা শীতলার অনুগ্রহ, অর্থাৎ বসন্ত। গোড়ায় অটলকে ধরল। ও রোগ একজনের হয়ে রেহাই দেয় না। অটল আরোগ্য হতে না হতেই এক সঙ্গে একেবারে তিন-চার জনে পড়ল—তার মধ্যে রাখালরাজের স্ত্রী বীণা। চলল এই রকম—কেউ বুঝি আর বাদ থাকবে না।

সুজনপুরের বাড়ি একলা রাখালরাজ খবর শুনে ছটফট করছে। সরকারি দায়িত্ব ফেলে বারম্বার পালানো ঠিক নয়—কতদিনে ফিরতে পারবে ঠিক কি—কোন রকম গণ্ডগোল ঘটলে জেল পর্যন্ত হতে পারে। হেড-অফিসে ছুটির জন্য লিখে পথ তাকাচ্ছে, অস্থায়ী লোক এসে পড়লে পালাবে। এলো সে মানুষ অবশেষে। কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে, এবং বাড়ির দেখাশুনার ভার নিরঞ্জন ও নীলমণির উপর ফেলে রাখালরাজ মামার বাড়ি ছুটল। গিয়ে দেখে আর সকলে একরকম সামলে উঠেছে। সবশেষ ললিতাকে ধরেছে এবার। শক্ত রকম ধরেছে তাকে, সকলের চেয়ে সাংঘাতিক।

ফিরতে তারপর আরও একমাস। রাখালরাজকেও ধরেছিল। তবে তার পানিবসন্ত—মা জননী ছুঁয়ে গেলেন এই পর্যন্ত। বাড়ী ফিরে ঢাকঢোল বাজিয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে জাঁকিয়ে শীতলা ঠাকরুনের পূজো দিল। প্রাণে প্রাণে যাহোক করে ফিরেছে, দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ধাক্কা পুরোপুরি সামলে উঠতে এখনো বিস্তর দিন লাগবে। পোস্টাপিসের চেয়ারে গিয়ে বসে এখন রাখাল কোন রকমে কাজকর্ম চালিয়ে যায়।

নীলমণি একদিন ডাকের ব্যাগের সঙ্গে আলাদা এক খামের চিঠি নিরঞ্জনের হাতে এনে দিল। রাখালরাজ লিখেছে। সন্ধ্যার পর আজকেই যেন নিরঞ্জন অতি অবশ্য সুজনপুর চলে আসে। বিষম বিপদ।

উদ্বিগ্ন হয়ে নিরঞ্জন বলে, এখানে এসেও ধরল নাকি? বসন্ত একবারের বেশি দুবার হয় না—ওদের বাড়ির সবাই তো ভুগে উঠেছে।

নীলমণি চটেমটে বলে, হয়েছে তোমার এবারে। এত করে বলি, মাতব্বরি করবে তো কেবলই খরচান্ত—এক ফেরে পড়ে গেছ, মাসে মাসে দশটাকা গুণাহ্‌গারি দিয়ে যাচ্ছ শৈল-বৌকে। কদ্দিনে ছাড়ান পাবে, ভগবান জানেন। পিওনমশায় চল্লিশ বছর হেসে খেলে একটানা কাজ করে গেলেন। একটি কথা কেউ কোনদিন বলতে পারল না। সেই নিয়মে কাজ করে যাও—মাথা ভাঙাভাঙি করেছি, কানে নিলে আমার কথা? ঠেলা সামলাও এইবারে।

অধীর উৎকণ্ঠায় নিরঞ্জন বলে, কি হয়েছে বলবি তো আমায় খুলে?

নীলমণি বলে, রানার মানুষ—আমার কাছে বেশি কি বলতে যাবেন ? বললেন, জরুরী ব্যাপার। চিঠি দেবে আর মুখেও বলবে, সন্ধ্যের পর অতি-অবশ্য যেন চলে আসে। শুনলাম তারপর বোনটার কাছে। চলে আসছি, সেই সময় হাতছানি দিয়ে ডাকল। আহা, মা-শীতলা কী চেহারা করেছেন—মুখের দিকে চাওয়া যায় না। বলে, তোমাদের পোস্টমাস্টার বাবুর যে চাকরি থাকে না। গাঁয়ের মানুষ দরখাস্ত করেছে।

নিরঞ্জন বিশ্বাস করে না: দুধসরের মানুষ আমার নামে দরখাস্ত করতে যাবে—হতে পারে না।

নীলমণি বলে, ললিতা কি মিছে কথা বলল ? ভাল মেয়ে—ছল চাতুরীর সে ধার ধারে না। তা হলেও সুজনপুরের মেয়ে যখন, আমি কেন খাটো হবো তার কাছে ? ডঙ্কা মেরে জবাব দিলাম: চাকরি না থাকে তো বয়ে গেল। নিরঞ্জনদা পরোয়া করে না। মাইনে যা, চাকরির দরুন খরচ-খরচা তার তিন-চারগুণ!

নিরঞ্জনকে কিন্তু চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে।

নীলমণি বলে, বড় মিথ্যেও বলিনি ভেবে দেখ। চাকরি গেলে আপদ যায়, ধান বিক্রি করে তখন আর সানুদির মুখঝামটা খেতে হবে না।

নিরঞ্জন বলে, কিন্তু নতুন পোস্টমাস্টার পাবি কোথায় তোরা ? পায়ে ধরে সাধলেও কেউ চাকরি নেবে না। পোস্টমাস্টার অভাবে তুলে দেবে আপিস। আমি কেবল তাই ভাবছি। দরখাস্তে পোস্টাপিস হয়েছে—দুধসরের মানুষ এত আহাম্মক কে আছে, দরখাস্ত করে সেই জিনিস আবার তুলে দিতে যাবে ?

সেইসব দেখাবেন হয়তো। সেই জন্যে ডাক পড়েছে। দেখে চক্ষু সার্থক করে এসো। কাঞ্চনে আর বিজয়ে বড় ফিসফিসানি। আমার চোখ এড়ায় না। বিয়ে হবে নাকি দুটোয়—ভাবলাম, তারই ফষ্টিনষ্টি। পালের গোদা ওরাই, এবারে বুঝতে পারছি। যাচ্ছ যখন সুজনপুর, পরখ হয়ে যাবে। যা বললাম, দেখে এসো তাই কিনা।

রাখালরাজ বারান্দায় বসে পথ তাকাচ্ছিল। বলে, শরীর দুবল, অন্যদিন এতক্ষণ শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নিই। তা হতে দেবে তোমরা ? আমার জীবন শেষ না করে ছাড়বে না। কী সব কাণ্ড করেছ—সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে দরখাস্ত করেছে তোমার গ্রামের লোক। একগাদা নালিশ।

নিরঞ্জন মরমে মরে যায়। দুধসরের মানুষ বিরুদ্ধে গেছে, এমন কথা শুনতে হল সুজনপুরবাসীর কাছে। হোক রাখাল পরমসুহৃৎ, তবু সুজন-পুরের লোক তো বটে।

রাখাল বলে, দীনেশ এসেছে, তার উপরে এনকোয়ারির ভার। কাল বিচার তোমার—দুধসর গিয়ে লোক-ডাকাডাকি হবে। দরখাস্তে যাদের সই,

ডাকিয়ে এনে তাদের মুখে শুনবে। বলি, মানুষটা তো হাঁদারাম—চটেমটে গিয়ে দশের মধ্যে কি বলতে কি বলে বসবে, রাত্রে নিরিবিলি একটু গড়েপিটে দেওয়া উচিত। দীনেশও বলল, হ্যাঁ। দিনমানে নয়, সন্ধ্যের পর। সেই জন্য তোমায় আসতে লিখলাম।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ইনস্পেক্টরবাবু।

কাজে আছে। আবার কি। বাবা উপস্থিত থাকতে সময়ের অপব্যয় হতে দেবেন? খেলার ব্যাপারে বাবার কাছে বয়সের বাছবিচার নেই। দীনেশের আজকে তত ইচ্ছে ছিল না, বাবাই জোর করে ধরে বসালেন।

দুজনে ঘরে ঢুকল। হেরিকেন পাশে রেখে কাজের মধ্যে ঘোরতর নিমগ্ন দীনেশ আর অটল-পিওন। দাবায় বসেছেন। সূচী-পতনও কানে শোনা যাবে, এমন নিঃশব্দ।

রাখালরাজ বলে, নিরঞ্জন এসে গেছে দীনেশ। ওঠো এইবার।

হুঁ বলে ঘাড় তুলে দীনেশ একবার দেখে আবার চাল ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রাখাল তাগিদ দেয়: একটিবার উঠে কাজটুকু সেরে দাও। ফিরে যাবে তো বেচারি এতখানি পথ।

বিরক্ত ভাবে দীনেশ এটাচিকেস ছুঁড়ে দিল: দরখাস্ত ওর ভিতরে। পড়ে নিনগে ভালো করে। জবাব ভাবতে লাগুন। যাচ্ছি আমি।

দরখাস্ত বের করে নিয়ে দুজনে আবার বারান্দায় গেল। নিরঞ্জন সর্বাগ্রে নামগুলো দেখে। প্রথম নাম কাঞ্চনমালা ঘোষ। ঠিক ধরেছে নীলমণি—লেখা-পড়া না জানুক, হাবেভাবে মানুষ বুঝতে তার জুড়ি নেই। কাঞ্চনের নিচেই বিজয়চন্দ্র সরকার। তার নিচে অজয়। সরকারদের গোমস্তা ও মাহিন্দার-গুলোর নামও পর পর চলল। জন চারেক অনুগত-আশ্রিতের নাম রয়েছে। সর্বশেষ খেয়াঘাটের মাঝি—

হি-হি করে হেসে ওঠে নিরঞ্জন: এই মাঝি বেটাকে হাজির করাব কাল। করাবই। ডাকের চিঠির কেমন চেহারা, খেতেই বা কি রকম লাগে—মিষ্টি না ঝাল, এই সব জিজ্ঞাসা করব। ইনস্পেক্টরের মুকাবেলা জিজ্ঞাসা করব। কী জবাব দেয়, শোনা যাবে।

সর্বসাকুল্যে তেরো জন। লিষ্টি দেখে নিরঞ্জনের সব দুঃখ জল হয়ে গেছে। বুকে থাবা মেরে বলে, তাই তো বলি দুধসরের লোক হয়ে আমার পিছনে লাগতে যাবে! গোড়ার ঐ দুটো নাম—নীলমণি ঠিকই ধরেছে, শয়তানি ঐ দুজনের। দুধসরের আসল মানুষ নয় ওরা, দৈবাৎ উড়ে এসে পড়েছে। খাঁটি দুধসরের হলে এমন পারত না—কলকাতার আমদানি।

রাখালরাজ আপত্তি করে বলে, দুজন কেন বলো, করেছে এক জনেই। কাঞ্চনমালা ঘোষ। কাঞ্চনের মুশাবিদা, হাতের লেখা আগাগোড়া কাঞ্চনের—ওর এই নাম সইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ না। এখন কিছু নয়—ঝঞ্ঝাট চুকে-বুকে গেলে এর শোধ নিও। বিয়ে দিয়ে ধমসিটাকে গ্রাম-ছাড়া কোরো।

দেখবে, চতুর্দিক ঠাণ্ডা।

নিরঞ্জন বলে, বিয়ে তো হবেই—পরের নাম যার, ঐ বিজয়ের সঙ্গে। ব্র্যাকেটে কাজকর্ম আগে থেকেই। কিন্তু গ্রাম-ছাড়া হবে না—মেয়ে ছিল, বউ হয়ে আরও এঁটে বসবে। সেটা কিছু খারাপ নয়। এমনি যা-ই হোক, পড়ায় সত্যি ভালো। চেষ্টাচরিত্র করে বালিকা-বিদ্যালয় এরই মধ্যে দিব্যি জমিয়ে তুলেছে।

মূল-দরখাস্ত দেখছে এবারে। দফায় দফায় অভিযোগ। নতুন কোনটাই নয়। চিঠিপত্র ঠিক মতো বিলি হয় না, বহু চিঠি নষ্ট করে ফেলে (এই সে-দিনও একটা নষ্ট করেছি কাঞ্চন। বেণুর মেসের লোক শৈল-জেঠার নামে যে চিঠি পাঠিয়েছিল)। যত চিঠি ডাকবাক্সে পড়ে, তার মধ্যেও বাছাই করে পাঠায় (কী করি। বালিকা-বিদ্যালয় অকূলে ভাসিয়ে ফুড়ুত করে তুমি যে উড়ে পালাতে চাও)। একের চিঠি অন্যের ঠিকানায় বিলি করে, যার জন্যে ক্ষতি-লোকসান হয় মানুষের (ক্ষতি লোকসান অজয় বিজয়ের, হারাধন ধাড়া রক্ষে পেয়ে গেল আমার সেই ভুলটুকুর জন্য)। খাম-পোস্টকার্ড প্রায়ই থাকে না পোস্টাপিসে; ফুরিয়েছে জানালেই আগের মূল্য শোধ করে দিতে হবে, কিন্তু ক্যাশ-ভাঙার দরুন মূল্য শোধের উপায় থাকে না (ক্যাশ-ভাঙা নয়, ধারবাকি খদ্দেরের কাছে। দায়ে বেদায়ে সব চিঠি লেখাতে আসে, শখের চিঠি একটাও নয়—নগদ পয়সা নেই বলেই হাঁকিয়ে দিতে পারিনে। দুঃসময়ের মানুষ তারা, হাঁকিয়ে দেওয়া যায় না)।

আরও আছে। আজেবাজে সেগুলো। দরখাস্ত বড় করার জন্য লিখেছে। যেমন: পোস্টাপিস খোলার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই (ঘড়ি ধরে পোস্টাপিস খুলিনে, তা ঠিক। পাব কোথায় ঘড়ি? ঘড়ির তোয়াক্কা রাখিনে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। ঘড়ি ক'জনার আছে শুনি। কলকাতার বাবু যেয়ে ছিলে কাঞ্চনমালা—সেই আমলের পুরনো ঘড়ি তোমারই একটা থাকতে পারে)। যেমন: আলাদা ঘর নেই পোস্টাপিসের, সরকারি অফিস বলে চেনাই যায় না। পোস্টমাস্টার নিরঞ্জনের ঘরের দাওয়ায় অস্থায়ী বেড়া বেঁধে কাজ চলছে। চোর-ডাকাতে ইচ্ছে করলেই বেড়া ভেঙে ফেলতে পারে। (পারেই তো বেড়া ভাঙতে। কিন্তু ভাঙতে যাবে কোন লোভে—ভেঙে তো ফুলো-ডুমুর। ব্যাগে ভরে পাঠিয়েছিলে, মনে নেই রাখাল?)

দাবাখেলা শেষ করে উঠে ইনস্পেক্টর দীনেশ এতক্ষণে বাইরে দেখা দিল। সে-ও হাসে: ওরে বাবা, এখনো যে পাঠ চলেছে! চাকরি তো চার টাকার, তার বিরুদ্ধে আস্ত একখানি মহাভারত। যাদের নাম সই আছে, তদন্তের সময় কাল সকলকে ডেকে দাবড়ি দিয়ে আসব আচ্ছা করে। চিঠি পড়ে তো কি হয়েছে—চোখ থাকলেই পড়ে থাকে, যারা কানা আর নিরক্ষর তারাই কেবল পড়ে না। হাতের উপর দিয়ে কোন জিনিসের চলাচল উঁকি না দিয়ে পারা যায় নাকি? এতই যদি আত্মসংযম থাকবে, তবে

তো পোস্টমাস্টার না হয়ে সাধু পরমহংস হবার কথা। চার টাকা মাইনের বদলে খাঁটি পরমার্থ।

নিরঞ্জনকে বলে, দরখাস্ত তো পড়লেন, জবাব কি হবে রাখালের কাছে থেকে ভাল করে শিখে পড়ে নিন। রাখালকে আমি বলে দিয়েছি। কষ্ট দিয়ে এই জন্যে আপনাকে নিয়ে এসেছি। গালে হাত দিয়ে ভাবনার কিছু নেই। মাকড় মারলে ধোকড় হয়। ঘোটের উপর তেড়েফুঁড়ে সকলের সামনে বেকবুল যাবেন। কিছু সাফাই-সাক্ষি ঠিক করে রাখবেন যদি সম্ভব হয়ে ওঠে।

নিরঞ্জন সগর্বে বলে, সম্ভব হবে না কি বলছেন। তুংসরের আপামর-সাধারণ আমার পক্ষে। এরাই কজন উড়ো আপদ—তুংসরের আদি-বাসিন্দা নয়। গাঁয়ের উপর সেইজন্যে মায়া নেই।

ও বউদি, ও ললিতা, সাড়াশব্দ পাইনে যে। রাগ করে শুয়ে পড়লেন? দাবা তুলে ফেলেছি, ভাত-টাত দিয়ে দিন এইবারে।

বলতে বলতে দীনেশ পেয়ারাতলায় কুয়োর ধারে মুখ-হাত ধুতে গেছে। বাড়ির ছেলে হয়ে গেছে একেবারে। কথাবার্তা তেমনি, চলাফেরা সেইরকম।

নিরঞ্জন নিঃস্বরে বলে, বড্ড স্ফূর্তি যে। দাবায় জিত হয়েছে। নিশ্চয়ই।

মুখ টিপে হেসে রাখালরাজ বলে, আরও ঢের ঢের বড় জিত। বিয়েটা অনেক দিন ধরে ঝুলছিল। দীনেশের মা-বাপের আপত্তি। দরখাস্তের এনকোয়ারিতে দীনেশ আজ এখানে, আবার আজকের ডাকেই তার বাপের চিঠি এলো, বিয়ের সম্পূর্ণ মত দিয়েছেন তিনি, এক-পয়সা দাবি দাওয়া নেই। সারা বিকাল তাই পাঁজি দেখা হয়েছে। আসছে মাসে শুভ ।

আবার বলে, দীনেশ আজ মাটিতে হাঁটছে না, উড়ে উড়ে ভাসছে। জোর কপাল তোমার, ময়লা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে।

॥ এগার ॥

সেই রাত্রি। চৌরি ঘর, মাটির দেয়াল, গোলপাতার ছাউনি—দীনেশ ঘুমুচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, দরজায় টোকা দিচ্ছে কে যেন। প্রথমটা ভেবেছিল বাতাসে পুরনো দরজা চকচক করছে। কান পেতে নিঃসন্দেহ হল, মানুষের আঙুলের টোকা।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে?

বাইরের ফিসফিসানি: দরজা খুলুন। আমি, আমি। চেঁচাবেন না।

স্ত্রীকণ্ঠ। রহস্যময় লাগে। হেরিকেনের জোর কমানো ছিল, জোর বাড়িয়ে দীনেশ দরজা খুলে দিল। কে জানত এত জ্যোৎস্না আজ বাইরে।

নিশিরাত্রি নয়, যেন দিনমান। দোরগোড়ায় ললিতা, চিনতে মুহূর্তকাল দেরি হয় না।

দরজা খুলে দিতে স্াঁ করে ললিতা ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজা ভেজিয়ে দিল।

দীনেশের বুক ঢিবঢিব করছে। ললিতার মতো মেয়ের সম্বন্ধে এ জিনিস স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এত দিনের আসা-যাওয়া, নিরিবিলি তাকে একটা মিনিট কাছাকাছি পায়নি। রাতদুপুরে আজ ঘরে এসে উঠল। বিয়ের কথা মোটামুটি পাকা, হঠাৎ তাই এতখানি সাহস! কী কাণ্ড না জানি করে বসে মেয়েটা!

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ললিতা, পায়ের নখ মেঝেয় আঁচড়াচ্ছে। কি বলতে চায়, সঙ্কোচে বলতে পারছে না। হঠাৎ নিচু হয়ে আলোর জোর কমিয়ে দিল। ঘর প্রায়-অন্ধকার। নিজেই তার কৈফিয়ত দিচ্ছে: বাবা ঘন ঘন উঠে তামাক খান, আলো দেখে এসে পড়তে পারেন।

সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু রাতদুপুরে কি জন্যে আকস্মিক উদয়, সেটা পরিষ্কার হল না এখনো। দীনেশই তখন শুরু করে: উঃ, কী করে যে মত আদায় করেছি ললিতা। সে এক মহাভারত।

বাপের ঘোরতর আপত্তি। পাত্রী আহা-মরি কিছু নয়, পাওনা-থোওনার ব্যাপারে লবডঙ্কা। কুটুম্বর পরিচয়েও মুখ উজ্জ্বল হয় না—কি না, পাত্রীর বাপ হলেন ভূতপূর্ব ডাকপিওন। দীনেশকে জাদু করেছে, বাপ-মায়ের কর্তব্যই হচ্ছে জাদুর কুহক থেকে মুক্ত করে আনা। কঠিন হয়ে বাপ বললেন, সুজনপুর থেকে সম্বন্ধ এসেছে, আমার তাতে অমত—

অতিশয় পিতৃভক্ত পুত্র। সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ বলল, যে আজ্ঞে, ভেঙে দিন তাহলে। আমিই ওঁদের বলে দিচ্ছি।

পাত্রীপক্ষকে কি বলেছিল, ঈশ্বর জানেন। কথাবার্তা চাপা পড়ে গেল তারপর। বাপ খুঁজেপেতে উপযুক্ত সম্বন্ধ নিয়ে এলেন, এবারে ছেলের পালা। মায়ের কাছে বলল, আমার মত নেই।

পর পর আরও কয়েকটা সম্বন্ধ এলো, দীনেশ নাকচ করে দেয়।

বাপ সামনে ডেকে মুখোমুখি প্রশ্ন করেন: মতলব কি তোমার? বিয়ে করবেই না একেবারে?

মতে না পড়লে কি করব? বিয়ে সকলেরই করতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

কিন্তু তোমায় করতে হবে। এক ছেলে তুমি—বিয়ে না করা মানে নির্বংশ করা আমাদের। ছেলেপুলের কাছে পিতৃপুরুষের এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশা—তাই থেকে বঞ্চিত করা।

দীনেশ বলে, ক'জনে আজকাল পিতৃপুরুষের তর্পণ করে, খোঁজ নিয়ে দেখুনগে। যা দিনকাল, বেঁচে থাকবারই ভাত জোটানো যায় না—মরার

পরে তর্পণ করতে যাচ্ছে।

দীনেশের বাপ শক্ত মানুষ, কিন্তু স্ত্রী বিধবা-বোন, ছোট ভাই ও ভাইবউ সকলে তাঁর বিপক্ষে—

লেখাপড়া-জানা রোজগেরে ছেলে বাপের হুকুমে সুড়-সুড় করে বরাসনে গিয়ে বসবে—অমন ধারা হয় না আজকাল। আমাদেরই অন্যায়।

সকলের দোষারোপে অতিষ্ঠ হয়ে বাপ ক্রমশ নরম হয়ে আসছেন। দীনেশকে ডেকে একদিন বললেন, তিন রকম চেয়েছিলাম আমি—পাত্রী, কুটুম্বিতে আর পণ। সে থাকগে, ষোলআনা পছন্দসই ক'টা ক্ষেত্রেই বা ঘটে। আমার ঐ তিন শর্তের একটা অন্তত পূরণ হবে—মেয়ে সুন্দরী হোক, কিম্বা বনেদি বাপের মেয়ে হোক, অথবা পণের টাকায় পুষিয়ে দিক—আমি তাহলে আপত্তি করব না।

হুঁ—বলে ঘাড় নেড়ে দীনেশ সরে পড়ল। কথাটা ধরেছে বলে মনে হয়। বাপ অতএব অপেক্ষা করে রইলেন তিনটে চারটে মাস। আরও গোটা দুই সম্বন্ধ এসেছে এর পর। কিন্তু কই, টলল না দীনেশ।

বাড়ির মধ্যে কান্নাকাটি পড়বার অবস্থা। দীনেশের মা শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, যত বয়স হচ্ছে লোভ তত বাড়ছে। পণের টাকার জন্য ছেলেটাকে বিবাগী করে দিল। চাকরি-বাকরি ছেড়ে ছাই মেখে চিমটে হাতে জঙ্গলে-পাহাড়ে বেরিয়ে পড়ে তবে দেখ।

বাড়ির গিন্নি এই শোনাচ্ছেন। অন্য সকলে এতদূর স্পষ্টবাদী না হলেও মনোভাব যে এই রকম, বুঝতে বাকি থাকে না।

পুরোপুরি রণে ভঙ্গ দিলেন দীনেশের বাপ। বললেন, হোক তবে ঐ সুজনপুরে। বলো গিয়ে তাঁদের।

ছেলে তবু বিগড়ে আছে। বলে, কাজ নেই বাবা। মনে মনে তুমি রাগ করে আছ।

বিপন্ন বাপ বললেন, মনের খবর কি করে বলছ তুমি? রাগটাগ নেই আমার। যেখানে হোক বিয়ে করে কুল উদ্ধার করো, সংসারের অশান্তি থেকে অব্যাহতি দাও আমায়।

খুশি হয়ে মত দিচ্ছ ত হলে?

হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। বলো তো শালগ্রাম-শিলা ছুঁয়ে না হয় দিব্যি করি।

দীনেশ বলে, তবে বাবা তুমিই লিখে দাও তাঁদের। সব বাপে যেমন লিখে থাকেন। আমি কি জন্যে বলতে যাব, বল। উচিত হবে না।

লিখি তবে হেঁটমুণ্ডে যুক্তকর হয়ে। যদি পিওনমশায় অধমের আরজি মঞ্জুর করেন।

দীনেশের বাপের চিঠি আজকে এসে পৌঁছল: দিন স্থির করে ফেলুন বেয়াইমশায়। পাত্রপক্ষ আমাদের হাঙ্গামা কিছু নেই, আপনার সুবিধা-অসুবিধা বিচার্য। অনেক টাল-বাহানা হয়েছে, আশা করি আর অধিক দেরি হবে না।

দরখাস্তের তদন্তে দীনেশ এসে পড়ল, তার একটু পরেই চিঠি ডাকে এসে পৌঁছল। যোগাযোগ একেবারে আকস্মিক মনে হয় না। অটল-গিন্নিকে একেবারে বেয়াইমশায় বলে সম্বোধন। বাড়িতে উল্লাসের অন্ত নেই। আর কি—সমস্ত বাধা সরে গেছে, শুধু মন্ত্র-গুলো পড়িয়ে নেবার অপেক্ষা।

সে বাধা মন্তোরে যায়নি। বুঝতেই পারছ, কাঠখড় পোড়ানো হয়েছে বিস্তর—

সগর্বে দীনেশ নিজ কৃতিত্ব জাহির করে। বলছে বান্ধব রাখালরাজের কাছে, কিন্তু এ বাড়ির কোন কানে পৌঁছতে বাকি নেই।

বলে, নিরুপদ্রব অসহযোগ কী সাংঘাতিক অস্ত্র। ইংরেজ হার মানল, কিন্তু বাবার সঙ্গে লড়াই তাদের চেয়ে কম কঠিন নয়। তাঁকেও ধরাশায়ী করে ফেলেছি।

সারা বিকাল ধরে এমনি বাহাদুরির গল্প। এক সময় তারপর অটল পাঁজি বের করে এনে ছেলে ও ভাবী জামাইকে ডাকলেন। দিনক্ষণ দেখছেন, এপক্ষ-ওপক্ষের, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করছেন। মোটামুটি তারিখও একটা সাব্যস্ত হল। সেই তারিখ জানিয়ে কা'ল দীনেশের বাপের চিঠির উত্তর যাবে।

কাজকর্ম সেরে নিশ্চিন্ত মনে অটল দীনেশকে বললেন, এক-হাত বসা যাক এই বারে বাবা।

দাবা খেলে দীনেশ চমৎকার। সুজনপুর এলে অটল ছাড়েন না, খেলতে বসে যান তাকে নিয়ে। আজকেও ছক পাতিয়ে অটল ডাকলেন, চলে এসো—

রাখালের বউ বীণা কাজের অজুহাত নিয়ে এঘর-সেঘর ঘুরঘুর করছিল। উদ্দেশ্য বিয়ের খুঁটিনাটি কথাবার্তা কানে শুনে নেওয়া। ননদিনীর কাছে বলবে। বীণা হেসে বলে, এ কি বাবা, জামাইয়ের সঙ্গে খেলবেন?

অটল বলেন, জামাই হয়ে গেলে তারপর দৃষ্টিকটু লাগবে। তখন আর খেলব না। জামাই না হতে দু-এক বাজি খেলে নিই আজ।

খেলা চলল বেশ-খানিকটা রাত্রি অবধি। বাড়িময় আনন্দ। খাওয়ারও গুরুতর রকমের আয়োজন। নিরঞ্জনকে রাখালরাজ না খাইয়ে ছাড়বে না। খেলা শেষ করে এই সময় দীনেশ এসে পড়ল: কাল আমার হাতে পড়বেন, মনে থাকে যেন। না খেয়ে চলে যান, চাকরি কেমন করে বজায় থাকে দেখব।

হাসিস্ফূর্তিতে খাওয়াদাওয়া সেরে দীনেশ শুয়ে পড়েছে। ঘুমও এসে গেছে। রাতদুপুরে ললিতা। কেমন করে কাজ হাসিল হল, দীনেশ ললিতার কাছেও সেই কাহিনী ফাঁদবার উদ্যোগে ছিল, ললিতা ঘাড় নেড়ে থামিয়ে দিল। বলে, একটা কথা না বলে কিছুতে সোয়াস্তি পাচ্ছি নে, সেই জন্যে চলে এসেছি।

বলার ভঙ্গিতে দীনেশ হকচকিয়ে যায়। লঘুকণ্ঠে তবু বলে, কথা বলার অফুরন্ত সময় তো এবার। চিরজীবন ধরে। দাঁড়িয়ে কেন, বসো ললিতা।

ললিতা বসল না। আসল বক্তব্য বেরুতে চায় না বুঝি মুখ দিয়ে, এটা ওটা ভূমিকা করে। বলে, সঙ্কোচ লজ্জা কেলেঙ্কারির ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আপনার ঘরে চলে এলাম।

দীনেশ উন্মুখ হয়ে আছে। না জানি কোন ব্যাপার। আকস্মিক বজ্রপাত যেন ঘরের মধ্যে। ললিতা বলে যাকে বরাবর জেনে এসেছেন সে ললিতা নই আর আমি। মামার-বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ভিন্ন মানুষ হয়ে ফিরেছি। আমি কানা। বসন্তে একটা চোখ পুরোপুরি গিয়েছে—

স্তম্ভিত দীনেশ। তাকিয়ে থাকে ললিতার মুখে। আধ-অন্ধকারে দেখা যায় না কণ্ঠস্বর কিন্তু কান্না। যে চোখে দেখতে পায় না, সে চোখে অশ্রু ঝরানোর ক্ষমতা থাকে নাকি?

ললিতা বলছে, মামার-বাড়ি থেকে সোজা কলকাতা গিয়ে পাথরের চোখ নিয়ে এসেছি। কুমারী মেয়ে যে। ঠাকুরদেবতারা একটা খুঁতো পাঁঠা বলি নিতে চান না, কানা পাত্রী কে নিতে যাবে। একেবারে নিখুঁত বানিয়ে দিয়েছে, দিনমানে ঠাহর করে দেখেও ধরতে পারবেন না যে, চোখ আমার ঝুটো।

একটু থেমে ললিতা আবার বলে, আপনাকে জানতে দেওয়া হয়নি। লোক জানাজানি হবে সেই ভয়ে মামার-বাড়ি থেকে চুপিচুপি কলকাতা চলে গিয়েছিলাম—সুন্দরপুর আসিনি। সবাই জানে মামার-বাড়িতেই বরাবর ছিলাম। বাইরের কোন লোক জানে না একটা চোখ নেই আমার বিয়েথাওয়া হয়ে গেলে তখন সকলে জানবে। শ্বশুর বা তেও জানতে পারবে।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে থেকে দীনেশ বলে, তুমিই বা এবে কেন জানাতে এসেছ?

ফাঁকি দিয়ে কেন কাঁধে ভর করব? সকলের আগে আপনারই সব জানা উচিত। একটা কথা, আমি এসে বলে গেলাম কেউ যেন জানতে না পারে। তাহলে আস্ত রাখবে না আমায়।

বলতে যাচ্ছিল দীনেশ আবেগ ভরে: তোমায় চাই আমি ললিতা। তোমার মনের কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমি মনে মনে অনেকাল ধরে তোমায় বুকে তুলে নিয়েছি। মন্ত্র-পড়া এবং লৌকিক অনুষ্ঠানগুলোই বাকি। চোখ সত্যি সত্যি গিয়েছে কিম্বা আমায় পরীক্ষা করছ, জানিনে। কিন্তু বিয়ে যদি আগেই হয়ে যেত, তাহলে কি করতাম?

এই সমস্ত বলবার কথা, নবেলের নায়ক হলে এমনিই বলত। কিন্তু বলতে গিয়ে দীনেশ সামলে নিল। একচক্ষু স্ত্রী নিয়ে জীবন-ভোর ঘর করা—কথা ভেবেচিন্তে বলা উচিত বইকি। মর্ক শান্ত চপ করে থেকে

ধীরে ধীরে বলে, চলে যাও ললিতা। আমি দরজা দিই। কে কোথেকে দেখে ফেলবে, চুনকালি পড়বে আমাদের মুখে।

কোন প্রত্যাশা ছিল ললিতার—মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর মুখে আঁচল ঢেকে দ্রুতপায়ে সে বেরিয়ে গেল।

সকালবেলা দীনেশের মারমূর্তি। রাখালরাজকে ডেকে বলে, আমি তোমাদের বাড়ির ছেলের মতো। সেই সুযোগ নিয়ে কানা-বোন গছাতে যাচ্ছিলে।

রাখাল আমতা আমতা করে অবশেষে বলে, কী করব ভাই, কালব্যাধিতে ধরল। দুর্ঘটনার উপর মানুষের হাত কি?

দীনেশ বলে, আমাকে তো ঘুণাক্ষরে জানতে দাওনি এত বড় ব্যাপার—

এক কথায় দু-কথায় তুমুল হয়ে উঠল ক্রমশ। এমন কি শঠ-জুয়াচোর অবধি বলে ফেলল। অ্যাটাচিকেস ও সাইকেল নিয়ে দীনেশ বেরিয়ে পড়ে। অটল রাখালরাজ এবং বাড়িসুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছে।

রাখালরাজকে দীনেশ বলে, দুধসরের এনকোয়ারিতে যাব নটার সময়। সাব-পোস্টমাস্টার হিসাবে তুমি যাও, ঝঞ্ঝাট তাড়াতাড়ি মিটবে।

রাখালরাজ বলে, তা এখনই চললে কোথা? চা-টা খেয়ে একসঙ্গে বেরুনো যাবে।

বাজারখোলায় চা পাওয়া যায়। এ বাড়িতে জলগ্রহণ আর জীবনে নয়।

রাগে দুঃখে কথা বলতে পারে না। স্বপ্ন তারও চুরমার হয়েছে। অনেক লড়ালড়ি করে বাপের মত আদায় করেছিল. কিন্তু কানা-মেয়েকে বউ করে বাড়ি তুলতে রাজী হবেন না—বাপ নন, মা-ও নন। আর দীনেশের নিজেরও কি ভাল লাগছে—কানা-স্ত্রীর স্বামী হয়ে চিরজন্ম কাটানো। নবেলে নাটকে এমন করুণাপর সুবিবেচক আদর্শনিষ্ঠ মানুষ মিলতে পারে, দীনেশ কাল সারারাত্রি ভেবে দেখেছে—নবেলের নায়ক সে হতে পারবে না।

॥ বার ॥

অতএব দুধসরের তদন্তে এসে ইনস্পেক্টরের একেবারে ভিন্ন মূর্তি। মুখ থমথম করছে। কারণে অকারণে ক্ষণে ক্ষণে ধমক দিয়ে উঠছে নিরঞ্জনেরই উপর। নিরঞ্জন ভ্রূক্ষেপ করে না। বাইরের মূর্তি এটা—অভিনয়। বিচারক হয়ে আসামির সম্পর্কে এমনি ভাবই দেখাতে হয়, কারো মনে বিচার সম্পর্কে একতিল যাতে সন্দেহের উদয় না হয়।

দরখাস্তে সর্বপ্রথম সই কাঞ্চনমালা ঘোষের—তাঁর ডাক পড়ল। অভি-

যোগ লিখে পাঠিয়েছেন, মুখে এসে বলে যাবেন। প্রমাণ যদি হাতে থাকে তা-ও নিয়ে আসুন।

কাঞ্চন নেই, কালই কলকাতা চলে গেছে। দোমোহনির ঘাট অবধি সঙ্গে গিয়ে বিজয় নিজে শেয়ারের নৌকোয় তুলে দিয়ে এসেছে। বলে, আপনি আসবেন ইনস্পেক্টরবাবু, কেউ তো জানে না। জানলেও থাকার উপায় ছিল না তার। এক বান্ধবীর বিয়ে, সেই উপলক্ষে কলকাতা গেল। কাঞ্চনকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়, আপনাকে আবার একদিন পায়ের ধুলো দিতে হবে।

শুনে নিরঞ্জন স্তম্ভিত। ইস্কুল বন্ধ দিয়ে কলকাতা গিয়ে বেরুল—বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, তাকে একটা মুখের কথা জানিয়ে গেল না।

নীলমণিকে ফিসফিস করে বলে, অরাজক অবস্থা একেবারে। আসুক ফিরে, কৈফিয়ত চাইব। এমনি ছাড়ব না।

নীলমণি বলে, ঘোড়ার ডিম। চাকরি ছেড়ে দেবে, বুঝো ঠেলা তখন। তোমার চাকরি আর কাঞ্চনের চাকরি একই রকমের নিরঞ্জনদা। চাকরি কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, তুলে নেবার লোক জোটে না।

কাঞ্চন অনুপস্থিত। অতএব পরের জন বিজয়কে নিয়ে পড়েছে ইন্‌স্পেক্টর দীনেশ। বিজয় যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে, যত রাগের শোধ নিচ্ছে। নিরঞ্জন বাধা দিতে গেলে দীনেশ দাবড়ি দিয়ে তাকেই থামিয়ে দেয়: কথার মধ্যে কথা বলেন কেন, চুপ করে থাকুন আপনি।

আধখানা সত্যের উপর সাড়ে-পনের আনা রং ফলিয়ে বলে যাচ্ছে—ক্ষমতা আছে বটে বিজয়ের, গালগল্প বানাতে পারে তো। নিরঞ্জনের মতো দায়িত্বহীন নৃশংস মানুষ দ্বিতীয় নেই—দুধসর গ্রামবাসী কান পেতে অবাধে এইসব শুনে যাচ্ছে। নীরব থাকতে হবে তবু নিরঞ্জনের। অথচ কাল রাত্রিবেলা ঠিক উল্টো রকমের কথাই বলছিল এই দীনেশ: যা-কিছু ওরা বলবে, তেড়েফুঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠবেন।

হতভম্ব হয়ে রাখালরাজের দিকে তাকায়। তদন্তের ব্যাপারে রাখাল এসেছে—ব্রাঞ্চ-অফিসে আর সাব-অফিসে ঘনিষ্ঠ লেনদেনের সম্পর্ক, সাব-পোস্টমাস্টার হাজির থেকে অনেক ব্যাপারের হদিস দিতে পারবে।

রাখালের দিকে করুণ চোখে চেয়ে নিরঞ্জন বলে এমন মারমুখি কেন বলো তো? উনি নিজেই তো কাল উল্টো রকম শিখিয়ে দিলেন। তেড়ে-ফুঁড়ে আমার বেকবুল যাবার কথা।

রাখাল তিক্ত কণ্ঠে বলে, সৃষ্টিসংসার উলটে গেল যে রাত্রের মধ্যে। কলি গিয়ে সত্যযুগ চলছে।

কালকের রাখালরাজও বদলে গিয়ে ভিন্ন এক মানুষ, কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে। ললিতার কাণ্ড জেনে ফেলেছে রাখালেরা সবাই। ললিতা

নিজেই বলেছে।

রাখাল বলে, অকথা-কুকথা বিস্তর শোনাল দীনেশ। জলগ্রহণ করবে না আমাদের বাড়ি, এখান থেকে সোজা শহরে চলে যাবে। তার জন্য কিছু নয়। কিন্তু কী পাগলামি সর্বনাশীর মাথায় চেপেছিল, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে। জেনেশুনে কানা-বউ কে ঘরে নেবে? ভাল দাম ধরে দিয়ে ওর বাপের কাছে পড়লে চোখের দোষ হয়তো এখনো শোধন হয়, কিন্তু সে টাকা পাই কোথা। মামার বাড়ি থেকে ফেরার পরে কেউই তো ললিতাকে দেখেছে, চোখ দেখে সন্দেহ হয়েছে কিছু? বলো। এক কাঁড়ি টাকা নিয়েছে ঐ চোখ বানাতে। না বললে দীনেশের বাপের সাধ্য ছিল না ধরতে পারে। বাবা শুনে অবধি অবিশ্রান্ত বকাবকি করছেন। তা বলে কি জান, এতবড় জিনিসটা গোপন করে জুয়াচোর হয়ে পরের ঘরে যাব কেন? বাবা বোধহয় ধরেই মারতেন, মেয়ে বড় হয়েছে বলে রেহাই হত না, আমি গিয়ে ঠেকিয়ে দিলাম।

তদন্ত ঘোর বেগে চলেছে, কিন্তু নিরঞ্জনের সেদিন বড় মন নেই। কানে যা আসে, শুনে যাচ্ছে এই পর্যন্ত। লেখাপড়া শিখে, এবং সদরে শহর জায়গায় থেকেও ললিতা সেকেলে রয়ে গেছে। বলতে হয়—বিয়েথাওয়া চুকেবুকে সকল দিক ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোন এক সময় দীনেশের কাছে চুপিচুপি বলতে পারত। রাখালরাজের এই কথা, এবং কথাটা অযৌক্তিক নয়। দীনেশই তখন চাপা দিয়ে রাখত কানা-বউয়ের বর হবার লজ্জায়। কাকপক্ষীতে জানতে পারত না।

আজ দীনেশের মনমেজাজের ঠিক নেই। মেজাজ ঠিক থাকে না হেন অবস্থায়। কতকাল ধরে প্রত্যাশা, কত লড়াই বাপের সঙ্গে। সিদ্ধি হাতের মুঠোয়, তখনই সব বরবাদ। আক্রোশটা এখন ললিতার সম্পর্কীয় যে যেখানে আছে, সকলের উপর। মেয়ে কানা সে কথা গোপন রেখে নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে। রাখালরাজের সঙ্গে নিরঞ্জনের ঘনিষ্ঠতা, ক্রোধ তাই নিরঞ্জনের উপরেও। তদন্তে বসে বিরোধী পক্ষের কথাই শুনে যাচ্ছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনছে। আচমকা এক এক প্রশ্ন—প্রশ্ন নয় উস্কানি। তাইতে আরো আস্কারা পেয়ে যা মনে আসে বানিয়ে বানিয়ে বলে যাচ্ছে।

কৃতজ্ঞ হারাধন ধাড়া নিরঞ্জনের হয়ে কি বলতে গিয়েছিল, তাকে এক বিষম ধমক: চুপ করো। সময়ের দাম আছে আমার। ধানাই-পানাই শুনতে চাইনে। বিজয়বাবু অত্যাচারী হন কি সদাশয় হন সে বিচারে আমার এক্তিয়ার নেই। আইন-আদালত খোলা আছে, ইচ্ছে হয় সেখানে চলে যেও।

সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলে, যা শোনবার শুনে নিয়েছি। কাউকে কিছু আর বলতে হবে না। ঘাস খাইনে আমি, বুঝতে কিছু বাকি নেই। আমার যা লিখবার লিখে পাঠাই। উপরে গিয়ে তদ্বির করতে পারেন।

সুপারেনটেণ্ডেন্ট নিজেই হয়তো আসবেন, যা বলবার তাঁর কাছে বলবেন। তবে নিশ্চিত জেনে রাখুন—

নীলমণি মনে মনে গর্জাচ্ছে: সাগুদি চন্দ্রপুলি-গোপালভোগ বানিয়ে বানিয়ে খাইয়েছে, এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে পাঁঠা মুরগি এনে জুটিয়েছি, মোটা মানকচু আর উৎকৃষ্ট নলেন্গুড় সাইকেলে বেঁধে দিয়েছি। এসো তুমি আবার কখনো—খাওয়াব ধুলোমাটি, ছাদনা বেঁধে দেবো উনুনের ছাই।

দীনেশ তার কথা শেষ করল: জেনে রাখুন, এত সব সাংঘাতিক অপরাধের পর নিরঞ্জনবাবুকে কোনক্রমে আর পোস্টমাস্টার রাখা চলবে না। পোস্টাপিসের পক্ষেও খুব খারাপ। উঠে যেতে পারে। রিপোর্টে আমি সব কথা পরিষ্কার লিখে দেবো।

আকাশ ভেঙে পড়ে এবার গ্রামবাসী সকলের মাথায়। দরখাস্তে সই দিয়েছে, বিপক্ষ-দলের সেই মানুষগুলো পর্যন্ত আঁতকে ওঠে। নিরঞ্জন বিদায় হোক, তারা বড় জোড় এই চেয়েছিল। একেবারে পোস্টাপিস ধরেই টান—কে ভাবতে পেরেছে।

বিমল তর্ক করে: দোষ করেছে পোস্টমাস্টার, তার চাকরি যাবে। পোস্টাপিসের কি?

দীনেশ জবাব দিতে যাচ্ছিল, নীলমণি ফুঁসে উঠল তার কথার আগেই: নতুন পোস্টমাস্টার পাচ্ছ কোথা মশায়রা? মাথায় পোকা না থাকলে এ চাকরিতে কেউ আসে না। মাইনে চার টাকা আর এই বাবদে খরচা অন্তত পক্ষে বিশ। আপিসঘরে বসে কাজ, তার উপরে গ্রাম ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করা আর টিকিট-পোস্টকার্ডের বাকি দাম আদায়ের কাজ। এ মানুষ কোথায় পাবে নিরঞ্জনদা ছাড়া?

দীনেশ বলে, এক্সপেরিমেন্টাল পোস্টাপিস আপনাদের। . . . কড় বসেনি, কলমের এক আঁচড়ে তুলে দেওয়া যায়। সরকার ভাবতে পারেন, গেঁয়ো দলাদলি রয়েছে, তার উপর ভাল পোস্টমাস্টার মেলে না—কাজ নেই ঝঞ্ঝাট পুষে রেখে। সুজনপুরের অধীনে যেমন ছিল, তেমনি চলবে আবার।

মুখ শুকাল উপস্থিত সর্বজনার। পোস্টাপিস দুধসরে ছিল না, সে একরকম। একবার বসে যাওয়ার পর সে জিনিস টিকিয়ে রাখতে পারছে না, পুনর্মূষিক হয়ে সুজনপুরের অধীনে চলে যাবে—এমন কাণ্ডের পর সুজনপুর তো গায়ে থুতু দেবে। কারও পানে মুখ তুলে তাকানো যাবে না।

দরখাস্তের ব্যাপারে বড় মাতব্বর বিজয়, তাকেই সকলে দুষছে। নিজেদের মধ্যে না মিটিয়ে সদরের সুপারেনটেণ্ডেন্ট অবধি ধাওয়া করেছে। এদ্দুর কেলেঙ্কারি যখন ঘটালে কাজটা তুমিই নিয়ে নাও। বড়লোক বলে চিঠি বিলি করতে যদি লজ্জা করে, টাকা দিয়ে আলাদা লোক নিযুক্ত করো। তোমার হয়ে সেই লোক চিঠি বিলি করে বেড়াবে। নিরঞ্জনদা একলা হাতে পোস্টাপিসের সব ধকল সামলে এসেছে। তার পিছনে লেগেছ তো দায়ভার

তোমাকেই কাঁধে নিতে হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।

এখন আর দল-বেদল নেই। সবসুদ্ধ মিলে দীনেশকে ধরা-পাড়া করছে : দুধসরের ইজ্জত যায়, কলম এইবারটা চেপে দিন। আবার যদি কখনো গণ্ডগোল দেখেন, তখন বেহাই করবেন না।

ভেবেচিন্তে দীনেশও নরম হয়েছে এখন। আক্রোশটা তো রাখালবাজদের উপরেই—দুধসরের লাঞ্ছনা ঘটিয়ে সুজনপুরকে আকাশে তুলে ধরতে যাবে কেন? মুরব্বিরাও ওদিকে তারস্বরে নিরঞ্জনের গুণগান করছেন : ছেলেটা সত্যি ভালো, গ্রামের চূড়ামণি। সকলের জন্য দরদ—এই দরদটাই কাল হয়েছে। এখন থেকে আমরা খুব নজরে রাখব। নিরঞ্জন, তুমি বাবা একবার দিয়ে দাও, কেউ বিরুদ্ধে বলতে পারে এমন কাজ কখনো আর হবে না। দুধসরের উপর টান তোমার মত কারো নয়, গাঁয়ের মুখ চেয়ে করো এইটে বাবা।

নিরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে রাজী। ব্যক্তিগত মান-অপমান বোঝে না সে। জলচৌকিতে বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিল একবার। একউঠান মানুষের মধ্যে গলা তবু কেঁপে যায়। বলে, তাই হবে সকলে যেমনটি চাচ্ছেন। সমস্ত গাঁয়ের নাম নিয়ে দিব্যি করে বলছি। পোস্টাপিস বজায় থাকুক। আমি না হয় মানুষই রইলাম না আজ থেকে। ডাকবাক্সে যা-কিছু আসবে—সে জিনিস বিষ হোক আর বোমা হোক ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসব। আর শুনে রাখুন মশায়রা নগদ পয়সা ছাড়া খাম-পোস্টকার্ড বিক্রি বন্ধ। ফেল কড়ি মাখ তেল। তাতে মামলা খারিজ হল কি ছেলের চিকিচ্ছে আটকাল—আমি কিছু জানিনে। পোস্টমাস্টারের এসব জানবার এক্তিয়ার নেই।

মিটমাট হয়ে গেল। নিরঞ্জন যেমন পোস্টমাস্টার আছে, তেমনি থেকে যাবে। গ্রামবাসী সকলে এ বিষয়ে একমত। দরখাস্তের পিঠে বিজয়ের সই সকলের উপরে। কাঞ্চন গাঁয়ে থাকলে তারই সই নিশ্চয় ওখানে আসত।

সেদিন আর নয়, পরদিন নিরঞ্জন সুজনপুর পিওনমশায়ের বাড়ি গেল। ললিতা তো কাণ্ড করে বসেছে, পরের অবস্থা কি এখন? ছোটবোনকে রাখালরাজ প্রাণের অধিক ভালবাসে। ক্ষমতায় কুলায় না, তা সত্ত্বেও অশেষ রকম কষ্ট করে বোনকে পড়িয়েছে। ভাল ঘরে বিয়ে হয়ে বোন সুখে-শান্তিতে থাকবে—কত বড় অভিলাষ তার। দীনেশের সঙ্গে এত যে ভাব জমল, তার মূলে রাখালের মতলব কাজ করেছে বই কি।

সন্ধ্যারাত্রি এখন. কিন্তু বাড়িতে আলো নেই, মানুষের সাড়াশব্দ নেই। এই পরশু দিনেও এসেছিল, তখন কেমন জীবন্ত ভাব চারিদিকে, কত হাসি-হুল্লোড় :

বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন ইতস্তত করছে। আবছা আঁধারে

কোন দিক দিয়ে ললিতা এসে পড়ল।

দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন নিরঞ্জনদা ?

ভাবছি, ঘুমিয়ে গেছ তোমরা সবাই, কিম্বা বাড়িই ছেড়েছ একেবারে।

ললিতা হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে বলে, বাড়ি আমাকেই ছাড়তে হবে নিরঞ্জনদা। না ছেড়ে উপায় নেই। সত্যিই তো, বাবা-দাদা চিরকাল কেন পুষতে যাবেন ? সে অবস্থা নয়ও ওঁদের। আপনি কোন-একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না নিরঞ্জনদা ? কাল থেকে ভাবছি। আপনাদের মেয়ে ইস্কুল তো বেশ জমে যাচ্ছে। পারেন তো ওর মধ্যে ঢুকিয়ে নিন। একটা চোখ রয়ে গেছে—পড়াতে বেশ পারব, অসুবিধা হবে না।

এমন অন্তরঙ্গভাবে কোন দিন ললিতা কিছু বলেনি। এ যাবৎ কথাই বা ক'টা বলেছে নিরঞ্জনের সঙ্গে ! ঝগড়াঝাটি নিদারুণ রকমের চলছে বোঝা গেল। ললিতার পক্ষে অসহ্য হয়েছে।

হিতার্থী অভিভাবকের মতো নিরঞ্জন বোঝাতে যায় ললিতাকে : নিজের দোষটাও দেখবে তো। বিয়েথাওয়ায় ভাংচি দেয় শত্রুপক্ষ। তোমার বিয়ের ভাংচি নিজেই তুমি দিয়েছ।

দৃঢ়কণ্ঠে ললিতা বলে : না, কোন দোষ নেই আমার। অসুখে কানা হয়ে গেলাম, তাতে আমার দোষ ছিল না। সত্য প্রকাশ করে দিলাম—সেটা কর্তব্য, তাতেও কোন দোষ হয় না।

উঃ, এই রকম জাঁক এত গালমন্দ খাবার পরেও। লেখাপড়া শেখালে মেয়েগুলো এমনি হয়ে দাঁড়ায় বটে। দেখ দুধসরের কাঞ্চনটিকে, দেখ সুজন-পুরের এই ললিতা। সংশোধনের অতীত এরা।

ঘরে একলা রাখালরাজ। নিরঞ্জন ডাক দিল : সন্ধ্যাবেলা ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন ? বাইরে এসো।

রাখাল দাওয়ায় এসে বসল। দুজনে পাশাপাশি বসেছে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল রাখাল। বলে, ললিতার এক চোখে অন্ধকার, দুটো চোখ বজায় থেকেও আমি চতুর্দিকে অন্ধকার দেখছি। পাশ-করা মেয়ে ছাড়া দীনেশ বিয়ে করবে না—পেটে না খেয়ে বোনকে পড়িয়েছে। কিনা চিরজন্মের হিল্লে হবে, সুখে থাকবে আমার বোন। তা দেখ, হতভাগী আখেরে বুঝল না, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারল।

নিরঞ্জন বলে, যাই বলো, তোমার দীনেশও কিন্তু লোক সুবিধের নয়। খোঁচা দিয়ে ইচ্ছে করে তো চোখ নষ্ট করেনি—রোগপীড়ের ব্যাপার। বিয়ের পরে হলে কি করতিস তুই শুনি ? সত্যি ব্যাপার খুলে বলেছে—সত্যসন্ধ মেয়েকে তো লুফে নেওয়া উচিত।

রাখালরাজ সায় দিয়ে বলে, আমাদের শতেক অপমান করেও আক্রোশ মেটেনি। দশের মধ্যে তোমার অত হেনস্থা—যেহেতু বন্ধু-লোক তুমি আমার।

নিরঞ্জন বলে, চাকরিটা খুব রক্ষে হয়ে গেল। আমি গেলে পোস্টাপিসও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেত—

নিরঞ্জনের পালা এবার। দুঃখিত স্বরে বলে, লড়ালড়ি করে দুটো জিনিস গড়লাম। টিকিয়ে রাখতে এখন প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ। পোস্টাপিসের এই গতিক। আর বালিকা-বিদ্যালয়ের অবস্থা তোমার কাছে বলতে কি—সব জায়গায় গ্রীষ্মের-বন্ধ দেয়, মাস্টার অভাবে আমরা শীতের বন্ধ দিয়ে বসে আছি। কাঞ্চনের কলকাতা-মুখো নজর, গাঁয়ের উপর একফোঁটা মমতা নেই, সুবিধা পেলেই পাকা-পাকি গিয়ে উঠবে।

অনেকক্ষণ এমনি সুখ-দুঃখের কথা। দুধসর ও সুজনপুরে শত্রু সম্পর্ক—ছেলেবয়সে এই দুজনের কুলতলা আমতলায় ঘোরাঘুরির মধ্যে ভাব জমে গিয়েছিল। সে বন্ধন কাটিয়ে কেনোদিন এরা শত্রু হতে পারল না।

॥ তের ॥

মঞ্জুলার বিয়ে উপলক্ষ করে কাঞ্চন কলকাতায় গেছে। বিয়ের আমোদ-স্ফূর্তি—তার মধ্যে তার চিরকালের কলকাতার খবরাখবর নেয়। এই কলকাতার দিকে অহোরাত্রি সে তো মুখ করে বসে আছে।

সমরের কথা উঠে পড়ে। রাণীশঙ্করী লেনের বাসিন্দা মিষ্টি কথার ঝরনা সেই কন্দর্পটি। নেমন্তন্ন করা হয়েছে তাঁকে? আসবে?

মঞ্জুলা ভ্রূকুটি করে: অন্তত একটি হাজার নেমন্তন্ন হলে তবেই তার কথা ওঠে। আমাদের অবস্থা জানিস তুই, দেশের অবস্থা দেখছিস। অত নেমন্তন্ন হয়নি।

হাজারের ওপার গিয়ে পড়ছে? কিন্তু মনে পড়েছে, একদা সে একজনই ছিল। পরিবারের মানুষ হয়ে গিয়েছিল তোদের।

এক ঝলক হেসে নিয়ে আবার বলে, আমাদেরও—

মঞ্জুলা বলে, তোর সঙ্গে তাই নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদের গতিক। মনে পড়ে? কিন্তু যা বললি কাঞ্চন, মুখের বার করবিনে, খবরদার! আমার বরের কানে না ওঠে।

হেসে উঠে আবার ভয় দেখায়: আমিও তাহলে ছাড়ব না। তোর বিয়ের সময় গিয়ে তোর বরের কানে তুলে দিয়ে আসব। সমরকে জড়িয়ে—ঠিক গণে দেখিনি অবশ্য—বোধহয় দেড় ডজন বরের কানে এখনি তুলে দিয়ে আসতে পারি। গোপীমন-মনোহরণ মডার্ন কেষ্টঠাকুর আর কি।

কলকাতায় এসে এই ক'দিনে কাঞ্চন ও বিস্তর জেনেছে। তিক্তকণ্ঠে বলে, কার কুঞ্জে এখনকার আনাগোনা, খবর রাখিস?

সে ভাগ্যবতী হলেন শ্রীমতি অর্পিতা। খবরের জন্য চরবৃত্তি করতে হয় না, সামান্য লজিকের জ্ঞানেই বলে দেওয়া যায়। যেহেতু অর্পিতা হল অতুলেন্দ্র

পালের মেয়ে।

চমক লাগে কাঞ্চনের: মামার অফিসের অতুলেন্দ্রবাবু। মামার এ্যাসিস্টেন্ট তো উনি ছিলেন।

জেঠাবাবু রিটায়ার করেছেন, তোমার মামার চেয়ারে পালমশায় এবার। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। সমরও অতএব আঠার মতন লেপটে আছে সেখানে। হতেই হবে।

শ্যামাকান্ত রিটায়ার করেছেন—জগন্নাথ ঘোরতর মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। মামলার একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানি বাইরে থেকে পাকা জেনারেল ম্যানেজার আনবে না—ভিতরের লোক নিয়ে অস্থায়ীভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অতুলেন্দ্র হেন মানুষ তাই জেনারেল ম্যানেজার। এত সমস্ত খবর কাঞ্চন জানত না, জানবার কথাও নয়।

মঞ্জুলা বলে, দেখেছিস তুই অর্পিতাকে?

একবার। ওর বড় বোনের বিয়েয় গিয়েছিলাম। সে মেয়েটার চাকচিক্য ছিল না।

অর্পিতার চাকচিক্য না থাক, বাপের ম্যানেজারি হয়েছে। অতুলবাবু বোঝেন সেটা—দিন স্থির করবার জন্য তাড়াতাড়ি করছেন—

বিবশ কণ্ঠে কাঞ্চন প্রশ্ন করে: হচ্ছে না কেন তবে?

মঞ্জুলা বলে, সমর আরও বেশি বোঝে। ঈশ্বর ওকে দুর্লভ চেহারা দিয়েছেন। আর চাটুবাক্য বলবার অপূর্ব ক্ষমতা। বিয়ে চুকেবুকে গেলে তো অস্ত্র দুটো অকেজো হয়ে পড়ল। চালনার জায়গা পাবে না। সেই জন্যেই ঝুলে পড়তে নারাজ।

কাঞ্চন বলে, আরও আছে। অতুল-মামা পাকা-ম্যানেজার নন, অস্থায়ী-ভাবে আছেন। পাকা যদি নাই-ই হন শেষ পর্যন্ত—ঝুলিয়ে রাখছে, নতুন কেউ যদি আসে তাদের সঙ্গে জমাতে হবে। জমিয়ে নিয়ে কন্ট্রাক্ট বাগাবে। সমরের আনাগোনার মধ্যে প্রেম এককোঁটাও নেই, পুরোপুরি পাটিগণিত।

এ অভিমত মঞ্জুলারও। সবিস্ময়ে মুহূর্তকাল সে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে থাকে: বুঝলি তবে এদ্দিনে? উপরে উঠবার সিঁড়ি ছাড়া কিছু নই আমরা। পা ফেলে ফেলে উঠে গিয়ে কাজকর্ম বাগায়।

কথার সূত্রে কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, গোপাল সামন্ত বলে যে বুড়ো আরদালিটা ঘুরত, মামার অত্যন্ত অনুগত—

লুফে নিয়ে মঞ্জুলা বলে, সে-ও কি আলাদা একটা-কিছু? এখন অতুলেন্দ্র পালের বাড়ি মোতায়েন থাকে। ঠিক যেমন তোদের ওখানে থাকত। মিস্টার পাল তোর মামার অফিসের চেয়ার পেলেন সেই সঙ্গে সমস্ত-কিছু পেয়ে গেলেন—মামার যা যা ছিল। মায় সমর নামের জীবটিকে মেয়ের পিছু পিছু ঘোরার জন্য।

তিক্তকণ্ঠে আবার বলে, সত্য-সাধুতা ভালবাসা-কৃতজ্ঞতা দেশ

ছেড়ে বিদায় নিয়েছেরে কাঞ্চন, কথাগুলোই শুধু মানুষের ঠোঁটে ঠোঁটে ঘোরে।

কাঞ্চন বলে, বড্ড চটে গিয়েছিস। তুই-আমি সামান্য মানুষ, গণ্ডির মধ্যে আনাগোনা। দেশের কতটুকু দেখেছি, মানুষ চিনি কজনকে? দেশ বলতে কি কলকাতার শহর? মানুষ বলতে সমর গুহ শুধু?

এর পর এক রবিবারে কাঞ্চন অতুলেন্দ্রের বাড়ি গিয়ে পড়ল। মামা-মামীর সঙ্গে একবার এবাড়ি সে নিমন্ত্রণে এসেছিল অতুলেন্দ্রের বড়মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে। মামাবাড়িতেও তাঁকে কয়েকবার দেখেছে, দায়ে-দরকারে জগন্নাথের কাছে যেতেন। অতুলেন্দ্র তবু চিনতে পারেন না, কাঞ্চনকে আত্মপরিচয় দিতে হল। বলে, কলকাতায় এসেছি সামান্য কয়েকটা দিনের জন্য। মামা কোথায়, ঠিকানা জানিনে। আপনার যদি জানা থাকে, সেজন্য এসেছি।

অতুলেন্দ্রও জানেন না। তবে আছেন তিনি কলকাতায়। মাস তিনেক আগে হাইকোর্ট-পাড়ায় হঠাৎ দেখা। না-চেনার ভান করে জগন্নাথ সরে পড়ছিলেন, অতুলেন্দ্র দ্রুত সামনে গিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। জবাব না দিয়ে জগন্নাথ ইতি-উতি তাকান, তারপর অবোধ্য স্বরে কি-একটু বলে পাশের এক গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অতএব কলকাতা ছেড়ে কোথাও তিনি যাননি। আরও পাকা প্রমাণ, কোম্পানির বিরুদ্ধে তাঁর কেস হাইকোর্টের লিস্টে উঠে গেছে। প্রচুর অর্থব্যয় এবং বিশেষ রকমের তদ্বির ছাড়া এমন নিখুঁতভাবে কেস সাজানো সম্ভব নয়। পরিচিত চক্ষুর অন্তরালে জগন্নাথ প্রাণ ঢেলে ঐ কাজই করছেন শুধু—

অতুলেন্দ্র মন্তব্য করলেন: পাকালোক হয়ে কেন যে এত সব করতে গেলেন বুঝি না। অত বড় কোম্পানি, ডিরেক্টররা কোটিপতি —চুনোপুঁটি উনি তাদের সঙ্গে লাগতে গেলেন! ধরলাম জিত হল মামলায়, ওরা তখন পাল্টা মামলা করবে, সেটা জিতলেন তো ফের আবার। জিতে জিতেও তো শেষ হয়ে যাবেন। তার চেয়ে মোটা কমপেনসেসনের কথা হয়েছিল—হাসি-মুখে হাত পেতে নিয়ে কর্তা-গিন্নি বাকি দিনগুলো নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দিতে পারতেন।

মনিবদের বিস্তর তাঁবেদারি করে অতুলেন্দ্র দুর্লভ আসনে বসেছেন—জগন্নাথের মামলা-মোকদ্দমার ফলে সমস্ত কেঁচে না যায় এই আশঙ্কা। তাঁর মনের কথা কাঞ্চনের বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু এসেছে সে তাঁর কাছে নয়, গোপাল সামন্তর খোঁজে।

গোপাল আসে তো আপনার এখানে?

অতুলেন্দ্র বলেন, তাকে নিউ-মার্কেটে পাঠালাম ভাল মাটন আনবার জন্যে। এদিককার জিনিস অখাদ্য। জগন্নাথবাবুর ঠিকানা সে-ও জানে না,

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম

কাঞ্চন গড়িমসি করে। গোপালের সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।

অর্পিতা আছে? দেখা করে আসি—

দোতলায় উঠে যায়। অল্পসল্প আলাপ অর্পিতার সঙ্গে—তার বড় দিদির বিয়েয় এসে সেই সময় আলাপ হয়েছিল। মামার দৌলতে সেদিন কত খাতির এবাড়ি। আজকে অর্পিতা চিনতেই পারে না—সবিস্তারে পরিচয় দিতে হল।

তবে জমিয়ে নিতে দেরি হয় না। এই ক্ষমতা আছে কাঞ্চনের—বিশেষ করে সমবয়সি মেয়ের সঙ্গে। দশ মিনিটের মধ্যে প্রায় অভিন্ন-হৃদয়। 'তুমি'তে এসে গেছে, আর খানিক পরে 'তুই-এ আসাও বিচিত্র নয়।

কথার মাঝখানে হঠাৎ কাঞ্চন বলে, ওহ আসে তো এখানে—পেলিকান ইণ্ডাস্ট্রীর সমর গুহ?

তুমি জানলে কি করে?

ছলাৎ করে রক্ত নেমে আসে অর্পিতার মুখে, মুখ রাঙা-রাঙা দেখায়। অর্থাৎ অতিশয় গদগদ অবস্থা—মঞ্জুলা যা বলল, তার বেশি বই কম নয়। কাঞ্চন মনে মনে হাসে। খেলাতে চায় একটুখানি। কৌতুক দেখবে, বুঝে নেবে মনের গতিক।

চমৎকার মানুষ সমরব বু—নয়? শিক্ষিত রুচিবান চৌকস মানুষ। কী সুন্দর কথাবার্তা, যখন হাসেন হাসিমাখা মুখের ফটো তুলে রেখে দিতে ইচ্ছে করে।

মুগ্ধদৃষ্টিতে হঠাৎ তাকিয়ে পড়ে অর্পিতার দিকে। ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বলে, তুমিও সুন্দর। খাসা হবে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বিশেষণ ফড়ফড় করে বলে যায়। অর্পিতার সম্বন্ধে—তার স্তুতিবাদ।

অর্পিতা অবাক হয়ে গেছে। হেসে উঠে কাঞ্চন বলে, হচ্ছে না ঠিক ঠিক?

অর্পিতা বলে, তুমি কি করে জানলে? আড়ি পেতে শুনে মুখস্থ করে রাখার মতো। ভাবভঙ্গিগুলো পর্যন্ত। মফস্বল থেকে সেটা তো সম্ভব নয়—নিশ্চয় জ্যোতিষ-বিদ্যার চর্চা আছে।

না ভাই, গ্রামোফোন-রেকর্ডে শোনা আছে। সে রেকর্ড আমার মামাবাড়ি বাজত। মঞ্জুলাকে চেনো কি। জানিনে, তার ওখানেও বেজেছে। বেজেছে আরো অনেক জায়গায়, শুনতে পাই। এক সুর এক কথা—শুনতে ভাল লাগে, তাই মুখস্থ হয়ে যায়।

এমনি সময় গোপালের গলা পাওয়া গেল। ফিরেছে নিউ-মার্কেট থেকে। কাঞ্চন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

ছাড়তে চায় না অর্পিতা: বসো ভাই আর একটু। শুনি।

কি করে আর? আর কেউ হয় খাবার...

কলকাতায় আসা, কত জায়গায় যেতে হবে আমার। পারি তো আর একদিন আসব। আজকে আসি ভাই।

সওদা রেখে গোপাল উঠানে নেমেছে সেই সময় কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে: দিদিমণি যে! কবে এলে, কোথায় উঠেছ?

তোমার জন্যে বসে আছি গোপাল। একটা কথা আছে, শোন এদিকে—

'শোন' 'শোন' করে গোপালকে নিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল কাঞ্চন। আরও কয়েক পা গিয়ে বলে, মামার কাছে নিয়ে চল আমায়।

থমকে দাঁড়িয়ে গোপাল নিরীহের মতো মুখ করে বলে, কোথায় থাকেন তিনি?

জানলে তোমায় খোশামোদ করতে যাব কেন? সেখানেই তো ছুটে যেতাম সকলের আগে। আমার যে কী তাঁরা, তোমার অজানা নেই গোপাল।

গোপাল বলে, আমি ঠিকানা জানিনে—

রেগে গিয়ে কাঞ্চন বলে, ধাপ্পা অন্যলোকের কাছে দিও। সোজা কথায় বলো নিয়ে যাবে না সেখানে। এদ্দিন পরে এলাম, আমার মামা মামীর সঙ্গে চোখের দেখাটাও দেখতে দেবে না। হোক তাই, উপায় কি?

গোপাল ভাবে, আর এক-পা দু-পা করে পথ এগোয়।

কাঞ্চন বলে যাচ্ছে, তুমি যে লেখাপড়া শেখোনি, ফড়ফড় করে ইংরেজী বলতে পারো না, ভণ্ডামিও তাই রপ্ত হয়নি। একবার যাঁকে মান্য দিয়েছ, দুঃসময় বলে সম্পর্ক ছাড়োনি তার সঙ্গে। এত মানুষ থাকতে তোমারই খোঁজে খোঁজে এসেছি। মামার বাসায় নিয়ে যাবে তো চলো। নয় তো সোজাসুজি বলে দাও, ফিরে চলে যাচ্ছি।

অনেক গলিখুঁজি পার হয়ে খোলার বস্তির ঘরে মামা-মামীর আবিষ্কার হল। হায়রে হায়, টমাস ব্রাইটন কোম্পানির দোর্দণ্ড প্রতাপ ম্যানেজার জগন্নাথ চৌধুরী সস্ত্রীক আজ এমনি জায়গায় বসতি পেতেছেন। এ হেন অজ্ঞাতবাসের জায়গা কলকাতা শহর ছাড়া দুনিয়ার আর কোনোখানে ভাবতে পারা যায় না।

কাঞ্চন কেঁদে পড়ল।

জগন্নাথ বলেন, কাঁদ—কিন্তু শব্দ বেরুলে হবে না মা। বস্তির সবাই উঁকিঝুঁকি দেবে।

কাঞ্চন বলে, একি বেশ তোমার মামীমা। দু-হাতে দুগাছি লাল শাঁখা—এত গয়না ছিল, সমস্ত গেছে?

জগন্নাথই জবাব দিলেন, এক কুচিও অপব্যয় করিনি রে। গয়না বেচে পেটে খাইনি—মামলার জন্য গেছে একখানা একখানা করে! সব গয়না

খতম, হাইকোর্টের তদ্বিরও শেষ। রায় বেরোনোর অপেক্ষায় আছি। প্রতিপক্ষের বিস্তর পয়সা, জেদ করে সুপ্রীম কোর্টেও লড়তে পারে। তখন কি হবে ভাবি। কিন্তু ছাড়ব না আমি—দেশের মধ্যে বিচার আছে কিনা, মরণপণ করে দেখব।

বেরিয়ে এসে কাঞ্চন দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপালকে বলে, আনতে চাচ্ছিলে না—তাই বোধহয় ভাল ছিল। কেন যে দেখতে এলাম এমন জায়গায় এমনিভাবে—

॥ চোদ্দ ॥

কলকাতা থেকে কাঞ্চন ফিরে এসেছে। শ্বশুরবাড়িতে মঞ্জুলা। রওনা হবার দিনও কাঞ্চন সেখানে গিয়ে দেখা করে এসেছে। আবার দুধসরে পৌঁছে চিঠি সেইদিনই। সে চিঠিও ছোটখাট নয়। প্রায় এক মহাভারত:

আছিস কেমন ভাই মঞ্জুলা? লাগছে কেমন? রাত্রিগুলোর খবর শুনি আগে। এখন তো খানিক পুরনো হয়ে এলি, মিনিট কয়েক দিচ্ছে এখন ঘুমোতে? কী সব বলছে এবার? কে কার কাছে জব্দ—তোর কাছে বর, না বরের কাছে তুই?

ভূমিকায় এমনি সব হাসাহাসি। পাতা খানেক এমনি চালিয়ে লেখার সুর পালটে যায় হঠাৎ। হাসতে হাসতে কেঁদে পড়েছিল ঠিক কাঞ্চন, চিঠির পাতা নিবিধ করে খুঁজলে অশ্রুচিহ্ন বুঝি পাওয়া যাবে—

ভাই মঞ্জুলা, এবারের কলকাতা যাওয়া সার্থক। বড় উপকার হয়েছে, মানুষ চিনে এলাম ভাল করে। অন্তত পক্ষে দুটি মানুষ। একজন হলেন এই গ্রামের পোস্টমাস্টার নিরঞ্জন। উঁহু, পরিচয় পূর্ণ হল না—তাঁর জীবনই এই দুধসর গ্রাম। এমন মানুষের বিরুদ্ধে দরখাস্ত হয়েছিল, আমিই তার প্রধান উদ্যোক্তা: ডাকের চিঠি পড়েন তিনি এবং প্রয়োজন মতো চিঠি ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করেন। ইনস্পেক্টর এসে এক-গাঁ লোকের মধ্যে তাঁর বিচার করে গেল। আমি তখন কলকাতায়। অঞ্চল জুড়ে জেনে গেছে, অমন খারাপ মানুষ আর দ্বিতীয় নেই।

চিঠি পড়া এবং ছিঁড়ে ফেলা—অভিযোগ শতদূর সত্যি, দরখাস্ত করা সত্ত্বেও মনে মনে সংশয় ছিল আমার। কলকাতা থেকে এবারে অকাট্য প্রমাণ নিয়ে ফিরেছি—সত্যিই অপরাধী তিনি। চিঠি পড়েন ও ছিঁড়ে ফেলেন। দাদা চলে গেল—দুঃসংবাদের সেই চিঠি খুলে পড়েছিলেন নিরঞ্জনদা, পড়ে গাপ করলেন। পরের চিঠি পড়া পরের গোপন কথা লুকিয়ে শোনার মতোই অন্যায়। অন্যায়ের শাস্তিও নিতে হচ্ছে এখন অবধি। চারকুটাকা মাইনের পোস্টমাস্টারকে মাসে মাসে ঠিক নিয়মে

দশটাকা করে বাবার হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন। দাদাই যেন মনিঅর্ডার করে পাঠিয়েছে। চিরকাল দিয়ে যাবেন এমনি। আমার বয়ে গেছে—আমি কোনোদিন কিছু জানতে যাব না। বাবাও জানবেন না। দাদা নিরঞ্জনদার বড্ড আপন ছিল, দাদার জায়গা নিয়ে আমার বাবাকে পুত্রশোক থেকে রক্ষা করেছেন তিনি। কলকাতায় গিয়ে খোঁজখবর না করলে আমিও টের পেতাম না, বেঁচে নেই আমার দাদা।

দাদার চিঠি পাইনে, রাণীশঙ্করী লেনের চিঠি আসে না—আক্রোশটা ছিল আমার সে-ই। দাদা চিঠি লেখেনি, কোনোদিনই লিখবে না আর। রাণীশঙ্করী লেনের চিঠি ইহজন্মে যেন আর না পাই, পেলে এবার থেকে আগুনে ফেলব। কলকাতা গিয়ে নিরঞ্জনদাকে যেমন চিনেছি, সমর গুহর আসল মূর্তিও তেমনি ভাল করে জানলাম। মানুষ নয় ওটা—গ্রামোফোন রেকর্ড। একই কথা সকলের কাছে সুর করে বাজিয়ে যায়। শোষণ করে কাজ হাসিল করে। মন বলে বস্তুই নেই—তাই কোনোটাই তার মনের কথা নয়, শুধুমাত্র মিষ্টি কথা তোকে শুনিয়েছে, আমায় শুনিয়েছে, অর্পিতাকে শোনাচ্ছে। বুদ্ধিমতী তুই মঞ্জুলা, দু-পাঁচ দিনে চালাকি ধরে ফেললি। আমিও বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছি—মামার-বাড়ি ছেড়ে ভাগ্যিস এসে উঠতে হল। অর্পিতাকে সামাল করে দিয়ে এনেছি তারই ভালর জন্য। বেচারি সেই রোগে ভুগছে, তোর, আমার এবং আরও কতজনকে একদা যে রোগে ধরেছিল। সমরের চিঠি পাইনে বলেই নিরঞ্জনদার বিরুদ্ধে আরো ক্ষেপে গেলাম। কিন্তু মামার চাকরি গেছে এবং চোখের অন্তরাল হয়েছি আমি, তারপরে ও-মানুষ রাখতেই পারে না চিঠির সম্পর্ক। আর নিরঞ্জনদা তার চিঠি সত্যিই যদি নষ্ট করে থাকেন, কৃতজ্ঞ আমি তাঁর কাছে। রাক্ষসের গ্রাস থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। অথচ সেই মানুষ লাঞ্ছিত হলেন—আমি তার পয়লা নম্বরের পাণ্ডা।

আচ্ছা মঞ্জুলা, আমি এখন কী করি বল তো। মানুষটির দু-পায়ে মাথা গুজে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। তাতে খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। সত্যিই যদি তাই করে বসি, তিনি কি লাথি মেরে সরিয়ে দেবেন ? না, কিছুতেই নয়। দেখে দেখে ধারণা হয়েছে, মানুষকে কষ্ট দেবার ক্ষমতাই নেই তাঁর। সাহস আমারই তো হবে না—লোকে কি বলবে, তিনিই বা কি ভাববেন।

চিঠি লিখতে লিখতে আবোলতাবোল ভাবনা মনে আসে। ভাবনার মুখে লাগাম পারানো যায় না। ভাবতে ভালো লাগছে, এই চিঠি কোনোক্রমে পড়ে ফেললেন সেই মানুষটি। বাবার কাছে এসে বললেন, বেণুধরের মতন আর এক ছেলে হতে চাচ্ছি আপনার।—কিন্তু অত হাঙ্গামে কাজ নেই, পুরুষ হলেও লজ্জা করে বই কি! কিছুই বলতে

নিঃশব্দে একটি প্রণাম করবেন। তাইতে আমি বুঝে নেবো—সমস্ত দায়ভার তারপরে আমার উপর। মনস্থির করে ফেলেছি ভাই মঞ্জুলা। চিঠি এই ডাকবাক্সে ফেলছি—প্রত্যাশা করে থাকব, আজ কাল আর পরশু তিন দিনের মধ্যে কোন এক সময় তিনি বাবার কাছে এসে যাবেন।

খামের চিঠি, জল দিয়ে কোন রকমে রাতরক্ষার মতো এটেছে। দক্ষ পোস্টমাস্টার—অন্যান্য কাজে কেমন জানা নেই, কিন্তু খাম খোলা ও আঁটার ব্যাপারে পরিপাটি রকমের হাত-সাফাই। এই খামের মুখ ছুটো নখে ধরে একটু টানলেই তো খুলে যাবে। পাঁচ বছরের শিশুও পারে।

তিনদিনের কড়ার, কিন্তু পুরো হপ্তাই কেটে গেল। কাঞ্চন তক্কে তক্কে আছে। মানুষের সাড়া পেলে ভাবে, নিরঞ্জনই বুঝি—শৈলধরকে প্রণামের জন্য এসেছে। ঘরে থাকলে তাড়াতাড়ি দরজার পাশে এসে অলক্ষ্যে ঠাহর করে। ইস্কুলের পর বাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করে: কেউ এসেছিল বাবা তোমার কাছে? কাকস্য পরিবেদনা।

হপ্তা পরে মঞ্জুলার জবাব এসে পৌঁছল। খাম উল্টেপাল্টে দেখে কাঞ্চন। খোলা হয়েছে তার চিহ্নমাত্র নেই। পড়েনি এ চিঠি নিরঞ্জন। গর্ব হওয়ার কথা বটে—এক দরখাস্তে মানুষটার শাসন হয়ে গেল। সবসমক্ষে নিরঞ্জন যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে মানছে সেটা।

মঞ্জুলার চিঠির মধ্যেও সেই প্রতিশ্রুতি-পালনের কথা। তোর কাছে শোনা ছিল কাঞ্চন—খাম খোলার আগে ভাল করে তাই দেখে নিলাম। কক্ষনো খোলেনি তোর চিঠি—মানুষটার নামে মিছামিছি তোরা বদনাম দিস। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি। যে-কথা তুই লিখেছিস—আলুল চুলের গোছা দিয়ে সত্যি সত্যি যেন্নো মানুষটার পায়ের কাদা মুছে দিবি। লাথির ভয় করিসনে, পুরুষ হয়ে তোর মতন মেয়েকে কেউ লাথি মারে না, বরঞ্চ অন্য রকম করে। কাঠ-পাথর হলে অবশ্য আলাদা কথা। আর সত্যি সত্যি মারেও যদি, পাপমুক্ত হয়ে তুই তো উদ্ধার হবি ভাই।

চিঠি খামে ভরে রাগে গর-গর করতে করতে করতে কাঞ্চন নিরঞ্জনের কাছে গিয়ে পড়ে: চিঠি খুলে কেন আপনি পড়লেন?

ঘাড় নিচু করে নিরঞ্জন কাজ করছিল। অবাক হয়ে তাকাল।

চিঠি চোখের উপর ধরে কাঞ্চন বলে, মঞ্জুলার এই চিঠি—

কে বলেছে, কেমন করে জানলে তুমি? আকাশ থেকে পড়ে নিরঞ্জন: কখনো না, কখনো না। অনেক তো হয়ে গেছে রেহাই দাও এবারে। চিঠি পড়িনি, কোনো চিঠিই পড়ব না আর কোনো দিন।

কাঞ্চন গর্জন করে উঠল: কেন পড়বেন না তাই জিজ্ঞাসা করি? ভয়

তুলেছে পোস্টাপিস। আজেবাজে লোকে কোথায় কি নিন্দেমন্দ করল, তার জন্যে হাত-পা গুটিয়ে অমনি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেলেন। ছিঃ ছিঃ—

শুধু মুখের নিন্দেমন্দই নয় কাঞ্চন, হেড- অফিস অবধি দরখাস্ত পড়েছিল। তদন্তের দিন তুমি ছিলে না—পোস্টাপিস উঠে গিয়ে গ্রামের বেইজ্জতির অবস্থা।

অবাক হয়ে নিরঞ্জন কাঞ্চনের রোষযুক্ত মুখের দিকে তাকায়। বলে, রাগ করছ, কিন্তু তুমিই তো পয়লা নম্বরে পাণ্ডা। দরখাস্ত সবাই দেখেছে। তোমার নাম সকলের আগে, হাতের লেখা তোমারই।

কাঞ্চন বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। সমান তেজে বলে, হবেই তো। মানুষ চিনলাম কবে, মায়ামমতা আসবে কিসে? শহরের উপর মামার-বাড়িতে মামার টাকায় নেচেকুঁদে বেড়িয়েছি। আর বড় বড় বুলি শিখেছি কতকগুলো। কিন্তু গাঁয়ের মানুষ আপনি কেন শহুরে কাঠখোট্টা আদব মানতে যাবেন? আমাদের সঙ্গে আপনার তবে তফাত রইল কোথা?

ম্লান হাসি হাসল নিরঞ্জন: দশের মধ্যে হলপ করে বলেছি, পোস্টাপিস বজায় থাকবে, আমিই আর মানুষ থাকব না।

ঠিক তাই। আপনি আর মানুষ নন নিরঞ্জনদা, চার তঙ্কা মাইনের পোস্ট-মাস্টার। হাত পেতে সেই মাইনে নেওয়া আর দুধসর পোস্টাপিসের গরব নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়ানো—এ ছাড়া সমস্ত কিছু গেছে আপনার।

চোখে আঁচল দিয়ে কাঞ্চন ছুটে পালাল।

॥ পনের ॥

মামা জগন্নাথ চৌধুরির চিঠি। দুর্দিনে সেই যে কলকাতা ছেড়ে দুধসর চলে এলো, তারপরে মামা এই প্রথম লিখলেন ভাগনীকে। নিরঞ্জন যথা-নিয়মে শৈলধরের বাড়ি চিঠি বিলি করে চলে গেল।

হাতের লেখা চিনতে পেরে কাঞ্চন তাড়াতাড়ি খাম খুলে পড়ছে। আনন্দের খবর—এতবড় খবর যে বিশ্বাস হতে চায় না। আগাগোড়া বার দুয়েক পড়ে সে মুখ তুলল। চিঠি দিয়ে নিরঞ্জন ততক্ষণে মোড় অবধি চলে গেছে। আনন্দ না শুনিয়ে পারে না, জোর গলায় কাঞ্চন ডাকছে: শুনে যান নিরঞ্জন দা। কি চিঠি দিয়ে গেলেন জানেন না—দুধসর ছেড়ে চলে যাবার চিঠি।

চকিতে নিরঞ্জন ফিরে দাঁড়াল। সত্যি, না ভয় দেখাচ্ছে? পায়ে পায়ে উঠানে এলো আবার। না, এতখানি উল্লাস ভাঁওতা বলে মনে হয় না। খোলা চিঠি এগিয়ে ধরে কাঞ্চন বলে, পড়েই দেখুন না। ডাক এসেছে, চলে যাবো।

চিঠির দিকে নিরঞ্জন ফিরেও তাকায় না। হতভম্ব হয়ে আছে। হেসে

হেসে কাঞ্চন বলে, কী সুবিধে হয়েছে, কেমন শাসন করে দিয়েছি! আগের দিন হলে এমন চিঠি কক্ষনো কাছে এসে পৌঁছত না, অগ্নিদেবের জঠরে যেত। বসুন। সুখবর এনে দিলেন, মিষ্টিমুখ করাবো। ক্ষীর-কাঁঠাল খেয়ে যান।

বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারিও নিরঞ্জন। হঠাৎ সে চাঙ্গা হয়ে উঠে ধমক দিয়ে বলে, দেখ, ইস্কুল ছেলেখেলার জিনিস নয়। সেই একবার হুট করে বেরিয়েছিলে। নিয়ম মাফিক একটা দরখাস্ত চুলোয় যাক, সেক্রেটারিকে মুখের কথাটাও বলোনি। শিক্ষক বলতে তুমি একজন মাত্তোর—বালিকা-বিদ্যালয় বন্ধ দিতে হল। কিসের বন্ধ নাম খুঁজে পাইনে—বলি গ্রীষ্মের বন্ধ তো হয়ে থাকে, আমাদের এটা শীতের বন্ধ।

বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে, সে লক্ষণ নয়। হাসছে তেমনি কাঞ্চন। তর্জন ছেড়ে তখন তোয়াজ: এতগুলো মেয়ের ভবিষ্যৎ তোমার উপর। কত দায়দায়িত্ব, কত বড় ক্ষমতা—এক ইস্কুল-মেয়ে তোমার কথায় ওঠে বসে। মাইনে থেকে এ জিনিসের মূল্যবিচার হয় না।

তবু কাজ হয় না দেখে ভড়কে গেছে এবারে নিরঞ্জন। চাকরি হল নাকি কলকাতায়? সকাতরে বলে, একলাটি তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারি। এইসা দিন নহি রহেগা। মেয়ে বাড়ছে, বিদ্যালয় ধাঁ-ধাঁ করে বড় হয়ে যাবে। শিক্ষক আরও এনে ফেলেছি। হাতের কাছে মজুতই আছে—রাখালের বোন ললিতা। বলছিল সে চাকরির কথা। মাথার উপরে হেড-মিস্ট্রেস তুমি—মাইনেও বেড়ে যাবে। তাই বলি, ছটফটানি ছেড়ে দাও, বাইরের দিকে চোখ দিও না।

কাঞ্চন বোমা নিক্ষেপ করল একেবারে। বলে, কলকাতায় এ-বারে দু-দশ দিনের জন্য নয়। কাজ ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকি চলে যাচ্ছি। মামাবাড়ির ভাগনী হয়ে থাকব, আগে যেমন ছিলাম। বাবা আর আমি দুজনেই যাচ্ছি, দুধসরে আর থাকব না।

এমনি বলে নিরঞ্জনকে একেবারে পাতালে বসিয়ে কাঞ্চন ফরফর করে ঘরে ঢুকে গেল। বোধ করি ক্ষীর-কাঁঠাল আনতে। কাঁঠাল তো বিষ এখন—তবু বসতে হল, চটানো যায় না এই অবস্থায়। ক্ষীর কাঁঠাল না দিয়ে বিষ দিলেও সোনামুখ করে সে জিনিস খেয়ে যেতে হবে।

নিরঞ্জনকে বলল কাঞ্চন এই সমস্ত, কিন্তু মামার চিঠির জবাব দিল একেবারে ভিন্ন রকম:

অঘ্রান মাসে মঞ্জুলার বিয়েয় গিয়ে অনেক দিন কাটিয়ে এসেছি। সামান্য আয়োজনের ইস্কুল আমাদের—দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠছে। সমস্ত দায়িত্ব একলা আমার উপর, শিক্ষয়িত্রী বলতে একলা আমি। আমি চলে যাবার পর ইস্কুল বন্ধ দিতে হয়েছিল। আবার এখন সেই জিনিস হলে

গার্জেনরা মেয়ে পাঠানো বন্ধ করে দেবে, উঠে যাবে ইস্কুল। অঞ্চলের মানুষ টিটকারি দেবে। বিশেষ করে পাশের সুজনপুর নিয়েই ভয়টা আমাদের বেশি। হাসাহাসি করবে তারা—

এমনি অনেক কথা। মামাকে অনেক রকমে রকমে বুঝিয়েছে, দুধসর ছেড়ে কলকাতা গিয়ে ওঠা আপাতত অসম্ভব তার পক্ষে।

উত্তরে জগন্নাথ কড়া করে লিখলেন: পাড়াগাঁয়ের যখন আর থাকবিনে, সুজনপুর হাসল কি কাঁদল কি যায় আসে তোর? চুলোয় যাকগে বালিকা-বিদ্যালয়। পরের টাকার মাস্টারনি হয়ে জনম খোয়াবি, সেইভাবে কি মানুষ করেছি তোকে?

খেয়ালি মেয়ের মতিগতি কেমন দুর্বোধ্য ঠেকছে। ভাগনীর উপর নির্ভর না করে জগন্নাথ শৈলধরকেও আলাদা চিঠি দিলেন: কাঞ্চন আর তুমি অবিলম্বে চলে এসো। মহাসুখে থাকবে এখানে। হুড্ড-হুড্ড করে ঘোরা অথবা হাত পুড়িয়ে নিজে রান্না করে খাওয়া—এই তো করে গেলে চিরকাল। বুড়োবয়সে সে জিনিস আর পোষাবে না। সেইজন্যে তোমাকেও আসবার জন্য বলছি। শহরের পাকাঘরে থেকে নির্গোলে ভগবানের নাম নেবে, আর শেষদিনে মা-গঙ্গায় দেহ রাখবে এর বেশি কি চায় মানুষে?

জ্যোৎস্নাও কাঞ্চনকে ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখছেন: কষ্টের দিন শেষ হয়েছে মা। বস্তিতে পড়ে ছিলাম আমরা—তুই যেখানে আছিস, তা-ও বস্তির চেয়ে ভাল কিছু নয়। চলে আয় নিজের জায়গায়। তুই না থাকায় ঘরবাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

চিঠিপত্র নিরঞ্জন নিজ হাতে নির্বিকারভাবে দিয়ে যাচ্ছে। চিঠি ডাকে এসে পৌছালেই বিলি করে, এবং যত কিছু ডাকবাক্সে পড়ে নিয়ম মাফিক মেলব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়। কে লিখল চিঠি, কি তার মর্ম—পোস্টমাস্টারের এক্তিয়ারের বাইরে এসব। আগেকার দিন হলে হাতের উপর দিয়ে সর্বনাশা জিনিসের চলাচল কখনো হতে পারত না।

রাহুমুক্ত হয়ে জগন্নাথ চৌধুরী বেরিয়ে এসেছেন। হাইকোর্টে প্রমাণ করে দিয়েছেন, বিরাট ষড়যন্ত্র তাঁর পিছনে। সমস্ত চার্জ থেকে বেকসুর খালাস। কোম্পানির ডিরেক্টর বদল হয়েছে ইতিমধ্যে, কর্মদক্ষ প্রবীণ অফিসার জগন্নাথের সঙ্গে তাঁরা মিটমাট করে নিয়েছেন। এতদিনের প্রাপ্য মাইনে সুদসমেত পেয়ে গেছেন জগন্নাথ। কিছু ক্ষতিপূরণও। এবং চাকরিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পূর্বের মতন খাতির ইজ্জত।

লজ্জায় এ যাবৎ মুখ দেখাতেন না জগন্নাথ। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে কানাগলির বস্তিতে ঢুকে পড়েছিলেন। মামলার তদ্বির ছাড়া দ্বিতীয় কর্ম ছিল না অহোরাত্রির মধ্যে। আজকে রণজয়ী বীর। আবার সব ফিরেছে। পৈতৃক বাড়িটা ফেরত পাবার উপায় নেই, কিন্তু নতুন যে বাড়ি সংগ্রহ

চিরকাল জগন্নাথ জাঁকজমক ভালবাসেন। একটা কলঙ্কের ছায়ায় আত্মগোপন করেছিলেন, তার শোধ তুলে নিচ্ছেন ডবল জাঁকজমক দেখিয়ে। ঝি-চাকর আগের আমলে যা ছিল, এবারে বহাল হল অনেক বেশি তার চেয়ে।

আত্মীয়স্বজন আশ্রিত-প্রতিপাল্য যত ছিল, সুদিন পেয়ে সকলের খোঁজ পড়েছে। ভাগনে বেণুধর আর আসবে না, বড় কষ্ট পেয়ে গেছে সে। কাঞ্চন দুর্গম গাঁয়ের মধ্যে মুখে রক্ত তুলে খেটে মরছে। সেজন্য চিঠি: তোদের নিয়েই আমার যা-কিছু। 'তোদের' বলি কেন আর—সন্তান বলতে তুই একলা। কেন মিছে দেরি করছিস মা, চলে আয়—

কাঞ্চন গা করে না তো শৈলধরকে লিখলেন, চুকিয়ে বুকিয়ে তাড়াতাড়ি মেয়ে নিয়ে চলে এসো। বিয়ে দিতে হবে না কাঞ্চনের? কোন দুঃখে গাঁয়ে পড়ে আছ, রাজার হালে থাকবে এখানে।

শৈলধর তো এক-পায়ে খাড়া। কিন্তু জেদী মেয়ে—ক্রমাগত বাগড়া দিচ্ছে। বলে, ইস্কুল?

গা জ্বালা করে কথা শুনে। শৈলধর খিঁচিয়ে উঠলেন: কাজে ইস্তফা দিয়ে দে। তার পরে যা পারে ওরা করুকগে।

হয় না বাবা। কত কষ্ট করে ইস্কুল জমিয়েছি, চোখেই তো দেখেছ সব। ঘরের কাজকর্ম থেকে ছাড় করিয়ে ইস্কুলে মেয়ে টেনে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। তর্ক করতে করতে মুখে ফেনা উঠে গেছে। সেইসব গার্জেন কি বলবে এখন—তাঁদের কাছে জবাবটা কি দেবো?

শৈলধর বলেন, নাগালের মধ্যে পেলে তবেই তো বলাবলি। চাকরি ছেড়ে দুশমনের মুখে লাথি মেরে বেরিয়ে পড়বি। থুতু ফেলতেও আমরা আর আসব না।

কাঞ্চন চুপ করে আছে।

অধীর উৎকণ্ঠায় শৈলধর বলেন, কি বলিস রে? জগন্নাথ কত করে লিখেছে—দায়ে বেদায়ে আপন বলতে ঐ একজন। ছেলে পুলে নেই, তুই ওদের সমস্ত। মামা-মামীর মন বিগড়ে যায়,কদাপি এমন কাজ করবিনে।

ভাবল একটুখানি কাঞ্চন। ভেবেচিন্তে নরম সুরে বললে, দেখি ওঁদের বলেকয়ে—

মুখে বলা নয় একেবারে দরখাস্ত নিয়ে হাজির সেক্রেটারি নিরঞ্জনের কাছে।

নিরঞ্জন বলে, কি ওটা?

পড়ে দেখুন। চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি।

নিরঞ্জন ব্যাকুল হয়ে বলে, কী সর্বনাশ! যা বললে সত্যি সত্যি তাই?

কষ্ট হয় মানুষটার মুখের দিকে চাইলে। চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন নিঃশব্দে পায়ের নখে মেজেয় দাগ কাটছে।

এমনি করে ভাসিয়ে যাবে তো কষ্ট করে গড়ে তুললে কেন জিনিসটা? একটা কুকুর-বিড়াল পুষলেও মানুষের মায়া পড়ে যায়, ছাড়তে আগুপিছু করে—

মনের ক্ষোভে একটানা বলে যাচ্ছে, কাঞ্চন বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, আমি গেলে কী—মাস্টারনি তো হাতের কাছেই মজুত আপনার।

নিরঞ্জন খেয়াল করতে পারে না। কাঞ্চনই ধরিয়ে দিল: ললিতা, পিওনমশায়ের মেয়ে—

তোমায় বলেছিলাম বটে সেদিন। মেয়েটা কাজের জন্য বলছিল। তা সত্যিকথা বলি—তোমার ছটফটানি দেখে ভাবিনি যে তার কথা এমন নয়। কিন্তু মুশকিল আছে—সুজনপুরের মেয়ে সে, শত্রু গাঁয়ের মেয়ে। খাতির যতই থাক, ষোলআনা আস্থা তার উপর রাখা যায় না। ঘাঁতঘোঁত বুঝে নিয়ে নিজের গাঁয়েই হয়তো ইস্কুল খুলে বসল। নীলমণিও সেই কথা বলে—ললিতা আসবে তো কায়দা করে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধ দিয়ে তাকে আনতে হবে। পরিণামে সরে পড়তে না পারে।

যত কিছু করতে হয়, করে নিন। আমি তার জন্যে আটক হয়ে থাকতে পারিনে?

কিছু বিরক্ত হয়ে নিরঞ্জন, বলে, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার মানে হল বিয়ে। এ গাঁয়ের বউ করে আনতে হবে। তখন আর সুজনপুরের মেয়ে থাকবে না—তুপসরের বউ। তা 'ওঠরে ছুঁড়ি' বলে বিয়েথাওয়া হয় না, সময় দিতে হবে। চোত মাস সামনে, অকাল পড়ে যাচ্ছে। নিদেনপক্ষে বোশেখটা তো আসতে দাও—

দরখাস্ত নিরঞ্জনের হাতে গুঁজে দিয়ে কাঞ্চন ফিরল। শৈলধর মুকিয়ে আছেন, সম্ভব হলে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েন। কাঞ্চন এসে ঘাড় নাড়ে: গ্রীষ্মের বন্ধের আগে ছাড় হচ্ছে না বাবা। সে তো এসেই গেল—চুপচাপ থেকে যাই এই ক দিন। গ্রামসুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ঠিক হবে না। মামাকে লিখে দিচ্ছি সেই কথা।

অগত্যা তাই। গ্রীষ্ম অবধি অপেক্ষা না করে উপায় নেই। ছুটি পড়ে গেলে অনেকটা নির্গোলে বেরোনো যাবে। 'ফিরে আসব'—মিছামিছি বলে যেতেও অসুবিধা নেই। শুধু সতর্ক হয়ে থাকা, মেয়ের মত না ঘুরে যায় ইতিমধ্যে।

চৈত্রমাস পড়তে শৈলধর তাগিদ শুরু করলেন: মাঠের মাটি ফেটে চৌচির; ঘাটের পৈঠা দুপুরবেলা আগুন হয়ে ওঠে—পা রাখা যায় না তার উপর। এর বেশি গ্রীষ্ম কি হবে, দিয়ে দে বন্ধ এইবার। দিয়ে বাপে-মেয়েয় বেরিয়ে পড়ি।

কাঞ্চন হেসে বলে, এখনই কী বাবা, সে হবে মে মাসের মাঝামাঝি। বন্ধ দেবার মালিকও আমি নই। মাথার উপরে সেক্রেটারি আছেন নিরঞ্জনবাবু,

প্রেসিডেন্ট আছেন অজয়বাবু। কমিটি আছে। আমি তো মাইনে-খাওয়া কর্মচারী মাত্র।

তাই তো বলি মা। পনেরটি টাকার জন্য সারা দিন ভ্যাজর ভ্যাজর করে মুখে রক্ত তুলিস, আর তোর মামা ঝি-চাকর কত জনাকে এই মাইনে দিচ্ছে। বেশিও দেয়।

কাঞ্চন পুরনো কথা তোলে: কাজ তো নিতে চাইনি বাবা। ঝগড়া করে হুকুম করে তুমিই চাপিয়েছিলে ঘাড়ে আমার—

হাতী সেদিন হাওড়ে পড়েছিল যে। দিন ফিরেছে বলেই কাদা-জল ধুয়েমুছে পালাতে চাচ্ছি।

কিন্তু যত ওঠে যই হন, যেতে হবে মেয়েকে গ্রাম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে। জগন্নাথ শৈলধরকেও কলকাতার আহ্বান করেছেন যেহেতু কাঞ্চন নামে মেয়েটির পিতা তিনি। কাঞ্চনকে বাদ দিয়ে তাঁর কোন মূল্যই নেই।

বন্ধের দিন এগিয়ে আসে। এই সময় একদিন নিরঞ্জন এসে ধরে পড়ল: থেকে যাও না গো। বেশ তো আছ—কলকাতায় গিয়ে দুটো শিং গজাবে নাকি?

বলবার এই ধরন। আগের দিনে হলে রাগ করত কাঞ্চন, এখন কৌতুক লাগে। হাসিমুখে প্রশ্ন করে: বলছেন নিজের পক্ষ থেকে না গ্রামের পক্ষ থেকে?

আমার একার কথায় কতটুকু জোর। গ্রামের পক্ষ থেকে বলছি। ভেবে দেখলাম, তুমি না থাকলে বালিকা-বিদ্যালয়ের বড় মুশকিল।

কেন, ললিতা?

নিরঞ্জন বলে, বলেছি তো সেকথা। বাঁধন-কষণ দিয়ে বিধিমত ব্যবস্থা করে তবে আনতে হবে সে মেয়ে। তার কোন উপায় করা যাচ্ছে না। ছোঁড়াদের কত জনাকে বলেছি। এমন গুণের মেয়ে—কিন্তু একটা চোখ নেই, খুঁৎটা চাউর হয়ে গেছে। কাউকে রাজী করানো যাচ্ছে না। যেন বিয়ে করে ওরা মেয়েকে নয়—মেয়ের হাত-পা চোখ-কানগুলোকে। সর্বঅঙ্গ ষোলআনা মিলিয়ে নিয়ে তবে বউ ঘরে তোলে।

তারপর অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, ভেবেচিন্তে দেখছি, তোমায় ছাড়া চলবে না। আরম্ভ থেকে আছ তুমি, নিজ-হাতে জিনিসটা গড়ে তুললে, তোমার মতন প্রাণ-ঢালা কাজ কে করবে?

এমন প্রশংসার কথাতেও কেন জানি কাঞ্চন ক্ষেপে যায়। বলে, যাবোই আমি। শেষ কথা আমার, পচা-গাঁয়ে পড়ে থেকে জীবন খোয়াব না। এক মাস ইস্কুল বন্ধ থাকবে, তার মধ্যে বন্দোবস্ত করে নেবেন। না পারলে নাচার।

নিরঞ্জন নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল। ব্যথিত কণ্ঠে তারপর বলে,

সারা গাঁয়ের কথা, আমার একলার মুখে জোরদার হল না। বলিগে তাই। সর্বসাধারণের কাজ যখন, সকলে মিলে করুন।

শিউরে উঠে কাঞ্চন বলে, আটকাবেন নাকি সকলে মিলে?

কী জানি! উদাসীন কণ্ঠে নিরঞ্জন বলে, হয়েছে অবশ্য তেমনি ব্যাপার। হাইকোর্টের অমন যে বাঘা-উকিল, তাঁকেও রেহাই দেয় নি। সে তো চোখের উপর দেখেছ।

জোর করে আটক করবেন?

জিভ কেটে শশব্যস্তে নিরঞ্জন বলে, সে কী কথা! জোর নয়, গ্রামবাসী সকলের আবদার। দুধসবে মানুষ এসে পড়লে লুফে নিয়ে কাঁধে তোলে, গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াটা বড় কঠিন।

ঘাবড়ে গিয়ে কাঞ্চন শৈলধরকে বলল, শাসিয়ে গেল বাবা, সবসুদ্ধ এসে পড়বে। পুরঞ্জয় সরকারের বেলা যা হয়েছিল, তেমনি দশা ঘটবে।

লক্ষণ তাই বটে। বিজয়ে-নিরঞ্জনে এত বিরোধ—নিরঞ্জনকে জব্দ করতে কাঞ্চনের সঙ্গে মিলে বিজয় দরখাস্ত করেছিল। এখন উল্টো—ওরা দুয়ে জুড়ি হয়ে কাঞ্চনের যাওয়া পণ্ড করতে লেগেছে।

শৈলধরের উপর বিজয় হুমকি দিয়ে পড়ল: মেয়ে নিয়ে সরে পড়ছেন?

শৈলধর বলেন, নতুনটা কি হল? ছিলই তো চিরদিন মামার-বাড়ি। অবস্থার ফেরে এসে পড়েছিল—দিন ফিরেছে মামা আবার ডাকছে।

বিয়েথাওয়ার কথাবার্তা চলছিল যে—

শৈলধর একগাল হেসে বলেন, আমার উপরে আর কিছু রইল না বাবা। মামার কাঁধে সব দায়িত্ব। মামা-মামী পছন্দ করে যেখানে হোক দিয়ে দেবে। অবস্থার বিপাকে মাঝে একটু গোলমাল ঘটেছিল, নয়তো বরাবরই এইরকম কথা।

বিজয় মারমুখি হয়ে ওঠে: তা হলে আমায় নিয়ে কি জন্যে বানর-নাচ নাচালেন?

বলবার কথা শৈলধর হঠাৎ ভেবে পান না। বলেন, বানর বলে নিজেকে ছোট করছ কেন? কায়দা পেয়েছিলাম, হয়েই তো যেত—তোমার মা বাগড়া দিয়ে দেরি করিয়ে দিলেন। তা মনে রইল তোমার কথা—পাত্র ঠিক করার সময় তোমার নাম নিশ্চয় উঠবে। আমি সেটা করব।

স্তোক দিয়ে অনেক করে বিজয়কে খানিক ঠাণ্ডা করা গেল। কিন্তু শেষ নয়। গ্রামবাসী অনেকে আসছে খবরের সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে। বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অজয় সরকার একদিন এসে উপস্থিত প্রবীণ মুরুব্বি কয়েকজন সঙ্গে নিয়ে। অভিভাবকের মধ্যেও পড়েন এঁরা।

অজয় বলে, ইস্কুলের সঙ্গে বাবার নাম যুক্ত রয়েছে। ইস্তফা দিয়ে যাওয়া মানে সবংশে আমাদের ডুবিয়ে যাওয়া। গাঁ-সুদ্ধ অপদস্থ করা। মাথাপাগলা

মানুষ নিরঞ্জন—একটা না একটা খেয়াল নিয়ে মেতে থাকে। ইস্কুলের খেয়াল কাঞ্চনকে না পেলে দুদিনেই জুড়িয়ে যেত। ছেড়েছুড়ে শহরেই যদি উঠবে, এতদূর তবে এগোনো কেন? কোথায় গেল আপনার মেয়ে—তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

শৈলধর বলেন, চাকরি নিয়ে আমার মেয়ে এমন দাসখত লেখেনি যে সারাজন্ম করে যেতে হবে, কোনো দিন ছাড়ান পাবে না।

আরও ক্ষেপে গিয়ে অভয় বলে, চাকরিটা কোথায় শুনি। চাকরি মানে দিনরাত পাপক্ষয়—সবলোকে যা করে থাকে। দশটায় গিয়ে পড়িয়ে শুনিয়ে চারটেয় বাড়ি এসে উঠল—ব্যস, ইতি। তেমন হলে বলবার কিছু ছিল না। এই এঁরা সব এসেছেন—জপিয়েজাপিয়ে এঁদের ঘরের মেয়েগুলো ইস্কুলে নিয়ে তুলেছে। কাজটা আপনার বিদ্যে দিগ্‌গজ মেয়ে ছাড়া অন্য কারো সাধ্য হত না। বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে গড়গড় করে ইংরাজি পড়ে যায়—ইস্কুল উঠে গেলে কি করবে তারা এখন? শিকেয় তোলা নিয়ে গাল বাটতে বসে রবে? আপনার সঙ্গে হবে না—কাঞ্চন কোথায়, ডেকে দিন একবার।

কাঞ্চন বাড়ি ছিল না। সবরক্ষে। থাকলে আরও খানিক বচসা হত। এই কাণ্ড চলছে নিত্যদিন। গ্রামের কারো সঙ্গে দেখা হল এই জিজ্ঞাসা। যাওয়ার কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। বাইরেও ছড়িয়েছে বেশ। মজুমদারের লোক হলে হাসি হাসি মুখে সান্ত্বনা দেয়: বটেই তো। এমন সুযোগ সুবিধা থাকতে পাঁচপোতা ডায়মণ্ড হয়ে কে পড়ে থাকতে যাবে!

এরই মধ্যে আবার একদিন নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা। বাড়ি পর্যন্ত আসেনি নিরঞ্জন, দেখাটা পথের উপর।

কি হলে থাকবে তুমি কাঞ্চন, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি—জবাব দাও। কোন রকম উপায় আছে কিনা।

কাঞ্চন বলে, জবরদস্তিতে হবে না। উকিল মশায়ের বেলা যা হয়েছিল সে কৌশল এখানে খাটবে না। বুঝেছেন সেটা? শক্ত মেয়ে আমি।

কৌশল খাটিয়ে লাভও নেই। আমি ভেবে দেখেছি। থাকতে হলে মনের খুশিতে থাকবে, স্ফূর্তিতে ইস্কুল চালাবে। এদ্দিন যেমন চালিয়ে এসেছ। দেখতে দেখতে তাই এমন জমে উঠেছে। কিসে সেটা সম্ভব হতে পারে, খোলাখুলি বলে দাও।

হাসিমুখে কাঞ্চন বলে, যা চাইব দেবেন তাই?

বলো শুনি। সাধ্যপক্ষে নিশ্চয় দেবো।

মোটা মাইনে, ধরুন আড়াই-শ টাকা—

মাসে মাসে, না বছরে? হেসে উঠল নিরঞ্জন: ইস্কুল তোমারই। সেক্রেটারি-প্রেসিডেন্ট আমরা নৈবেদ্যের উপরের কাঁচকলা বই তো নই

বলো তো ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার ইস্কুল যদ্দুর দিতে পারে, নিয়ে নাও তুমি—'না' বলতে যাবো না। ঠাট্টা নয়. বলো কি করতে পারি? ছটফটানি ছেড়ে চিরকাল যাতে থেকে যাও।

কাঞ্চন খেলার ছলে যদি এইবার বলে বসে, বর হয়ে বসো নিরঞ্জনদা, তোমায় বিয়ে করে কায়েমি হয়ে থেকে যাই—কোঁচানো ধুতি পরে মাথায় টোপর চাপিয়ে তক্ষুনি নিরঞ্জন বরাসনে বসে পড়বে, সন্দেহমাত্র নেই। নিরঞ্জন বলে কি—গাঁয়ের ছোঁড়াদের ভিতর যার দিকে চেয়ে ইশারা করবে, গুটগুট করে সেই লোক এসে বসবে। তার মধ্যে বিজয় সরকার তো আছেই। বড্ড পশার ইদানীং কাঞ্চনের—কলকাতায় যাওয়ার নামে পশার বেড়ে আকাশচুম্বী হয়েছে। ইচ্ছে হলে অক্লেশে এখানে স্বয়ম্বর-সভা ডাকতে পারে। ডাকবে নাকি তাই একদিন?

হপ্তাখানেক গেল, বন্ধের দিন আরও এগিয়েছে। হঠাৎ কাঞ্চন পোস্টাপিসে এসে হাজির। সুজনপুর সাব-অফিসে ডাক রওনা হয়ে যাচ্ছে—নিরঞ্জন ভারি ব্যস্ত এখন।

দুমদুম করে ধরা কাঁপিয়ে কাঞ্চন সোজা ঘরে ঢুকে পড়ল। নো অ্যাডমিশন, ভিতরে আসিও না—চৌকাঠের মাথায় সরকারি নোটিশ লটকানো। কিন্তু কাঞ্চনকে আটকাবে কোনো নোটিশের বাপের সাধ্য নেই।

একখানা আঁটা-খাম কাঞ্চন নিরঞ্জনের হাতে দিল। সিল মেরে মেরে যাবতীয় চিঠিপত্র মেলব্যাগে ঢোকাচ্ছে, এ চিঠিতেও সিল মারতে গেছে—

মুখ তুলে নিরঞ্জন বলে, টিকিট দিয়েছ কই?

ভারি বেকুব হয়েছে যেন কাঞ্চন। তেমনি ধরনের মুখ করে বলে, তাই বটে! ভুল হয়ে গেছে, টিকিট পাই কোথা এখন? আপনার আবার নগদ কারবার, ধারবাকি বন্ধ করে দিয়েছেন। রইল চিঠি, বাড়ি থেকে টিকিটের দাম নিয়ে আসছি।

দাওয়ায় পড়ে হঠাৎ সে ফিরে দাঁড়াল। তীব্র কণ্ঠে বলে, সেদিন বলেছিলাম, মানুষ নন আর আপনি, আমাদের এক দরখাস্তের ঠেলায় পোস্টমাস্টার। ভুল হয়েছিল বলতে, বেশি মান দিয়েছিলাম। পোস্টমাস্টারও নন, শুধু এক ডাকবাক্স। ডাকবাক্সে না ফেলে চিঠি আপনার হাতে দিয়েছি—একই ব্যাপার। ডাকবাক্সের ভিতরেসব চিঠি একাকার, আপনার হাতেও তাই।

ফরফর করে চলল। টিকিটের পয়সা না আরো-কিছু, আড়াল হবার ছুতো। নীলমণি ডাক নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, কাজকর্ম মিটেছে। পোস্টাপিস একেবারে নির্জন, সেই সময় কাঞ্চন ফিরে এলো।

মুখ টিপে হেসে বলে, বিনা-টিকিটেও চিঠি যায় নিরঞ্জনদা। বেয়ারিং হয়ে ডবল মাশুল আদায় করে গ্রাহকের কাছে। বেয়ারিং যাবে আমার চিঠি, গ্রাহক মাশুল দিয়ে নেবে। একি, একি—খাম ছিঁড়ে পড়তে লেগেছেন যে! টের পেলেন কি করে যে গ্রাহক আপনিই! ডাকবাক্স ঠিকানা পড়ে

না—তবে আর ডাকবাক্স কেমন করে আপনি! তার কিছু উপরে—

কি হলে কাঞ্চন চিরকাল থেকে যাবে, সেই প্রশ্নের জবাব। সে দিন যেকথা নিরঞ্জনকে মুখে বলতে পারেনি, সোজাসুজি লিখে জানিয়েছে তাই। মেয়ে হয়ে পুরুষকে লিখেছে। গভীর মনোযোগে নিরঞ্জন চিঠির কথাগুলো পড়ছে—টিবটিব করে তখন কাঞ্চনের বুকের ভিতরটা। চুপ করে থাকলে বুকের শব্দ বুঝি বাইরের লোকের কানে যাবে—অসংলগ্ন অর্থহীন নানান রকম বকে যাচ্ছে তাই।

পড়া শেষ করে নিরঞ্জন চোখ তুলল কাঞ্চনের দিকে। অস্থির ভাবে কাঞ্চন পায়চারি করছে, আর বকছে অবিরাম। কিন্তু চোখ থাকলে নিরঞ্জন তুমি দেখতে পেতে এক নিঃশব্দ কাতর প্রার্থিনা অঞ্জলি জুড়ে সামনে দাঁড়িয়ে। বেণুদের আদরের ছোট বোন, তোমার শৈল-জেঠার সবশেষ মেয়ে, টমাস-ব্রাইনের ম্যানেজার জগন্নাথ চৌধুরীর ভাগনী। মেয়েটার ভাল ঘর বরের জন্য শৈলদা তোমার কাছেই কতবার বলেছেন, বেণু সেই কলকাতার মেসে কত উদ্দে... ...শ করেছিল -

নিরঞ্জন বলে, উপায় নেই যে কাঞ্চন। ললিতার সঙ্গে বিয়ে আমার—সুজনপুরের মেয়ে ললিতা, ভুবসরের বউ হয়ে আসছে। পাকা-কথা দিয়েছি, ও-পক্ষও রাজী। ...কটা চোখ কানা, নিজেই তা জাহির করে দিল। অঞ্চল সুদ্ধ জেনে গেছে। কতজনের খোশামুদি করলাম, ও-মেয়ে কেউ বিয়ে করতে পারে না।

নিশ্বাস ফেলে বলে, অথচ দুটো মাস আগেও এই ললিতার জন্য দীনেশ পাগল। অসুখে চোখ গেল, আর সকল সম্বন্ধ ধুয়ে মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তা ভেবে দেখতে গেলে ভালই হয়েছে। বাপ-মায়ের অমতে জেদ করে দীনেশ বিয়ে করছিল—বউকে তারা কক্ষনো সুনজরে দেখতেন না। এর উপরে জানতে পেলেন, বউয়ের একটা চোখ নেই—তখন আর কোনো রকমেই রেহাই ছিল না, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার্ করে বাড়ি থেকে তাড়াতেন।

এমনি বলে যাচ্ছিল একনাগাড়। কাঞ্চন খিল খিল করে হেসে উঠল। চমক খেয়ে নিরঞ্জন চুপ করে যায়।

কাঞ্চন বলে, সমস্ত আমার জানা, আপনার একটা খবরও নতুন নয় নিরঞ্জনদা। জানি বলেই তো এমন চিঠি লিখেছি। নইলে যত বড় বেহায়াই হক মেয়েছেলে হয়ে কেউ পারে না এমন! চিঠির ধাপ্পায় আপনার মুখ দিয়েই আগাগোড়া শুনে নিলাম।

নিরঞ্জন সবিস্ময়ে বলে, কথাবার্তা কালই মাত্র পাকা হয়ে গেল। বাইরের কেউ জানে না—তোমার কানে গেল কি করে?

গণে বলতে পারি আমি, মন পড়তে জানি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে এত সব লাগে না। সুজনপুরের সঙ্গে আড়াআড়ি—অথচ দিন নেই রাত নেই সেখানে আসা-যাওয়া চলছে, পিওনমশায়ের বাড়ি আস্তানা—মতলব এর পরে

যে না সে-ই ধরতে পারে।

একটু থেমে আবার বলে দিব্যি হয়েছে, বড্ড খুশী আমি। কানা-খোঁড়া না হলে কে-ই বা মেয়ে দেবে। দুটো চোখ যদ্দিন বজায় ছিল, তখন আপনার কথা ওঠেনি।

তিক্ত কথার নিতান্তই বাজে খরচ। নিরঞ্জনের তিলমাত্র ভাবান্তর নেই। মাথা নেড়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, তেমন হলে আমিও কি ঘাড় পেতে দায় নিতে যেতাম? তুমি কত সুন্দর, অসুখটা হবার আগেও ললিতা তোমার পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারত না—সেই তোমারই সঙ্গে সম্বন্ধ উঠেছিল। বেণুধর ধরাপাকড়া করেছিল, আমি কবুল-জবাব দিয়ে দিলাম। এখন ভাবছি, রাজী হলেই ভাল ছিল তখন। যত কিছু হাঙ্গামা তোমার জন্যেই তো—

আমি কি করলাম?

পালাই-পালাই রব তুলেছ। এত কষ্টের ইস্কুল উঠে যাবার দাখিল। তবু একটা হাতের-পাঁচ রইল। ঘরের বউ হয়ে ললিতা ভার সামলাতে পারবে না। তোমার অবর্তমানে যা-হোক করে চালিয়ে যাবে। একটা চোখ ভাল আছে, একচোখ দিয়ে পড়ানোর অসুবিধা নেই। বললা, এছাড়া আর কি করা যেত?

কাঞ্চন সায় দিয়ে বলে, ভালই করেছেন।

নিরঞ্জন বলে যাচ্ছে, উল্টো দিকটাও ভেবেছি। হয়তো, বিয়ে করলাম না ললিতাকে। কানা মেয়ের বিয়েই হল না, সারা জীবন বাপের বাড়ি থেকে রইল। [illegible] বাড়ি বসে [illegible] পড়াশুনো শুরু করেছে— [illegible] পাশও করে যাবে ঠিক। পাশ-করা পুরোদস্তুর দিদিমণি মেয়ে গাঁয়ের উপর—তখন কি [illegible] সুযোগ ছাড়বে ইস্কুল না বানিয়ে? সেই ভয়ে আগেভাগে তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনছি।

কাঞ্চন নিশ্বাস ফেলে বলল, নির্ভাবনা হলাম, দায়িত্ব চুকল। চলে যেতে আর কোন বাধা নেই।

নিরঞ্জন গভীর দৃষ্টিতে কাঞ্চনের দিকে তাকাল। মৃদু হাসি ফুটল তার মুখে। বলে, তোমার ভয় দেখানো কথা। যাবে না তুমি কাঞ্চন, যেতে পারবে না—সে আমি জানি। হাতে-গড়া এমন জিনিস কেউ বিসর্জন দিয়ে যেতে পারে? এ যে সন্তানের মতো। তুমি রয়েছ, ললিতাকেও নিয়ে আসছি। ইস্কুল বড় হয়ে যাচ্ছে—একলা একজনে কত আর সামলাবে? তুমি হেডমিস্ট্রেস আছ, তোমার নিচে এসিস্টান্ট-মিস্ট্রেস ললিতা—

বলতে বলতে নিরঞ্জন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে: কলকাতার মতলব ছেড়ে দাও। বেণুর বড় আদরের বোন তুমি, সেই জোর নিয়ে বলছি। গ্রামের মধ্যেই সুপাত্র—বিজয়রা বড়লোক, অগাধ বিষয়সম্পত্তি। শৈল-জেঠার ইচ্ছে আছে। আর বেণুও মত দিয়েছিল, তুমি একদিন বলছিলে। খাসা থাকবে কাঞ্চন, গ্রামের মেয়ে আছ, তার উপরে গ্রামের বউ হয়ে চিরকাল

ভুধসরে থেকে যাবে। তোমার শ্বশুরের বালিকা-বিদ্যালয় দিনকে-দিন ঠেলে উঠে হাই-ইস্কুলে দাঁড়াবে। তল্লাটের মধ্যে প্রথম হাই-ইস্কুল মেয়েদের জন্য। ভুধসরের জয়-জয়কার।

কিন্তু বলছে কাকে? হিত পরামর্শ কাঞ্চনের কানে ঢোকে না। দাওয়া থেকে নেমে উঠান পার হয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। এ মেয়ের মনের তল পাওয়া দুষ্কর।

পুরঞ্জয় বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে যাচ্ছে—ঠিক সেই দিন, কোথাও কিছু নেই—কলকাতা থেকে স্বয়ং জগন্নাথ চৌধুরী এসে হাজির। শুকনোর সময় জীপগাড়িটা এখন কষ্টেসৃষ্টে চলে। সদরের এক কন্ট্রাক্টরের কোনো কোনো সূত্রে ব্রাইটন কোম্পানির সঙ্গে বাঁধা-বাঁধকতা—তাদের একটা জীপ চেয়ে এনেছেন, এবং তাদেরই দুটো নেপালি গার্ড সঙ্গে। কখনো কাঁচা রাস্তায় কখনো বা মাঠের উপর দিয়ে গর্জন তুলে শৈলধরের বাড়ির সামনে টলতে টলতে গাড়ি এসে থামল।

গাড়ির আওয়াজে ইতর-ভদ্র অনেকে ভিড় করেছে। নেমে পড়ে জগন্নাথের প্রথম কথা: নিজে চলে এলাম। কাণ্ড আঁকাতে আসে দেখি।

গ্রামের মতিগতির সমস্ত খবর জানেন তিনি। শৈলধরই যে খবরদাতা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ত্রাসমুখে হন্তদন্ত হয়ে নিরঞ্জন এসে গেল। একদল মেয়ে সঙ্গে। কাঞ্চনকে বলে, চললে সত্যিই? ভুধসরের নাম নিয়ে কিছু আর বলছিনে—কিন্তু তোমার ছাত্রীরা এসেছে, এদের কাছে জবাব দিয়ে যাও।

কাঞ্চন বলে, আপনিই জুটিয়ে আনলেন এদের।

ঠিক উল্টো জিজ্ঞাসা করে দেখ। মুরুব্বি মাকেই টানতে টানতে নিয়ে এসেছ। পরে খারাপ করল। এমনি যদিও বা কিছু আশা ছিল, আমায় দেখে বিগড়ে গেলে। আমার উপরে রাগ তোমার।

কণ্ঠে বেদনার আভাস। আজ এই সর্বপ্রথম কাঞ্চন অনুভব করল, নিরঞ্জনের মানুষটার ভিতরেও মন বলে কিছু বস্তু আছে। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে নিরঞ্জন বলে, আমার উপর তোমার ভীষণ রাগ। গোড়া থেকেই। প্রথম আসার পর এই উঠোনেই একদিন কী ঝগড়াটা করলে। তোমার হয়তো মনে নেই কাঞ্চন, আমি ভুলতে পারিনি।

শৈলধর কোনদিকে ছিলেন, গজর গজর করে এসে পড়লেন। জগন্নাথকে সাক্ষি মানেন: শয়তানিটা দেখো ভায়া। বন্দুকের মুখে নিজেদের দাঁড়ানোর মুরোদ নেই, স্কুলের প্রমীলা-সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছে। একে শিশু তায় স্ত্রীজাত—সাত খুন মাপ এদের।

কাঞ্চন কঠিন হয়ে প্রতিবাদ করে: না বাবা, আমার মেয়েদের নিয়ে একটা কথাও তুমি বলতে পারবে না। নাড়িনক্ষত্র জানি ওদের—কেউ

পেলিয়ে দেয়নি। আমায় ভালবাসে মনের টানে চলে এসেছে। চোখের দেখা দেখে যাবে, তাতেও কেন তোমাদের আপত্তি?

কলকাতা থেকে জগন্নাথ কিছু কেক-প্যাট্রিস এনেছেন, ভাগ করে কাঞ্চন মেয়েদের হাতে হাতে দিল। কাজল মেয়েটা নেবে না কিছুতে। অভিমান-রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, খাবো না তো— কক্ষনো নয়। চলে যাচ্ছ দিদিমণি আমাদের ছেড়ে—আর নাকি আসবে না?

কথা কেড়ে নিয়ে হেসে হেসে কাঞ্চন প্রবোধ দেয়: কী বোকা মেয়ে রে! মিছিমিছি কে তোদের ভয় দেখিয়েছে। আসব রে, আসব। তোদের ছেড়ে থাকা যায় না কি?

কাজল বলে, খাতায় লিখে দাও তুমি আসবে। কোনখানে থাকবে, ঠিকানাও দাও—আমরা চিঠি লিখব।

মেয়েটার মুখে মৃদু টোকা দিয়ে কলকণ্ঠে কাঞ্চন বলে ওঠে, দেখ মামা, কী সাংঘাতিক। দলিল বানিয়ে আটেঘাটে বেঁধে নিচ্ছে। নয়তো ছেড়ে দেবে না।

অবশেষে জীপে উঠে পড়ল কাঞ্চন। সামনের সিটে, জগন্নাথের পাশটিতে।

তাকিয়ে দেখে জগন্নাথ বলেন, এই সাজে কেন মা?

কাঞ্চন বলে, কলকাতা থেকে অনেক সেজে এসেছিলাম মামা। সে কি আর এদ্দিন থাকে, ছিঁড়েছুটে করে শেষ হয়ে গেছে। এখন এই।

জগন্নাথ বলেন, ছোট্ট একটা জিনিস আমিও তো হাতে করে এসেছি! কাপড়টা বদলে অন্তত একটা রংচঙে ভাল কাপড় পরে আয়।

কাঞ্চন ঘাড় নড়ে: কী যে বলো মামা। আমার মেয়েরা সব রয়েছে—লজ্জা করে ওদের সামনে রঙিন কাপড় পরতে।

নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ কণ্ঠে আবার বলে শখের কাপড় পরবার বয়স ওদেরই—পাবে কোথা? সাদামাটা একখানা আস্ত কাপড়ই বা ক'জনের আছে। যা পরে আছি, মন্দটা কি দেখছ মামা? সবাই এখানে এমনি জিনিস পরে।

জগন্নাথ কিছু বিরক্ত হয়ে বলেন, গাঁয়ে পড়ে পড়ে মাস্টারি করে আদ্যিকালের বুড়ি হয়ে গেছিস তুই। রুচি জাহান্নমে গেছে। কলকাতায় কত আনন্দ করে বেড়াতিস—চল্, আবার দেখা যাবে সেখানে।

গাড়ি চলছে। মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে—আরও একজন, নিরঞ্জন তাদের পাশে। একদৃষ্টে কাঞ্চন সেদিকে তাকিয়ে ছিল, জগন্নাথের কথায় ঘাড় ফেরাল। বলে, আনন্দ এখানে নেই? তোমরা ভাবো, আনন্দ কেবল টাকায় কাপড়-চোপড়ে ক্লাবে হোটেলে। চেয়ে দেখ, কত আনন্দ ঐ পিছনে ফেলে চললাম।

॥ ষোল ॥

কলকাতায় জগন্নাথ চৌধুরীর নতুন বাসায়। যেহেতু ভাড়া বাড়ি, বাসাই বলতে হবে আপাতত। যতদিন না জগন্নাথ আবার নিজস্ব বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছেন। বেশ কিছু দেরি হবে—অর্থ পেলেও এমন অভিজাত-পাড়ার মধ্যে এত সুন্দর বাড়ি হবে বলে ভরসা নেই।

গাড়ি থেকে নেমে কাঞ্চন ধুলো-পায়েই একবার উপর-নিচে চক্কোর দিয়ে এলো। নতুন সব ঝি চাকর—পুরনো মধ্যে একটি দুটি। জ্যোৎস্না অবাক হয়ে থাকেন: এ কী রে! আমাদের কাঞ্চন বলে চেনার উপায় নেই।

কাঞ্চন বলে, ছিলাম না যে তোমাদের এদ্দিন।

জগন্নাথের কানে গেছে। তিনি বললেন, রোমে গিয়ে রোমান হতে হয়—ওর বা দোষ। আবার এই হাজির করে দিলাম, মেয়ে তোমার অভিরুচি মতে গড়ে পিটে নাও।

মামী কাঞ্চনের আপাদমস্তক বার বার তাকিয়ে দেখে বলেন, মাগো! খালি পায়ে হাঁটু অবধি ধুলো—এক জোড়া চটি পর্যন্ত জোটেনি।

জগন্নাথ বললেন, তা বললে হবে কেন? পনেরটি টাকার উপর নির্ভর—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। বেণু কিছু কিছু পাঠাত, সে পর্ব চুকে-বুকে গেছে। বয়স হয়ে ঘোষজা মশায়ও চরে ফিরে বেড়াতে পারেন না। ক্ষেতের ধান চাটি পাওয়া যায়, তাই উপোস করতে হয়নি। এর উপরে জুতো আসে কেমন করে?

কাঞ্চন হেসে বলে, না হয় থাক। কবে কিনলাম এক জোড়া জুতো। গাঁয়ের মধ্যে পরি কোথা বলো দিকি। সেই তো কলকাতা থেকে পরে গিয়েছিলাম, হাঁ-করে সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইত। দৃষ্টির খোঁচা খেয়ে খেয়ে শেষটা একদিন রাগ করে জুতো পানাপুকুরে ছুঁড়ে দিলাম।

জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে বলে, পায়ে জুতো না দেখে অবাক হচ্ছ মামীমা। হবারই কথা। শহরের মেয়ে তুমি, থেকেছও চিরকাল শহরে—খালি পায়ের মানুষ তোমরা ভাবতে পারো না। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে মেয়েলোকের তো কথাই ওঠে না—পুরুষের পায়ে, এমন কি বাচ্চা ছেলেপুলের পায়ে পর্যন্ত জুতো জোটে না। মামা ঠিক কথা বলছেন—আমাদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলাতো না। কিন্তু টাকাপয়সা থাকলে সকলের আগে আমি বাচ্চাদের জন্য জুতো কিনে দিতাম।

তখন এই পর্যন্ত।

বিকালবেলা জ্যোৎস্না এসে ডাকলেন: আয়রে কাঞ্চন, বেড়িয়ে আসি।

কোথায় মামীমা?

মার্কেটে। ভস্মমাখা সন্ন্যাসিনী হয়ে ঘুরবি, সে তো আমরা চোখে দেখতে পারিনে। তোর মামা তাই গাড়ি নিয়ে অফিস থেকে সকাল

সকাল ফিরলেন।

বড্ড যে তাড়া। আজ এসেছি, একেবারে আজকের দিনের মধ্যেই? বলেই কাঞ্চন সঙ্গে সঙ্গে কথা ফিরিয়ে নেয়: বুঝেছি মামীমা, মানের হানি হচ্ছে তোমাদের। তা চলো—

অতএব মাসীর সঙ্গে মার্কেটে ঘুরে ঘুরে শুধুমাত্র পায়ের জুতো নয়, একগাদা পোশাক-আশাক নিয়ে এলো কাঞ্চন। আর রকমারি প্রসাধনের জিনিস। শহরের মেয়েরা হালফিল যেমন যেমন সাজে—যা এখনকার সর্বাধুনিক ফ্যাসান, যেমন ভাবে বেড়ালে ব্রাইটন কোম্পানির জেনারেল-ম্যানেজারের ভাগনীর পক্ষে বেমানান হবে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কেনা হয়েছে

বাড়ি ফিরে প্যাকেটগুলো নিয়ে কাঞ্চন ঘরের দরজা দিল। সাজ করছে। বেরল ঘন্টাখানেক পরে।

জ্যোৎস্না অবাক: এ কি, পরিসনি যে কিছু? ঘরে বসে এতক্ষণ ধরে কি করলি তবে?

পরেছিলাম বই কি। পরে আয়নায় দেখলাম। ভুলে যাইনি, ঠিক আছে মোটামুটি। মুশকিল হল মামীমা এত সমস্ত গায়ে চড়িয়ে গরম লাগে বড্ড, গায়ে ফোটে। খুলে রেখে এলাম।

জ্যোৎস্না তো হেসে খুন। পুরনো ঝি সুমতিকে ডেকে বললেন, শোন্‌রে মতি, মেয়ের কথা। দু বছর জঙ্গলে থেকে জংলি হয়ে এসেছে। কাপড়-চোপড় নাকি গায়ে ফোটে—

অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ বেশ চোখ চেয়ে দেখতে পারিনে—বদলে আয়। বদলে আয় বলছি। না হয় চল্‌, আমি পরিয়ে দিই গে।

কাঞ্চন সকাতরে বলে, রাত্রে নয় মামীমা, এটুকু মাপ করো। যা পরে আছি, তাই থাকুক। অনভ্যাসের জিনিস পরে ঘুম হবে না আমার। বরঞ্চ ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি, আধ-অন্ধকারে চোখে তেমন লাগবে না। রাত পোহালে দিনমান হোক—যেমন বলবে তখন তেমনি সেজে বেড়াব। তোমাদের মুখ হেট হবে তেমন কাজ কক্ষনো আমি করব না।

তা কথাটা ঠিক রাখল বটে। বড়ঘরের মেয়ের উপযুক্ত সাজসজ্জা করল পরের দিন। মামীর কাছে গিয়ে কাঞ্চন টিপিটিপি হাসে: চেয়ে দেখ।

জ্যোৎস্নার চোখে পলক নেই: কী রূপ খুলেছে মরি মরি। ওরে হত-চ্ছাড়ী, কাল আয়নায় দেখেছিলি, এখন একটিবার দেখে আয়। এই হয়েছিস—আর কী চেহারায় উঠেছিলি কাল বাড়িতে।

কাঞ্চন ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, বড্ড গালি হয়ে যাচ্ছে মামীমা—

গালি—তোকে?

দু-হাতে জ্যোৎস্না তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। ঠিক এমনি করেই আর একদিন ফুটফুটে শিশু-কাঞ্চনকে নিয়েছিলেন—গঙ্গাস্নান

কাঞ্চন বলে, সে তবু অনেক ভাল মঞ্জুলা। এরা কি—সব-কিছু এদের, শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে। নিজের সুখশান্তি, নিজের ভোগ ঐশ্বর্য। অতিবড় মহৎ যিনি, নিজের উপরে তিনি বড় জোর নিজ সংসারটি নিয়ে আছেন। বহুজনকে আপন মেনে বৃহৎ পরিধির জীবন থাকে, বিপুল তার পরিতৃপ্তি—এ সব চেতনা শিক্ষিত মহল থেকে হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল। কোনোখানে তার প্রকাশ দেখিনে—

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলছে, বোধ করি স্বাধীনতা'ই বিষফল! লড়াইয়ের ব্যাপার নেই, তাই ক্ষুদিরাম গোপীনাথের মতো প্রীতিলতা উজ্জ্বলার মতো তরুণ ছেলেমেয়ে এগিয়ে আসে না। সুযোগ সমৃদ্ধির নানান দরজা খোলা—প্রতিভাধারীদের কতক গেল রাজসরকারে, কতক কালো বাজারে, কতক বা—

আরো কি বলত কাঞ্চন—শেষ করতে না দিয়ে মঞ্জুলা কথার মাঝে ফোড়ন দেয়: লড়াই নেই, কে বলে? ভারি ভারি লড়নেওয়ালা—[illegible] রাগী-তরুণ—আরো কত নামের দল। কলম কালি আর কণ্ঠধ্বনির লড়াই।

হাসতে হাসতে বলে, গাঁয়ে পড়ে ছিলি, হালের খবর কতটুকু বা রাখিস—

মুখে তম্বিতম্বি এবং হা-হুতাশ যতই করুক, মামাবাড়ির সেই আগেকার কাঞ্চনই সে অপরাহত।

জগন্নাথ বলেন, গোলমালের মধ্যে পড়াটা তোর বন্ধ হয়ে গেল। সে চলবে না মা, নতুন সেসনে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়—

কাঞ্চন বলে, কদ্দিন হয়ে গেল, সে কি আর কিছু মনে আছে মামা। যা ভিড় আজকাল কলেজে, ভর্তিও তো হতে পারব না।

সে ভার আমার উপরে। তোর কিছু করতে হবে না, তুই চুপ করে বসে থাক। পড়াশুনো আবার চলবে, এইটে দেখে রেখে দে।

হেসে জগন্নাথ বলেন, মাঝের এই ক'টা বছর হলে কোন-কিছুই হত না। বন্ধুরা চিনতেই পারত না আমায়। চাকরিতে ফিরেছি, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফিরেছে। যার সঙ্গে যে থাকত, আবার জুটজাট হয়েছে সমস্ত। ভর্তি তুই এক কথায় হয়ে যাবি।

ফাঁকে ফাঁকে কাঞ্চন উৎসবের কথা শোনায়, বালিকা-বিদ্যালয়ের কথা: গ্রীষ্মের বন্ধ কমিয়ে দিয়ে এসেছি মামা। শীতের বন্ধ করা হয়েছিল কিনা।

হেসে হেসে বলে, শীতের বন্ধের কথা শুনেছ মামা কস্মিনকালে? আমাদের তাই দিতে হল। আমারই দোষে। সেই যে মঞ্জুলার বিয়েয় এসেছিলাম, বস্তিতে গেলাম তোমাদের কাছে—তার খেসারত। গ্রীষ্মের বন্ধ ছাঁটতে হয়েছে—মোটে আর পঁচিশটে দিন।

জগন্নাথ বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, পঁচিশ দিন থাকুক আর পাঁচশ দিন থাকুক, তোর সেজন্য কি? আর যখন যাচ্ছিসনে—

সে হয় না মামা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তো আসিনি, ছুটিতে এসেছি।

না গেলে তারাই ছাড়িয়ে দেবে।

তবে আর শুনছ কি এতদিন ধরে। দায়িত্ব সমস্ত আমার উপরে। আমি হেডমিস্ট্রেস—আরো যত মিস্ট্রেস থাকা উচিত, সমস্ত আমি একাধারে। কুসুম বলে ঝি আছে একটা—কোন দিন না এলে ঝি-ও আমি সেদিনের জন্য। একবার যেতেই হবে মামা। গিয়ে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে মাইনের টাকা হিসেব করে নিয়ে আসব।

জগন্নাথ ব্যঙ্গস্বরে বললেন, সে তো অঢেল টাকা—

তা কম হল কিসে? পনের টাকায় ঢুকেছিলাম, কাজ দেখে কমিটি বিশ টাকায় তুলেছে। আরও উঠবে, আশা দিয়েছে। ইস্কুল খোলার দিন কাজে যোগ দিলে চব্বিশ দিনের মাইনে পাওনা হবে আমার। দেখ তাহলে হিসাব করে—

নিতান্ত নিরীহভাবে কাঞ্চন বলে যায়, জগন্নাথ চৌধুরী রেগে টং। বললেন, হিসাবটা তুই করগে যা। আমার কানে তুলবি নে, কান জ্বালা করে।

মামা কলেজে ভর্তির ব্যবস্থায় আছেন আর মামী আছেন ওদিকে বিয়ে গাঁথাবার তালে। ঘটকের চলাচল ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, কাঞ্চন টের পাচ্ছে সমস্ত। অর্থাৎ দু-বছর আগে যেখানটা ছেদ পড়েছিল ঠিক ঠিক সেইখান থেকে আরম্ভ। এই দুটো বছর মামা মামী মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান কাঞ্চনের জীবন থেকে। টাকার ধারাবাহিকতা ভাঙতে দেননি মামা—ব্রাইটন কোম্পানি গোলমালের এই দুটো বছর চাকরির মধ্যেই ধরে দিয়েছে। অন্যসব ক্ষেত্রেও ঠিক সেই জিনিস।

কানে এলো, সেই আগেকার মতোই কোনো ঘটককে ফরমাশ করছেন মিষ্টি স্বভাব ভাল বংশের শিক্ষিত ছেলে দেখতে-শুনতে খুব সুন্দর হবে। অবস্থা তেমন ভাল না হলেও ক্ষতি নেই। টাকাওয়ালাদের বড় দেমাক, মেয়ের যত্ন হবে না তেমন। অবস্থা নরম দেখেই আপনি খোঁজ করবেন ঘটকমশায়। বাড়িতে ছেলে নেই—যাকে ছেলের মতন পালন করেছিলাম, সে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। জামাই আমার এমন চাই, ছেলের মতন মা-মা করে সদা সর্বদা চোখের সামনে ঘুরবে।

বর্ণনাটা সমরের সম্পর্কেই হুবহু খাটে। কথাগুলো কোন রকমে কানে পৌঁছে থাকবে, একদিন সকালবেলা সে সশরীরে হাজির।

কাঞ্চন বিগলিত কণ্ঠে আহ্বান করে: আসুন, আসুন—রোজই ভাবি আপনার কথা।

অভিমান ভরে সমর বলে, জানব কি করে যে কলকাতায় এসেছ? একটা যদি খবর পাঠিয়ে দিতে—

কাঞ্চন বলে, সাহস হয়নি। ভেবেছিলাম এতদিন আপনি আরও বিস্তর উঁচুতে। আমাদের ভুঁয়ে ফেলে অনেক—অনেক উঁচুতে উড়ছেন। খবর দিলে আসবেন না—সাধ করে কেন অপমান কুড়োতে যাই।

সমর বলে, দেখছ তো খবরটা নিজে কুড়িয়েই ছুটে এসেছি—

অবাক লাগছে সত্যি। কারিতকর্মা তুখড় মানুষ—আপনার ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। হল কি বলুন দিকি? দু-দুটো বছর কেটে গেল, অথচ একই ধাপে পড়ে আছেন আপনি। সেই জেনারেল-ম্যানেজারের বাড়ি—ঘুরে ফিরে ম্যানেজারের সেই ভাগনা। উঠতে পারলেন আর কই?

কথা কেমন গোলমেলে লাগে সমরের কাছে।

কাঞ্চন বলে যাচ্ছে, আপনার ক্রমোন্নতির ইতিহাসটা ভাবি। নানান ঘাটের জল খেয়ে টমাস ব্রাইটন কোম্পানিতে ভিড়লেন। পদস্থাপনা হল ক্যাশিয়ার শ্যামকান্ত মিত্তিরের ভাইঝি মঞ্জুলা মিত্তিরের মাথায়। সেখান থেকে আর এক ধাপ উঠে ধন্য করলেন ম্যানেজারের ভাগনী এই অধম'কে। ম্যানেজারের বিপর্যয় ঘটল তো সেখানে এলো নতুন ম্যানেজারের মেয়ে অর্পিতা। কিন্তু ম্যানেজারেই থেমে রইলেন—এদ্দিনে তো কোম্পানির খোদ ডিরেক্টরের বাড়ি অবধি পৌঁছনোর কথা। ও, ডিরেক্টরের মেয়ে-ভাগনী নেই বুঝি তেমন? ধরেছি ঠিক—

চুকচুক করে আপসোস জানিয়ে কাঞ্চন বলে, তাই হবে। আচ্ছা বসুন, চা নিয়ে আসি—

লোকটার সামনে বসতেও গা ঘিনঘিন করে। চায়ের নাম করে পালাল। আষ্টেপিষ্ঠে কথার চাবুক হেনে সমরকেও পালানোর সুযোগ করে দিল। উপরে চলে গেল কাঞ্চন, অনেক ক্ষণের ভিতর আর নামে না।

কলকাতায় কাঞ্চনকে পাওয়া গেল না। জগন্নাথ এমন করে বলছেন, জ্যোৎস্না বলছেন। শৈলধর তো মারমুখী। কাঞ্চন সেই এক জবাব ধরে আছে: ছুটিতে মামা-বাড়ি এসেছি—ছুটি ফুরাল, না গিয়ে কি করব? মেয়েদের গার্জিয়ান ভুলিয়ে ভালিয়ে ইস্কুলে এনেছি। তাদের সকল দায় আমার উপর। আসতে হলে নিয়মমতো ইস্তফা দিয়ে কাজের বিলিব্যবস্থা করে আসতে হয়।

জগন্নাথ বলেন, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসছিস, এই জানতাম। ক'দিনের ছুটি কাটিয়ে আমার বাড়ি ধন্য করে যাবে, তারই জন্যে কি এই বয়সে এত কষ্ট করে ঢাকা নিয়ে গিয়েছিলাম?

শৈলধর গালিগালাজ শুরু করেছেন: সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। বারোভূতের কিল খেয়ে মরবি, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সাধ হয়েছিল, অন্তিমে হাড় কখানা গঙ্গাজলে বিসর্জন যাবে—বুলাঙ্গার মেয়ে তুই সে জিনিস হতে দিবি?

মঞ্জুলা এলো একদিন। এসে বলল, আমায় ধরেছেন বুঝিয়ে সুজিয়ে তুমি একবার দেখ। আসল ব্যাপার কি, খুলে বল্—

বলব, তোকে ছাড়া কাকেই বা বলা যায়। টের পায় না যেন অন্য কেউ।

বকুল

কান পেতে আছে অমরেশ। ঘরের মধ্যে কাতরানি।

হল কি?

মনোরমা বেরিয়ে এসে ঝঙ্কার দেয়, কেন বিরক্ত করছেন বলুন তো? কাজ করতে দেবেন না?

বেকুব হয়ে অমরেশ বলে, মানে…বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম, কি রকম করে উঠল যেন হঠাৎ—

অমন ঢের ঢের করে থাকে। যান।

তারপর সুর নরম করে বলে, এই করে চুল পাকিয়ে ফেললাম— এমন ভয়তরাসে মানুষ দেখি নি বাপু—

ভয় নেই তো?

না গো মশায়, না। সব মায়েরই এই রকম হয়ে থাকে। আপনার মায়েরও হয়েছিল। সৃষ্টির গোড়া থেকে হয়ে আসছে। ভয় আবার কিসের?

অমরেশের মুখের দিকে চেয়ে করুণাপরবশ হয়ে বলল, আচ্ছা, দেখে যান একবারটি না হয়—

রেবার ফরসা রঙ রক্তশূন্যতায় সাদা হয়ে গেছে। কাপড় চোপড় সামলে নিয়ে একটুখানি ম্লান হেসে সে বলল, খাওয়া দাওয়া কর নি তুমি?

অমরেশ বলে, হুঁ—

কক্ষনো না। রুক্ষ চুল, শুকনো চেহারা—যাও, পাগলামি কোরো না, খাও-দাও গিয়ে।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে রেবা?

রেবা তাকাল মনোরমার দিকে। ইতস্তত করছে পর একজনের সামনে জবাব দিতে। এই অবস্থায় দ্বিধা করা সাজে না। সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে বলে, কিসের কষ্ট। মা হওয়া কি যে সে কথা? সে তুমি বুঝবে না। অনেক ভাগ্যে স্বামীর হাতে ছেলে তুলে দেওয়া যায়। যাও, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নাও গে একটু। নইলে সত্যি আমার কষ্ট হবে।

আর এক মেয়ে জয়ন্তী।

তুলার ভাড়াটে বসানো যায়, আবার মানুষও চলতে পারে, এই তার একমাত্র গল্প ইদানীন্তন। কিঞ্চিৎ বুদ্ধিজ্ঞান-সম্পন্ন কাউকে পেলেই ফটিক ডেকে এনে দাওয়ায় বসায় এবং গল্পের প্রয়োজনে নকশা ইত্যাদি বের করে।

হুঁকো হাতে অমরেশ হুঁ-হাঁ দিয়ে যাচ্ছিল ফটিকের কথায়। হঠাৎ সজাগ হয়ে টান দিল কয়েকটা। ধোঁয়া বেরোয় না—কলকে নিভে আছে না টানার দরুন।

উয়া-উয়া—আওয়াজ আসছে না? হ্যাঁ…তাই তো। ছুটল অমরেশ।

মিসেস পালিত—

ভিতরে হাস্যধ্বনি। মনোরমা বলে, আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। ছেলে হয়েছে। এখনই এসে পড়বেন না—দেরি আছে। আমি ডাকব।

ডাক এলো অনতিপরেই। ত্রস্ত কণ্ঠে মনোরমা বলে, দেখুন তো? শব্দ সাড়া নেই পোয়াতির চোখ মেলছে না।

আরও ব্যাকুল হয়ে কান্নার মতো করে বলে ওঠে, ডাক্তার ডাকুন অমরবাবু। শিগগির। ভালো মনে হচ্ছে না।

করালী ডাক্তার দিবানিদ্রা ভঙ্গে সবে [illegible] এসে বসেছেন। মনুষ্যজন [illegible] নি। অমরেশকে দেখে [illegible] হলেন।

এমনি [illegible] না কোন লোক। [illegible] নিয়ে আসছি।

অমরেশ ভেবে এসেছিল কত মিনতি করবে—দরকার হলে হাত পা জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু [illegible] সামনে বসে [illegible] সব গোলমাল হয়ে গেল। সে-ও সমান তেজে বলে, টাকা দিলে [illegible] কাছে আসব কেন?

টাকা দিয়ে কেউ বুঝি আমায় ডাকে না? বেগার খেটে ভাই, বাতাস খেয়ে থাকি—উঁ?

টাকা খরচ করে আপনাকে ডাকবে [illegible]।

যেমনি কাটা-কাটা জবাব পেলেই তবে করালী শায়েস্তা হন। সবাই জানে। নরম হয়েছ তো গালাগালিই চলবে—তখন তাঁকে কাজে পাওয়া যাবে না।

কত গাধা আছে তবে পাড়ায়—আমার এনগেজমেন্ট-বই থেকে হিসাব করে দেখো। হুঁ—হুঁ, চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। হাতুড়ে গোবদ্যি নই! পাঁচ বছর পড়ে তবে পাশ করে এসেছি।

কিন্তু রোগি দেখেন মনোযোগ দিয়ে? গোড়া থেকে তো আপনাকে ডাকছি। দেখলে রোগার এই অবস্থা হয়?

ভালো জিনিস কিছু খাওয়াবে না, শুধু ওষুধের উপর রেখেছ। তা-ও মাগনা পাচ্ছিলে বলে। উল্টে এখন আমার উপরে চাপ।

করালী গজর-গজর করতে লাগলেন।

কী আবার আজকে? যেতে হবে? বলে ফেলো—লজ্জা কিসের? ভিজিট, ওষুধের দাম সমস্ত লিখে রাখছি—সিকি পয়সা রেহাই দেব না।

দিয়ে দেব—সুদ সমেত নেবেন আদায় করে। যাবেন কিনা, তাই বলুন এখন।

এ বাড়ী-ঘর করালীর খুব চেনা। প্রতিটি সংসারে হামেশাই তাঁর ডাক পড়ে। ডাক্তারের সাড়া পেয়ে মনোরমা বেরিয়ে এলো।

তুই এসে জুটেছিস? ডাক্তারের ফী দিতে পারে না, নার্সের নবাবি। পাওনাগণ্ডা নগদ মিটিয়ে নিচ্ছিস তো রে?

অমরেশ বলে, এঁরও ধার। নবাব-বাদশা তো নই—নগদ কোথা পাব।

করালী হেসে উঠলেন।

ধারে হাতি পাওয়া যায় তো হাতিই সই। বেড়ে কারবার ফেঁদেছে।

অমরেশের বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি সুর বদলে ফেললেন।

বাপু হে, চোখ রাঙাবে আবার খয়রাতি নেবে—দুটো একসঙ্গে হয় না। নরম হয়ে দু-একটা মিষ্টি কথা বলতে শেখো—তোমারই মঙ্গল হবে।

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

মনোরমা বলছিল, প্রসবের পর একবার চোখ মেলে দুটো-তিনটে মাওয়ার কথা বলল—

আর বলবে না—

ঝুঁকে পড়ে তিনি দেখতে লাগলেন, মণিবন্ধে হাত দিলেন। এতক্ষণের করালী ডাক্তার আর নেই। কম্পমান কণ্ঠে বললেন, বেঁচে গেল মেয়েটা। আমিও বাঁচলুম—আর দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না।

দুখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে যেন তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন। ফটিক এবং এ-কামরার ও কামরার আরও দু-পাঁচ জন এসে জমেছে। বলছিল, এমন ডাক্তার হয় না। পয়সা লাগে না, আবার শ্মশানের কড়ি অবধি দিয়ে যায়।

করালীর কানে যেতে তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠলেন।

শ্মশানের কড়ি? মেথর-মুদ্দফরাশের জিম্মা করে দিও—এক পয়সাও ঐ টাকা থেকে খরচ হবে না। থাকতে দিল না দানা-পানি, মলে করবে ছানা-চিনি। বাচ্চাটা অনাহারে যেন না মরে ওর মায়ের মতো। সেই জন্য ধার দিয়ে যাচ্ছি।

ছেলে উয়া-উয়া কাঁদছে।

ডাক্তারবাবু। একটা সার্টিফিকেট লাগবে যে ডাক্তারবাবু—

করালী ছুটে চলেছেন। হাজার ডাকে এখন তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না, এটাও সকলে জানে। ডাক্তারি করে বুড়ো হয়েছেন—কত শত মরেছে তাঁর হাতে। মৃত্যু দেখলে তবু তিনি কেঁদে ফেলেন শিশুর মতো।

এক দিন ফটিক বলল, বউমার ঐ অবস্থায় এত দিন কিছু বলতে পারি

উপায় কী বলুন? এ ভাবে চুপচাপ থেকে তো চলবে না। আবার ছেলের একটা গতি না হলে কাজকর্মের চেষ্টাও করতে পারছি নে।

ছেলেটা কাঁধের উপর চেপে রয়েছে বুঝি?

অমরেশ এক মুহূর্ত তাকাল মনোরমার দিকে। সেখানে কী দেখল, কে জানে—গম্ভীরকণ্ঠে সে বলল আপনি অনেক করেছেন মিসেস পালিত। তা হলেও আমাদের গরীবের পক্ষে ছেলে একটা বোঝা বইকি।

বাস উঠিয়ে পাকাপাকি চলে যাচ্ছেন তা হলে? আমার ব্যবস্থা কী হল?

অমরেশ অবাক হয়ে তাকাল। মনোরমা বলে, ছেলে কোনোখানে বিলিয়ে দিয়ে বিবাগী হবেন, এই মতলব করেছেন বোধ হয়?

জনার্দন চোখে কম দেখেন—পুরু কাচের চশমা, নিকেলের ফ্রেম, একটা ডাঁটা সুতো দিয়ে বাঁধা। কিন্তু কান খুব সজাগ। মেয়ের বাড়াবাড়ি অসহ্য লাগে। দোকান থেকে হাঁক দিয়ে ওঠেন, নিজের সন্তান বিলিয়ে দিক, হার জলে ছুঁড়ে ফেলুক— তোর বলবার কী এক্তিয়ার আছে শুনি?

মনোরমা বলে, কিচ্ছু নেই। আমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে যান. যা ইচ্ছে করুন গে। কোনো কথা বলতে যাব না। তুমি যে বলছ বাবা—কষ্ট হয় নি ছেলে ধরতে? দিয়েছেন উনি তার দরুন একটা পয়সা? এখন সবসুদ্ধ সরে পড়ার তালে আছেন।

জনার্দন বলেন, পয়সার আশা ছেড়ে দে। কাকে দিয়েছে পয়সা দেবে কোত্থেকে?

আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়েছে মনোরমার। এ কবালী ডাক্তার নয়। সজোরে ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে সে বলে, হকের ধন—গায়ের রক্ত জল-করা পয়সা কিসের জন্য ছাড়তে যাব? কক্ষনো না।

কী করবি তবে?

ছেলে আটকে রাখব। টাকা শোধ করে তবে নিয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে রঙ্গস্থলে ফটিক দেখা দিল।

ধন্যি মেয়ে বটে। আমি গয়না বন্ধক রাখি, থালা-বাটি বন্ধক রাখি; একবার একজনের শিলনোড়াও বন্ধক রেখেছিলাম চার আনায়। সকলকে ছাড়িয়ে গেলে তুমি মনোরমা—হি-হি-হি—ছেলে বন্ধক।

বিরক্ত জনার্দন ফটিককেই সাক্ষী মানেন।

তাই দেখ তুমি—মাথায় এক ছিটে ঘিলু থাকলে কেউ ইচ্ছে করে এমন হাঙ্গামা জড়ায়? তুমি মালপত্র বন্ধক রাখ—সে সব এক জায়গায় রেখে দিলে হল—নড়াচড়া করবে না, খাওয়াতে হবে না, সিকি পয়সা খরচা নেই। ছেলে আটকে রেখে এক্ষুনি তো তার জন্য মিছরি-সাবু-বার্লি কেনো—দুধ যোগান করো—কাঁদছে তো চুষিকাঠি কিনে দাও—

মনোরমা আগুন হয়ে বলে, যেমন হাড়কিপ্পন তুমি—মনের সাধ মিটেছে। বাপ-বেটি ছাড়া আধখানা বাড়তি খোরাকির দায় নেই। তা ভয় নেই

তোমার—সাবু-মিছরি তোমায় কিনতে বলব না—আমার নিজের রোজ-গারে খাওয়াব।

জনার্দনও বলেন, তাই তাই। দেখি কত ক্ষমতা। অতি-বড় দিব্যি রইল—ছেলের জন্য সিকি পয়সা চাস যদি কোনো দিন—

কলহের মধ্যে অমরেশ হতভম্ব হয়ে ছিল। ছেলে নামিয়ে দিয়ে হাসল আবার একটু। বলে ভারমুক্ত হলাম—রুজি-রোজগারের ধান্দায় ঘোরা যাবে। গছিয়ে দিতে হত কোথাও না কোথাও। নিলেন—তা ভালোই হল।

কয়েক পা গিয়ে কী ভেবে আবার ফিরল। বলে, আপনার পাওনা শোধ দিতে পারলে রেবার ছেলে দেবেন তো ফিরিয়ে? তখন কোনো বাধা হবে না?

ছেলে বুকে তুলে মনোরমা মুখ ফিরিয়ে দুম দুম করে ঘরে ঢুকে গেল।

অমরেশ এক বন্ধুর মেসে গিয়ে উঠল। দুপুর বেলাটা খায় সেখানে—ফ্রেণ্ডচার্জ পাঁচ সিকে। রাতে খাওয়ার অবশ্যক হয় না, নিয়মিত নিমন্ত্রণ থাকে। এক বেলার এই পাঁচ সিকেও বেশি দিন দেওয়া চলবে না, সঙ্গতি ফুরিয়ে এল। তখন ভাবনা কিসের। ফটিকের ট দেশ নিয়ে পৃথিবীর বিশাল তেপান্তরে বেরিয়ে পড়া যাবে। মরার বেশি ক্ষতি নেই—বেঁচেবর্তে জীয়ন্ত হয়ে থাকাটাই বা লোভনীয় কিসে?

একটা ইস্কুল-মাস্টারির খোঁজে সেদিন বড়িশে অবধি চলে গিয়েছিল। সে লোক আগের দিন নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আবার এই এত পথ হেঁটে মেসে ফিরে যাওয়া। চার পয়সার ট্রামে চড়বার বিলাসিতা ভরসায় কুলোয় না। অবসন্ন মনে ধীরে ধীরে চলেছে।

ঝকঝকে মোটর নিঃশব্দে একেবারে পিছনে এসে ইলেকটিক হর্ন বাজিয়ে উঠল। চমকে উঠে অমরেশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সে দিক তাকিয়ে রাস্তার কিনারায় গেল। চলেছে। মিনিট কয়েক পরে আবার সেই মোটর—এবং তেমনি হর্ন পিছনে।

মোটর আছে বলে কি পথ হাঁটতে দেবেন না মশায়?

মোটর থামল একেবারে। দরজা খুলে লাফিয়ে নামল সেই মেয়েটা—জয়ন্তী।

হাঁটতে যাবে কেন রয়েছে যখন মোটরগাড়ি?

অমরেশের সে হাত এঁটে ধরল। বলে, আমার নাম কক্ষনো মনে নেই। মনে করে রাখবার মতো নইও আমি। কিন্তু 'মশায়' বলে ডাকলে—ছি-ছি-ছি—মেয়েমানুষ আমি, তা ও বুঝি ভুল হয়ে গেল?

চেয়ে দেখেছি নাকি?

রক্ষে পেলাম। দেখলে ঠিক চিনতে পারতে। অন্তত একটি মেয়ে

বলে। কি বলো?

সত্যি বলি জয়ন্তী যা তোমার বেশভূষা—আচমকা দেখলে সবাই পুরুষই ভাববে।...কিন্তু হাত ধরেছ কেন বলো তো?

কী মনে হয়?

টিপি টিপি হাসে জয়ন্তী। বলে, রাস্তার মাঝে হঠাৎ এক মেয়ে এসে হাত ধরলে নানা কথা মনে হয়। নিজের হয়—আশপাশে যারা দেখছে, তাদেরও হয়। মনে যা-ই হোক—তোমায় গাড়িতে তুলে নিয়ে যাব এই মাত্র। আপাতত তার বেশি নয়। একা একা আমার ভয় লাগছে।

ড্রাইভার বনমালী ভিতরের সিটে প্রায় বিলুপ্ত। তাকে দেখিয়ে অমরেশ বলে, একা হলে কিসে?

ঐ তো বিপদ! সন্ধ্যে হয়ে আসছে! চেহারা দেখ না—আস্ত একটা দুশমন, চোখ গোল-গোল করে তাকায়। ঐ লোকের সঙ্গে রাত বিরেতে একলা ঘোরা ঠিক? তুমিই বলো না।

ধরে নিয়ে বসাল পাশের সিটে। জয়ন্তীকে জানে অমরেশ। জানে প্রতিবাদ নিষ্ফল। কোলাহল জমিয়ে লোকের নজরে পড়া হবে শুধু।

গাড়ি ছুটছে।

অমরেশ বলে, একটা নতুন কথা শুনলাম, তোমারও ভয় লাগে জয়ন্তী—

জয়ন্তী হুমকি দিয়ে ওঠে, অমন উবু হয়ে কেন—ভালো হয়ে বোসো না তুমি। ঘেন্না করছে?

না...মানে, ওধারে তুমি বসেছ—

ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে জাত যাবে? না গো—অত ছুঁৎমার্গী আমি নই। হাসি পায়—ট্রামে বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে, আর আমাদের পাশে খালি জায়গা। বলাও চলে না, বসুন এসে—

আটকায় কিসে?

লজ্জা-লজ্জা করে—এই আর কি! যদিও মানে হয় না এমন নিরর্থক লজ্জার।

তা হলে লজ্জা-ভয় দুটোই ঢুকছে তোমার মধ্যে?

জয়ন্তী বলে, পুরুষের কিন্তু লজ্জা বেমানান অমরেশ। ক-বছরে এমন জরদ্গব হয়ে পড়েছ—ছি-ছি!

অমরেশ বলে, এক-পা ধুলো, ময়লা কাপড়-চোপড়—তার পাশে তোমার ঐ পরিপাটি সাজ। পাশে বসা মানায় না সত্যিই।

জয়ন্তী তার আপাদমস্তক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

অমরেশ সভয়ে বলে, সামনে রাস্তার দিকে তাকাও। গাড়ি চালাচ্ছ যে!

জয়ন্তী বলে, কাপড় যাই হোক জামার যে আধখানাই নেই। এই পাগলের বেশে পথে বেরুলে কী করে?

ব্রেক কষে গাড়ি থামাল পথের পাশে।

চললে কোথা?

কৈফিয়ত দিতে পারি নে—

দু-পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে জয়ন্তী বলে, জবাবদিহির অভ্যাস নেই কি না। বাবার আদুরে মেয়ে ছিলাম—সমস্ত তুমি জানো। বোসো, আসছি এখুনি—

ঢুকল এক শৌখিন পোশাকের দোকানে। অনতিপরে একটা প্যাকেট হাতে বেরিয়ে এল।

পাঞ্জাবি তোমার গায়ে হবে কি না দেখ তো। এবং নিজেই তার গায়ের উপর মেলে ধরে বলে, ঠিক হবে। আমার আন্দাজ কি রকম দেখ।

অমরেশ রাগ করে ওঠে, আমার জন্যে কেন জামা কিনবে। আমি নেবই বা কেন?

জয়ন্তী বলে, কে বললে তোমার জামা? এক আত্মীয়ের ফরমায়েশ আছে। দেখতে তোমার মতো। তাই মাপটা দেখছিলাম।

জামা ভাঁজ করে স্টার্ট দিল।

এ কোন দিকে চললে? আমি শহরে ফিরব।

আমি শ্যামগুহাবরাব যাব, আমাদের কাজি-ডাঙার দিকে—

তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে নাকি?

নইলে তুললাম কেন গাড়িতে?

বেশ মজা। কাজকর্ম নেই আমার?

না নেই নিশ্চয়। তুমি বেকার; নইলে এই দশা। কলেজে সাদামাঠা পোশাকে আসতে—কিন্তু ভিখারির সজ্জায় নয়।

দোহাই তোমার, রাস্তার দিকে চেয়ে কথা বলো। গাড়ি ছুটছে আর তুমি আমার দিকে তাকিয়ে—সবসুদ্ধ যমালয়ে নিয়ে তুলতে চাও?

শহরের সীমানা পার হয়ে গ্রামাঞ্চল এসে পড়েছে। কথাবার্তা নেই। লাভ কি বকাবকি করে—এ পাগলের হাত এড়ানো যাবে না, অমরেশ নিশ্চিত জানে। মেসের সঙ্কীর্ণ শয্যায়, তা ছাড়া গুটিসুটি হয়ে পড়ে থেকে কী এমন মোক্ষলাভ হবে? যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাক—একটু বৈচিত্র্য ভোগ করে আসা যাবে জয়ন্তীর আতিথ্যে।

হঠাৎ জয়ন্তী চমকে উঠল।

ঘাড়ের ওখানটা কী হয়েছে তোমার?

কী?

লাল টকটকে হয়ে আছে। দেখি, জামাটা তোলো একটু উঁচু করে।

তাচ্ছিল্যের সুরে অমরেশ বলে, ছারপোকার কামড়ে বোধ হয়—

উঁহু। গভীর ভাবে জয়ন্তী ঘাড় নাড়ল। লেপ্রসির গোড়ার দিকে

এমনটা হয় জানি। আহা, জামা খুলে ফেলো না—দেখি আমি ভাল করে।

অমরেশ বলে, খুলছি। কিন্তু গাড়ি রোখো—

অনুরোধ রাখল জয়ন্তী। ইঞ্জিন কাঁপছে,- এক্সেলেটরে এক-একবার পায়ের চাপ দিচ্ছে আর গর্জে উঠছে গাড়ি। শতচ্ছিন্ন জামাটা যেই খুলেছে, জয়ন্তী একটানে কেড়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে ছাড়ল গাড়ি। খিলখিল খিলখিল হাসি। গতি বাড়ছে ক্রমে—টপ-গীয়ারে চলেছে।

মুহূর্তের ব্যাপার। অমরেশ বুঝতে পারছে না ভালো করে। বলে, কী করলে?

নতুন জামা পড়বে না যে! না পরো তো থাকো খালি গায়ে।

গাড়ি দৌড়ল বিষম জোরে। স্পীডোমিটারে মাইল উঠছে—চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—

ক্ষণপরে অমরেশ প্রশ্ন করে, কার বাড়ি নিয়ে তুলছ বলো তো ঠিক করে? কী পরিচয় দেবে আমার?

কোন আশ্চর্য রকম পরিচয়ের প্রত্যাশা করো নাকি অমরেশ?

তার পর হেসে ওঠে বলে, অন্য কারো বাড়ি নয়—আমার নিজস্ব কাছারি। কাউকে কিছু বলতে যাব না—যার যেমন খুশি ভেবে নেবে। কিন্তু জামা না পরে খালি গায়ে নামতে পারবে তো অত লোকের মধ্যে? ভেবে দেখ।

জামা তুলে নিতে হয় অগত্যা। গায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে অমরেশ বলে, পথে পেয়ে তেড়ে ধরা—এ অতি অন্যায় জবরদস্তি। কাউকে কিছু বলে আসতে পারলাম না—

বলবার মতো আছে নাকি কেউ? সত্যি বলো, কে কে আছে?

কেউ নেই—

ঘাড় নাড়ল অমরেশ। স্তব্ধ হয়ে রইল একটুখানি।

না কেউ নেই আমার—

স্বর অতি করুণ, যেন কান্নার আভাস। জয়ন্তী হেসে উঠল।

আমারও তাই। কেউ না থাকাই তো ভালো!

হাসির উচ্ছ্বাসে সে যেন ভেঙে পড়ছে। বলে, বাবা নেই, মা নেই—আমারও কেউ নেই ত্রিভুবনে। তাই দেখো, মজা করে মোটর চালিয়ে বেড়াচ্ছি। বাবা থাকলে দিত এমন পথে পথে ঘুরতে?

অমরেশ বলে, মোটর আছে তাই তোমার মজা। কিন্তু দোহাই জয়ন্তী, রয়ে-সয়ে মজা করো। এত জোরে নয়, মাথা ঘোরে।

এ তো টিকিয়ে টিকিয়ে যাচ্ছে। জোরে চালিয়ে দেখবো?

সভয়ে অমরেশ বলে, না গো, রক্ষে করো—

চোখ বোজো। ঠেসান দিয়ে পড়ো সিটে।

উড়িয়ে নিয়ে চলেছে যেন। পৃথিবীর ধুলো-মাটির অনেক উর্ধ্বে—অন্তরীক্ষে…গতিবেগে তারা ছিটকে ছিটকে চলেছে। অমরেশ চোখ বুজে

আছে—শুনতে পাচ্ছে একটানা মৃদু গম্ভীর আওয়াজ গ্রহলোকের অশ্রুতপূর্ব গীতিগুঞ্জনের মতো।

কতক্ষণ চলেছে। ঘুম এসেছিল বোধহয় অমরেশের। ধড়মড়িয়ে এক সময়ে খাড়া হয়ে বসল। রাত্রি। আমবাগানের মধ্যে গাড়ি এসে থেমেছে।

জয়ন্তী বলে, তুই চল্ বনমালী আমার সঙ্গে। তুমি গাড়ির থাকো অমরেশ।

জঙ্গলে বসে থাকব?

জঙ্গল কোথা? আমাদের কাছারি বাড়ি ঐ যে—

নির্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে জয়ন্তী আঙুল দেখাল। কিন্তু ঘর-বাড়ির কোন চিহ্ন নজরে আসে না। বনমালী আর সে বড় বড় গাছের আড়ালে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েকটা খানা-ডোবা ও বাঁশঝাড় পার হয়ে—হ্যাঁ, আছে বটে বাড়ি একখানা। কাছারিবাড়ি এটা—খিলানওয়ালা একতলা পাকা দালান। সদর রাস্তার উপর বা ফটক। জয়ন্তী পিছনের সুঁড়ি-পথ ধরে এসেছে। বনমালীকে রোয়াকে নিচে দাঁড় করিয়ে মৃদু পায়ে উঠে এসে থামের পাশে দাঁড়াল।

কাছারি সরগরম। আবাদ বাঁধবন্দি হচ্ছে। মজুরেরা মাটি কাটার রোজগণ্ডা মিটিয়ে নিচ্ছে নায়েব-গোমস্তার কাছ থেকে। জয়ন্তী দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে। থামগাছটা ছায়াচ্ছন্ন বলে হোক অথবা সবাই হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত—সেই কারণে হোক, কারো সেদিকে নজর পড়ল না। শেষটা নিজেই সে আত্মপ্রকাশ করে। নায়েবের পাশে বসে পড়ে বলল, জমাখরচটা দেখি একটু—

ঘরের মধ্যে এবং তার নিজেরই মাথায় বজ্রপাত হয়েছে, নায়েবের মুখ-ভাব এই রকম। কথাটা যেন বোধগম্য হচ্ছে না—এমনিভাবে বলল, আজ্ঞে?

খাতা এগিয়ে দিন।

কিন্তু সে অবধি অপেক্ষা করল না। নিজেই হাতবাক্সর উপর ঝুঁকে খস-খস করে জমাখরচের পাতায় পাতায় সই করল। খাতা বন্ধ করে শেষে সহজ কণ্ঠে বলে মামাকে দেখছিনে যে?

বাসাবাড়ি চলে গেছেন। কাছারি সন্ধেটায় বন্ধ কিনা। আমরাও উঠছিলাম। তা বলেন তো ডাকতে পাঠাই ওঁকে

জয়ন্তী তটস্থ হয়ে বলে সে কি কথা। বুড়ো মানুষ—তায় আমার মামা। আমরাই যাচ্ছি তো বাসাবাড়ি। আপনি বরঞ্চ একটা কাজ করুন নায়েব মশায়। গাড়িটা গোপলাধোবা-আমতলায় রয়েছে—গোটা দুই লোক ডেকে দিন, ধুয়ে ভালো করে সাফসাফাই করে দেবে।

বাসাবাড়ি আরও খানিকটা দূরে একেবারে গঙ্গার উপরে। জয়ন্তীর বাপ শিবচরণ মাঝে মাঝে এসে থাকতেন—শখের বাড়ি, আসবাবপত্রের

অভাব নেই, শহুরে শ্রীছাঁদও বাড়িটার সর্বাঙ্গে। উপরের খান দুই ঘর আলাদা করা আছে, মনিবেরা খেয়ালখুশি মাফিক এসে পড়লে যাতে অসুবিধাগ্রস্ত না হন। বাকি অংশ আশুতোষের দখলে। আছেন পরম আরামে—তবু শিবচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন যে এ সমস্ত ছেড়েছুড়ে কলকাতায় উঠেছিলেন, তিনিই তা বলতে পারেন।

আশুতোষ শুষ্ক কণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, এসো, এসো। বুড়োবুড়ি আমরা কত দিন বলাবলি করি, এখানে এতগুলো আশ্রিত প্রতিপাল্য আছে---মা-জননী তাদের একটি বার দেখতে আসে না। এতদিনে মনে পড়ল তা হলে?......বনমালী, তুই বাবা একেবারে হাত-পা ধুয়ে এসে বোস। কখন বেরিয়েছিস, ক্ষিধে পেয়েছে—মুড়ি-গুড় আম-কাঁঠাল এনে দিচ্ছে, খা বসে বসে।

অমরেশকে লক্ষ্য করে বলেন, এ ছেলেটিকে চিনতে পারছি নে তো?

অমরেশ আগ বাড়িয়ে পরিচয় দেয়, পথে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন।

খবর পেয়ে নবদুর্গা এবং ছেলেমেয়েদের যে ক-টি ঘুমোয় নি, সকলে এসে পড়ল বিষম সোরগোল। জেলেপাড়ায় লোক ছুটল। মাছ পাওয়া গেল না। ঐ রাত্রে তখন জাল নামানো হল কাছারির বাঁধা-পুকুরে। অল্প-স্বল্প মিলল।

অমরেশকে জয়ন্তী প্রশ্ন করে, রাতে কী খাও তুমি?

কী জবাব দেবে সে, চুপ করে থাকে। পেট ভরে কলের জল খায়—আর কিছু নয়। মেসের মতো বলতে পারল না নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়ায়। জয়ন্তীর কাছে পার পাওয়া যাবে না ওসব বলে, এ মেয়ে অত সহজ নয়। অবশেষে জেরার মধ্যে পড়বে।

জয়ন্তী বলে ভাত না লুচি-রুটি? যা দরকার মামাকে বলে দেব। সঙ্কোচ কোরো না, পাড়াগাঁ হলেও কোন রকম অসুবিধা হবে না।

অমরেশ বলে, দেখতেই পাচ্ছি। অগাধ ঐশ্বর্য তোমার। এতখানি ধারণায় ছিল না। কিন্তু আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না—যা-ই দেবে, নিশ্চয় তা আশার অতীত আমার কাছে।

জয়ন্তী হেসে উঠে বলে, সে কি গো, কতটুকু আশা তোমার? মামার মতন তোয়াজ করে কথা-বলা তোমার মুখে বড় বিশ্রী লাগে অমরেশ—

খাবার সময় দেখা গেল, লুচি-পোলাও দুই-ই আছে। সুবৃহৎ থালার চারদিকে বৃত্তাকারে নানা আয়তনের বাটি—কতগুলো তরকারি, গণে শেষ করা দায়। এতদূর আয়োজন জয়ন্তী নিজেও ভাবতে পারেনি।

আবার এর উপর নবদুর্গা সামনে বসে পড়ে অনুযোগ করছে, খবরবাদ না দিয়ে এসে পড়লে মা। এ তো কলকাতা শহর নয়—কিচ্ছু পাওয়া যায় না। দোকান-পাট যা দু-চারটে আছে, এ রাত্রে সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কোন যত্নআত্তি করতে পারলাম না, আমার লজ্জা করছে পাতের কাছে সামান্য এই

ক-টা জিনিস আনতে। তুমি যা অবিশ্যি ঘরের মানুষ—কিন্তু সঙ্গে এই ছেলেটি এসেছেন।

জয়ন্তী বলে, রাত্তিরবেলা বিনা খবরে এসে পড়েছি—ভাঁড়ার থেকে এতগুলো জিনিস বেরুল। কলকাতার কথা কি বলছেন—আমরা এর সিকিও জোটাতে পারতাম না। আরামে আছেন সত্যি আপনারা।

নবদুর্গাকে এক সময় আড়ালে পেয়ে আশুতোষ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন—মেয়েমানুষ—আখের বুঝে কাজ করতে জানো না। কি দরকার ছিল এত যোগাড়যন্তোর করবার?

ওদের খাচ্ছি পরছি—বাড়ির উপরে এসেছে, খাওয়ালে দাওয়ালে খুশি হবে—

মুণ্ডু হবে সন্দেহ করছে। পঞ্চাশ টাকা মাইনের ভাঁড়ার থেকে ঘি-ময়দা বাদাম পেস্তা বেরোয় কি করে? মন খারাপ হয়ে গেছে। বলেও ফেলল তাই মুখ ফুটে।

যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন হায় হায় করে লাভ নেই। কিন্তু ছোঁড়াটাকে কি হেতু জুটিয়ে আনল? খাতির এতখানি যে খেতে বসবে—তা-ও পাশাপাশি হওয়া চাই। দুশ্চিন্তায় আশুতোষ ঘুমোতে পারেন না—অবিরত এ পাশ ও-পাশ করছেন। অমরেশও শুয়েছে সেখানে। দুজনের এক ঘরে শয্যা।

আশুতোষ প্রশ্ন করেন, ঘুমোলে নাকি বাবা?

এত বড় এস্টেট মুঠোর মধ্যে—সে মানুষের মুখের কথা এমন অমায়িক আর মোলায়েম? অমরেশ তাজ্জব হয়ে যায়। বিনীত কণ্ঠে বলে, আজ্ঞে না—

একটু খেয়ালী আমার ভগ্নী—কিন্তু বড্ড ভালো। গেল-বছর ওর বাপ মারা যান—মরবার সময় হাতে ধরে আমার উপর সমস্ত ভার দিয়ে গেছেন। এখন আমি যা করব তাই।

অমরেশ বলে, আপনারাও বড় ভালো। আমি লোকটা কে, কী বৃত্তান্ত—কিছুই জানেন না। কিন্তু যে রকম যত্নটা করলেন, আমি অবাক হয়ে গেছি।

কী আর করেছি, কতটুকুই বা সাধ্য। জংলি গাঁয়ে পড়ে আছি, মানুষ-জন কেউ এলে বর্তে যাই। কিন্তু তোমার এর আগে দেখি নি বাবা, পরি-চয়টা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার ভাগ্নী যে-সে লোককে খাতির করে না তো!

অমরেশ বলে, নিতান্তই সামান্য লোক—বেকার। অবস্থা দেখে জয়ন্তীর হয়তো করুণা হয়েছে। নইলে এমন-কিছু খাতির ছিল না কোন দিন। ঐ যা বললেন—খেয়ালি মানুষ। আমিও ভেবে পাচ্ছি নে, কেন টেনে নিয়ে এলেন এখানে, কেন এমন যত্ন?

একটুখানি ইতস্তত করে আবার বলল, দেখুন, আমি বড় বিপন্ন। আপনাদের এস্টেটে তো অনেক লোকজনের দরকার হয়। এর মধ্যে আমাকে একটু নিতে পারেন না? চাকরির কথা জয়ন্তীকে বলতে পারি নে—একসঙ্গে পড়েছি, সঙ্কোচ হয়।

বললেই বা কি হবে? এসব তার এক্তিয়ার নয়। চাকরির বহাল-বরতরফ সমস্ত আমার হাতে।

আশুতোষের নিজের ক্ষেত্র এটা। এস্টেটের ম্যানেজার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার মধ্যে, কণ্ঠস্বর মুহূর্তে বদলেছে। বললেন, লোক তো রয়েইছে—নতুন লোক নেবার জায়গা কোথায়? অভিজ্ঞতা আছে তোমার? বলি, জমিদারি-লাইনে কাজকর্ম করেছ?

আজ্ঞে না। শিখে নেব। কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।

কিন্তু ইংরেজিনবিশ নব্য লোক তোমরা—পোষাতে পারবে? জয়ন্তী মা'র ক্লাসফ্রেণ্ড বলছ—সেই খাতিরে না হয় একটা গোমস্তা করে দেওয়া গেল—তার বেশি আপাতত হয়ে উঠবে না। পনেরো টাকা মাইনে, ওর মধ্যে খাওয়া-পরা—

আশ্চর্য হয়ে অমরেশ বলে, পনের টাকায় খাওয়াই তো হয় না একটা লোকের—

তাই তো বলছিলাম ইংরেজি পড়ে গোল্লায় গিয়েছ—তোমাদের কর্ম নয়। খাওয়া হয় না—গোমস্তারা তবে কি বাতাস খেয়ে থাকে? ঐ পনেরোর মধ্যে দুধ-ঘি, সময় বিশেষে পোলাও কালিয়াও খাচ্ছে, আর মাসে মাসে বিশ-পঞ্চাশ করে বাড়ি পাঠাচ্ছে।

বলেন কি?

মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে আশুতোষ বলেন, এ সব তোমাদের কলেজে-শেখা অঙ্কের হিসেবে মিলবে না। আমার বাড়ির এই যে একটু ঠাটঠমক দেখতে পাচ্ছ—মাইনে কত করে নিই আন্দাজ করো তো? পাঁচ-শ ছ-শ—কি বলো? যাক গে—শুনে লাভ নেই। ও সব মাথায় ঢুকবে না। মনিবেরাও জানে। আমাদের মাইনে মাসে মাসে নয়—দু-বছর তিন বছর অন্তর একদিনে হিসাব করে মাইনে চুকিয়ে নিই।

অমরেশ সসম্ভ্রমে স্বীকার করে নেয়।

ঠিক বলেছেন। আমার ধারণায় আসে না। তাই বলছি, দয়া করে যদি যৎসামান্য পেটের ভাত জোটাবার মতো মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিতে পারেন, আমি আপনাদের কাজে লেগে যাই। আর ঘুরে বেড়াতে পারি নে।

আশুতোষ জাঁক করে বলেন, তা পারব না কেন, খুব পারি। পনেরোর জায়গায় পঁচিশ করে দিলে কে আটকায়? জয়ন্তীরও আমার উপর কথা বলবার তাগত নেই। তবে মুশকিল হল, একজনকে দিলে সবাই সঙ্গে সঙ্গে

পোঁ ধরবে। যাকগে, যাকগে। তুমি ঘুমোও তো এখন। কাল তারপর ভেবে দেখব।

দিতেই হবে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে—

ঘুমোও—

বলে অনতিপরে আশুতোষ ঘুমিয়ে পড়লেন। নিশ্চিন্ত হয়েছেন ছোকরা শুধু মাত্র চাকরির উমেদার। এবং জয়ন্তীর কিঞ্চিৎ দয়া হয়েছে, তার অধিক কিছু নয়। বুকের উপর থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেল।

আশুতোষ ভোর থাকতেই উঠে পড়েন। জয়ন্তী শহরে মেয়ে হলেও দেখা গেল তার অভ্যাস আশুতোষের মতন। কে আগে উঠেছে বলা কঠিন। নিচের বারাণ্ডায় মুখ ধুতে এসেছিল জয়ন্তী। সেইখানে দেখা হল

চলুন মামা কেমন কাজ করলেন—ঘুরে দেখে আসি।

আশুতোষের চমক লাগে। বললেন, এখনি রোদ উঠে যাবে—কষ্ট হবে যে মা। নতুন মাটি দেওয়া হয়েছে, এবড়ো খেবড়ো পথ। তার উপর দিয়ে তুমি মোটে হাঁটতেই পারবে না এই একটা কথা বলে দিলাম।

জয়ন্তী হেসে বলে, আচ্ছা দেখতে পাবেন। আপনিই পারবেন না আমার সঙ্গে হেঁটে। এক কাজ করুন—আমিন মশায়কে খবর দিয়ে পাঠান ফিতে-টিতে নিয়ে তাড়াতাড়ি যাতে চলে আসেন।

আমিন কি করবে?

মাটি কেটেছে—সেই সব খানাখন্দ মেপে দেখা যাবে। আমিন ছাড়া মাপজোপ করবে কে? আপনিও তো সমস্ত নিজে দেখতে পাবেন না। অন্যের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। যাচ্ছি যখন, মনে সন্দেহ রাখা ঠিক নয়। কি বলেন?

আশুতোষ স্তম্ভিত হলেন। তাঁকে অবিশ্বাস করছে এই একফোঁটা মেয়ে—কালকে যাকে ফ্রক পরে নেচে বেড়াতে দেখেছেন। তাই আবার এমনি স্পষ্ট করে মুখের উপর বলা।

খানা মেপে কি বুঝবে মা। সেই যে ক'দিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল—খানা তাতে অর্ধেক ভরাট হয়ে গেছে।

তবু আন্দাজ পাওয়া যাবে। আপনি তৈরি হয়ে আসুন মামা। তাড়া-তাড়ি করুন, রোদ উঠে গেলে কষ্ট হবে।

চা এসে পড়ল। এই এত সকালেই নবদুর্গা নিজ হাতে লুচি-মোহনভোগ তৈরি করে এনেছে। কলকাতায় থাকবার সময় দেখে এসেছে, জয়ন্তী খুব ভোরে ওঠে এবং উঠেই চা খায়। বারাণ্ডায় বেতের চেয়ার-টেবিল পড়েছে, অমরেশ এসে বসেছে। জয়ন্তী ডাকে, মামা চা খাবেন না?

না—

রাগে গর-গর করতে করতে আশুতোষ ঘরে ঢুকে গেলেন তৈরি হবার জন্যে। এত করছেন তাঁরা—ঐ রাতে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ধরালেন, এক প্রহর রাত থাকতে উঠে স্ত্রী চা খাবার বানিয়ে তোমার মুখে তুলে ধরছে, তবু গিয়ে স্বচক্ষে বাঁধ দেখতে হবে! জমিদারনী হয়ে পড়ে তোমার মাথা ঘুরে গেছে, আস্পর্ধা বড় বেড়েছে! মাটিকাটার হিসাব তো যথারীতি পাঠানো হচ্ছে—হেরফের যদি কিছু হয়েই থাকে, ধরে ফেলবে এমন সাধ্য তোমার নেই। তুমি তো তুমি, তোমার বাপ, চেষ্টা করে যা ক কেওড়াতলা-শ্মশানঘাট থেকে উঠে এসে—সে-ও পেরে উঠবে না। এই কর্মে চুল পাকিয়েছি, পাকাপোক্ত আমার কাজকর্ম।

চায়ের বাটি শেষ করে জয়ন্তী তিন লাফে উঠানে নামল।

কাছারি যাওয়া যাক মামা। আমিন মশায় তো এখানে আসছেন! আপনাদের জমাখরচের খাতাটাও সঙ্গে নিতে হবে।—ওতে মাটির মাপ রয়েছে।

আশুতোষ বললেন, তা তো আছেই। আর সদরে তোমার কাছেও পাঠানো হয়েছে হপ্তায় হপ্তায়—

সমস্ত নিয়ে এসেছি, একটাও হারায়নি। বাঁ-হাতে ঝোলানো ফোলিও-ব্যাগ একটু উঁচু করে তুলে জয়ন্তী দেখিয়ে দিল। বলে, আপনাদেরটাও চাই। গোলমাল দেখলে তখন মেলানো যাবে।

কাছারিবাড়ি এত সকালে বন্ধ এখন। আশুতোষের কাছে একটা অতিরিক্ত চাবি থাকে। বেজার মুখে তালা খুলে তিনি খাতা বের করে দিলেন।

কয়েকটা পাতা উলটে জয়ন্তী বলে, এটা কী? খালের মুখে জল সরাবার বাক্স বসানো হল, তা আবার জোয়ারে ভেঙে গেল—এ সব কিচ্ছু হয় নি।

আশুতোষ রুষ্ট স্বরে বললেন, তোমার কাছে হিসাব গেছে, দেখ তার সঙ্গে মিলিয়ে—

এমনি সময় নায়েব দেখা দিল।

জয়ন্তী কঠিন কণ্ঠে বলে, এ জমাখরচের খাতা জাল। কাল পাতায় পাতায় সই করে দিয়ে গেলাম—সে খাতা বের করুন নায়েব মশায়।

খাতা বেরুল। জয়ন্তী চেপে বসল ফরাশের উপর।

কি চমৎকার—আমায় একেবারে মনগড়া হিসাব পাঠিয়ে আসছেন, স্রেফ কল্পনাবিলাস! এমন রচনাশক্তি আপনাদের, গল্প-উপন্যাস লেখেন না কেন? নাম-যশ হয়, মুনাফাও বেশি। আমায় মিথ্যে খরচ দেখিয়ে ডুপ্লিকেট-খাতা বানিয়ে এত তোড়জোড় করে ক-টাকাই বা পেয়েছেন!

আশুতোষের মুখের উপর দু চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করে বলে, সম্পর্কে মামা আপনি—বুড়ো মানুষ, মা-বাপ-মরা ভাগ্নীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতে

কাছারি বসে আছেন—

সহসা সুর বদলে বলল, নিজে কিছু দেখেন না বুঝি ?

জবাব দেবার মতো কিছু পেয়ে আশুতোষ বেঁচে গেলেন। জয়ন্তীর কথা লুফে নিয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই বটে মা জননী। কিচ্ছু করে না হারামজাদারা—একা আমি দুটো চোখে কত আর দেখব ? যে দিকে না যাব, ঠিক একটা অনাছিষ্টি ঘটিয়ে বসে আছে। বোসো, দেখাচ্ছি এবার। উঃ, আমায় ভালোমানুষ আর সরল-বিশ্বাসী পেয়ে—

জয়ন্তী বলে, ভালোমানুষ আর তার উপরে বুড়ো মানুষ। অমরেশকে তাই নিয়ে এসেছি। ইনি এখানকার সমস্ত ভার নেবেন মামা। বয়স হয়েছে, আপনি আর কত খাটবেন ?

আশুতোষ ক্ষণকাল কথা বলতে পারেন না। এতদিন ধরে এত প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে এসে কাছারিবাড়ির উপরেই শেষটা এমন লাঞ্ছনা ঘটবে, এ তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। ধুরন্ধর মেয়েটার সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না—নিঃসংশয়ে বুঝলেন তিনি। বললেন—যেন হাহাকারের মতো শোনাল।

আমরা খাব কি মা ? একপাল পুষ্যি, সবাই উপোস করে মরবে—তাই তুমি চাও ?

উপোস করবেন কেন। যেমন আছেন তেমনি থাকবেন এখানে। আর মাসে দু-শ টাকা করে পাবেন। এস্টেটের কোন কাজ কর্ম করতে হবে না।

এবারটা মাপ করো মা। ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেছে—ওরাই করেছে, আমি কিছু জানিনে।

জয়ন্তী বলে, পঞ্চাশ টাকায় চালাচ্ছিলেন, সেখানে দু'শ টাকাতেও পারবেন না ?

খিলখিল করে হেসে উঠল। এক আশ্চর্য মেয়ে—ক্ষণে মেঘ, ক্ষণে রৌদ্র।

কাছারিবাড়ির সামনে বিস্তীর্ণ উঠান নদীতে গিয়ে মিশেছে। সূর্য উঠছে নদীজলে। খোলা দরজার পথে জয়ন্তীর নজর পড়ল সেদিকে। জমাখরচের খাতা সরিয়ে দিয়ে ছুটে সে উঠানে নামল। জল ও আকাশ টকটকে লাল। একা দেখে সুখ হয় না। ছোট মেয়ের মতো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকে, অমরেশ, শিগগির এদিকে এসো—শিগগির—

আমিন এসে দাঁড়ালেন। জয়ন্তী ভ্রূকুটি করে, কী চাই আপনার ?

ডেকে পাঠিয়েছেন আমায়। মাপজোখ করতে হবে।

কিছুই মনে পড়ছে না আর এখন জয়ন্তীর।

কিসের মাপজোখ ?

বাঁধের মাটি কাটা হয়েছে, তাই আবার আপনি নাকি মেপে দেখতে ান—

অমরেশ বেরিয়ে আসতে পূর্বাকাশে আঙুল দেখিয়ে জয়ন্তী বলে, কলকাতার গর্তের ভিতর দেখে থাক এ বস্তু? দেখো, দু-চোখ ভরে দেখে নাও—

আমিন তখনো দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আমার মামা নিজে ব্যবস্থা করে মাটি কাটিয়েছেন—আমি তার দেখব কী? মাপ উনি নিয়েছেনও তো একবার—

কিন্তু ম্যানেজার মশাই যে বললেন—

বলে থাকেন যান তাঁর কাছে। একবার কেন—বিশ বার তিনি মেপে দেখতে পারেন। আমার অত শখ নেই রোদে রোদে ঘুরবার।

আশুতোষ বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এ খেয়ালি মেয়ের অন্ত পাওয়া ভার। দেওয়ালে টাঙানো কালীর পটের দিকে অলক্ষ্যে নমস্কার করলেন। মা-কালী রক্ষা করেছেন—দশের মুকাবেলা আর কেলেঙ্কারির দায়ে পড়তে হল না তাঁকে। তবে এটা নিশ্চিত বুঝলেন, শিবচরণের আমলে যেমন ছিলেন এখন থেকে তার শতগুণ সামাল হয়ে চলতে হবে।

জয়ন্তী অমরেশকে ডাকল, চলো—বেড়িয়ে আসা যাক খানিকটা—

এখন? রোদ উঠে গেল যে! জষ্ঠির রোদ বড্ড কড়া—

গলে যাবে নাকি? ননীর পুতুল?

যাচ্ছে দুজনে পাশাপাশি। আশুতোষের ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। পিছন থেকে বললেন, আমিন তবে ফিরে যাক—কী বলো মা?

জয়ন্তী নিতান্ত নিরাসক্তভাবে বলে, আমি তার কী জানি? আমি বাবা পেরে উঠব না ধুলো-কাদা মেখে মাটি মেপে বেড়াতে। তাতে আপনার বাঁধ বাঁধা হোক আর নাই হোক।

পুরো ভাঁটা এখন। জল অনেক নেমে গেছে, চর বেরিয়ে পড়েছে। নদীর কিনারায় নতুন বাঁধের উপর দিয়ে অনেক দূর তারা চলে গেল। জয়ন্তী এক সময় অমরেশের হাত ধরে ফেলে।

কী?

শক্ত কাঁকুরে মাটি, পায়ে লাগছে—

খালি পায়ে আসা ঠিক হয় নি!

আবদারের ভঙ্গিতে জয়ন্তী বলে, মাটি ফেলে ফেলে কী রকম করে রেখেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব হয়তো কোন সময়। তার চেয়ে নিচে দিয়ে চলো যাই—

জল-কাদা ওখানে—

উচ্ছল জলতরঙ্গের মতোই জয়ন্তী হেসে ওঠে।

রোদে ভয়, জলেও ভয়?

কিন্তু জয়ন্তীর হাত এড়াবে হেন সাধ্য কার? অমরেশ সন্তর্পণে এগুচ্ছে আর জয়ন্তী ছটছে বীর দাপে—দু-খানি পদ-তাড়নায় ছররা গুলির মতো চতু-

দিকে কাদা ছিটকে ছিটকে পড়ছে। উপভোগ করছে যেন কাদায় পায়ের পাতা ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলা। গদগদ হয়ে এক সময়ে বলে উঠল, আহা, যেন ফুলের উপর দিয়ে হাঁটছি—

কাদা হল ফুল? ক্রমেই তাই বেশি কাদার দিকে নামছ? যাবে কোথায় বলো তো?

ঐ যেখান থেকে সূর্য উঠল—

অতল জল ওখানে।

জলে ডুবব, চলো যাই—

আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। যা গতিক, সত্যি সত্যি অমনি কিছু করে বসা নিতান্ত অসম্ভব নয়। তুমি বড-লোক মানুষ—ইচ্ছা মাত্রেই অজস্র পাচ্ছ, পেটের দায়ে ছুটোছুটি করতে হয় না। আত্মজন অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে—এ তোমার অতি-বড় কঠিন কল্পনারও অতীত। গঙ্গার লবণাক্ত পলি ফুলের মতো লাগে পদতলে, আজগুবি খেয়াল-খুশি তোমাকেই মানায়। সকলে ভাগ্যবান নয় তো তোমার মতো···

এবং যা ভেবেছিল তাই। পা হড়কে পড়ে গেল জয়ন্তী।

অমরেশ ব্যস্ত হয়ে তুলে ধরল। তখনো সে খিল-খিল করে হাসছে।

কাদার মধ্যে পথ চলেছি আর গায়ে কাদা মাখব না, সে কি হয়? তোমার কিন্তু ও-রকম সাফসাফাই হয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না অমরেশ। কেউ বিশ্বাসই করবে না যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলে।

অমরেশ জাঁক করে বলে, জল-কাদা ভাঙা আমার এক দিনের ব্যাপার নয়। অভ্যাস আছে—তাই আছাড় খাই নে।

আছাড় না খেয়ে বুঝি কাদা মাখা যায় না?

জয়ন্তী কাদা ছিটিয়ে দিল তার গায়ে। বিরক্ত হয় অমরেশ। পথ থেকে নিজের এলাকায় টেনে নিয়ে এসে গরিব বেকার জেনেই এই আচরণ। সমান-সমান হলে কি পারত?

মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এত সমস্ত মনোভাব বুঝে দেখবার বুদ্ধি জয়ন্তীর নেই। হাত ধরে টানে, এসো—

কোথা?

জলে ডুববার কথা হচ্ছিল না? ভুলে গেলে?

একেবারে জলের কিনারে নিয়ে এসেছে। অমরেশ সাবধান করে দেয়, কুমির থাকে এ সব অঞ্চলে—

শুনে জয়ন্তী থমকে দাঁড়াল, তবে তো ভয় ধরিয়ে দিলে—

কিন্তু মরতেই যখন তৈরি, কুমিরের ভয় কেন?

জয়ন্তী বলে, কুমিরে ধরলে তো কুমিরের পেটেই যেতে হবে। জলে ডোবা হবে না। তা হলে উপায় কি?

বাসায় ফিরে যাওয়া—

এই জলকাদা মাখা অবস্থায়? জানো, ভরা-কাছারি চলছে এ সময়। কত প্রজাপাটক, আমলা-পাইক। এমনি ভূতের মূর্তি নিয়ে দাঁড়ানো যায় তাদের সামনে?

অমরেশ বলে, কাছারির দিকে না গিয়ে চুপিচুপি বাসায় ঢুকে পড়ব।

রাত্তির বেলা হলে হতে পারত। ছোট্ট জায়গা—মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীযুক্তেশ্বরী জয়ন্তী দেবী সশরীরে হাজির হয়েছেন—জানাজানি হতে কিছুই বাকি নেই। গিয়ে হয়তো দেখব, দর্শনের জন্য মানুষজন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরক্ত হয়ে অমরেশ বলে, আবার রাত না হওয়া পর্যন্ত তবে তো চরের উপর ঘোরা ছাড়া উপায় নেই।

অথবা কুমিরের পেটে যাওয়া। আর কোন পথ দেখি নে। এই বেশে ডাঙায় উঠতে কিছুতে আমি পারব না।

জলে গিয়ে নামল। কুমিরের কবল সত্যি সত্যি পছন্দ করল নাকি? অমরেশকে বলে, তুমি যাও—

অমরেশ হতভম্ব, কী করবে ভেবে পায় না। তখন হেসে জয়ন্তী বলে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সরে যাও। কাপড় চোপড় ধুয়ে ফেলি। আমার হয়ে গেলে তারপর তুমি এসো।

রোদ খুব প্রখর। গায়ের ভিজে কাপড় এরই মধ্যে শুকিয়ে এসেছে। অমরেশ বলে, ফেরা যাক। অনেকটা দূর আসা হয়েছে—মাইল দুয়েক হবে। বেলাও হয়েছে—জোয়ার এসে গেল, দেখছ না?

জয়ন্তী ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

হুঁ, বেলা হয়েছে সত্যি। হাঁটতে হাঁটতে ক্ষিধে পেয়ে গেল।

অমরেশ বলে, মামীমা, গিয়ে দেখবে, কত কী সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন। রাত্রিবে দুঃখ করছিলেন কিছু জোগাড় করতে পারেন নি বলে। দিনমানে ক্ষোভ মিটিয়ে নেবেন।

অত সবুর সইবে না—

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে জয়ন্তী। ছোট খাল বেরিয়েছে অদূরে—খালধারে সারিসারি খড়োঘর।

ওদিকে যাচ্ছো কোথা?

পিছনে তাকায় না জয়ন্তী, ভ্রূক্ষেপ করে না। হন-হন করে চলেছে পাড়ার দিকে। ইচ্ছে হয়, পিছনে পিছনে চলে আসুক অমরেশ। নয়তো প্রয়োজন নেই—কারো মুখাপেক্ষী নয় সে।

সর্বপ্রথমে যে বাড়ি, সেই উঠানে ঢুকে পড়ল। ঢেঁকিশালে ধান ভানছে মাঝবয়সি বউটা। পুরুষ কোন দিকে কাউকে দেখা যায় না। তবে আর কি। ঢেঁকিশালের ছাচতলায় গিয়ে জয়ন্তী বলে, ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু

খেতে দিন।

পাড় দেওয়া বন্ধ করে বউ অবাক হয়ে দেখছে। এমন চেহারা—সোনার পদ্ম থেকে নেমে লক্ষ্মীঠাকরুন ধুলোমাটির উঠানে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু বিপর্যস্ত বেশ। আচ্ছা···ভালো ঘরের মেয়ে পাগল হয়ে যায় নি তো? কোথা থেকে এলো হঠাৎ এই বাড়ির মধ্যে।

জয়ন্তী বলে, ষষ্ঠীমাসের দিন—আর কিছু না পাও, গাছের আম-কাঁঠাল রয়েছে। দাও কিছু লক্ষ্মীভাই, তাড়িয়ে দিও না। তাড়াতাড়ি করো। আমি তোমার ধান ভেনে দিচ্ছি ততক্ষণ।

উঠান পার হয়ে বউ পুবের ঘরের দাওয়ায় উঠল। বিস্ময়ের তার সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু কিছু বলবারও অবসর হল না, পিছন পিছন এক পুরুষ মানুষ— অমরেশ এসে দাঁড়াল। জয়ন্তী তখন আড়া ধরে তার উপর শরীর ঝোঁক দিয়ে ঠিক ঐ বউটার মতন ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে। অমরেশ সকৌতুকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। বাহাদুরি দেখাচ্ছে তার সামনে? কিংবা হয়তো বেকার কাজে চুপ করে থাকা এ চঞ্চলার ধাতে সয় না।

বাড়ির কর্তা এসে পড়লেন। ঢেঁকিশালে নজর পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

মা জননী—আপনি? মা ওখানে ঢেঁকিশালে কেন—ছি ছি, এ কী করছেন সন্তানের বাড়ি এসে?

আপনার বাড়ি বুঝি আমিন মশায়? তবে তো ভালোই হয়েছে—নিজের জায়গায় এসে উঠেছি।

খুব হাসতে লাগল জয়ন্তী। বলে বউঠাকরুনের একটু কাজ করে দিচ্ছি। তাতে দোষের কী হল? ক্ষিধে পেয়েছে, উনি গেলেন আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে।

মুকুন্দ ত্রস্ত হয়ে বলেন, আজ্ঞে না···সে কি কথা? গরিবের বাড়ি কত ভাগ্যে পায়ের ধুলো পড়ল তো ঢেঁকিশালে কেন? আসুন আপনি, ইদিকে এসে ভালো হয়ে বসুন। নইলে আমার শান্তি হবে না—পদতলে গিয়ে আছড়ে পড়ব।

অমরেশ ইতিমধ্যে দাওয়ার জলচৌকির উপর বেড়া ঠেস দিয়ে বসে পড়েছে।

জয়ন্তী দেমাক করে, দেখলে তো, কেমন ধান ভানতে পারি আমি?

কলকাতায় তোমার লাইব্রেরি-ঘরের একদিকে ঢেঁকি বসিয়ে নিলে কেমন হয়, তাই ভাবছিলাম আমি।

ঐ দাওয়ারই প্রান্তে একটু জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে দুখানা ঠাঁই করল। জয়ন্তী বলে, এত কী করছেন বলুন তো? একটা করে আম দিন হাতে—খেয়ে চলে যাই, ও সব হাঙ্গামার দরকার নেই।

বউটি ততক্ষণে প্রকাণ্ড দুই থালায় আম কেটে কাঁঠালের কোয়া ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। নিজে মুকুন্দ ঝকঝকে-মাজা কাঁসার গেলাসে জল পুরে এনে দিল।

আর খাবারের গন্ধে হোক, কিংবা জয়ন্তীর পরিচয় ছড়িয়ে যাওয়ার দরুনই হোক, পিলপিল করে একগাদা ছেলেমেয়ে এসে পড়ল। নানা বয়সের—ছমাস থেকে বছর বারো-চোদ্দ, সকল ধাপেরই আছে। নিতান্ত বাচ্চাগুলোকে বড়রা কাঁখে করে এনেছে।

খাওয়ার স্ফূর্তি উপে গেল জয়ন্তীর। তবে এটা নিজেদের বাড়ি নয়—নবদুর্গাকে যেমন বলেছিল, এখানে তা চলে না।

বিরক্ত যথাসম্ভব গোপন করে—বরঞ্চ মুখে একটু হাসির মতো ভাব এনে জয়ন্তী বলে, পাড়া ভেঙে এসেছে যে!

মুকুন্দ বলেন, পাড়া কোথায়—সবই এ বাড়ির! আমার ছটা, ছোট ভাইয়ের আটটা আর এক বিধবা দিদি আছেন তাঁর হলগে তিন। কত হল দেখুন এবারে যোগ কষে।

একটা-কিছু বলতে হয়, জয়ন্তী তাই বলে ওঠে, চমৎকার! সচকিত হয়ে মুকুন্দর দিকে তাকায়, মনের ভাব বেরিয়ে পরল না তো?

মুকুন্দ বলেন, সাত-আট গণ্ডা মুখে ভাত জোগাতে হয়, এই তো বিপদ? চমৎকার বলা যেত মা-জননী, যদি ওগুলোকে শুধু হাওয়া খাইয়ে রাখতে পারতাম—

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, ব্যাকরণের 'অনাদরে ষষ্ঠী' আমার সংসারে হুবহু খেটে যাচ্ছে। এত দূরছাই করি, কিছুতে তবু মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদ কমে না।

হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, ব্যস্তভাবে তিনি রান্নাঘরের দিকে গেলেন। কয়েকটি বাচ্চা ইতিমধ্যে সাহস করে দাওয়ার উপর উঠে খাওয়ার জায়গার সামনাসামনি জাপটে বসেছে। আমের এক-এক টুকরা থালা থেকে উঠে মুখ-বিবরে গিয়ে পড়ছে—অন্তর্বর্তী যাবতীয় প্রক্রিয়া তারা নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে নিরীক্ষণ করছে।

অমরেশ সর্বাধিক নিকটবর্তী মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করে, খাবি খুকি?

হ্যাঁ—বলে তৎক্ষণাৎ সে হাত পাতল।

এক চোকলা হাতে তুলে দিতে পাশের ছেলেটা বলে, আমায় দিলে না?

দেব বই কি, সক্কলকে দেব।

আম শেষ হয়ে গেলে সেই আগের মেয়েটা বলে, আমি কাঁঠালও খুব ভালো খাই।

জয়ন্তী বললে, ভালো খাও—তাই বা ছেড়ে দেবে কেন? শুনতে পাচ্ছ না অমরেশ কাঁঠাল চাচ্ছে—

কাঁঠাল-কোষগুলাও অমরেশ বাঁটোয়ারা করে দিল। চক্ষের পলকে

সমস্ত সাবাড। ভ্রূকুঞ্চিত করে জয়ন্তী দেখছিল। ব্যঙ্গের সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, আর খাবে?

হ্যাঁ—

নিজের থালাটা ঠেলে দিল ওদের মধ্যে। দিয়ে সে মুখ ফেরাল। রাক্ষসগুলোর কাডাকাডি চোখ মেলে দেখবার রুচি নেই। ভয়ও করে খাওয়ার রীতি দেখে।

দুহাতে দুটো বাটি নিয়ে মুকুন্দ রান্নাঘর থেকে বেরুলেন। জয়ন্তী উঠে পড়েছে। মুকুন্দ বলেন, এ কি, খাওয়া হয়ে গেল এর মধ্যে? ক্ষীর দিয়ে কাঁঠাল খেতে হয়—আমি তার একটু ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলুম মা—

জয়ন্তী তিক্ত কণ্ঠে বলে, সে জন্যে দুঃখ করবেন না। কিছু নষ্ট হবে না। হ্যাঁগো, ক্ষীর খাবে তোমরা?

হুঁ—উঁ—উঁ—

ক্ষীরের বাটি চালান করে দিল।

মুকুন্দ বলেন, সবই বোধ হয় ওদের দিয়ে খাইয়েছেন। মা কিছু মুখে দিলেন না গরিবের বাড়ি।

জয়ন্তী একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ক্ষীর-ভোজনরত ছেলেপুলের দিকে। অমরেশকে বলে, সারাদিন ধরে খাওয়া চলবে নাকি? হাত-মুখ ধোবে না?

একদল পাতিহাঁস আঁস্তাকুড়ের ময়লা খুঁচে খুঁচে খাচ্ছে। আঁচাতে গিয়ে জয়ন্তী নিম্নকণ্ঠে অমরেশকে বলে, এই হাঁসের পাল—আর দেখ, দাওয়ার উপর ঐ গুলোকে। এক রকম নয়? খাওয়াবার ইচ্ছে ছিল তো পল্টন কি জন্য এগিয়ে দিলেন আমিন মশায়?

পান সেজে বাটায় সাজিয়ে নিয়ে মুকুন্দর বউ দাঁড়িয়ে আছে। পান দিয়ে জয়ন্তীর পায়ের গোড়ায় ঢিব করে সে প্রণাম করল।

মুকুন্দ অমরেশকে দেখিয়ে দেয়, এঁকেও। আমাদের নতুন ম্যানেজার। ইনিই সর্বময় এখন। হবে না? মা-জননী একেবারে পুকুর-চুরি ধরে ফেলেছেন।

জয়ন্তী হেসে ফেলল।

এটা বাড়িয়ে বললেন আমিন মশায়। পুকুর অবধি ওঠে নি—খানা-খন্দ দু-চারটে।

মুকুন্দ জোর দিয়ে বলেন, তাই বা কেন হবে? জানেন না মা, আপনার হকের ধন মেরে অষ্টপ্রহর এখানে মচ্ছব চলছে।

তবুও উত্তপ্ত হল না জয়ন্তী। বলে, কিছু না, কিছু না—হকের ধন আবার কিসের? ধন-সম্পত্তি ঈশ্বর কি কাউকে ইজারা দিয়ে গেছেন? দৈবাৎ পেয়ে গেছি—খাচ্ছি-দাচ্ছি মজা করে।

অমরেশ কিছু জানে না, কখন ইতিমধ্যে সে নতুন ম্যানেজার হয়ে পড়েছে। মুকুন্দর কথা বিমূঢ়ের মতো শুনছিল। তার দিকে চেয়ে জয়ন্তী

বলে, তাই তো, ভুল হয়ে গেছে তোমায় বলতে। তুমি ছিলে না সে সময়টা—হঠাৎ একেবারে সর্বময় হয়ে পড়েছিলে। এখন অকশ্য চুকেবুকে গেছে—বুঝলে না—হুমকি দিয়ে আরও বেশি কাজ যাতে পাই। বয়স চেহারা কোনটাই আমার প্রবীণের মতো নয়—তাই দুটো গরম গরম কথা বলতে হয় পশার বাড়ানোর জন্য।

ও হরি, আসলে কিছুই নয়—শুধু পশার বাড়ানোর ব্যাপার। মুকুন্দ অনেক আশায় নতুন মুরুব্বির তোয়াজ শুরু করেছিল—সমস্ত ভুয়া। তার মুখ মলিন হয়ে গেল। মুখ টিপে হেসে জয়ন্তী বলে, ঠক-সিঁধেলদের বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে গোলমাল করতে নেই—বিপদ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাই মাপ করে দিয়েছি। কিন্তু পাকা লোক হয়েও আপনারা কেন বোঝান না আমিন মশায় ?

মুকুন্দ তটস্থ হয়ে বলেন আজ্ঞে ?

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেরা এস্টেটের চাকরিতে আসেন না, সবাই জানে। ম্যানেজারের দোষের কথা লিখে আমায় তো এদ্দূর অবধি নিয়ে এলেন, তিনি যদি এর পর আপনার পিছনে লেগে যান ?

মুকুন্দ আকাশ থেকে পড়লেন। আমি কখন লিখলাম মা ?

হাসতে হাসতে ফোলিও ব্যাগ থেকে জয়ন্তী ডাকের শিলমোহর-আঁকা পোস্টকার্ড বের করে ধরল।

বেনামিতে লিখেছেন। কে আমার এত বড় সুহৃৎ, কিছুতে পাচ্ছিলাম না। এখন 'পুকুর-চুরি' 'হকের ধন' কথাগুলো শুনে পরিষ্কার হয়ে গেল। হুবহু চিঠির ভাষা।

মুকুন্দ আমতা আমতা করে বলেন, আজ্ঞে আমি তো—

আপনিই লিখেছেন। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। আর 'পুকুর চুরি' যদি লিখতে বলি, অবিকল এমনি হরফই হবে। কিন্তু এক দলের মধ্যে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করা…ছিঃ।

মুকুন্দ চুপ করে রইলেন। জয়ন্তী বলে, আপনি এমন করলেন—অথচ মামা দেখি আপনার কথা বলতে অজ্ঞান। আমায় ধরেছেন, আমিন মশায় ভারি কাজের লোক—মাইনে না বাড়ালে অবিচার হবে। দিতে হল তাই দশ টাকা বাড়িয়ে। খবর জানেন না বুঝি, আপনার দশ টাকা মাইনে বেড়েছে।

ঢোক গিলে মুকুন্দ বললেন, না—তাই বলছি—আশুবাবু সত্যি সত্যি অতি মহাশয় লোক।

কেবল ঐ একটু চুরি-চামারির অভ্যাস—

মুকুন্দ হাঁ হাঁ করে ওঠেন। ওকথা বলবেন না, আজ্ঞে। সাগরের জল আঁচল ভরে নিলে সাগরের কি ক্ষতি হয় বলুন। বলে নিই আর না বলে নিই—খাচ্ছি পরছি আপনারই। সে আর নতুন কথা কি ? সবাই জানে।

মুকুন্দ সঙ্গে গিয়ে বাসাবাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবেন, কিন্তু জয়ন্তীর ঘোর আপত্তি। বুড়ো মানুষ রোদের মধ্যে অদ্দূর যাবেন, আবার ফিরে আসবেন—না, কিছুতে হতে পারবে না। নদীর ধারে ধারে এই তো সোজা পথ—এত অপদার্থ ভাবছেন কেন যে পথ চিনে যেতে পারব না?

অমরেশ আঘাতে আঘাতে মুশড়ে পড়েছিল—এই প্রাণোচ্ছল মেয়েটার সংস্পর্শে সে নতুন জীবন পেয়েছে, দুঃখ বেদনা ভুলে আছে কাল সন্ধ্যা থেকে। একটা না একটা খেয়ালে মেতে আছে জয়ন্তী—আশ্চর্য এক ক্ষমতা, আনন্দ আহরণ করে নিতে পারে সকল ক্ষেত্র থেকেই। খর রৌদ্র মাথার উপরে, খাওয়াও হল না—তবু দেখো, কেমন হাসতে হাসতে যাচ্ছে—খুনসুটি করছে অমরেশের সঙ্গে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে এক-একটা সামান্য সাধারণ কথায়।

হাসি হঠাৎ নিভে গেল। বাঁধের ধারে নালায় মাছ ধরা হচ্ছে, অনেক লোক জড় হয়েছে⋯কোমরে ঘুনসি-বাঁধা দিগম্বর ছেলে অনেকগুলি। হাঁ করে চেয়ে রয়েছে তারা—দেখাচ্ছে জয়ন্তীকে আঙুল দিয়ে। জয়ন্তী জোরে চলছে—খুব জোরে। হাঁটা নয়—দৌড়ান বলে একে। অমরেশ পিছনে পড়ে যাচ্ছে, ওর সঙ্গে তাল রাখা দায়। বাঁধের নতুন-তোলা মাটির চাংড়ায় ঠোক্কর খেয়ে একবার জয়ন্তী উহু—করে বসে পড়ল। অমরেশ ছুটে যায়। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জয়ন্তী—হাত ধরে তুলল তাকে। উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

বড় যেন আনন্দ। লাগে নি?

লাগে নি আবার। তবে অল্পের উপর দিয়ে গেছে। আনন্দ সেই জন্য।

এক নজর পিছনে তাকাল। ছোঁড়াগুলোকে দূরে অতিক্রম করে এসেছে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক—এইবারে সামাল হয়ে ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে।

কিন্তু অমন দৌড়াচ্ছিলে কেন? বাঘ দেখে পালাচ্ছ, এমনি ভাব।

জয়ন্তী বলে, বাঘের চেয়েও ভয়ানক। দৌড়াচ্ছিলাম চোখ বুঁজে। ল্যাংটা প্রেতগুলো না দেখতে হয়।⋯একবার কি হল, বলি শোনো। গাড়ি বিগড়েছে এক গ্রামের মধ্যে। যত ছা-বাচ্চা ছেঁকে এসে ধরেছে। আমার গতিক দেখে বোধ হয় মজা পেয়ে গেল। যত বলি চলে যা—কেউ আর নড়ে না। শেষটা চারটে করে পয়সা দিলাম তাতে আরও বিপদ। একজন গিয়ে পাড়ার মধ্যে বলে দেয়—পয়সার লোভে দশজন চলে আসে। বাচ্চার ঝাঁক দেখলে সেই থেকে বড় ভয় লাগে আমার।

অমরেশ বলে, ছেলেপুলে হল নারায়ণ। যীশু বলেছেন, শিশুদের কাছে আসতে দাও—কারণ স্বর্গরাজ্যটা তাদের।

স্বর্গে তবে আমার গরজ নেই অমরেশ। মরার পর নরক-বাস করব।

অমরেশ বলে, সে তো অনেক পরের কথা। বিস্তর সময় পাবে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবার। প্রার্থনা করি, সে দিন যোটে না আসুক। কিন্তু আপাতত কী করছ। সামনে ঐ জেলেপাড়া—পাড়ার ভিতর দিয়ে পথ। বাইরে ছিটকে-পড়া ঐ কটা ছেলে দেখে আঁতকে উঠলে, পাড়ায় তো অগুন্তি। আজকে আবার কিন্তু সেই মোটর বিগড়ানোর ব্যাপার হবে।

অসহায়ভাবে জয়ন্তী বলে, তবে?

জোয়ারবেলা, এখন সব জলে ভরতি। তখনকার মতো বাঁধ ছেড়ে যে চরের উপর দিয়ে যাবে, তার জো নেই—

অধীর কণ্ঠে জয়ন্তী বলে, বলো একটা কোন উপায়। নয় তো ভাঁটার সময় পর্যন্ত বসে থাকতে হবে কি এখানে?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে উপায় সে নিজেই ঠাওরাল। গাঙের দিকে নেমে যাচ্ছে। অমরেশকে ডাকে, এসো—

কোথায়? না জয়ন্তী, আবার এক দফা কাদা মাখতে আমি রাজি নই।

ডাকছি, এসোই না। কাদা মাখতে হবে না।

তারপর ছুটে এসে যেন বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তার হাত এঁটে ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অমরেশ বলে, কী হচ্ছে বলো দিকি? ওরা সব তাকিয়ে দেখছে, কী মনে ভাবছে—

জয়ন্তী তাচ্ছিল্য করে বলে, যা ইচ্ছে ভাবুক গে। তুমি কিছু ভাবছ না তো? তা হলেই হল।

ভাবছি বই কি।

জয়ন্তী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে যায়। বলে. সেটা অবস্থার অতিরিক্ত হয়ে যাবে। পরে পস্তাবে।

ঠিক ঐ কথাই ভাবছি। বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বলতে গেলে রাজরানী তুমি—এ তোমার রাজ্য। বিবেচনা করে চলা উচিত এখানে।

ঘাড় দুলিয়ে জয়ন্তী বলে, সেই জন্যেই তো। পাড়ায় পা দিলেই ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ তটস্থ হয়ে উঠবে। ভারি বিশ্রী লাগে—আমি যেন আজব দেশের মানুষ। পাড়ার মধ্যে আমি কিছুতে ঢুকব না।

ছোট্ট ডিঙি বাঁধা আছে ঝোপের পাশে—জোয়ার-বেগে দুলছে। জয়ন্তী লাফিয়ে উঠল তার উপর। একদিকে কাত হয়ে খানিক জল উঠে গেল। পাকা মাঝির মতো বসে পড়ে বোঠে হাতে জয়ন্তী হুকুম করে, কাছি খুলে দাও—

অমরেশ বলে, এত টানের মুখে ভেসে পড়া ঠিক হবে না। ডাঙায় এসো।

জয়ন্তী বলে, আমি একাই যাচ্ছি তা হলে। ডাঙায় ডাঙায় তুমি হেঁটে যাও। পাড়া পার হয়ে গিয়ে খাল-ধারে তুমি দাঁড়িও—সেইখানে নাবব

আমি।

এমন অবস্থায় আর দ্বিধা করা চলে না, কাছি খুলে দিয়ে অমরেশ গলুয়ে উঠে পড়ল। আনাড়ি হাতের বোঠে ধরা—ডিঙি টলমল করছে। তারপর স্রোতের মুখে পড়ে তীরবেগে ছুটল।

জয়ন্তী হাততালি দিয়ে ওঠে।

কী জোরে ছুটছে! কেমন বইতে পারি তা হলে দেখো।

অমরেশ সভয়ে বলে, বোঠে ছেড়ে বাহাদুরি করছ, টানের মুখে নৌকো বানচাল হবে—

বেশ তো, মজা করে সাঁতার কাটা যাবে—

সাঁতার জান তুমি?

দিইনি কখনো সাঁতার। কিন্তু শক্তটা কি? হাত-পা মেলে জলে দাপাদাপি করলেই ভেসে থাকা যায়—

দোহাই তোমার? হাত-পা মেলে আবার তা দেখিয়ে দিতে হবে না। বোঠে বাও. শিগগির ধরো বোঠে। নৌকোর মাথা ঘুরে গেল যে?

জয়ন্তী অভিমান করে বলে, অত বোকো না। জীবনে এই প্রথম ধরলাম বোঠে। এর চেয়ে আর কি হবে? এ-ই বা কজনে পারে?

জোয়ারের নদী অভিমানের মর্যাদা রাখেন না। অবস্থা সঙ্গিন হয়ে ওঠে। অমরেশ বোঠে ছিনিয়ে নিল, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল জয়ন্তীকে।

সরো, কী সর্বনাশ, কী তোমার দুঃসাহস। যায় যে নৌকো!

প্রাণপণে বাইছে। হাতের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে। কিন্তু ঐটুকু এক বোঠের সাধ্য কি, গতি আটকাবে, তীরবেগে ছুটছে মাঝনদীর খরস্রোতে পড়ে। খড়-বোঝাই বৃহৎ এক সাঙড়ের গায়ে সজোরে ধাক্কা লাগল। অমরেশ সর্বশেষ প্রান্তে—ছিটকে পড়ল সে আঘাত পেয়ে। কিংবা প্রাণের জন্য হয়তো বা জলে লাফিয়ে পড়েছে। আর্তনাদের মতো উঠল নিমেষের জন্য। একটুখানি শুভগ্রহ—আট-দশটা জোয়ান লাফিয়ে পড়ল সাঙড় থেকে। ডিঙি ধরে ফেলে অনেক কষ্টে সাঙড়ের কাছে নিয়ে আসা হল। জয়ন্তী রক্ষা পেয়েছে। আর অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে, অমরেশ স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণে ভেসে থাকবার চেষ্টায় আছে।

অনেকক্ষণ অনেক চেষ্টার পর অমরেশকে তোলা গেল। এলিয়ে পড়েছে সে। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে এতক্ষণ কোনো রকমে যুঝছিল। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল নৌকোর উপরে এসে।

খোকন, তোর বাপ অতি পাষণ্ড। জোচ্চোর, ফেরেববাজ। তোকে গছিয়ে দিয়ে পালাল। দেখতেও আসে না একবার। কেন আসে না বল্ দিকি? ভয় আছে, পাছে তোকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিই—

খোকন বলে, আঁ—

খবরের কাগজ হাতে নিয়ে মনোরমা শুয়েছিল খোকার পাশে। হঠাৎ

খোকা কাগজের প্রান্ত মুঠি করে ধরল।

রাখো, রাখো—ছিঁড়ে যাবে যে। ফটিকের কাগজ—মাস্টার ফেরত দিতে হবে। পড়বার ইচ্ছে হয়েছে? খোকন আমার ভাবি বিদ্বান—কাগজ পড়বে। আচ্ছা, তুমিই পড়ো তা হলে—

খোকন, দেখো, দুই হাতে ধরেছে কাগজটা। প্রবীণ মানুষের মতো দৃষ্টি ঘুরছে এদিক থেকে ওদিক। সত্যি সত্যি পাঠ হচ্ছে যেন। খবরটা বলো না খোকন, নতুন মিনিস্টার কে কে হলো? ওমা, কি কুরুক্ষেত্তোর ব্যাপার—দুম-দুম করে পা দাপাচ্ছে কাগজ ছেড়ে দিয়ে। মিনিস্টার পছন্দসই নয় বুঝি?...এই যা-গেল তো ছিঁড়ে? তোকে নিয়ে পারা যায় না খোকন, দস্যি ছেলে হয়েছিস তুই। এখনই এই—আর যখন বড় হবি—হাঁটতে শিখবি?

এতক্ষণে জনার্দন আহ্নিক সেরে উঠে এলেন।

কী বকছিস রে একা-একা?

একা নয়, খোকনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। বুদ্ধি কত। সব বুঝতে পারে। নইলে তাক বুঝে সায় দেয় কেমন করে?

মনোরমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বাপের ভাত বেড়ে দিচ্ছে। আর সময় নেই, অসময় নেই—জনার্দনের সেই এক কথা। মেয়ের সঙ্গে আর যেন বলবার কিছু নেই।

এ মাসেরও ভাড়া দিতে পারলাম না। ফটিক তড়পাচ্ছে। উপায় দেখ মনো। পরের পোলার সোহাগ করেই দিন কাটাবি?

এইটুকুতেই মনোরমার চোখে জল এসে যায়।

সবাই ঝেড়ে ফেলতে পারে বাবা, আমি যে পারি নে। কত কষ্ট করে বাঁচিয়ে তুলেছি, কত রাত জেগেছি—

তার মজুরো কেউ দেবে না রে—সমস্ত বরবাদ। সে বেটা এক নম্বর শয়তান—পালিয়ে রয়েছে। বেঁচেছে পালিয়ে গিয়ে। বয়ে গেছে তার টাকা পয়সা মিটিয়ে ছেলে ফেরত নিতে।

কিন্তু আমি কী করি এখন? ছুঁড়ে ফেলে দেব রাস্তার নর্দমায়? কী করতে বলো তুমি আমায়?

জনার্দনও ভেবে হদিস পান না। এ যে বিষম বিপদ হল। হায় ভগবান! চিরকাল ধরে পুষতে হবে ঐ ছেলে?

শুনছিস তো খোকন, বাবা দিনরাত দুষছেন। কী যে করি তোকে নিয়ে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবার—তাই সব-সময় এমন খিটাখিট করেন। বুড়ো মানুষ, চোখে ভালো দেখেন না—অভ্যাসবসে কাজ করে যাচ্ছেন। নইলে ওঁর কি খাটবার অবস্থা আছে! আমারও রোজগার হচ্ছে না, বিশ রকম তোর বায়না কুলিয়ে বেরুই কখন? বড় হয়ে যা খোকন শিগগির শিগগির।...চাকরি-বাকরি করে হ্যাট মাথায় দিয়ে খোকন বাবু

তো বাড়ি আসছেন! মা, পুজোয় তোর জন্য জামা-কাপড় নিয়ে এসেছি—আর দাদুর এই তসরের জোড়, তসর পরে দাদু পুজোয় বসবেন। আহা, এত বয়সের মধ্যে আহ্লাদ করে কেউ কিছু দেয় নি তোর দাদুকে। তসর পেয়ে বড্ড খুশি হবেন—বকবেন না, কত ভালবাসবেন তোকে দেখিস।

ভেবেচিন্তে মনোরমা গুহ সাহেবের বাড়ি গেল। পনেরোটি টাকা অন্ততপক্ষে—ফটিকের এক মাসের ভাড়া—মঞ্জু-বউয়ের কাছে হাওলাত চাইবে। এক মুশকিল—হাওলাত নিয়ে এলে আবার কি ফেরত নেবে ঐ টাকা? মঞ্জু-বউর মেয়ে যায়-যায় হয়েছিল ও বছর—যমের সঙ্গে টানাটানি দু-মাস ধরে। মঞ্জু-বউ শয্যাশায়ী। যম পরাভয় মানল শেষটা—মায়ের বুকের ধন মায়ের কোলে সে তুলে দিয়ে এলো। মঞ্জু-বউ সজল চোখে হাত ধরে বলেছিল, এ মেয়ে তোমার ছোট বোন। বোন আর মেয়েকে দেখে যেও মাঝে মাঝে এসে। সম্পর্ক যেন শেষ হয়ে যায় না…

আজকে এক কাণ্ড হল খোকন। শোন্। মঞ্জু-বউর কাছে—না, টাকাকড়ির জন্য কক্ষনো নয়—এমনি গিয়েছিলাম। যেতে হয় রে, আলাপ পরিচয় রাখতে হয়। এর বাড়ি থেকে ওর বাড়ি এমনি ভাবে পরিচয় বাড়াতে হয়—তবে তো লোকে ডাকবে আমাদের হাসিস কেন রে হেসে-কুটে গেলে—হাসলে আমি কিন্তু কিচ্ছু বলব না। আমি দুঃখধান্দা করব, আর যা বলতে যাব উনি হেসেই কুটিকুটি। কী হল শোন্ না রে—মঞ্জু-বউর মেয়ে কী সুন্দর যে হয়েছে? সেই মেয়ে, যাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম। আহা, ঠোঁট কোলাতে হবে না…কী ডিংসুটে হয়েছিস তুই খোকা। ফুটফুটে রঙ হতে পারে, কিন্তু দেখতে কি আর তোর মতন। এক দশেক বয়স তখন—বিছানার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। কত বড় হয়ে গেছে খুকি, ফ্রক পরে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। কত চেষ্টা করলাম, একটা বার কাছে এলো না। অথচ প্রাণ দিয়াছিলাম আমিই তো। ওর মা কী বলল জানিস? বলে, একবারে সুহাসের রীত পেয়েছে। সুহাস হল মঞ্জু-বউর স্বামী। বড়মানুষ ওরা, স্বামীর নাম ধরে ডাকে—স্বামীর কথা বলতে যেন গরবে ফেটে পড়ে। বলে, যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। ভারি সাফসাফাই—এক কণিকা ধুলো লাগতে দেয় না গায়ে বা জামা-কাপড়ে। তোমার ঐ যে ময়লা কাপড় দেখেছে।… মানে পাকে-প্রকারে ও-ই কোলে নিতে দিল না। ও যদি চেষ্টা করত, আসত না কি মেয়েটা? বয়ে গেল—তুই আমার কোল জুড়ে থাক খোকন। টাকা চাই নি আমি—বল্ তুই, ঐ ব্যাপারের পর টাকা চাইতে পারি মঞ্জু-বউর কাছে? রাগ করে চলে এলাম।

খোকা বলে, উঁ—

কত বুদ্ধি-জ্ঞান খোকনের আমার, ভেবেচিন্তে তার পরে মতামত দেওয়া হয়। বটেই তো। সোজা ব্যাপার নয়—

ভ্যাবভ্যাব করে খোকা চেয়ে আছে—কত যেন বুঝছে। অবোধা ভাষায় দুঃখ করছে সে যেন। মনোরমা আরও আকুল হয়ে পড়ে, হু-হু করে জল ঝরে পড়ে দু-গাল বেয়ে।

কত ছেলেমেয়ে ধরলাম আজ অবধি! তাদের বুকে করে করে বাঁচিয়েছি। মা-বেটিরা কী করেছে—গদির বিছানায় পড়ে পড়ে কাতরেছে শুধু—তখন তো মা-ই আমি তাদের। সুস্থ হয়ে উঠে তার পর যে যার ঘর গুছিয়ে নিল—আমার আর তখন দরকার নেই। এত সংসার ভরে দিলাম—ভগবান, আমায় একটা সংসার দিলে না! দায়ে না পড়লে কেউ ডাকে না—গিয়ে দাঁড়ালেও চিনতে চায় না। মাংসের এক-একটা দলা—কাদা দিয়ে পুতুল গড়ার মতো—নাকটা একটু টিপে কপালটা একটু চেপে ধীরে ধীরে তাদের মানুষের আকৃতিতে নিয়ে এলাম, তারা আমায় দেখে পালায়। পেত্নী-শাকচুন্নির গল্প শুনে থাকে, তারই হয়তো একটা ভাবে আমায়।

শেষ পর্যন্ত ফটিকই একটা ব্যবস্থা করে দিল। বাড়ি-ভাড়া আদায়ের চাড় আছে। বলে, এতগুলো টাকা বরবাদ হয়ে যাবার দাখিল। দেবে কোত্থেকে একটা উপায় জুটিয়ে না দিলে? ঐ যেমন অমরেশবাবুর বেলায় হল—একখানা ভাঙা চৌকি আর খানচারেক ফুটো থালা-বাটিতে সমস্ত শোধবোধ।

মনোরমাকে বলে, ভালো কপাল তোমার? কাজ জুটেছে। যা তুমি করে বেড়াও, সে রকম দু-দিন পাঁচ দিনের ছেলে-ধরুনি কাজ নয়। লক্ষপতি লোকের বউয়ের অসুখ। অসুখ হল হাঁপানি—সারেও না, মরেও না। লেগে যদি যায়—চাই কি চিরকাল ধরে চাকরি চলবে। সারাদিন এমনি বেশ থাকে—রাত হলেই রোগী শ্বাস টানতে আরম্ভ করে।

মনোরমা বলে, রাতে থাকা আমার পক্ষে যে মুশকিল—

রাতেই তো ভালো? বড়লোকের বাড়ি—ভালো খেয়ে-দেয়ে মজাসে ঘুমোবে। বড্ড চেঁচামেচি করলে উঠে ঢুলতে ঢুলতে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দেওয়া। ওর বেশি কোন্ নার্স কোথায় করে থাকে? সকাল হলে আর-এক দফা চা-টা খেয়ে ডবল ফী আদায় করে নিয়ে বাড়ি চলে আসবে।

কিন্তু ছেলে—

আরে মোলো! আখের খোয়াবে তুমি পরের ছেলের জন্য?

মনোরমা ভাবল অনেকক্ষণ। এমন কাজটা জুটিয়ে নিয়ে এসেছে, ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। সংসার অচল, কাজ না নিয়ে উপায় কি?

কবে থেকে ফটিক? যেতে কিন্তু খানিকটা রাত্রি হবে, ছেলে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তারপর বেরুব। একটু রাত করে যেন গাড়ি পাঠান—বলে দিও।

তাই হল। গলির মোড়ে মোটর হর্ন দিচ্ছে। কিন্তু ছেলের কী হয়েছে আজকে যেন, ঘুমোতে চায় না—কিছুতে ঘুমোবে না। ফটিক বারম্বার

তাগিদ দেয়, হল তোমার? বড়লোক মানুষ—কতক্ষণ থাকবেন রাস্তার উপর পড়ে?

নিজে এসেছেন?

আসবেন না? তাই বললেন আমায়, বউ ছটফট করছে—হাঁপানি আজকে বড্ড বেড়েছে—এ তিনি চোখের উপর দেখতে পারলেন না। উদ্বেগে বেরিয়ে পড়েছেন। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আর দেরি কোরো না তুমি—

দেরি কি ইচ্ছে করে করছি? কাণ্ড দেখো—ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে এখনো। এইও—চোখ বোঁজ বলছি। দেবো চোখে আঙুল পুরে। আমার সবদিক তুই নষ্ট করে দিলি।

রাগ করতে গিয়ে হেসে ওঠে মনোরমা।

না গো, মুখ ফেরাতে হবে না তোমার। বুদ্ধিটা দেখো ফটিক, সমস্ত কেমন বুঝতে পারে। ...তোমায় আমি বলি নি কিছু। তুমি হলে সোনা মানিক—তোমায় বলা যায় কিছু? বলেছি ফটিককে। বড় দুষ্টু ওটা।

ফটিক বিরক্ত হয়ে বলে, ঐ করো বসে বসে। বাবু চটে যাচ্ছেন, চলে যান তিনি তা হলে—

মনোরমাও একটু উষ্ণ হয়ে বলে, চটলে আমি কী করতে পারি? ইচ্ছে করে তো দেরি করছি নে। বাবুকে বুঝিয়ে বলো একটু। তোমার ঘরে নিয়ে বসাও—

বিড়বিড় করতে ফটিক চলে গেল।

ছেলে ঘুমুল, তখন সাড়ে-আটটা বেজে গেছে। দোকান বন্ধ করে এসে জনার্দন আহ্নিকে বসেন। আহ্নিক শেষ হয়েছে, এইমাত্র বাপকে সমস্ত ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে মনোরমা বেরিয়ে পড়ে। কয়েক পা গিয়ে আবার নতুন কথা মনে পড়ে।

উঠে উঠে কাঁথা বদলে দিতে হবে বাবা। খেয়াল রেখো। ভিজে কাঁথায় থাকলে অসুখ করবে।

জনার্দন রাগ করে বলেন, লাট সাহেবের বাচ্চা কিনা—আঙুরের মতো সমান করে তুলোর বাক্সে রাখতে হবে। যাচ্ছিস তাই চলে যা। অত কিসের?

গাড়িতে উঠে মনোরমা অবাক হল। ফটিক নাম বলে নি—দামোদরবাবু—দামোদর মান্না। লক্ষপতি বলে পরিচয় দিয়েছিল—লক্ষপতি বললে ছোট করা হয়, অনেক লক্ষ আছে ব্যাঙ্কে। এই বস্তির জমি এবং শহরের উপর আরো বহু জমি ও বাড়ির মালিক। দামোদরের ছিটেফোঁটা প্রসাদ পেয়েই ফটিক এমন মাতব্বর।

হু-হু করে ছুটেছে গাড়ি। গাড়ির ভিতর আবছা আঁধার।

পথ জনবিরল। মনোরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সহসা গায়ের উপর একটা হাত এসে পড়ায় চমকে উঠল।

সরে বসুন—

কেন রে, কী হয়েছে?

কঠিন স্বরে মনোরমা বলে, তর্কে কী হবে? যা বললাম, ওপাশে সরে গিয়ে বসুন—

ভালো রে ভালো! আমার গাড়ির মধ্যে তুই বসে হুকুম চালাবি?

গরীব আছি বলে অমন তুই-তোকারি করবেন না—

হুজুর-জাঁহাপনা বলতে হবে নাকি রে? ঢং রেখে দে, ঢের ঢের দেখা আছে আমার।

তবে বাবু গাড়িটা রুখতে বলুন। ড্রাইভারের পাশের সিটে গিয়ে বসব।

আমি লোক খারাপ—আমার পাশে ছারপোকা কামড়ায়? ড্রাইভার ঋষিতপস্বী—এই বলতে চাচ্ছ?

ঋষিতপস্বী কেন হবে—গরীব লোক, ছোটলোক। তাই বড়লোক মনিবের সামনে ইতরামি করতে সাহস করবে না।

দামোদর অগ্নিশর্মা হলেন।

এত বড় কথা! ইতর বলা হয় আমাকে? জানিস, আমি যাচ্ছেতাই করতে পারি এখানে। ড্রাইভার আমার চাকর—তাকে ডরাই নাকি? যা করব সে মুখ বুজে দেখবে—টুঁ শব্দ করবে না।

কিন্তু আমি চেঁচাব। লাফিয়ে পড়ব গাড়ি থেকে। আপনাকে খুনের দায়ে ফেলব। স্ত্রী হাঁসফাস করছেন, প্রাণ তাঁর কণ্ঠাগত—ছি-ছি, মানুষ না জানোয়ার আপনি? এই ড্রাইভার, গাড়ি থামাও বলছি—

•

শহরতলী জায়গা—যুদ্ধের সময় মিলিটারির দখলে ছিল, এখন নতুন শহর গড়ে উঠছে। দশ-বিশটা বাড়ি উঠেছে—বসতি জমে নি এখানে। এই প্রহরখানেক রাতেই নিষুপ্তি চারিদিকে। পায়ে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। তা আবার রাস্তায় আলোর অভাব। এতদূর অন্ধকার পথ অতিক্রম করে একাকী চলে আসা মনোরমা বলেই পেরেছে।

বাবা—

জনার্দনের ঘুম এসেছিল, ধড়মড়িয়ে উঠলেন। খিল খুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে রাতের আন্দাজ নিলেন।

এরই মধ্যে এলি?

কণ্ঠ তিক্ত হয়ে উঠল। বললেন, ছেলে রেখে গিয়ে সোয়াস্তি নেই? ভরসা হয় না আমার কাছে? ঐ ছেলে শেষ করবে আমাদের।

মনোরমা আকুল হয়ে বলে, গিরি-গিরি করব বাবা, বাড়ি বাড়ি কেচে বাসন মেজে বেড়াব। এমন কাজে আর নয়।

হারিকেন টিপ-টিপ করছিল। জোর বাড়িয়ে জনার্দন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হলেন।

কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ?

ফটিকের লোক বাবা, দামোদর মান্না। চেঁচামেচি করে আমি মোটর থেকে নেমে এসেছি।

জনার্দন আর একটি কথাও না বলে দোকান-ঘরে ঢুকলেন। ঐ ঘরে থাকেন তিনি। এ ঘরে মনোরমা আর ছেলে।

এইবার খোকার দিকে নজর পড়ল। আরে সর্বনাশ—ভাগ্যিস মনোরমা এসে পড়েছে ? ছেলে বিছানা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে স্যাঁতসেঁতে মেজের পড়ে আছে। সারা রাত এমনি থাকলে রক্ষে ছিল ? বাবার তাই তা দেখা যাচ্ছে —বুড়ো আর বাচ্চা একই রকম। একের ভার অন্যের উপর দিয়ে গেলে এমনি দশা ঘটে।

অনেক রাতে কখন চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে বারাণ্ডার উপর—সেখান থেকে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে, যেখানে ছেলে নিয়ে মনোরমা ঘুমুচ্ছে। সমস্ত বেদনা-অপমান মুছে গেছে ছেলে বুকের ভিতর আঁকড়ে ধরে, নিশ্চিন্ত আরামে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে যেন কানে এল, নাম ধরে অনুচ্চ কণ্ঠে বারম্বার কে ডাকছে।

চোখ মেলে মাথা কাত করে দেখতে পেল জনার্দনকে। জনার্দন বললেন, দরজা খোল্—

সাড়া দিল, উঁ—

ঘরের মধ্যে এসে চুপিচুপি বললেন, বাঁথা বালিশগুলো বেঁধে নে তাড়াতাড়ি।

মনোরমা কিছুই বুঝতে পারছে না, বিস্মিত চোখে তাকাল। জনার্দন বললেন, দোকানের জিনিসপত্তোর পাচার করে দিয়ে এসেছি আমার এক গুরুভাইর বাড়ি। রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি অবধি সরিয়েছি। এই তো করছি সেই তখন থেকে। তোর ঘরের এইগুলো শুধু বাকি।

মনোরমা বলে, পালাচ্ছি আমরা ?

নয়তো কি রক্ষে রাখবে ? ফটিকের মতলব বানচাল করে এসেছিস— সকাল বেলা যখন টের পাবে, সকলের আগে আমাদের জিনিসপত্তোর আটকাবে। দোকানে হয় না হয় না করেও নুন-ভাতটা তবু জুটে যাচ্ছে। দোকান গেলে খাব কী ?

একটুখানি চুপ করলেন। বললেন, আর ভাবছিলামও অনেক দিন থেকে, এ-পাড়ায় ছবির খদ্দের নেই—ভালো জায়গা কোনোখানে উঠে যেতে হবে।

অনেক দূরে এসে গেছে তারা—একেবারে ভিন্ন অঞ্চলে। ভোরের বেশি দেরি নেই। এতক্ষণে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে জনার্দন বললেন, আর ফটিকের তোয়াক্কা রাখি নে। ভেবেছে কী শয়তান বেটা—পয়সা দিয়ে মাথা কিনেছে ? গরিব বলে তাই এমনি ব্যাভার !

গলা বুঝি ধরে আসে। মনোরমা কথা ঘুরিয়ে নেয়।

গরিব বলেই তো হাঙ্গামা কম হল বাবা—জিনিসপত্তর সহজে সরিয়ে ফেললে। কোনোদিন যে ওখানে ছিলাম, সকালবেলা কেউ তার চিহ্ন দেখতে পাবে না।

মাস দুয়েক অমরেশ হাসপাতালে ছিল। তার পর থেকে জয়ন্তীর বাড়ি। বেশ আছে—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব। চেহারা ভালো বরাবরই—ইদানীং স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে, গায়ে রঙের জৌলুষ খুলেছে। একটা ভাবনা আসে মাঝে মাঝে—ছেলেটার কী হল? মরে গিয়ে থাকে তো ভালোই—সকলের পক্ষে। নয় তো মনোরমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে। বেশ হয়েছে, টাকার জন্য আটকেছিল—বোঝো এখন মজা। অমরেশ সে বস্তু নয় যে হাহাকার করে গিয়ে পড়বে সজীব ঐ মাংসপিণ্ডটুকুর জন্য—ছেলের নামে আর দশজনা যেমনটা করে থাকে। গদ গদ হবার কী আছে—আক্রোশ বরঞ্চ ছেলেরই উপর, রেবা মারা গেল যার কারণে।

গাদা গাদা ফল মিষ্টি-নিয়ে জয়ন্তী হাসপাতালে যেত। অমরেশ বলত, এত কেন? বিশ জনে খেয়েও যে ফুরোতে পারে না—

জয়ন্তী বলত, তা আছেও তো ওদিকে বিশের অনেক বেশি। পড়ে থাকবে না, ফুরিয়ে যাবে।

নিকটে দূরে রোগিগুলোর উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি বুলিয়ে বলে, তুমি এখানে ছিলে—সেই কথা মনে রাখবে ওরা চিরকাল।

মনে থাকবে চিরকাল আমারও। ভাঙা পা আর খাড়া হবে না—পঙ্গু হলাম চিরদিনের মতো।

জয়ন্তী শুনেও শোনে না—ফল কাটছে, খাবার সাজাচ্ছে।

খোঁচাটা প্রকট করবার অভিপ্রায়ে অমরেশ আবার বলল, তোমার খেয়ালের জন্যই জয়ন্তী। কুক্ষণে নৌকো বাইতে গেলে—

নিস্পৃহভাবে জয়ন্তী বলে, হয়েছে কী তাতে? পূর্বপুরুষের ল্যাজ ছিল মাছি তাড়াবার জন্য। ল্যাজ খসে গেছে আমরা অন্য দিক দিয়ে সক্ষম হওয়ায়। এত রকম-বেরকমের গাড়ি বেরিয়েছে—বিজ্ঞান যুগে এখন পায়ের দরকারটা কি বলতে পারো?

পা সকলের, গাড়ি আর ক-জনের?

অন্তত তোমার একখানা হওয়া উচিত, পা গেছে যখন।

ব্যঙ্গের সুরে অমরেশ বলে, দেবে নাকি তুমি? তা হলে অবশ্য দুঃখ করা সাজে না। একটা পায়ের জন্য হাজার বারো চোদ্দর গাড়ি—ভালো দাম বলতে হবে বৈকি!

আচ্ছন্ন করে রেখেছে জয়ন্তী এই মাসগুলো। মুহূর্তের ফাঁক দেয় না যে, নিরিবিলি অমরেশ অবস্থাটা পর্যালোচনা করে দেখবে। এই গান

গাচ্ছে, এই গল্প বা তর্ক জুড়ে দিয়েছে…তাস খেলছে…একটা বই পড়ে শোনাচ্ছে। অথবা নিয়ে বেরুল গাড়ির ভিতরে পুরে। গাড়ি তখন ড্রাই-ভারে চালায়, সে অমরেশের পাশে বসে বকবক করে। গাড়ি চালাতে গেলে অনর্গল বাক্যবর্ষণ চলে না, তাই জয়ন্তী ইদানিং গাড়ি-চালানো ছেড়ে দিয়েছে।

*   *   *

পৌষ মাসের শেষে আশুতোষ সদরে ইরশাল করতে এলেন। নিজের আসার প্রয়োজন ছিল না, নায়েব মুহুরিদের দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলত। কিন্তু সেই মফস্বল মৌজা অবধি নানাবিধ রটনা পল্লবিত হয়ে পৌঁছেছে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে তাই নিজে এসে পড়েছেন। ইতঃস্তত করলেন খানিকটা, নানা দিক দিয়ে ভেবে দেখলেন। কিন্তু যতই হোক, সম্পর্কে মামা তো বটে,—নির্বিকার ঔদাসীন্যে চক্ষু বুঁজে থাকেন তিনি কী করে?

এত বড বাড়িতে একা-একা থাক কি করে মা? একটা-দুটো দিনের জন্য এসেই আমরা হাঁপিয়ে উঠি।

জয়ন্তী হাসিমুখে বলে, একা কোথায়? কতই তো লোকজন! চাকরে আর দারোয়ানে মিলে কতগুলো হয়, সেইটেই শুধু হিসাব করে দেখুন না।

আশুতোষ স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলেন, বাজে লোক দিয়ে কী হবে? সর্বক্ষণের সাথী চাই যে একজন—

তা ও আছে। রাতদিনের জন্য রোহিণী রয়েছে। বাইশ টাকা হাত-খরচ পায়—কিন্তু ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

আশুতোষ বলেন, এত বিষয় সম্পত্তি ঘর বাড়ি, এমন রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি —তা ঐ রোহিণী-ঝি নিয়েই কাটিয়ে দেবে নাকি? বলি, বিয়ে-থাওয়া করতে হবে না?

নিশ্বাস ফেলে বলেন, মিত্তির মশায় বর্তমান থাকলে কাকে কিছু ভাবতে হত না। তাঁর কত রকম সাধ ছিল! আমাকেই শুধু খুলে বলতেন মনের কথা।

বাপের কথা মনে পড়ে জয়ন্তীর কষ্ট হয়। বলে, মা কোন্ ছেলেবেলায় গেছেন। বাবাও গেলেন। বেশ তো আছি—কি দরকার, বলুন, আর হাঙ্গামা জড়িয়ে?

শোন মেয়ের কথা। তাঁরা গেছেন, এই বুড়ো হাড় ক-খানা এখনো খাড়া আছে! তার উপরে তোমার মামী—সে তো এদেশ-সেদেশ ঘোড়-দৌড় করাচ্ছে আমায় দিয়ে।

জয়ন্তী বলে, না মামা, দরকার নেই, এদেশ-সেদেশ করে—

দরকার তোমার না থাক, আমাদের আছে যে? হীরের টুকরোর মতো একটি ছেলে চাই যে আমাদের নতুন বাপ হয়ে মাথার উপর বসবে।

জয়ন্তী জেদ ধরে বলে, তা সে যা-ই হোক—বুড়ো মানুষ আপনাকে

দৌড়ঝাঁপ করিয়ে মেরে ফেলতে দেব না। ঘরে যা আছে, তাতেই মামীর খুশি হতে হবে।

ঘরে কে আবার?

আশুতোষ ইচ্ছে করেই অজ্ঞতা দেখাচ্ছেন। নইলে কে সেই মানুষটা পথের ফকির হয়ে রাজতক্তে বসতে যাচ্ছে—তা কি আর জানেন না? কানাঘুসো যা শুনেছিলেন, মুখের উপর কালামুখী সেটা প্রকাশ করে বলছে। এতখানি নির্লজ্জতা স্বপ্নে কেউ ভাবতে পারে না। কিন্তু একেবারে স্পষ্ট করে না বলা পর্যন্ত আশুতোষও আমল দেবেন না।

হতবুদ্ধির ভাবে আশুতোষ বললেন, কার কথা বলছ মা-জননী?

এতক্ষণ বসে বসে আলাপ করে এলেন যার সঙ্গে—

ঐ খোঁড়াটা?

আকাশ থেকে পড়ছেন যেন তিনি।

খোঁড়ার হাতে মেয়ে দেব দেখে-শুনে?

দেখে শুনেই তো দেবেন। খোঁড়া ছিল না—আপনাদের মেয়ে খোঁড়া করেছে। তাতে দায়িত্ব বর্তাচ্ছে।

দৈব দুর্ঘটনা—এমন কতই হচ্ছে অহরহ। জামাই করে তার দায়িত্ব শোধ করতে হবে—ভালো রে ভালো।

জয়ন্তী জবাব দিল না, টিপি-টিপি হাসছে।

আশুতোষ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে বলেন, সত্যি সত্যি বিয়ে করবে ওকে—না ভয় দেখাচ্ছ বুড়োকে?

জয়ন্তী সংশোধন করে বলে, বিয়ে হবে আমাদের। অমরেশ রাজী হয়েছে।

আশুতোষ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, রাজি হয়েছে তো মিত্তির মশায়ের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল। ও পাগল ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়? হ্যাংলাটা তো কড়ে-আঙুল বাড়িয়েই আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন রুচিতে তুমি মা ওটাকে পছন্দ করলে?

জয়ন্তী বলে, আপনার যে জামাই হবে তার সম্বন্ধে এমন করে বলা কি ঠিক হচ্ছে মামা? বিশেষ করে যে তার স্ত্রী হতে হচ্ছে, তারই মুখের উপর—

একেবারে পাকাপাকি হয়ে গেছে? এতখানি আমি বুঝতে পারি নি। সুর নরম করে আশুতোষ বলতে লাগলেন, তা বেশ! সুখী হও, বেঁচেবর্তে থাকো। তবে কিন্তু মা, আমায় এর মধ্যে থেকে ছেড়ে দিও। স্বর্ণপ্রতিমা গাঙের জলে বিসর্জন যাবে, এ আমি চোখে দেখতে পারব না।

জয়ন্তী কঠিন হয়ে বলে, গাঙ তবু অনেক ভালো, পচা ডোবায় পড়তে হল না—

পচা ডোবা বলছ কাকে?

আপনার শালার ছেলে। বার পাঁচ-সাত চেষ্টা করেও যে আই. এ.-

ট্টা পাশ করতে পারল না।

কিন্তু চেহারায় চরিত্রে আলাপ আচরণে অমন আর একটি খুঁজে বার বের করো দিকি। চাকরি করে খেতে হবে না—কোন দুঃখে বিছের বোঝা বয়ে মরবে?

একটু থেমে আবার বলেন, আর বিছে হলেই যদি মন ওঠে, বেশ তো, বিদ্বানও আছে—

আপনার ভাইপো রণধীর বোধ হয়। সেকেণ্ড ক্লাস সেভেন্থ। আর অমরেশ ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড।

আশুতোষ রাগতভাবে বললেন, ভাইপো-ভাগনে আমার আপন লোক—তাদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু শুধু দুটিমাত্র তো নয়—ঢের ঢের ভালো ছেলে আছে বাজারে। ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্টও আছে।

রোহিণী এসে দাঁড়িয়েছে। আশুতোষ ঝি বলে পরিচয় দিলেও ঠিক ঝি নয়। জয়ন্তীদের দূর-সম্পর্কিত পূর্ব-বাংলা-ছেড়ে-আসা একটি মেয়ে।

রোহিণী টিপ্পনী কাটল, অন্য ছেলের কী দরকার মামা? একজনের সঙ্গে ছাড়া বিয়ে হয় না যখন?

জয়ন্তী খিলখিল করে হেসে ওঠে। আশুতোষ রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকান ডেঁপো মেয়েটার দিকে। কিন্তু জয়ন্তীর সখীস্থানীয়—ভয় পাবার মেয়ে নয় সে-ও। বলে, চুপিচুপি আরও একটা খবর বলি মামা। ওটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, পুরোপুরি ষড়যন্ত্র। নৌকোয় নৌকোয় লাগিয়ে জয়ন্তী অমরেশের পা ভেঙে দিল, যাতে তিনি কোথাও পালিয়ে যেতে না পারেন।

আশুতোষ রাগ করে বলেন, যা ইচ্ছে করো গে তোমরা। আমি ও-বিয়ের মধ্যে নেই।

জয়ন্তী বলে, ঝেড়ে ফেললে হবে কেন মামা? আপনি ছাড়া . . আছে বলুন মাথার উপরে?

মামা বলে কী খাতিরটা রাখলে? মুখের একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছ?

জয়ন্তী মেনে নেয়।

অন্যায় হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করা একশ বার উচিত ছিল, ব্যাপার শুনে আপনিই তখন বলতেন, তা আর কী হবে—হোক ওর সঙ্গে বিয়ে। আমায় কিছু বলতে হত না, আপনার মুখ দিয়েই বেরুত। এই এক যাচ্ছে-তাই ব্যাপার—ঠিক সময়ে ঠিক বুদ্ধিটা কিছুতে মাথায় খেলে না।

আরও নরম হয়ে বলে, তবু তো মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে! খাট মানছি—আমার জীবনের এমনি ক্ষণে কিছুতে আপনি ক্ষোভ পুষে রাখতে পারবেন না।

আশুতোষ বললেন, ঝোঁকের মাথায় এত বড় কাজটা করতে যাচ্ছ—কিন্তু ওর সম্পর্কে চিরদিন মনের ভাব থাকবে, জোর করে বলতে পারো?

তা ঠিক, কিছুই বলা যায় না মামা। আজকের ভাবনাই শুধু ভাবতে পারি আমরা। আজ মনের মধ্যে এক তিল ফাঁকি নেই। এই তো ঢের—এই বা ক-জনের ভাগ্যে ঘটে ভেবে দেখুন।

বিয়ে-বাড়ি আত্মীয়-কুটুম্বে ভরে গেল। জয়ন্তী আর একেশ্বরী নয়—বাড়ির ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। নানা সম্পর্কের নানা জনে এসে হুকুম-হাকাম চালাচ্ছে। পুরোপুরি বিয়ের কনে হয়ে দাঁড়িয়েছে, বড়রা যা বলছেন নিঃশব্দে তদনুযায়ী চলা তার কাজ। এ এক বিচিত্র অনুভূতি—ছোট হয়ে সকলের আদেশ মাথায় নিয়ে বেড়ানোর অপরূপ আনন্দ। বাড়ির মধ্যে ইদানিং তার কোনো কথাই থাকছে না, সে-ও কিছু বলতে চায় না কাউকে।

অমরেশকে চালান করে দেওয়া হয়েছে ভিন্ন পাড়ার এক ভাড়াটে বাড়িতে। সেখানে সে বর হয়ে আছে। মোটর চড়ে কিছু বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে ঐখান থেকে বিয়ে করতে আসবে। বিয়ের পরে বউ নিয়ে তুলবেও ওখানে। উৎসব একেবারে মিটে গেলে তার পর জোড়ে ফিরে আসবে। অনেক দিনের পর আবার সে স্বাধীনতা পেয়েছে—জয়ন্তীর পাহারা ঘিরে নেই তাকে। আহা, বড় মিষ্টি পাহারাদার জয়ন্তী। জয়ন্তীর অভাবে অসুবিধা পদে পদে, তার উপর কতখানি সে নির্ভরশীল, এই ক-দিনে ভালো করে টের পাচ্ছে। তা হোক, আনন্দও আছে মুক্তির মধ্যে। চিরবন্দিত্বের আগে এই অবসরটুকুতে অঞ্জলি ভরে মুক্তির স্বাদ নিয়ে নিচ্ছে।

এরই মধ্যে এক সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে অমরেশ বেরিয়ে পড়ল। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। জয়ন্তী কনে হয়ে ও-বাড়ি আছে, তাই রক্ষা। সে থাকলে এমন একা হতে পারত না। পাশের জায়গাটি জুড়ে বসে থাকত।

গাড়ি এসে থামল তার পুরানো পাড়ায়।

জনার্দনের ছবির দোকান নেই, সেখানে মুদিখানা খুলেছে—নুন-তেল ডাল-মশলা মেপে মেপে দিচ্ছে খদ্দেরদের। সামনে ডাক্তারখানায় করালী ডাক্তার একা বিশটা রোগির মহড়া নিচ্ছেন। চিকিৎসা নয়, চিৎকার। রোগিরা যেন পরম শত্রু—ষড়যন্ত্র করে তাঁর শান্তি বিঘ্নিত করতে আসে।

ডাক্তারবাবু, অসুখ তো সারে না—

অষুধে সারে না অসুখ। কেন আসিস জ্বালাতন করতে? বাড়িতে ভালোমন্দ খা গিয়ে ঐ পয়সায়।

সারে না, কী বল ডাক্তার? বাজে ধাপ্পা দিও না, ভালো হবে না। আমার ছোট মেয়েটা দেড় বছর জ্বর-পিলের ভুগে ভুগে যাবার দাখিল হয়েছিল, তোমার রাঙা অষুধের এক দাগ যেই মাত্তোর পেটে পড়া—

করালী ডাক্তার চটে ওঠেন। কী বল তুমি? অষুধই নয় ওটা আদপে।

কলের জলে পঞ্চানন একটু করে আলতা গুলে দেয়।

অমন মিষ্টি-মিষ্টি হয় তবে কী করে? তোমার অষুধ ঘরে রাখবার জো নেই। যার অসুখ নয়, চুরি করে সে-ও এক দাগ খেয়ে ফেলে—

এই সর্বনাশ করেছে! পঞ্চানন তুমি ওতে আবার সিরাপ ঢালছ নাকি?

পঞ্চানন কম্পাউণ্ডার বলল, আপনিই তো সেদিন—

খবরদার বলছি, এবার থেকে কুইনিন মিশিয়ে দিও। কিংবা নিমপাতাসিদ্ধ—যাতে অন্নপ্রাশনের ভাত অবধি বেরিয়ে আসে।

ক্রাচে ভর দিয়ে অমরেশ এমনি সময় ধীরে ধীরে এসে ঢুকল। সবিস্ময়ে করালী চেঁচিয়ে ওঠেন।

বেঁচে আছ? ইস্‌, কোন্‌ ডাকাতের আস্তানায় গিয়ে পড়ে ছিলে গো?

রোগিদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ডাক্তার নয় তো ডাকাত। দেখ্‌ তোরা—কি করি আমরা। হাত কাটি, পা কাটি, পেটের মধ্যে ছুরি চালাই—

অমরেশ বলে, অনেক কিছুই করেন, পরিচয় দিতে হবে না। এ পাড়ার সকলে তা জানে। টাকা ষাটেক নেওয়া আছে আপনার কাছ থেকে—সেটা ফেরত দিতে এসেছি। আর যা দিয়েছেন, সে দেনা শোধ হবে না ইহজন্মে।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নেন। একবার তার বেশ-ভূষা এবং একবার বাইরে মোটরখানার দিকে তাকিয়ে বললেন, বড়লোক হয়ে গেছ দেখছি—

এই খোঁড়া হয়ে যাওয়ার কল্যাণে।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, সমস্ত দানছত্তোর করে দিয়ে বিবাগী হয়ে তুমি বেরিয়ে পড়েছ—

অমরেশ বলে, ভুল শুনেছেন ডাক্তারবাবু। পাওনাদাররা সমস্ত কেড়ে-কুড়ে নিল। ফটিক নিল বাসন তক্তাপোশ, মিসেস পালিত নিলেন ছেলে। আচ্ছা মিসেস পালিত কোনখানে থাকেন, ঠিকানা বলতে পারেন ডাক্তারবাবু?

করালী বললেন, রাতারাতি পালিয়ে গেছে। ছেলে খালাস করতে এসেছ বুঝি? সে হবে না। অতি হতভাগা তোমার ছেলে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মা টিকে তো সাবাড় করল। এখন তোমার অবস্থা ভালো—নিয়ে গিয়ে আদরে যত্নে রাখতে পারতে। কিন্তু কোথায় পাবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হলেন করালী ডাক্তার।

বেঁচে আছে কি মরেছে কে জানে? হয়তো বা না খেয়ে শুকিয়ে খতম হয়ে গেছে। শেষটা যা অবস্থা হয়েছিল ওদের! ছবিতে ছবিতে, ঐ দেখো, ডাক্তারখানার দেয়াল ভরে ফেলেছি। জীবনে ঠাকুর-দেবতার ছায়া মাড়াই নি—নির্ঘাত তো নরকে নিয়ে ঠাসবে—সেই মানুষের ঘরে, দেখো, কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ধূমাবতী—তেত্রিশ কোটির মধ্যে বড় বেশি বাকি নেই।

কী করা যাবে? জনার্দনের খদ্দের হয় না—এই সব ছবি আর এই ঢঙের বাঁধানো পছন্দ নয় আজকালকার। শেষটা আমিই তার একমাত্র খদ্দের হয়ে উঠলাম।

সন্ধান পাওয়া যাবে না, অমরেশ আগেই বুঝতে পেরেছিল। হাস-পাতাল থেকে লেখা চিঠি আবার তারই কাছে ফেরত গিয়েছিল, সেই থেকে জানে। তবু একটিবার নিজে এসে জেনে-শুনে যাওয়া। মনকে চোখ ঠারা—না হে, মানুষের যতদূর সাধ্য সমস্ত করেছি আমি। ভালোই হল, জীবনের কয়েকটা বছর বিধাতা পুরুষ রবার দিয়ে ঘষে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়েছেন। একেবারে নবজাতকের মতো নিঃসম্বল ও নির্বন্ধন ধরিত্রীর উপরে। জয়ন্তীর কোনো ক্ষোভেরই কারণ ঘটবে না, চমৎকার হয়েছে।

ডাক্তার বললেন, ছেলের আশা ছেড়ে দাও। বাসন তক্তাপোশ খালাস করতে চাও তো ফটিককে ডেকে পাঠাই।

আজ্ঞে না। যেখানে আছি, এ সব বাজে আসবাব তোলা যাবে না সে জায়গায়। আচ্ছা, উঠলাম তবে—

আশুতোষই শুভলগ্নে কন্যা-সম্প্রদান করলেন। কন্যাকর্তার করণীয় অতিথিসজ্জনদের আদর-অভ্যর্থনাও করলেন তিনি।

পরদিন জয়ন্তী আশুতোষকে একান্তে নিয়ে বলল, আপনি কথা বলছেন না যে জামায়ের সঙ্গে?

বিয়ের কনে এতখানি নজর রেখেছে। আশুতোষ ধৈর্য রাখতে পারে না, বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

উঃ, আজ যদি মিত্তির মশায় বেচে থাকতেন।

জয়ন্তী মৃদু হেসে বলে, নিয়তি—বুঝলেন মামা, আপনি আমি কী করতে পারি? তা হলে বরাসন আলো করে বসত আপনার ভাইপো কি ভাগনে, কিন্তু তা যখন হয় নি, যে বর হয়েছে তাকেই তো আদর-আপ্যায়ন করতে হবে।

আশুতোষ বললেন, এ, যেন হুকুমের মতো হল—

মুখের হাসি নিভে গয়ে জয়ন্তীর স্বর কঠিন হয়েছে। বলল, হুকুম নয়, কর্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছি।

যেমন একদিন বোঝাচ্ছিলে, বাঁধের মাটির হিসাব কেমন করে রাখতে হয়?

ঠিক তাই। সেদিন বুঝিয়েছিলাম এস্টেটের ব্যাপারে কর্মচারীর কর্তব্য, আজকে বোঝাচ্ছি সামাজিক ব্যাপারে মাতুলের কর্তব্য। বিয়ে যখন হয়ে গেছে, আর মুখ বেজার করা বোকামি। এইটেই মনে করিয়ে দিলাম আপনাকে।

চার বছর কেটেছে। ভারি বিপদ গেল ও-বাড়ির উপর দিয়ে। জয়ন্তী বিছানায় একেবারে লেপটে গেছে—মিনমিন করে কথা বলে,পাশ ফিরে শোবে এমন শক্তিটুকুও বোধ করি নেই। প্রাণচঞ্চলা মেয়েটির এমনি দশা!

অমরেশের এবার শিয়রে বসে থাকবার পালা। দরকার না থাকলেও জেগে বসে থাকে। আশঙ্কার অবস্থা পার হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছেন, রোগিণী পর পরই ভালো হয়ে উঠবে। এতদিনে নিশ্চিত হাসি ফুটেছে সকলের মুখে।

রোহিণী একদিন বলল, এক মুহূর্ত ক্লান্তি আসে না, এক পলক ঘুম পায় না—দেখালেন বটে অমরেশবাবু সেবা বলে কাকে!

অমরেশ বলে, খোঁড়া মানুষ—বাইরে যাওয়া ঘটে না, ঘরেই পড়ে থাকি। রাতদিন পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি। চার বছরে এত ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছি যে চার পুরুষ আর ঘুমের দরকার হবে না।

জয়ন্তী ক্লান্ত হাস্যে চেয়ে দেখে অমরেশকে। গভীর আনন্দ ও ভালোবাসায় অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে আবার তার চোখের পাতা নেমে আসে।

চোখ বুজে কিন্তু অন্ধকার নয়—পরমসুন্দর এক ছেলে। এ কি ছেলে হয়েছে রে—ধপধপে সাহেবের মতো রঙ, ছোট ছোট হাত-পা—ওমা, একটা দাঁতও বুঝি বেরিয়েছে নিচের মাড়িতে। ঐ একখানা দাঁতের দেমাক কত! হাসির ছল করে দাঁত বের করে দেখানো হয়।...তারই ছেলে এ কি? কতটুকু বা দেখতে পেয়েছিল জয়ন্তী, আর কি-ই-বা দেখেছিল। ফরসেপের চাপে পিষ্ট-মাথা বীভৎস এক দ্রাণ—রক্তস্রোতের মধ্যে মাংসের একটা তাল। তার পরই সে চেতনা হারাল।

চিকিৎসা সমারোহে চলেছে। আত্মীয়বর্গ যে যেখানে ছিলেন, খবর পেয়ে এসে পড়লেন। রোগিণীর ঘরের বাইরে সে-ও এক তুমুলকাণ্ড—দীয়তাং ভুজ্যতাং চলেছিল সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি। এখন ভিড় পাতলা হয়েছে, আত্মীয়েরা যে যার কোটে ফিরে গেছেন। যান নি সপরিবারে আশুতোষ। আর দশজনের মতো উড়ো সম্পর্ক নয় তো তাঁর সঙ্গে—একেবারে পরিপূর্ণ সুস্থ না করে যাবেন কী করে?

রোহিণী বলেছিল, নমস্য আপনি অমরেশবাবু। পতিব্রতার ছড়াছড়ি পুরাণে ইতিহাসে। পত্নীব্রতর নাম শুনি নে। এবার এই দেখলাম বটে!

বাইরে আশুতোষের কানে গেল। স্ত্রীর দিকে চোখ টিপে বললেন, শুনছ গো—খোশামুদির বহরটা দেখো। পথের ফকির ক রাজতক্তে এনে তুলেছে—করবে না সে সেবা? অষুধ খাইয়ে বাতাস করে গায়ে হাত বুলিয়ে খাড়া করে না তুললে আবার যে পথে নামতে হবে। তার উপরে ঠ্যাং এখন একখানা মাত্তোর—ভাঙা ঠ্যাংটা দেখিয়ে দেখিয়ে ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় নেই। ছেলেটা বেঁচে রইল না যে বউ অন্তে তার নামে বিষয় ভোগ করবে।

নবদুর্গা ভ্রূকুটি করে ঘরের দিকে চেয়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিস-

ফিস করে বলে, অত ঘেন্না ছেলেপুলের উপর—ছেলে বাঁচবে ওর ? কেন্নো আর আরশুলা—শিরশির করে নাকি বাচ্ছা ছেলে কাছে গেলে। শোন কথা একবার। ওঃ দেবতা—বুঝতে পারে সমস্ত। পেটে এলো তো কোলে গেল না। জ্বালা দিয়ে গেল—বুকের মধ্যে দাউ দাউ করবে চিরজীবন। চোখ মুছিস কেন, বোঝ এবার।

কিন্তু জয়ন্তীর সামনে নবদুর্গার মুখের কথা একেবারে উলটো রকমের।

তা কী হয়েছে! ডালে যে কটি ফল ধরে সব কি ঘরে আসে মা, ঝরে যায়—পড়ে যায়। এই তো সবে শুরু। কোল কাঁকাল ভরে যাবে মা-ষষ্ঠীর বরে—ওর জন্যে দুঃখ কোরো না, আপদ-বালাই এসেছিল—বিদেয় হয়ে চলে গেল। তোমার যদি হত, ঠিক তবে বজায় থাকত।

কিন্তু জয়ন্তী জানে, এই শেষ। ডাক্তার বলেছিলেন, দুটো বাঁচবে না—মা অথবা ছেলে। জয়ন্তীর ইচ্ছে করেছিল, চিৎকার করে বলে—ছেলেই বাঁচান তবে। বলে নি কিছু, বললেও কেউ শুনত না। যা হবার, হয়ে গেল তাই। নবদুর্গার মনের কথাটাই অহোরাত্র এখন জয়ন্তীর মনে বিঁধছে। ছেলেপুলে দূর-ছাই করত, তাই এমন হল—কোনো দিন ছেলে আসবে না তাই সংসারে··

বয়ে গেল, না এলো তো। বিশ্বসংসারে কত কাজ, কত মানুষ। জীবনের কত বৈচিত্র্য! বিছানা ছেড়ে বাইরে এসেছে জয়ন্তী। স্বাস্থ্য ও রূপের প্লাবন এসেছে অকস্মাৎ, প্রাণপ্রাচুর্যে ঝিকমিক করছে। অমরেশ পর্যন্ত অবাক হয়ে যায়। এই সুন্দরী যৌবনোচ্ছলা যেন তার অনেকখানি অপরিচিত। ব্যর্থ জননী এ কোন উর্বশী হয়ে উদয় হল।

বেরুচ্ছি একবার। বন্ধুরা যাচ্ছেতাই করে বলে, ঘরকুনো হয়ে গেছি নাকি একেবারে। সত্যি, কতদিন যে স্টিয়ারিঙে হাত দিই নি।

যেন পটের পরী সেজে এসেছে। ঘর ভরে গেছে সৌরভের মাদকতায়। অমরেশও বিহ্বল দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। বলে, এতদিন বিছানায় কাটালে, বেরুবে বই কি। অসুখের সময় তোমার বন্ধুরা আসতেন—তোমার যাওয়া উচিত এক-একবার সকলের বাড়ি।

একটু দ্বিধান্বিত ভাবে জয়ন্তী বলে, যাবে তুমি ?

উঁহু, মেয়েদের মধ্যে আমি কি যাব! আমি সঙ্কুচিত হয়ে থাকব। তাঁরাও।

কিন্তু একলাটি তোমার কষ্ট হবে যে।

কষ্ট কিসের ? ঘরে বসে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। অভ্যাস তো করতেই হবে পা গেছে যখন।

বই পড়ো বসে লক্ষ্মীটি। কেমন ? সন্ধ্যের আগেই এসে পড়ব। এসে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাব আজ।

বাড়ি ফিরল তখন রাত্রি দশটা। বলল, তোমার বড্ড কষ্ট হয়েছে—বুঝতে পারছি। কী করি, ছাড়ল না কিছুতে—সিনেমায় ধরে নিয়ে গেল। মন পড়ে আছে এখানে, ছবি কি দেখেছি ছাই? আর আমি যাব না। কোনো দিন না।

সে কি? কোন দুঃখে খোঁড়ার সঙ্গে খোঁড়া হতে যাবে জয়ন্তী?

জয়ন্তী সজল চোখে বলে, দুঃখ নয়, আনন্দে। যে আনন্দে গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ হয়ে থাকতেন। কিন্তু আর নয়—চুপ!

মুখে হাত চাপা দিয়ে আটকাল জয়ন্তী। এ সব কথা কক্ষনো বলবে না। বললে—

মুখ টিপে হেসে অমরেশ বলে, কী হবে বললে?

কিছু না—

সহসা বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গভীর আলিঙ্গনে আচ্ছন্ন করল অমরেশকে। কথা শেষ হয়ে যায়। যত বয়স হচ্ছে, জয়ন্তী যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

পরদিন বিকেলে বনমালী গাড়ি যথারীতি ফটকে এনে রাখল। অমরেশ বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে বসেছিল মেঘপুঞ্জিত আকাশের দিকে চেয়ে। সাজ-গোজ করে জয়ন্তী হাসিমুখে এসে দাঁড়াল।

অমরেশ ঘাড় ফিরিয়ে বলল, চললে?

দেখো, তোমায় ওদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় না—

অমরেশ সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়। নিশ্চয়ই নয়। খোঁড়া বর নিয়ে দেখানো গৌরবের নয়—কে না জানে?

জয়ন্তী চটে গিয়ে বলে, বটে। নিশ্চয় নিয়ে যাব। চলো, উঠতেই হবে। আমার হল ঘর-আলো-করা বর—সকলের কাছে বরের জাঁক করে বেড়াই। নিয়ে যেতে চাই নে কেন জান? বর যদি কেউ ডাকাতি করে কেউ কেড়েকুড়ে নিয়ে নেয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল একটুখানি। বলে, ওঠো। আজকে ওদের সঙ্গে নয়—আমরা দুজনে একলা বেড়াব।

অমরেশ ঘাড় নেড়ে বলে, পারছি না জয়ন্তী। বেশ আছি, ওঠা-নামা করতে ইচ্ছে করছে না। কষ্টও হয়।

কিছুতে যাবে না। কী করে জয়ন্তী? নেমে গেল ধীরে ধীরে। রূপের লহর তুলে চলে গেল।

খোঁড়া বলে তোমার করুণা হয়েছিল জয়ন্তী, খোঁড়া করে দিয়ে দায়িত্ব এসে পড়েছিল। দিয়েছও আমায় প্রচুর। তা বলে চিরজন্ম খোঁড়া আগলে বসে থাকবে, এই বা কেমন কথা? পারে নাকি কেউ, বিরক্তি আসে না? তবু তুমি কত ভালো! তোমার মুখের হাসিতে ছায়া পড়ে না কখনো, কথায় থাকে না এতটুকু তাপ।

কিন্তু স্বামী হয়ে এমন মনোভাব বজায় রাখা যায় না খুব বেশি দিন। মাস খানেক পরে অমরেশই একদিন প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছ?

স্বরের রূঢ়তায় জয়ন্তীর চমক লাগে। ক্ষণকাল অবাক হয়ে থাকে তার দিকে চেয়ে।

কৈফিয়ত চাও?

চাইতাম যদি পুরোপুরি স্বামী বলে আমায় ভাবতে। যদি তোমার গলগ্রহ না হতাম।

অর্থাৎ আমিই যদি গলগ্রহ হতাম তোমার। পুরুষের সেই যা চির কালের মূর্তি। কিন্তু জবরদস্তি অনেক যুগ ধরে চলেছে, এখন আর চলে না।

অসহ্য লাগছে আমাকে?

জয়ন্তী কঠিন স্বরে বলে, এ তোমার অন্যায় আশা। ঘরে বসে আকাশের তারা গুনবে, আকাশ-পাতাল ভাববে—অন্য সকলে যদি তা না পেরে ওঠে।

সেই বেরুল জয়ন্তী, আর ফেরেই না। বাড়িশুদ্ধ নিষুপ্ত, অমরেশ একলা কেবল জেগে। কান খাড়া করে আছে—হ্যাঁ, ফিরল এতক্ষণে। মোটর এসে দাঁড়াল, দারোয়ান ফটক খুলে দিল। উঠছে সে উপরে, দরজায় করাঘাত করছে মৃদুভাবে।

অমরেশ সাড়া দেয় না। চুপ করে থাকা যাক তো এমনি ঘুমিয়ে পড়েছে—তাই যেন শুনতে পাচ্ছে না। জয়ন্তী জোরে ঘা দেয়—জোরে আরও জোরে। নিতান্তই মৃত্যু না ঘটলে এর পর সাড়া না দেওয়ার মানে হয় না।

দেয়াল ধরে ধরে গিয়ে অমরেশ সুইচ টিপল. নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল। সারা মুখের উপর উজ্জ্বল আলো পড়েছে—নিশিরাত্রে স্বপ্নলোকের পরী এসে ঘরে ঢুকল। এ যেন অপরিচিত আর-এক জয়ন্তী। অমরেশের বুকের ভিতর রি-রি করে ওঠে।

দরজা ভাঙছিলে—পাড়াময় ঘুম ভাঙিয়ে জানান দিলে যে ফেরা হল এই-বার বাড়ি। এতে কি খুব মুখোজ্জ্বল হল?

জয়ন্তী সহজভাবে বলল, নয় তো তুমি যে কিছুতে সাড়া দাও না। তোমার ঘুম ভাঙাতে গিয়েই পাড়াপড়শির ঘুম ভেঙে গেল। উপায় কী বলো।

আয়না-দেওয়া বড় আলমারির কাছে গিয়ে কানের ঝুমকো খুলছে। অমরেশ বলে উঠল, সাজগোজ বড় বেশি বেশি দেখা যায় আজকাল—

ফুরিয়ে যাচ্ছি কিনা—সাজগোজে আসল চেহারা ঢেকে তাই ভোলাতে হয় তোমাদের।

সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে মোহময় হাসি হেসে বলল, দেখতো—পছন্দের মতো কিনা আমি এ পোশাকে।

অমরেশ চোখই তুলল না। তিক্ত কণ্ঠে বলে, নিরুপায় গলগ্রহ হয়ে আছি

আমার আবার পছন্দ-অপছন্দ! এ সব তারা ভাবুক গে রাত দুপুর অবধি যাদের পছন্দ কুড়িয়ে এলে।

জয়ন্তীর মুখের উপর দপ করে যেন আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। কিন্তু সে নিমেষের জন্য। ঠিক আগেকার কণ্ঠেই সে জবাব দিল, তা ঠিক। ঘরের মানুষ অহরহ আটপৌরে মূর্তি দেখছে, সে চোখে ফাঁকি চলে না। একটু শুধু যাচাই করে নেবার জন্য কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

সজ্জা খুলে খাটের প্রান্তে সে শুয়ে পড়ল। সাড়া নেই অনেকক্ষণ, খুব সম্ভব ঘুমিয়ে পড়েছে। অমরেশের এমন একটা ব্যঙ্গোক্তি জয়ন্তী কানেই নিল না—পিছলে পড়ে গেল বাইরে। আর, দেখো, কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে বিভোর হয়ে। কী যেন হয়েছে অমরেশের—আঘাত না দিতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, কী করবে ভেবে পায় না। স্বগত ভাবেই একসময়ে বলে উঠে, রাজশয্যা বিষের মতো লাগছে—

হল না, ভাষার ভুল হয়ে গেল। বলো, কাঁটার মতো—

জেগে আছে তবে জয়ন্তী। অমরেশ উঠে বসল বিছানায়।

আমি থাকতে পারছি নে আর এমন করে—

জয়ন্তী বলে, বাইরে ঠাণ্ডায় বোসো গে একটু। মাথা গরম হয়ে গেছে। তা ই উচিত। ধরব, দিয়ে আসব বাইরে?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে অমরেশ বলে, আমি পঙ্গু—কথায় কথায় সেটা মনে করিয়ে না দিলেই নয়? জিজ্ঞাসা করি, কে করেছে আমার এ অবস্থা?

জয়ন্তী সহজভাবে স্বীকার করে নেয়, আমি। কিন্তু তার চেয়ে বড় দোষ আমার, চার বছর একটা মানুষকে অচল নিষ্কর্মা ভাবে বাড়ির মধ্যে বসিয়ে রাখা। দেহ নড়ে না, মস্তিষ্কই শুধু আজব ভাবনা ভেবে মরে: এ বাড়ি ছেড়ে সত্যিই কিছুদিন তোমার বাইরে থাকা দরকার হয়ে পড়েছে।

যাব, তাই যাব। পাগল হয়ে যেতে হবে এভাবে আর বেশি দিন থাকলে।

উত্তেজনায় কয়েক পা গিয়ে অমরেশ ক্রাচ নিল বগলে।

জয়ন্তী বলে, বেশি ঠাণ্ডা লাগিও না। সেবারের মতো যদি কাশি বেধে যায়, আমি জব্দ হবো ঠিক—কিন্তু তোমারও কষ্ট কম হবে না।

তোমায় কিছু করতে হবে না আমার জন্যে—

উঁহু, আমি কেন—কত দিকে কত আত্মীয়জন হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছে, আমাদের মা-বাপ আছেন, ছেলে আছেন, মেয়ে আছে—তারাই সমস্ত করবে।

জবাব না দিয়ে অমরেশ বারাণ্ডায় চলে গেল। জয়ন্তী অনেক খেটে এসেছে—অনাথ ছেলেমেয়েদের একটা বোর্ডিং হচ্ছে, তারই প্রতিষ্ঠা উৎসব ছিল। বড় ক্লান্ত, পেরে উঠছে না। তবু উঠল সে একবার। উঁকি দিয়ে দেখল, বারাণ্ডায় সোফায় বসে নিচু টেবিলের উপর অমরেশ মাথা গুঁজে

আছে। ঘুমাল নাকি এই অবস্থায়? টিপিটিপি জয়ন্তী পর্দাটা ফেলে দিয়ে এল, বেশি ঠাণ্ডা না লাগে।

তার পরে জয়ন্তীও ঘুমিয়ে পড়েছে। আর কিছু জানে না। আহা, জানে বৈ কি! ঘুমের মধ্যেই তো তার ব্যস্ত জীবন—পুরো সংসারের কাজকর্ম। তার খোকা নাচে সামনে এসে—কাজে ভণ্ডুল ঘটিয়ে দেয়। তোড়া পরিয়ে দিয়েছে কে খোকার পায়ে, তোড়া বাজে ঝুনঝুন করে।

আয়, আয়রে খোকনমণি, কোলে আয় দিকি একটু। আসবি নে?

খোকা মিটিমিটি হাসে, দুষ্টুমি চোখে চায়। সেই যে বীভৎস মাংসের দলা…কেমন বেশ বড় হয়ে গেছে, সুন্দর হয়েছে। সাদা-সাদা ছোট যেন ইঁদুরের দাঁত—দাঁতের হাসি ঝিলিক দেয় বিদ্যুতের মতো। জয়ন্তী ছুটে যায় খোকার দিকে—বাহুপাশে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলতে। বুকে তুলে চুমু খাবে। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল যেন। বুকের মধ্যে বিষম ব্যথা। ব্যথা পেয়ে সে ফোঁপাচ্ছে, কী যেন বলতে যাচ্ছে খোকাকে ডেকে—মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

তখন বুঝল ঘুমিয়ে আছে সে—স্বপ্ন দেখছে ঘুমের মধ্যে। এর আগে এমন হয়েছে আরও। নিজের সমগ্র চেতনা প্রাণপণ চেষ্টায় সংহত করে সে জাগল। অভিমান হয়—এতক্ষণ ধরে এমন আওয়াজ করেছে, এত কষ্ট পাচ্ছে—অমরেশ জাগিয়ে তুলল না তাকে? পরক্ষণে মনে পড়ল, বাইরে তো অমরেশ। কত রাত হয়েছে—এখনো বাইরে পড়ে? অসুখ করবে যে।

বাইরে গিয়ে দেখল, পশ্চিমে অনেক দূরে সাদা বাড়িটার চিলে কোঠার আড়ালে চাঁদ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভোর হয়ে এলো। কিন্তু অমরেশ নেই তো বারাণ্ডায়—কোথায় গেল, যাবে আর কোথায়, যাবার কি শক্তি আছে? আছে কোনোখানে, হয়তো বা বৈঠকখানায় শুয়েছে। এখন ডাকাডাকি করে মানুষজন জাগানো ঠিক হবে না। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরেছে—দরজা খোলানোর চেষ্টায় অনেকে তা টের পেয়েছে। স্বামীর রাগ এর উপরে বাইরে আর জানান দেওয়া হবে না।

খোঁড়াচ্ছে একটা ছেলে। অমরেশ ভালো করে তাকিয়ে দেখে একজন কেন—পুরো একটা দল। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়, তাকাবে না আর ওদিকে। দেখেছে বুঝতে পারলে হতভাগারা আরও পেয়ে বসবে। চোখ ফেটে জল আসার মতো হল। অবস্থা ভালো ছিল না বটে কিন্তু সবল নিখুঁত দেহ—আশৈশব চেহারার সকলে তারিফ করে এসেছে। আর এখন তার চলন দেখে হাসছে ঐ দেখো। ঘরের মধ্যেই চুপচাপ বসে থাকতে হবে চিরজীবন—তা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কি করে থাকে সে ঘরে, ঘরের কর্ত্রীর যখন ঐ রকম ব্যবহার? হায় ভগবান, ঘর-বার কোথাও তার শান্তি নেই?

ছেলেগুলো সমস্বরে এবার ছড়া কাটছে—

খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং

কার দুয়ারে গিয়েছিলি, কে ভেঙেছে ঠ্যাং ?

নিতান্ত নাছোড়বান্দা। মুখ ফিরিয়ে আছে তো কানে না ঢুকিয়ে শুনবে না। পালাতে গেলে পিছু নেবে নিশ্চয়—হাত তালি দিয়ে পিছু পিছু চলবে। অগত্যা বসে পড়ল সেই পার্কের এক বেঞ্চিতে। ছেলেগুলো তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

ইতস্তত করে অমরেশ অবশেষে চোখ তুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ সকলে। কে বলবে, একটু আগে এমন শোরগোল হচ্ছিল।

অমরেশ ডাকে, শোনো তোমরা, কাছে এসো, শুনে যাও—

কেউ আসে না। দূর থেকে তাকাচ্ছে, দু পা এক পা করে পেছোচ্ছেও কেউ কেউ।

অমরেশ হেসে বলে, ভীরু—ছিঃ।

গটমট করে একটা ছেলে এগিয়ে আসে। উদ্ধত ভঙ্গিতে কাছে এসে দাঁড়াল।

তোমার ভয় করে না বুঝি ?

না—

তা বেশ···ভালো। নাম কি তোমার ?

অ্যাং-ব্যাং—

অ্যাং-ব্যাং আবার নাম হয় বুঝি ? থাক কোথায় ?

গড়ের মাঠ—

যা মনে আসছে, বলে যাচ্ছে বেপরোয়া ভাবে। আচ্ছা বেশ তো! অমরেশ বলে, তোমরা ঐ সব বলছিলে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে ?

না তো—

দেখো, মিথ্যে কথা বলতে নেই—

ছেলেটা আরও একটু কাছে এসে ড্যাবড্যেবে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করে, বললে কী হয় ?

ঠাকুর রাগ করেন—

কথা বলে না সে ক্ষণকাল। ঠোঁটের উপর দুটো আঙুল চাপিয়ে গম্ভীর হয়ে ভাবছে। ভঙ্গি দেখে অমরেশের মজা লাগে। জোর দিয়ে সে আবার সেই কথাই বলে।

ঠাকুর ভয়ানক রাগ করেন মিথ্যে কথা বললে—কানাকে কানা বললে, খোঁড়াকে ন্যাং-ন্যাং করলে।

সজোরে ঘাড় নেড়ে ছেলে এবার প্রতিবাদ করে, না—কক্ষনো না। মিথ্যে কথা। ঠাকুর থাকেন কত উঁচুতে—ঐ আকাশের উপর। শুনতে পাবেন তিনি কী করে ?

সব তিনি শুনতে পান। চোখ মেলে সমস্ত দেখেন। কানা খোঁড়াদের বড় কষ্ট কিনা—তার উপরে আবার কষ্ট দিলে ঠাকুর রাগ করেন।

ছেলের ঘোরতর আপত্তি। ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কষ্ট না আরো কিছু! কানাখোঁড়া হওয়াই তো ভালো। কত মজা! রাস্তায় কাপড় পেতে বসে থাকে—কত জনে পয়সা দিয়ে যায়, খাবার খেতে দেয়—

হঠাৎ—কি আশ্চর্য ব্যাপার! মনোরমা।

এর মধ্যে বেরিয়ে পড়েছ বকুল? খুঁজে খুঁজে হয়রান। মুখ ধোওয়া নেই, খাওয়া নেই, লেখাপড়া নেই—

ছেলেটাকে মনোরমা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। অমরেশকে দেখে নি। ছেলে গ্রেপ্তারের তালে ব্যস্ত ছিল, আর অমরেশও সেই ফাঁকে অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসল। ঐ তার ছেলে নাকি?···মনোরমা দেখতে পায় নি ভাগ্যিস! তা হলে ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টাকার দাবি করত। টাকাটা সে হয়তো জয়ন্তীকে চুরি করে কায়ক্লেশে মিটিয়ে দিতে পারবে—কিন্তু ছেলে···রেবার স্মৃতিকণ্টক ঐ ছেলে নিয়ে কি করবে এখন সে? কোথায় তুলবে? বোঝা গেল, বাইরে বেরুনো তার চলবে না। নিজে তো ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র, তার উপরে এই উপসর্গ। এত কাছাকাছি এসে জুটেছে মনোরমা—বাড়ি ফেরা যাক তাড়াতাড়ি। পদব্রজে অতঃপর সে আর ফটকের বাইরে আসছে না।

দোকানের জন্য জনার্দন এবারে ভালো ঘর পেয়েছেন চওড়া রাস্তার উপরে। বাড়ি থেকে দূরও নয়। সকালে স্নান-আহ্নিক সেরে দোকানে গিয়ে বসেন। দুপুরবেলা একজন কাউকে বসিয়ে—হয়তো বা বকুলকেই বসিয়ে রেখে—তাড়াতাড়ি খেয়ে যান। দিবা-নিদ্রাটুকু দোকানের মেঝের সপ পেতে সেরে নেন—গণেশ ঠাকুরকে সন্ধ্যা দেখিয়ে ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে দোকানঘরে তালা বন্ধ করে বাড়ি চলে আসেন।

বকুলকে মনোরমা টানতে টানতে নিয়ে আসছে। জনার্দন বেরুচ্ছিলেন—মনোরমা বলে, ছোঁড়াগুলো এই সাত সকালে ঘুম থেকে টেনে তুলে নিয়ে বের করছে। কি বদমায়েশ পাড়া তাই দেখো—এ পাড়া না ছাড়লে রক্ষে নেই।

জনার্দন ভ্রূকুটি করে বললেন, পাড়া বদমায়েশ নয়, বদমায়েশ হল ছেলে। গাছকোমর বেঁধে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সঙ্গে তো ঝগড়া করে বেড়াস, কিন্তু ঐ ছেলে হতে তুই যে সব খোয়ালি—ঠাণ্ডা মাথায় সেটা ভেবে দেখেছিস কখনো?

জনার্দন চলে গেলেন। বাপের কথাগুলো মনোরমার মাথায় ঘুরছে।

শুনলি তো—তোর জন্য আমার ইহকাল নেই, পরকালও নেই। কোনো জায়গায় যেতে পারি নে, কাজ করতে পারি নে—চোখের আড়ালে হলেই

তুই এক অঘটন ঘটিয়ে বসবি। পরের ছেলে কেন এমন করে হাড় জালাচ্ছিস যা চলে—আমি আর তোর দায় ঠেকতে পারব না।

বকুল গ্রাহ্য করে না। গালি দিচ্ছে—সে তো দেবেই যখন সে বজ্জাতি করে বেড়ায়। বড় বড় চোখের দৃষ্টি মেলে মনোরমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাব?

শোন আবদার। ঠিকানা বলে দেব, তবে উনি যাবেন। যাবার জায়গা থাকলে আমিই কি থাকতাম রে। হোক না বাবা—কথায় এত খোঁটা আমার ভালো লাগে না।

মনোরমা আঁচলে চোখ মুছল। বকুল পরমাগ্রহে বলছে, তাই চল্। বুড়ো দাদু ভালো না। তুই আর আমি দুজনে থাকব—খাসা হবে—বড্ড মজা হবে।

সব দুঃখ ভুলে যেতে হয় বকুলের কথা শুনে।

আমি কেন, তুই একলা চলে যাবি—একা-একা থাকবি।

মুখ-চোখ ঘুরিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে বকুল বলে, ওঃ—

তা না হয় গেলাম, কিন্তু খাব কী বলতে পারিস?

পরম নিশ্চিন্ততায় বকুল বলে, ভাত—

কোথায় পাবি?

বেঁধে দিবি তুই—

কিন্তু টাকা? চাল কিনতে হবে তো টাকা দিয়ে? টাকা আনতে পারবি খোকা?

আনব—অনেক টাকা এনে দেব তোকে। এক বাক্স, পাঁচ বাক্স—

আর এনেছিস তুই। কী করে আনবি? লেখা - তো তোর ক ছ বাঘ। খালি দুষ্টুমি করে বেড়াবি। বিদ্যে না থাকলে কি টাকা রোজগার হয়, বড় হওয়া যায়?

অতএব লেখাপড়া করতেই হবে। লেখাপড়া জানলে টাকা আসে, গাড়ি-ঘোড়া চড়া যায়,—সকলের মুখে এই কথা।

মনোরমা বলে, মুড়ি খেয়ে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এবারে পড়তে বোসো—কেমন?

বকুল বই-দপ্তর খুলে বসেছে। পরিণামে সুখ-ভোগের জন্য এই কষ্ট আপাতত করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আলস্য লাগে, উৎসাহে ভাঁটা পড়ে আসে। অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার যে এই লেখাপড়া—বহু দিন ধরে বিস্তর চেষ্টা করতে হয়। বুড়ো দাদুর দোকানে সে বসে মাঝে মাঝে—ছবি নিয়ে লোকে টাকা পয়সা দিয়ে যায়। সে বেশ ভালো—পড়তে হয় না, কিছু না—লোকে এসে অমনি পয়সা দিয়ে যায়। সে-ও পারে দোকান চালাতে। জনার্দন যখন বাড়ি খেতে আসেন, গম্ভীর হয়ে বসে সে তাঁর

জায়গাটিতে। খরিদ্দার এলে এ ছবি ও-ছবি দেখায়, দাম বলে আট আনা, বারো আনা, পাঁচ সিকে—যেটা যেমন মুখে আসে। হাসে খরিদ্দার।··· লেখাপড়া না করে বকুল দোকান করবে। দোকানই ভালো সকলের চেয়ে।

চশমা ফেলে গেছেন জনার্দন আজ ভুল করে—চশমা পরে বকুল জনার্দন হল। ডাঁটি-ভাঙা চশমা—কানের সঙ্গে সুতো বেঁধে কসরত করে পরতে হয়। জনার্দনের মতোই চশমার ফাঁক দিয়ে কুঞ্চিত দৃষ্টি মেলে চারিদিকে একবার সে তাকিয়ে নিল। পড়তে হবে তো সামান্য এই 'অ-আ'-র বই কেন—জনার্দনের ভাগবত পুঁথিখানা পেড়ে নিয়ে বসল। পুঁথি পড়ছে যখন, চন্দনের ফোঁটা পরা তো উচিত। চন্দন ঘষার অত হাঙ্গামায় গেল না—পারেও না সে—মাটি গুলে বকুল কপালে ফোঁটা দিল তিলক-চন্দনের মতো। ডাবা হুঁকোটা টেনে নিল হুঁকোদান থেকে। কি ভাবে টানলে ফড়ফড় আওয়াজ হয় ভেবে পাচ্ছে না, নানান কায়দা করছে। জোরে ফুঁ দিতে নলচে দিয়ে জলের ধারা উঠে গায়ে পড়ল। পুঁথিও ভিজে গেছে হুঁকোর জলে। অনেক চেষ্টায় অবশেষে হুঁকো টানা আয়ত্ত করল। বাঃ —দিব্যি আওয়াজ হচ্ছে তো। জলচৌকির উপর বসে হুঁকো টানতে টানতে সে পুঁথি উলটাচ্ছে।

আর দোকানে গিয়ে অনতিপরেই জনার্দনের চশমার গরজ পড়ল। ছবি বাঁধাতে দিয়ে একজনে আর নিতে আসে না—তার নাম-ঠিকানা পড়ে ছবি পৌঁছে দিয়ে দাম আদায় করে আনতে হবে। দিনকাল বড় খারাপ—ঘরের মধ্যে গদিয়ান হয়ে ব্যবসা চালাবার অবস্থা নেই।

এ কি রে? এই দশা করেছ পুঁথি-পত্তোরের? খেলা এই সমস্ত নিয়ে? আবার তামাক খাওয়া হচ্ছে—বড্ড পাকা হয়ে গিয়েছ।

সজোরে জনার্দন এক চড় মারলেন। ফরসা গাল রক্তাভ হল। কেঁদে উঠল বকুল।

মনোরমা ছুটে আসে। কী হয়েছে?

বকুল অশ্রুভরা চোখে একবার জনার্দনের দিকে তাকাল। বাপে মেয়ের খণ্ড-প্রলয় বাধে বুঝি। তা ছাড়া অন্যের হাতে মার খেয়েছে, এ ব্যাপারে বকুলের অপমানও আছে। সামলে নিয়ে জবাব দেয়, পড়ে গিয়েছি—

মনোরমা জনার্দনকে প্রশ্ন করে, মেরেছ একে বাবা?

জবাব দেবার আগেই বকুল ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বললাম না যে আমি পড়ে গিয়েছিলাম? কেন তুমি বকবে আমার দাদুকে? না—কিছু বলতে পারবে না। এসো তুমি, চলে এসো—

মনোরমার সে হাত ধরে টানে। মনোরমা বলে, এইটুকু ছোট্ট ছেলে— ত্রিভুবনে মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই—এর গায়ে হাত তোল বাবা!

আবার তুমি ঠাকুর-পুজো করো ধর্মের বড়াই করো। ভগবান তো এরাই—

কেন? বকুল তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিল মনোরমার মুখে। তুমি আমার কথা কানে নিচ্ছ না মা। আমি বুঝি মিথ্যে বলছি?

রাগ ভুলে মনোরমা হেসে ফেলল।

তাই হবে। ভালো ছেলেরা মিথ্যে বলে না। তারা ভগবান। আমার ভুল—পড়েই গিয়েছিলে তুমি।

জনার্দন গম্ভীর ভাবে কোঁচার কাপড় দিয়ে পুঁথির উপরের জল মুছে ফেললেন। পাতা উলটাচ্ছেন, ভিতরে কোথায় কি হয়েছে দেখলেন। কিন্তু চোখে জল আসে। চোখের জলে আচ্ছন্ন হয়ে যায় দৃষ্টি। হঠাৎ রুখে উঠলেন, না—মিথ্যে বলবে কেন? ছেলে তোর পরম সত্যবাদী—আমিই খারাপ। মারি নি আমি? পাঁচটা আঙুলের দাগ রয়েছে, গুনে গুনে নে গালের উপর। আবার বলছে, পড়ে গেছে। মিথ্যে কথা বলে দোষ ঢাকছ আমার।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কেউ হাত তোলে কচি ছেলের উপর? আমার মাথার ঠিক ছিল? মাথা ঠিক থাকে কী করে। কাল আর আজ দুটো দিনের মধ্যে একটা পয়সার মুখ দেখলাম না, একটা খদ্দের ঢোকে না দোকানে। মানুষজনের যেন কী হয়েছে—বুড়ো বয়সে এখন কি করে পেট চালাব ভেবে পাই নে। ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়

দোকানে একাকী বসে জনার্দন তাই ভাবেন। কী হল মানুষজনের! ছোটে সবাই চাল-ডালের দোকানে—খাওয়া-পরা ছাড়া কোনো-কিছু নিয়ে মাথাব্যথা নেই। সেকালের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে, জিনিসপত্র সস্তা ছিল আর অগুন্তি খদ্দের। কত রকমের খাসা খাসা ছবি—আজকাল সে সবের চল নেই—কালীঘাটের পট, মা-দুর্গা, কৃষ্ণ-রাধা, শকুন্তলা-দুষ্মন্ত, কালা-তারা-ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-ধূমাবতী-বগলা-দশমা-মাতঙ্গী-কমলা দশ-মহাবিদ্যার ছবি—কাচ কেটে সাদামাঠা ফ্রেমে কোনো গতিকে ঢুকিয়ে দিলেই হল, লোকে মাথায় করে নিয়ে পরমানন্দে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখত। এখন আর এক যুগ। ঠাকুর দেবতা নয়—মানুষের ছবি। কত ঢঙে মানুষ ছবি তোলে—বড়লোকেরা তাই বাঁধিয়ে নেয়। ফ্রেমেরই বা কি বাহার। এক রকম ফ্রেম তিনি নতুন দেখে এলেন—কাচের মতো, কিন্তু কাচ নয়। তার উপর কাজ কর্মই বা কত। ওসব জনার্দনের দোকানে নেই—টাকা কোথায় কিনে রাখবার? ছবি বাঁধানোর বড়লোক খদ্দের আর দোকানে আসে না সে জন্যে।

দোকানপাট বন্ধ করে জনার্দনের বাসায় ফিরতে প্রহরখানেক রাত্রি হয়ে যায়। তখন আর একবার স্নান করেন। আর কোন কাজ নেই তারপর।

স্নানের সময় সারাদিনের কাপড়খানা কেচে দিয়ে লালপাড় খাটো মাপের তসরের ধুতি পরেন। তেমনি যেন সাংসারিক যাবতীয় চিন্তাও ধুয়েমুছে ফেলেন মন থেকে। কুলুঙ্গি থেকে বংশীবদনকে নামিয়ে ছোট্ট জলচৌকির উপর স্থাপন করেন। মনোরমা যৎসামান্য মিষ্টি ও দু-চার টুকরো ফল কেটে ভোগ সাজিয়ে দিয়ে যায়। ধুনুচিতে নারিকেল-খোসা জেলে ধুনো ছড়িয়ে দেয় তার উপর। ছোট্ট ঘরখানা সুগন্ধ ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পূজার যোগাড় করে দিয়ে মনোরমা রান্নায় বসে। বকুল ঘুমুচ্ছে—আর কোনো ঝামেলা নেই। ছেলে সারাদিন দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়—সন্ধ্যা হলেই নেতিয়ে পড়ে, তখন তার চোখ মেলবার উপায় থাকে না। জনার্দন সমাহিত হয়ে বসে থাকেন—কখনো ঠোঁট নেড়ে অস্ফুট মন্ত্র পড়ছেন, কখনো বা একেবারে স্থির নিস্পন্দ—নিঃশ্বাস পড়ছে কি না, তা-ও বোঝা যায় না।

পূজা অন্তে একদিন জনার্দন লক্ষ্য করলেন, সন্দেশটা নেই। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! কিছু বললেন না মনোরমাকে, চিন্তান্বিত হলেন। পরদিন দোকান বন্ধ করে আসবার সময় আবার সন্দেশ কিনে নিয়ে এলেন—সন্দেশ-ভোগ আজকেও। সেই সন্দেশও অন্তর্হিত থালা থেকে।

জনার্দন বলেন না, কিন্তু মনোরমার নজর পড়েছে বকুলের প্রসাদ রাখতে গিয়ে।

বাবা, সন্দেশ দেওয়া হল—সে কোথায়?

যাকে দিয়েছিলি, সে-ই খেয়ে গেছে। আমি তার কি জানি?

বলো না কি হয়েছে? বেড়ালে খেলে?

জনার্দন বিরক্ত হয়ে বলেন, তুই ভোগ সাজাস পুজোর পরে গুনে-গেঁথে সমস্ত ঠিকঠাক পাওয়া যাবে—সেই ভরসায় বুঝি!

খাঁটি খবর পাওয়া গেল না বাপের কাছে। চোখ বুঁজে থাকেন, জানবেনই বা কি? বিড়ালের কাণ্ড—মনোরমা একেবারে নিঃসন্দেহ। একটা বিড়াল এসে জুটেছে—খাবার জিনিসপত্র একটু বেসামাল রাখলে রক্ষে নেই। নিজেরা কী খায় ঠিক নেই, তার উপর যত বাইরের পোষ্য এসে জুড়ে বসেছে। এখন তারা বাপে-মেয়ের যদি উপবাসী থাকে, বকুলের ভাত যথাসময়ে জুগিয়ে যেতে হবেই। বংশীবদন—এমন কি নতুন-আসা বিড়ালটার ব্যাপারেও তাই।

মনোরমা বলে, একটু নজর রেখো বাবা পুজোর সময়টা। ঠিক ধরতে পারবে। ঠাকুরের ভোগ জীবজন্তু এসে খেয়ে যায়, সে তো ঠিক নয়।

জনার্দন নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলেন, তুই তো দোর ভেজিয়ে দিয়ে যাস। পুজোর পরে দেখতে পাই, ঠিক তেমনি ভেজানো আছে। বেড়াল চলে যাবার সময় বুঝি দোর ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়?

তবে খেয়ে যাচ্ছে কে বলো?

বোঝ, ভাই। তোরা নাস্তিক মানুষ—কিছু বিশ্বাস করিস নে—তাই

দেখিয়ে দিলেন চোখের উপর।

কিন্তু জনার্দনের প্রত্যয় কোথায় পাবে মনোরমা? ছোট্ট ঘর—জনার্দনের তক্তাপোশ অর্ধেকটা জুড়ে, বাকি মেঝেয় পূজোপচার সাজানো। পা ফেলার আর জায়গা নেই। পরের দিন মনোরমা দরজার সামনে লাঠি হাতে পাহারায় বসে রইল।

দেখো বাবা, আজকে গোনাগুনতি ভজে যাচ্ছে কি রকম।

জনার্দন আগুন হলেন।

কেন তুই দারোয়ানি করতে গেলি, কে বলেছে তোকে? পুজোর কোন ব্যাপারে তুই থাকবি নে, মানা করে দিচ্ছি। সব ব্যবস্থা আমিই করব এবার থেকে।

সারারাত জনার্দন অশান্তিতে ছটফট করলেন—ঘুম হল না। পুজোর নামে অপমান করেছেন বংশীবদনকে। দিন দুয়েক কেটে গেল—ভালো করে তবু কথাবার্তা বলেন না কারো সঙ্গে, কাজে কর্মে মন দিতে পারেন না।

দু-দিন পড়ে পূজা অন্তে অতিরিক্ত খুশি হয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। আজকে এক অপরূপ ব্যাপার—ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চ লাগছে। এত ভাগ্য এই অধম অকৃতী জনের। এমন অহৈতুকী করুণাপর তুমি ঠাকুর। ধূপ ও পুষ্পগন্ধে বাসিত প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে আধ-নিমীলিত ধ্যানদৃষ্টির সামনে দেখতে পেয়েছি, কেমন ধীরে ধীরে বংশীধারী হাতখানা ভোগের রেকাবিতে নামিয়ে এনে বিদুরের ক্ষুদ তুলে নিলে…

মনোরমাও অবাক। জনার্দন কিছু বলেন নি—কিন্তু তাঁর ভাব ভঙ্গিতে আন্দাজ পেয়েছে। ছাঁচ-বাতাসা দিয়েছিল আজ—সত্যিই ছাঁচ-গুলো কে নিয়ে নিয়েছে। জনার্দন মেয়ের উপর আর রাগ করেন না, টিপিটি। হাসেন তার বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব দেখে। হাবা মেয়ে নোস তুই—নিশ্চয় কড়া নজর রেখেছিলি, কিন্তু পারলি ধরতে? স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে কারো সাধ্য নেই যে ঐ চোর চূড়ামণিকে ধরতে পারে। মা যশোদাকে কম নাকালটা করেছিল। চিরকাল সে ত্রিভুবন ব্যেপে এমনি-ধারা লুকোচুরি খেলে বেড়ায়।

আচ্ছা, বেড়ালে কি ছাঁচ-বাতাসা খায়? অতগুলো ছাঁচ চিবিয়ে খেলে, আওয়াজ পাওয়া গেল না তো। মনোরমার মনেও নানা প্রশ্ন জাগছে। জনার্দন যা বলেছেন, তাই ঠিক? কতটুকুই বা আমাদের জ্ঞান—জানার বাইরে বিশ্বজগতে অহরহ কত কী বিচিত্র ঘটনা ঘটছে। এই তো, এতখানি বয়স হয়ে গেল—ভালো কথা শোনবার কি উঁচু ভাবনা ভাববার সময় হল কোনো দিন? সংসারের দুঃখধান্দার মধ্যে খেটে খেটে জীবনটা গেল।

মনোরমার লোভ হয় বাপের মতো একবার ধ্যানে বসে দেখবে কী মজা আছে ওর ভিতর। ক্ষণভঙ্গুর জীবনের কী সে সবল সান্ত্বনা! কিন্তু বসবে কোথায়, লজ্জা করে যে। সুবিধে এই, তারা দুটিমাত্র প্রাণী—সে আর

জনার্দন। বকুল তো বিভোর হয়ে ঘুমোয়। জনার্দন ঘরের মধ্যে জপে মজে থাকেন। কে দেখেছে তাঁর ধ্যানমূর্তি? কেউ জানতে পারবে না।

তাই হল। পরের দিন জনার্দন যথারীতি দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন। বাইরে মনোরমা—স্বর্গ-সীমানার বাইরে অভিশপ্ত প্রেতমূর্তির মতো। ঘরে হয়তো শিলা-বিগ্রহ জীবন্ময় হয়েছেন এতক্ষণে…

ঠন করে কি বস্তু পড়ল ওধারে দর্মার দিকটায়। খুব সম্ভব উপর থেকে কিছু পাচার করছে বোবা রাঁধুনিটা। মাগীটা যত শয়তান—তার অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

তুমি? আরে সর্বনাশ—এই কর্ম তোমার? ঠাকুরের ভোগ চুরি করছ দিনকে দিন? আমরা জানি তুমি ঘুমোচ্ছ—টিপিটিপি বেরিয়ে এসে সেই সময় এই সর্বনেশে দুষ্টুমি—

পুরানো বাড়ির ওদিককার জানলাটা নড়বড়ে। একটা শিক খুলে ফেলা যায়, তা ও বকুল ঠাহর করে দেখেছে। ঐ শিক আলগোছে খুলে হামাগুড়ি দিয়ে তক্তোপোশের নিচে ঢুকে পড়ে—তার পর ফাঁক বুঝে এক সময় হাত বাড়িয়ে দেয় মিষ্টান্নের দিকে খেয়ে যাবার পর যেমনকার শিক তেমনি বসিয়ে দেয় আবার। দিব্যি বিছানায় শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে ভোগ গ্রহণ করে। আজকেই গোলমাল ঘটল—শিক বসাতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে গেছে মেঝের উপর।

এত কাণ্ড—জনার্দন তবু চোখ মেলেন নি। যেমন ছিলেন তেমনি ধ্যানস্থ বসে রইলেন।

ও বাবা গালমন্দ কর তো আমাকে। এবারে দেখে নাও, কোন ঠাকুর নিত্যি এসে ভোগ খেয়ে যায়। চোর—চোরের বাচ্চা এইটুকু বয়সে এমনি চোর-চক্রবর্তী হবে কালে কালে—ফাটকে পচে মরবে।

চোখ মেললেন জনার্দন। প্রদীপ নিবু-নিবু হয়েছিল—মনোরমা উসকে দিল। প্রদীপের আলোয় আর প্রচ্ছন্ন হাসিতে জনার্দনের মুখ ভারি উজ্জ্বল। একটুকু রাগ-দুঃখ নেই। দু চোখ ভরে নতুন দেখছেন আজ বকুলকে—অবিচল দৃষ্টি মেলে দেখছেন।

বকুলের হাতের মুঠো মনোরমা জোর করে খুলে দেখাল।

দেখো বাবা, দু-হাত ভরতি খেজুর আর নারকেল নাড়ু—

জনার্দন হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।

কেড়ে নিস নে যে খবরদার। কিচ্ছু বলবি নে ওকে—

ঠাকুরের ভোগ এঁটো করে খেয়েছে, বাসি কাপড়ে বিগ্রহও ছুঁয়ে ফেলেছে হয়তো। জনার্দন তবু এই বলছেন। বুঝতে না পেরে মনোরমা হাঁ করে বাপের দিকে চেয়ে থাকে।

জনার্দন বলেন, ও জানে সমস্ত প্রসাদ ওরই জন্য তোলা থাকবে। তবু ঘুম ভেঙে যায় কেন? কলের টানে ঐটুকু ছেলে চোখ মুছতে মুছতে এসে

ভোগ চুরি করবে? আমার বংশীবদন এমনিভাবে ছলনা করে বেড়ান নানা মূর্তিতে। নিরন্ন নির্ধনের ঘরে দয়াল এসে উঠেছেন।

এ যে উলটে-উৎপত্তি হল। জনার্দন খিটখিটা করতেন আর মনোরমাই সামলে নিয়ে বেড়াত বকুলকে। সেই বুড়ো এখন অগ্নিশর্মা হয় মনোরমার উপর যদি সে তিলেক মাত্র ছেলে শাসন করতে যায়। আর বকুলও পেয়ে বসেছে। মনোরমার কাছে তেমন জুত হয় না—কিন্তু ঠাকুর হবার যাবতীয় সুখ ও আরাম বুড়ো ভক্তটির কাছ থেকে পুরো মাত্রায় সে আদায় করে নিচ্ছে। দেবতা-বকুলের হাঁকডাকে তটস্থ তিনি।

সংসার মাত্র আড়াই জনের—তা ও আর চালানো যাচ্ছে না। দোকান থেকে ফিরেই জনার্দন সেদিন মুখ শুকনো করে বসে আছেন, নড়ে বসবারও শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

বকুলের আর ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবার হেতু নেই, দাদুর অপেক্ষায় বসে থাকে। দু হাতে জনার্দনের কণ্ঠ বেষ্টন করে সে বলল, চান টান কখন করবে দাদু? পূজোয় বসবে না?

বসব তো রে—আজ কিন্তু ঠাকুরের নিরম্বু উপোস। ভোগ কিনবার পয়সা জুটল না—ধানদূর্বা আর বেলপাতা। হায় ভগবান, বুড়ো বয়সে কত যে দুঃখ আছে অদৃষ্টে।

বকুলও অবিকল সেই সুরে বলে ওঠে, হায় ভগবান।

হেসে ওঠেন জনার্দন। না হেসে কেউ থাকতে পারে এমন ভাব-ভঙ্গি দেখে? গুমোট কেটে গেল।

হাসতে হাসতে জনার্দন বলেন,—আসছে সেদিন। হাসি শুকিয়ে যাবে মুখ থেকে। তার দেরি নেই।

মনোরমা এসে বাগিনি দেয়, বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে কি রকম কথাবার্তা বাবা? মুখ চুন হয়ে গেছে।

জনার্দন বললেন, আর পেরে উঠব না—সে আমি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিচ্ছি। ও ই আমার দাদু হয়ে সংসার দেখাশুনা করুক।

গভীর নিশ্বাস ফেললেন মনোরমার পিঠোপিটি এক ছেলে হয়েছিল। বাঁচল না। জামাইটাও যদি থাকত, বুড়ো বয়সের তবু এক আশ্রয় হত—একটুখানি ভরসার আলো দেখতে পেতেন তিনি।

পয়সা চাই। বুড়ো দাদু চোখের জল ফেলেছে পয়সা নেই বলে। বাড়ির অনতিদূরে শিববাড়ি—বকুল ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে সেখানে। উলটো দিকের ফুটপাতে কয়েকটা ভিখারি।

অন্ধ নাচার বাবা, একটি পয়সা দাও—

চেঁচাচ্ছে এমনি। চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। স্থলবপু এক

মহিলা একটি আনি ফেলে দিয়ে মন্দিরের চাতালে উঠলেন। আহ্নিক করলেন অনেকক্ষণ ধরে, আরও বহু জনে করছে। তারপর নেমে আবার রাস্তায় এসেছেন।

অন্ধ নাচার মা—

এ কোন কচি অন্ধ রে! মহিলা তাকালেন তার দিকে। তাকিয়েই টের পেলেন।

জোচ্চুরির জায়গা পাস না? ওইটুকু ছেলে, মুখ টিপলে দুধ বেরোয়··· ও মা, কালে কালে হয়ে উঠল কি!

অন্ধ নাচার—

দাঁড়া, তোর বজ্জাতি বের করছি। পুলিশ ডাকব।

পুলিশের নামে বকুল ভয় পেয়ে গেল। বিশুষ্ক মুখে বলে, সত্যি অন্ধ— মাইরি···বিদ্যের কিরে—

একটু ভিড় জমেছে। নানা জনের নানা মন্তব্য। এরই মধ্যে জয়ন্তীর ঝকঝকে মোটর এসে থামল। এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল। তাকিয়ে দেখে নেমে পড়েছে।

কী হয়েছে?

দেখুন দেখুন—বাচ্চা ছেলে অন্ধ সেজেছে। পয়সা জুটিয়ে বিড়িটিড়ি খাবে আর কি!

জয়ন্তী বলে, বিড়ি হতে পারে, ছাতু-মুড়িও হতে পারে। যা দিনকাল পড়েছে, কিছু বলা যায় না। হ্যাঁরে, বিড়ি খাবি তুই বুঝি?

আমি বিড়ি খাই নে। বিদ্যের কিরে।

কী খাস?

বাতাসা খাই, ভোগ খাই, ভাত আর আলু-ভাতে খাই—

জয়ন্তী মহিলার দিকে হাসিমুখে বলে, কথায় তুবড়ি ফোটাচ্ছে কি রকম দেখুন! বড় হলে যা হবে—

মহিলা তিক্ত কণ্ঠে বলেন, এখনই বা কম কিসে? লোক ঠকাচ্ছে। অন্ধ ওর চোদ্দ পুরুষে নয়।

বকুল বলে, সত্যি আমি অন্ধ। চোখ বন্ধ আছে, এই দেখো—

জয়ন্তী বলে, হাতে আমার কী আছে, বল্। অন্ধ হলে ঠিক বলতে পারবি।

ব্যাগ—

উঁহু—হল না। উনি ঠিক বলেছেন, অন্ধ তুই কখনো নোস। হাতে যে আমার ছাতা।

বকুল রাগ করে বলে, কক্ষনো না। হাতে ব্যাগ আছে তোমার—

আচ্ছা, কেমন ব্যাগ? রাঙা, সাদা না কালো?

সাদা—

জয়ন্তী হেসে বলে, সত্যি অন্ধ তুই। আর সন্দেহ করা চলে না। বাড়ি

কোথায় রে তোর ?

হুই, উদিক পানে—

কে কে আছে ?

মা আছে, দুধগোপাল আছে, দাদু আছে—

দুধগোপালটা কে ?

বেড়াল। খেলা করে আমার সঙ্গে, শোয়—

জয়ন্তী একটা টাকা দিল। আহ্লাদে তিড়িং করে এক নাচন দিয়ে গলিঘুঁজি ভেঙে বকুল চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ন্তী যেন সম্বিৎ হারিয়ে তাকিয়ে আছে।

স্থূলাঙ্গিনীর কথায় চমক ভাঙল।

কেমন অন্ধ, দেখলেন তো ? এদের আগাপাশতলা চাবকানো উচিত।

টাকা এলো কোত্থেকে জনার্দনের ফতুয়ার পকেটে ? রুপোর টাকা নয়, নোট নয়। পড়ে ছিল আগে থেকে, তিনি টের পাননি—এমনটা হতে পারে না।

মনোরমা বলে, খদ্দের কেউ দিয়ে গেছে বাবা। ঠাকুরের কথা ভাবছিলে হয়তো তখন—অন্যমনস্ক হয়ে পকেট ফেলেছ।

তাই হবে।

জনার্দন হাসলেন। কথা বাড়িয়ে লাভ কী, মনোরমা বুঝবে না। তাই বটে। খদ্দের আজকাল এত টাকাকড়ি দিয়ে যায় যে অন্যমনস্ক হয়ে কোথায় কী রাখেন, খেয়াল থাকে না। কালকে উপোস গেছে—খুব জব্দ হয়েছে ঠাকুর—দায়ে পড়ে ভোগের টাকা নিজে দিয়ে গেছে পকেটের ভিতর

অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। তাঁর উপর যাদের নির্ভর, তারা কষ্ট পাচ্ছে। নিজের বা মেয়ের জন্য তত ভাবেন না—অবোধ অবোলা-গুলোর জন্য—ঐ বকুল, বংশীবদন, দুধগোপাল। এটা বোঝা যাচ্ছে, ঘরে বসে এই ভাবে দোকান চলবে না। রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে খদ্দের ধরতে হবে। কার বয়ে গেছে—কে তোমার দোকান অবধি এসে ছবি কিনবে, ছবি বাঁধতে দিতে যাবে ? ঐ তো সব মান্ধাতার কালের ছবি, আর কাঠে কাঠে পেরেক ঠুকে বাঁধানো।

ভেবেচিন্তে জনার্দন একটা থলিতে কিছু ছবি আর বাঁধানোর যন্ত্রপাতি ভরলেন। ফ্রেমের তাড়া আর কাচ ন্যাকড়ায় জড়িয়ে বগল-দাবায় যাবে। রাস্তায় হাঁক দিয়ে বেড়াবেন, ছবি বাঁধাই—ছবি-ই-ই…

ডাকবে নিশ্চয় কেউ কেউ। ছবি সেখানে বসে বাঁধানো না-ই যদি হয়ে ওঠে, অর্ডার নিয়ে আসা যাবে। ভাবতে ভাবতে জনার্দন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কত বাড়িতে দেখা যায়, পুরানো ছবি ভেঙে পড়ে আছে—কর্তা-দের উদ্যোগ হয় না নতুন করে বাঁধাবার। বাড়ির উপর গেলে চাড় হবে।

কিন্তু প্রথম দিন পুরো একটা বেলা ঘোরাঘুরিই সার হল। ফিরে এসে গড়িয়ে পড়লেন—রোদে ও ক্লান্তিতে অবসন্ন। এ বয়সে পোষায় কি এমন করে? হায় ভগবান, কত দুঃখ আছে এই পোড়া অদৃষ্টে। দুঃখ না থাকলে ছেলেটা চলে যাবে কেন—থাকলে আজকে কি নড়ে বসতে হয়?

মনোরমা বলে, হল কিছু?

আট আনার পয়সা বের করে তার হাতে দিলেন। বললেন, আর খা কটা ঘুরলে হত। কিন্তু রোদে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, চোখে অন্ধকার দেখলাম। ক্ষমতার শেষ হয়েছে বুঝতে পারছি, এখন চলে যাওয়ার পালা।

বকুল এসে বড় বড় চোখ মেলে শুনছিল। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জনার্দন বললেন, মনে কষ্ট হয়েছে ওর। না, ওর সামনে আর কিছু বলা হবে না। মুখ আঁধার হয়ে গেল—দেখেছিস নজর করে?

ডাকছেন, বকু—বকুলবাবু! কোথায় গেলে মানিক আমার?

বারাণ্ডার নিচে উঠানের প্রান্তে দেখতে পেলেন, এদিকটায় পিছন ফিরে অতি নিবিষ্ট হয়ে বকুল কী করছে। টিপিটিপি গিয়ে আড়কোলা করে তুলে ধরলেন।

ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না—করছ কী এখানে বসে?

সে কোথা থেকে এক থলি জুটিয়েছে। ফ্রেম আর কাচের ছাঁট পুরেছে তার ভিতর। মতলব বোঝা গেল অতএব।

জনার্দন বলেন, ছিঃ—ফেরিওয়ালার কাজ তোমায় কি মানায় সোনার ঠাকুর? তুমি পাটে বসে থাকবে। পড়বে, লিখবে, হাসবে, খেলবে। না, না—আমরা যা করি, তুমি সে সব করতে যাবে কেন?

পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেন। ভেবেচিন্তে এই ঠিক হয়েছে—বেলা বাড়বার আগেই বাড়ি ফিরবেন, তারপর খাওয়া-দাওয়া অন্তে দোকানের দরজা খোলা হবে। দোকান একেবারে ছাড়া চলবে না, দুই কূল রাখতে হবে। মারা পড়তে পারেন না তো ঠিক দুপুরে পথে পথে ঘুরে সিদ্ধ হয়ে? মরার ভয় এমনি অবশ্য নেই, কিন্তু মরলে যে একটি পয়সাও এনে দেওয়া যাবে না—ওদের সংসার চলবে কেমন করে?

রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে, জল জমে আছে রাস্তায়। সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছে। শিববাড়ি ছাড়িয়ে ট্রামরাস্তায় পা দিয়েছেন, মিষ্টি রিনরিনে গলা কানে এল, ছবি ছবি—ছবি-ই-ই—

এক বাড়ির পাঁচিলের গায়ে জনার্দন গুটিসুটি হয়ে দাঁড়ালেন। কাছে যেই এসেছে—বলে উঠলেন, কই গো, কোথায় ছবি? আমি চাই। এই যে সোনার ছবি এই আমার বুকে তুলে নিয়েছি। আরে, আরে—এ কী মূর্তি হয়েছে, পড়ে গিয়েছিলে দাদাভাই?

বন্দী বকুল পা দাপাচ্ছে, দু-হাতে গুম-গুম করে মারছে জনার্দনের পিঠে। তাই কি পাবে বুড়োর সঙ্গে? কোলের উপর নিয়ে একেবারে মনোরমার সামনে তাকে হাজির করলেন।

পা পিছলে আছাড় খেয়েছে। পা ধুইয়ে কাপড় বদলে দে। আমাদের দুঃখ দেখে রোজগারে বেরিয়েছিল—কিছু বলিস নে মনু, খবরদার!

খুব রেগে আছে বকুল। সমস্তটা দিন একটা কথা বলে নি জনার্দনের সঙ্গে। একবার হাত ধরে ফেলেছিলেন, এঁকে-বেঁকে ছাড়িয়ে নিল। চোখে জল টলটল করছে, জোর করে ধরতে ভরসা হয় না। পূজার প্রসাদ দেবার সময় দেখা গেল, অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে বিছানায় পড়ে। ঠেলাঠেলি করেও ঘুম ভাঙল না। মুখের মধ্যে জনার্দন একটা কদমা ভেঙে একটুখানি দিতে গেলেন। কিন্তু দাঁতে দাঁতে চেপে আছে ঘুমন্ত মানুষ। সাধ্য কি মিষ্টি খাওয়ানো যায়।

পরদিন খুব ভোরে উঠে আসবার সময় মনোরমা শিকল দিয়ে বকুলকে ঘরে আটকে এল। জনার্দন বেরিয়ে পড়ুন, বেলা হোক—তখন দরজা খুলবে। হল তাই। অনেকক্ষণ জনার্দন চলে গেছেন। রোদ ঝিলমিল করছে চারিদিকে কিন্তু বকুল একেবারে চুপচাপ। যা ছেলে—চোখ মেলে অবস্থা বুঝতে পেরেছে, উচ্চবাচ্য না করে দেদার এই ফাঁকে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

মনোরমা দরজা খুলল। তুলে দিতে হবে এবার—খাবে, পড়তে বসবে, আর ঘুমুলে চলবে কেন?

কী ব্যাপার, শয্যায় তো নেই। পালাল কোথা দরজা-বন্ধ ঘর থেকে! বকুল করেছে কি—লুকিয়ে ছিল কবাটের আড়ালে, কাঁধে ঝোলানো সেই থলি। মনোরমা তক্তপোশের নিচে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে, টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ে সে দে ছুট—

এ-ফুটপাতে জনার্দন হেঁকে চলেছেন, ও-ফুটপাতে তার প্রতিধ্বনি। একদিকে বুড়া, ওদিকে শিশু। পাল্লা চলেছে হাঁক পাড়বার। জনার্দন না দেখতে পান এমনি ভাবে বকুল এক একবার তাকাচ্ছে এদিকে। জনার্দনও চুপিসাড়ে তাকান। ভয়ানক বিবাদ চলেছে কি না—কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। তাকিয়েও দেখবে না কে কী করছে। ট্রাম-মোটর এসে পড়ছে তাদের মধ্যে, মাঝখানের পথের উপর। নজর সেই সময়টা আটকে যায়। গাড়ি চলে গিয়ে খালি হয় আবার। প্রায় সমান তালে চলেছে, কেউ কারো পিছনে পড়ে না। অথচ দেখো, ভারি ঝগড়া দুজনের মধ্যে। কোনো দিন যে পরিচয় ছিল, ভাব দেখে তা বুঝতে পারবে না।

পথ-চলতি মানুষ সকৌতুকে তাকাচ্ছে বকুলের দিকে। এমন কচি ছেলে ছবি বেচতে বেরিয়েছে। দুঃখও লাগে—নিতান্ত অভাবে পড়েই পথে

বেরিয়েছে এইটুকু ছেলে।

দেখি খোকা কী ছবি আছে তোমার—

পাঁজি থেকে কাটা ঘণ্টাকর্ণ-পুজোর ছবি—দমাদম লাঠি পিটে ক-ভাই পুজোপচার লণ্ডভণ্ড করছে···হাঁপানি-সংহারক রস অশ্বিনীর লোকটির বুকে মলম মালিশ করছে···জনার্দনের দোকানের ছেঁড়া বাতিল ছবিও আছে দু-চারখানা।

লোকটি তারিফ করে, বাঃ—খাসা খাসা ছবি তো। নিচ্ছি আমি একখানা।

বকুল বলে, ছবি বাঁধাতেও পারি। বাঁধিয়ে দেব?

লোকটি হেসে বলে. সে বুঝতে পেরেছি। সব পার তুমি। কিন্তু এখন সময় নেই। কিছু খেও এই দিয়ে—কেমন?

হাতে একটা পয়সা গুঁজে দিয়ে হনহনিয়ে লোকটা চলে গেল। তা বলেছে ভালো। সকালে কিছু খায় নি, খিদে পেয়েছে, খাওয়ার প্রয়োজন।

সওদার সময়টা জনার্দন দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর ফুটপাতেব উপর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকুলকে নয়—উপরের দিকে ট্রামের তার দেখছিলেন। এগোবেন কেমন করে যদি সে পথ হারিয়ে ফেলে। এতদূর এসে পড়েছে. পথ চিনে বাড়ি ফেরা কি সহজ কথা?

লোকটা চলে গেলে জনার্দন বকুলের দিকে এগিয়ে এলেন। হাতের মুঠোয় পয়সা—বকুলের মন এখন ভারি খুশি। জনার্দনও তাতে বাতাস দিচ্ছেন।

ক্ষমতা আছে বটে ঠাকুরের! আমি পারলাম না, দাদা ভাই আমার কত রোজগার করে ফেলেছে!

গলিতে ঢুকবেন জনার্দন এবার।

দাদাভাইয়ের আমার সঙ্গে তো ঝগড়া! ও পাতিকাক শোনো—তুমিই শোনো তবে, ডাইনে ঢুকছি। বড়-রাস্তায় চারতলা ছ-তলা বাড়ির উপর থেকে আমার গলা শুনতে পায় না। গলির মধ্যে চেঁচিয়ে দেখি। আমি বকুবাবু নই, অত কায়দা-কানুন জানি নে বাপু। উঃ, বকুবাবু কেমন সব ছবি বিক্রি করে. আমি পারি নে।

মোড় ঘুরে জনার্দন আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। বকুলের দৃক্‌পাত নেই তো! যেমন যাচ্ছিল, তেমনি চলেছে থপথপ করে গম্ভীর মুখে, ব্যবসায়ের থলিটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে। জনার্দন আবার চিৎকার করেন।

শুনছ—ওহে থামওয়ালা বাড়ি, আমি এই ডাইনে ঘুরলাম। কেউ যদি হারিয়ে যায়, আমি কিন্তু জানি নে বাপু।

আবার খানিকটা গিয়ে তাকান। দেখা নেই তো! আলাতন, এই করে বেড়াবেন তো কাজ হবে কখন? রাস্তায় রাস্তায় দুই ছেলে-বুড়োয়

লুকোচুরি খেলতে কি বেরিয়েছেন ?

মনোযোগ দিয়ে হাঁক দিচ্ছেন এবার—খদ্দের চাই-ই। এরই মধ্যে নজর পড়ল...যাক, এতক্ষণে দেখা গেছে বাবুকে। দূরে অনেক পিছনে। না এসে যাবে কোথায় ? জনার্দন এক রোয়াকের কোণে বসে পড়লেন। যেন কষ্ট হয়েছে, জিরিয়ে নিচ্ছেন। বকুল এগিয়ে আসুক খানিকটা—অনেক পিছনে পড়েছে। এসেছে...চোরের মতো পা টিপে টিপে রোয়াকের ধারে এসে গেছে। কিছু টের পাচ্ছেন না জনার্দন—পাবেন কী করে, পিছনে তো চোখ নেই। মাথা টপকে সামনে সামনে এসে পড়ল মুড়ির একটা ঠোঙা। এই জন্য অদৃশ্য হয়েছিল সে—মুড়ি কিনছিল। মুড়ি ফেলেই বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো সাঁ করে সে ছুটে বেরুল। দুজনে বিষম ঝগড়া কিনা।

এমন পথে-ঘাটে বুড়ো মানুষের খাওয়া চলে কি ? কিন্তু বকুল দিয়েছে যত্ন করে—সে তো যে-সে বস্তু নয় ? এর চেয়ে পবিত্র সংসারের মধ্যে আর কী আছে ? গঙ্গাজল খেতে দোষ নেই তো এতেও নেই।

রাত্রিবেলাও এই রকম মুড়ি হয়েছে। ক্ষিধেয় অবসন্ন হয়েছিলেন। বসবার কারণ শুধু বকুল নয়—এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে। মুড়ি খেয়ে রাস্তার কলে জল খেয়ে চাঙা হলেন। হাঁক দিচ্ছেন ছবি—ছবি—বাঁধাবেন—

ওদিকে আর কোন্ অদৃশ্য গলি থেকে শোনা যাচ্ছে, ছবি—

বিশালকায় এক গোরু বকুলের গলিতে। বড্ড বেয়াড়া গোরু তো—শিং উঁচিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে পিছু নিয়েছে। কেন, কি জন্যে ? মুড়ি শুধু দাদুকে দেয় নি, তারও আছে—ঠোঙায় খেতে খেতে আসছিল, গোরু কি তার ভাগ চায় ? মুড়ি ছড়িয়ে দিল চাট্টি। গোরুটা শুঁকছে, এই ফাঁকে বকুল এগিয়ে গেছে অনেকটা। কী মুশকিল, মুড়ি না খেয়ে 'বার সে পিছু ধরল। ছুটল এবারে বকুল।

দুই গলি এক জায়গায় মিশেছে চওড়া রাস্তায়। ছুটতে ছুটতে সে এসে পড়েছে জনার্দনের কাছে। অতি সন্তর্পণে তাঁকে স্পর্শ করে। আর কি, নির্ভয় এতক্ষণে। কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না সে এখন। গোরুও চলে গেছে অন্যদিকে, দাদুকে দেখে পালিয়েছে। গোরু যখন নেই, আবার খানিকটা দূরে দূরে চলতে বাধা কি ?

অদৃষ্ট ভালো—এক বাড়ি থেকে আহ্বান এলো, এসো এই দিকে বুড়ো—

জনার্দন ঢুকলেন। ফটকের বাইরে বকুল উঁকিঝুঁকি দেয়।

ছবিটার কাচ ভেঙে গেছে, বাঁধিয়ে দিতে পারবে ?

কেন পারব না। এই তো কাজ আমাদের—

ছবি হাতে নিয়ে দরদস্তুর করলেন। তারপর যন্ত্রপাতি নামিয়ে বসে পড়লেন সেখানে।

বকুলই বা কম কিসে ? এদের দরদস্তুরের মধ্যে সে কেন অকারণ সময় নষ্ট করবে ? খানিকটা দূর এক বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচাচ্ছে, ছবি—

কেউ সাড়া দেয় না। বারংবার হাঁক পাড়ছে, ছবি—ছবি—

বৈঠকখানা খোলা। বকুল ঢুকে পড়ল। পাশের কামরায় মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলে, ছবি বাঁধাবে?

ধমক দিয়ে উঠল একটা লোক, আচ্ছা উৎপাত তো।

লোক আর বলি কেন—আশুতোষ। জয়ন্তীর বাড়িতে আশুতোষ বছরে নিকাশ দিতে এসেছেন। বৈঠকখানায় এলেন তাকের উপর থেকে দোয়াত-কলম নিতে। বকুলকে দেখে অবাক হয়ে বলেন, এইটুকু ছেলে—তুই বাঁধবি ছবি?

দিয়ে দেখো না—

যা, যা, ছবি নেই।

না থাকে, কেনো তবে আমার কাছে। দাদুর কাছে আরো সব ভালো ভালো ছবি আছে। ভালো করে বাঁধিয়ে দেব। আমি না পারি, দাদু আসছে। তার মতো ছবির কাজ পিরথিমে কেউ পারে না।

আশুতোষ বলেন, হ্যাঁ—যা বাজার পড়েছে, মানুষ আবার ছবি কিনবে!

নাছোড়বান্দা বকুল বলে, তবে পুরানো ছবিই বাঁধিয়ে নাও।

মুখের দিকে চেয়ে অনুনয় করে, নাও গো—নাও—

সবই বাঁধানো আছে রে—

কাচ ভেঙেচুরে যায় তো অনেক। দেখো না—

যা-যা-যা। নেই। বেরো—বেরিয়ে যা বলছি।

দোয়াত নিয়ে আশুতোষ কাছারিঘরে চলে গেলেন।...

ঝনাত—

কি রে? দেখ তো, কী পড়ল ওদিকে?

দারোয়ান আর দু-তিনটে চাকর ছুটে এল।

বাবুর বড় ছবিটা ভেঙেছে। বজ্জাত ছোঁড়া ভেঙে দিয়ে গেল। ধর্, ধর্—উই পালিয়ে যাচ্ছে—

নাগরা জুতোর আওয়াজ পিছনে। বকুল প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। এঁকে-বেঁকে এ-গলিতে ও-গলিতে ঢোকে।

জয়ন্তী বাইরে গিয়েছিল। বৈঠকখানায় পা দিয়ে স্তম্ভিত।

ছবি ভাঙল কে?

বাচ্চা একটা—

কে সে?

রাস্তা থেকে হঠাৎ এসে ঢুকে পড়েছিল।

জয়ন্তী গর্জন করে ওঠে, দারোয়ান করছিল কী? ঢুকতে দেয় কেন যাকে তাকে? খালি আড্ডা হয়েছে তোমাদের। দাঁড়াও, দলসুদ্ধ বিদেয় করছি—

ছবির কাচ ভেঙেছে, সে একটা ক্ষতি বটেই—আবার ছবিটা হল অম-

রেশের। জয়ন্তী রীতিমত শঙ্কিত অমরেশ সম্পর্কে। এমনিতেই রাগারাগি চলছে, এর উপরে ছবিতে ইট পড়েছে টের পেলে রক্ষে থাকবে না। এটা জয়ন্তীদের কারসাজি, নিঃসন্দেহে সে বিশ্বাস করে বসবে। অবস্থা এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় সে ঝগড়া বাধায়।

তোমার খাই-পরি কি না, তাই এত অপমান করতে সাহস কর—

আগে জয়ন্তী নিরুত্তরে সয়ে যেত। এখন সমান সমান জবাব দেয়।

তোমার খাই না, পরিও না—কিন্তু তুমি কি ছেড়ে কথা বল? ড্রাইভারের কাছে পর্যন্ত খোঁজ নিয়েছ, গাড়িতে পুরুষ কেউ আমার সঙ্গে থাকে কি না।

আমায় সঙ্গে নিলে তো কথা ওঠে না—

তোমায় নিয়ে কোথায় যাব?

তা তো বটেই। আমি যে খোঁড়া—

অন্ততপক্ষে এই অবধি জয়ন্তীর থেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেদিন কি হল—মন জ্বলছে বনমালীর কাছে তত্ত্বতল্লাশ হয়েছে, খবরটা শোনা অবধি—সমান তেজে সে জবাব দিল, খোঁড়া সে কি মিথ্যে?

ব্যাপার সত্যি তাই। ঘর-সংসারে জয়ন্তীর বিরক্তি ধরে গেছে, যতক্ষণ পারে বাইরে বাইরে বেড়ায়। অমরেশকে সঙ্গে নেবে--তা ঠিকই ধরেছে অমরেশ—বান্ধবীদের সঙ্গে খোঁড়া স্বামীর পরিচয় করিয়ে দিতে লজ্জা করে বই-কি। সে সব দিন আর নেই, স্বামীগর্বে ফেটে পড়ত সে যখন—কে আছে ভুবনে, রূপে গুণে বিদ্যায় অমরেশের পাশে দাঁড়াতে পারে? আর অমরেশও স্ত্রীকে পাগল হয়ে ভালোবেসেছে, মর্যাদার অনেক উঁচু সিংহাসনে নিয়ে বসিয়েছে মনে মনে। সেই পরম সুখী দম্পতির একে অন্যকে এমন হয়েছে, কেউ কাউকে সইতে পারে না। ভব্যতার আবরণটুকুও থাকে না সময় সময়।

আমি যে খোঁড়া—

জয়ন্তী বলে, খোঁড়া সেটা মিথ্যে নয়। আর বারবার শোনালেই নতুন একখানা পা বেরুবে না।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিঘূর্ণিত করে অমরেশ বলে, কিন্তু কে করেছে?

দৈব দুর্ঘটনা। সেই বিপাকে তোমার না হয়ে আমার পা ও খোঁড়া হতে পারত। কিন্তু সে যা-হোক, আমি তো অপরাধ মেনে নিয়েছি—জীবনভোর তার প্রায়শ্চিত্ত চলেছে।

অমরেশ বলে, সে জানি—আমার স্ত্রী হওয়া তুমি বলে প্রায়শ্চিত্তের সমান। অনেক দিন তো হল—এবারে মুক্তি। থাকব না তোমার গলগ্রহ হয়ে—

অবিরত কলহ এবং অকারণ সন্দেহে জয়ন্তীও সহ্যের শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বলে, জুটল নাকি কোথাও কিছু?

জোটাবই। পা একখানা আছে তবু—তারই উপর ভর দিয়ে দাঁড়াব।

জয়ন্তী বলে, আমিও তাই বলি—কোনো কাজে লেগে পড়া উচিত। যত

গোলমাল কুঁড়ে হয়ে শুয়ে-বসে থাকার জন্য। মামা এসেছেন—যাও না তাঁর সঙ্গে মহালে। সেখানে দিনকতক থেকে এসো।

অমরেশ বলে, তোমার এলাকা ছাড়াও পৃথিবীতে জায়গা আছে। ঢের ঢের নিয়েছি, আর তোমার দয়া নেব না।

পরে শান্ত হয়ে জয়ন্তীর লজ্জার অবধি রইল না। অমরেশকে অনেক রকমে ভোলাবার চেষ্টা করেছে, মাপ চেয়েছে তার কাছে প্রকারান্তরে। ইদানীং তাদের মধ্যে সামান্যই কথাবার্তা হয়, অমরেশ প্রায় নির্বাক হয়ে থাকে। খুব কম সময় সে বাড়ি থাকে, পুরানো পরিচিতদের কাছে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়। প্রাণপাত চেষ্টা করছে চাকরির জন্য। জয়ন্তীর গাড়িও নেয় না, ক্রাচে ভর দিয়ে খুটখুট করে চলে। দূর বেশি হলে ট্রামে বাসে যায়।

শঙ্কান্বিত জয়ন্তীর কানে এলো, ছবি বাঁধাবেন?

জয়ন্তী বলে, ডাকো ছবিওয়ালাকে। শোনো বুড়ো, ছবির কাচ লাগিয়ে দিতে হবে।

যে আজ্ঞে—

লেগে যাও তবে।

এত বড় কাচ সঙ্গে আনা যায় না মা। দোকানে আছে, সেইখানে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দেব—

তাড়াতাড়ি কিন্তু, খুব জরুরি—

গাড়ি তখনো গ্যারেজে ওঠে নি। জয়ন্তী ড্রাইভারকে ডেকে বলে, ছবিটা পাড়ো বনমালী। কারিগরকেও তুলে নাও। দোকান থেকে কাচ লাগিয়ে নিয়ে এসো এক্ষুনি—

গাড়িতে উঠতে গিয়ে জনার্দন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। নিঃসংশয়ে জানেন, বকুল আশেপাশে আছে কোথাও লুকিয়ে। একবার ডাকলেন, বকুবাবু—

বনমালী তাড়া দেয়, যাবে তো চলো। নয় তো আর কোনো দোকানে দিয়ে আসি।

বকুল কি একা-একা চলে গেছে বাড়িতে? চিনে যেতে পেরেছে? না গিয়ে থাকে তো ছবি দোকানে রেখে আবার এসে খোঁজাখুঁজি করতে হবে। জ্বালাতন, জ্বালাতন। ছেলেটার জ্বালায় এক তিল সোয়াস্তি নেই।

দারোয়ান ধরে ফেলেছে বকুলকে। চুল ধরে টানতে টানতে জয়ন্তীর কাছে নিয়ে এলো। অনেক ভুগিয়েছে হতভাগা—মুখের গালিতে বোধ হয় রাগ শোধ যায় নি। নাগরা-জুতো দিয়ে পিটেছে কিনা কে জানে? রক্ত ফুটে বেরিয়েছে পিঠের কয়েকটা জায়গায়।

জয়ন্তী বলে, ইট মেরেছ তুমি ছবিতে?

হুঁ—

কেন ?

ভাণ্ডব বলে—

আশুতোষ রাগে গরগর করছেন। সময়ে সময়ে জয়ন্তী একেবারে পরমহংস হয়ে ওঠে—এমন কাটা-কাটা জবাব শুনেও দৃকপাত নেই। যেন ভারি মজার কথা—আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাই শুনছে।

কোন্ দিক দিয়ে অমরেশ এসে পড়ল।

কে ছেলেটা ?

আশুতোষ বলে, কি জানি—কোন লাটসাহেবের বেটা। ঢিল মেরে আমার ছবি ভেঙেছে। তার উপরে ব কিার বহর শোনো।

কী আশ্চর্য, অমরেশও হাসে।

ঢিল ছবিতে মেরেছে, আমায় মারে নি তো। খেপে যাচ্ছেন কেন মামা ?

তার পর সে-ও রসিয়ে রসিয়ে প্রশ্ন করে, আমার উপরে এত রাগ কেন খোকা ? খোঁড়া ল্যাং-ল্যাং কর, ঢিল মেরে ছবি ভেঙে দাও—

বকুল সবিস্ময়ে বলে, তোমার পরে রাগ কেন হবে ? ছবিতে মারলে ব্যথা লাগে না তো !

কিন্তু ছবির পরেই বা রাগ কিসের ?

রাগ নয়—

থেমে রইল একটুখানি। আবার জোর দিয়ে বলে, ছবি মারে না, বকে না, কিচ্ছু না। ছবি আমার কী করেছে ?

রাগ নয়, কি তবে বলো। বলতেই হবে খোকা—

এবার জয়ন্তীর মুখে সোজা তাকিয়ে বকুল বলল, ছবি বাঁধাও না কেন তোমরা ? জান, কালকে দাদু না খেয়ে আছে। মা-ও খায় নি—

জল টলটল করে উঠল একফোঁটা বালকের চোখে। কান্না-ভরা কণ্ঠে সে বলল, কেউ চায় না ছবি বাঁধাতে। কেউ ছবি কেনে না। কত দুঃখ যে দাদুর কপালে—হায় ভগবান।

আশুতোষ বলেন, বুঝতে পারলাম, ঐ যে বুড়ো ছবি-ছবি হাঁক দিচ্ছিল—

আমার দাদু—

আর কোথায় যাবে, আশুতোষ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন।

শুনলে তো ? বাচ্চা-বুড়োয় দল বেঁধেছে। বুড়োই লেলিয়ে দেয় বাচ্চাটাকে—দুটোকে একসঙ্গে থানায় পাঠাতে হবে।

অমরেশ তখন বকুলকে কাছে নিয়ে পিঠে হাত বুলাচ্ছিল। চোখ সজল হয়ে উঠেছে। আশুতোষের কথায় সে গর্জন করে ওঠে, থানায় আপনাদের পাঠানো উচিত। মনিব চাকর সবগুলোকে। দুষ্টুমি করে না হয় ক্ষতিই করেছে ; তা বলে একটু দয়ামায়া থাকবে না ? উঃ, কশাই আপনারা—মুখ দেখলে পাপ হয়।

জয়ন্তী তখন ওদিকের দরজায় কুঞ্জ খানসামাকে ডেকে কী নির্দেশ

দিচ্ছিল। অমরেশের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। বোধ করি মুখ দেখবারই অনিচ্ছায় অমরেশ টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

খানিক পরে হৃদয়ের ভারটা একটু কেটেছে। বকুলকে কোলের কাছে বসিয়ে জয়ন্তী ঘাটিয়ে ঘাটিয়ে তার কথা শোনে। কুঞ্জ এসে বলল, খানা তৈয়ারি—

যাচ্ছি—

উঠে দাঁড়িয়ে বকুলের হাত ধরে জয়ন্তী বলে, চলো খোকা। খেতে খেতে গল্প হবে—কেমন ?

বড় বড় ঝাঁকড়া চুলের বোঝা নেড়ে বকুল বলে, আমি যাই।

খেয়ে তারপর যাবে।

না না— মাথা জোরে বকুল ঘাড় নাড়ে। আমি বাড়ি যাব।

বাড়ির কথা মনে উঠতে ছেলে ব্যাকুল হয়েছে, খাঁচায়-পোরা পাখির মতো ছটফট করছে। অসহায় চোখের চাউনি। খাওয়ানোর আগ্রহ ও টানাটানিতে আরো যেন ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্তী বলে, যাবে-যাবে বলছ, তা ঠিকানা জান ? কোন রাস্তায় তোমাদের বাড়ি ?

বকুল ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

চিনে যেতে পারবে ?

বকুল বলে, আমার ভয় করবে মস্ত বড় তেঁতুলগাছ—সেই গাছে ভূত থাকে।

দু পা এগিয়ে এসে এবারে সে-ই জয়ন্তীর হাত চেপে ধরে।

—তুমি চলো—

জয়ন্তী বলে, আমি তো চিনি নে তোমাদের বাড়ি।

যে আশুতোষ এমন বারমুখি হয়েছিলেন, নিরুপায় শিশু তাঁর দিকে চেয়ে বলে, তুমি চেন ?

কিন্তু আশুতোষ মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বকুল আঁচল ধরে বলে, কে চেনে তা হলে বলো—

জয়ন্তী বলে, কেউ চেনে না খোকা। চিনবে কী করে ? তুমি যে ঠিকানা বলতে পারছ না।

ঐ যে বললাম, তেঁতুলগাছ—খুব বড় বড় ডাল, একটা বাঁদর এসেছিল ঐ গাছে—তেঁতুল খেত।

জয়ন্তী হেসে বলে, বড় ডালওয়ালা কত তেঁতুল গাছ আছে। শুধু গাছ বললে কি চেনা যায় ?

বিরক্ত অধীর কণ্ঠে বকুল বলে, তোমরা বোকা—কিচ্ছু জান না। তবে আমি একলাই যাব। রাম-রাম করতে করতে যাব, ভূতে কী করবে ?

তখনই রওনা হয়ে যায়। জয়ন্তী বাধা দিয়ে বলে, একলা যেতে হবে না খোকা। গাড়িতে তোমার দাদুকে নিয়ে গেছে। আসুক—আবার তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে বকুল বলে, কিসের গাড়ি?

মোটরগাড়ি। ঐ যে ভকভক করতে করতে দৌড়ায়—

মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যাবে আমায়? কখন ফিরে আসবে মোটরগাড়ি, কত দেরি?

বকুলের আর সবুর সইছে না। জয়ন্তী বলে, এক্ষুনি এসে যাবে। এই ফাঁকে একটু-কিছু খেয়ে নাও। এই, দুধ নিয়ে আয় খোকার জন্য, আর বিস্কুট কখানা—

ব্যাকুল হয়ে বকুল বলে, খাব না আমি। তোমার মোটর আসুক—এসে তক্ষুনি আমায় রেখে আসবে।

খাবে না কেন খোকা?

পালিয়ে এসেছি। মা কত কাঁদছে। আমি না গেলে সে কিছু খাবে না।

যা কখনো হয় না—অলক্ষ্যে জয়ন্তী বুঝি আঁচলে একবার চক্ষু মার্জনা করল।

না খেলে মোটর চড়া হবে না কিন্তু। আমার কথা শুনছ না—গাড়িও চলবে না তা হলে।

গাড়ি চলবে না কেন?

বাঃ, তার বুঝি রাগ নেই? গাড়ি যেই শুনবে, তুমি খাও নি, কথা শোন নি, গুম হয়ে পড়ে থাকবে এক জায়গায়। কেউ তাকে নড়াতে পারবে না।

অমনি করে নাকি?

করে না! তুমি যেমন—তোমার চেয়েও বেশি দুষ্টু মোটর-গাড়িটা। তাই তো বলছি, লক্ষ্মীর মতো খেয়ে দেয়ে নাও গাড়ি আসবার আগে। তাহলে সে-ও বেয়াড়াপনা করবে না।

ঢোক কয়েক দুধ খেয়েছে, এমন সময় আওয়াজ করে গাড়ি ফিরে এলো। আর বকুলকে খাওয়ায় কে? দুধ ফেলে সে ছুটল গাড়ির কাছে।

বনমালী বলে, অতি ছোট্ট দোকান মা, অত বড় কাচ কোথায় পাবে? কিনে এনে কালকের মধ্যে লাগিয়ে দেবে, বলছে। ছবি আমি ফিরিয়ে আনছিলাম। তা বুড়োমানুষ এমন হাতে-পায়ে ধরতে লাগল—আমি তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

জয়ন্তী বলে ছবি ওখানেই থাকবে। বরঞ্চ কটা টাকা দিয়ে এসো—কাচ-টাচ কিনবে তো? আর এই খোকাকে পৌঁছে দিয়ে এসো সেখানে।

টেবিলে পাশাপাশি তিনটে প্লেট পড়েছে। তিনখানা ধবধবে ন্যাপকিন ফুলের মতো গুটিয়ে রাখা। কুঞ্জ খানসামা সুপ এনে দিল একটা প্লেটের

উপর

জয়ন্তী প্রশ্ন করে, বাবু ?

খাবেন না—অসুখ করেছে বললেন। রোহিণী দিদি ডাকতে গিয়েছিল—তাকে গালমন্দ করলেন।

তারপর কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করে, এক বাবালোক খাবে—বললেন যে ?

সে-ও চলে গেল। কেউ নেই—আমি একা। আমার একলার মতন দাও কুঞ্জ।

অমরেশ চাকরি জুটিয়ে ফেলেছে কোথায়। বেশ তো, ভালোই তো, এই চায় জয়ন্তী। কাজে লেগে থাকলে মন সুস্থ হবে তার। পরের সে গলগ্রহ নয়—এই আনন্দে সহজ মানুষ হয়ে উঠবে, শ্লথ দাম্পত্য-বন্ধন মধুর হবে আবার তাদের মধ্যে।

চাকরির খবর শুনেছে নিতান্তই এর তার মুখে। অমরেশ নিজে কিছু বলে নি। কটা কথাই বা বলে সে আজকাল। তা না-ই বলুক—জয়ন্তীর তাতে ক্ষোভ নেই। অমরেশ ভালো থাকলেই হল, অমরেশের উন্নতি হলে সে খুশি।

কিন্তু কী হল আজকে—ভোরবেলা সে বেরিয়ে গেছে, অফিসে কী কাজ আছে—ভারি জরুরি। সন্ধ্যা হয়ে আসে, এখনো দেখা নেই। নাওয়া-খাওয়ার সময় হল না—কী এমন চাকরি রে বাপু ? জয়ন্তীকে যদি জিজ্ঞাসা করে, এক্ষুনি বলে দেবে ইস্তফা দিতে। দরকার নেই অমন চাকরি করবার। কিন্তু কে-ই বা জিজ্ঞাসা করছে আর কাকেই বা সে বলবে ! এত বড় বাড়ির মধ্যে জয়ন্তী নিতান্ত একা। অমরেশের রাগ, কেন সে বাইরে ঘোরে। কিন্তু কথার দোসর নেই—কী করে বাঁচে নিষ্প্রাণ নিঃসঙ্গ এই ইষ্টকপুরীর মধ্যে ?

বড় বিশ্রী লাগছে। জয়ন্তী গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াল লক্ষ্যহীনভাবে। তারপর গাছের তলায় এক নিরালা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল। একটা-দুটো করে আকাশে তারা ফুটছে, দেখছে তাই তাকিয়ে তাকিয়ে। আছে বসে কতক্ষণ ধরে।

এমন চুপচাপ যে ?

এক বান্ধবী, এক সঙ্গে কলেজে পড়েছে। যেন বাঘের মুখোমুখি গিয়ে পড়েছে, এমনি আতঙ্কিত চেহারা জয়ন্তীর। কথার একটি জবাব দিল না। অভ্যাস মতো নমস্কার করল, এই মাত্র। কোথায় হয়তো নিয়ে যেতে চাইবে, অথবা কাছে বসে অভ্যস্ত যত বুলি কপচাবে—জয়ন্তীর সহ্য হবে না আজকে। অতি দ্রুত গিয়ে সে গাড়ির দরজা খুলে পিছনের সিটে গড়িয়ে পড়ল। পালিয়ে গিয়ে যেন বাঁচল—জনসঙ্গ এমন বিরক্তিকর লাগছে।

বনমালীকে বলে, চলো—

কোথায় যাব মা ?

এই এক সমস্যা—এবারে তো বলতে হয় একটা-কিছু। নিজের হাতে স্টিয়ারিং নেই যে খেয়ালমতো গাড়ির মুখ ঘোরাবে।

সেই যে ছবি বাধাতে দিয়ে এলে, আর দেখা নেই। কদিন হল বনমালী ?

বনমালী মনে মনে একটু হিসাব করে বলে, দিন পাঁচ-ছয় হল বই-কি! পরের দিন দিয়ে যাবে বলেছিল—তাই দেখুন! ওদের কোনো কথায় ভরসা করা যায় না।

চলো সেখানে—

বনমালী বলে, আপনি যাবেন কি করে মা? পথ খুঁড়ে রেখেছে—গাড়ি রেখে অনেকখানি হাঁটতে হবে। খোয়া ঢেলে রেখেছে—তার উপর দিয়ে লোকজন যায়। সে আপনি পেরে উঠবেন না।

জয়ন্তী বলে, না গিয়ে উপায় কি? একদিন বলে নিয়ে গিয়ে আর দিচ্ছে না। ছবি আমি আজকেই চাই।

একটু ম্লান হেসে বলে, ঠাকুরের ছবি, বাপরে বাপ! খোয়া গেলে রক্ষে থাকবে না।

গাড়ি থামল গলির মোড়ে। বনমালী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গ্যাস-পোস্ট একটা এই এখানে একটা ওই ওখানে খাড়া আছে ঠিকই—কিন্তু উপরের অংশ ভেঙে নিয়ে গেছে। আলো জ্বালা বন্ধ লড়াইয়ের সেই ব্ল্যাক-আউটের আমল থেকে। তার উপর সোনায় সোহাগা—বৃষ্টির জল জমে রয়েছে রাস্তায়! জলকাদা মেখে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি হয়ে জয়ন্তী জনার্দনের দোকানঘরে এসে উঠল।

দোকান বন্ধের সময়। বুড়ো ধূপকাঠি জ্বেলে দিচ্ছিলেন কুলুঙ্গি গণেশ-মূর্তির সামনে। জয়ন্তীকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠলেন।

অপরাধ হয়েছে মা-জননী। এমন কাচ আমরা রাখিনে—ছোটখাটো দোকানে এত বড় কাজ কে দেবে? যেতে হল বাধাবাজার অবধি। আজকেই নিয়ে এসেছি এই দেখুন। অ্যাদ্দিন পেরে উঠি নি—নানান অসুখ-বিসুখ অশান্তি—একবার গিয়ে খবর দিয়ে আসব, তা-ও পেরে উঠি নি। নিজে আপনাকে এই নরককুণ্ডে আসতে হল।

জয়ন্তী ব্যাপারটা লঘু করে নেয়।

তাতে কী হয়েছে? এদিক দিয়ে যাচ্ছি, তাই ঘুরে গেলাম। আর ক-দিন লাগবে?

এইবার হয়ে যাবে। কাচ যখন এসে গেছে, আর কতক্ষণ? কাল সকালে না পারি তো বিকাল বেলা ঠিক পৌঁছে দিয়ে আসব।

ছেঁড়া-মাদুরের প্রান্তভাগে জয়ন্তী বসে পড়েছে। জনার্দন সঙ্কুচিত হয়ে বলে, টুল এনে দিচ্ছি বাড়ি থেকে। একটু দাঁড়ান—

জয়ন্তী হেসে বলে, দাঁড়াতে পারছি নে কর্তা। অনেক পথ হেঁটে এলাম

কিনা। একটু বসেছি, তার জন্য অমন করছেন কেন?

মানে, ধুলোবালি···বসবার মতন জায়গা কি এটা?

ততক্ষণে জয়ন্তী মগ্ন হয়ে গেছে ছবির মধ্যে।

বাঃ, ভালো ভালো ছবি আপনার দোকানে। বিক্রির জন্যে তো? আমি বাছতে লাগলাম কিন্তু—

জনার্দন সলজ্জে বললেন, আপনাদের বড় ঘরে টাঙানোর মতো নয়। কাঁচা রঙের ছবি—দেশী পোটোরা এঁকেছে। মেলার মরশুমে কিছু-কিছু বিক্রি হয়। আমরাও দু-দশখানা রেখে দিই—বেশি পয়সা দিয়ে ছবি কেনার লোক আমাদের কাছে আসে না।

জয়ন্তী বলে খেতে না পেয়ে মরে গেল। রঙ তুলি ছেড়ে লাঙল ধরেছে, মোট বইছে, ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। আর ভদ্রসমাজের কত নকল পোটো সেজে টাকা লুটছে। সেই নকল পট কিনি আমরা হাজার টাকায়, দেয়ালে টাঙিয়ে দেমাক করি।

ছোটবড় নানা আকারের ছবি এক দিকে—কতক আলগা, কতক বাঁধানো। খান কয়েক বাছাই করে জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করল কী দামে বিক্রি করেন এগুলো?

দাম এক রকম নয় মা। মালের রকমফের আছে—সেই অনুযায়ী দর। এইগুলো দু আনা করে, আবার বড় হলে আট আনা অবধিও ওঠে।

জয়ন্তী বলে, দু-আনা আট আনা করে কিনতে পারব না, সে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

জনার্দন তাড়াতাড়ি বলেন, তার জন্যে কি হয়েছে মা, আপনার সঙ্গে কথা কী। যা খুশি হয়ে দেবেন, আমি সোনা মুখ করে নেব।

পাঁচ টাকা করে দেব আমি—

বিস্ময়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে জনার্দন পুনরাবৃত্তি করেন, পাঁচ টাকা?

সে-ও তো জলের দাম—

তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, এমনিভাবে বলে, সেই যে ছেলেটা—আপনার নাতি হবে বোধহয়—কী নাম ভালো?

বকুলের কথা বলছেন?

নাম বকুল? মজার নাম তো। বকুল আবার বেটাছেলের নাম হয়? ছেলেটা সেদিন পায়ের জুতো ফেলে এসেছে আমাদের বাড়ি।

ছেঁড়া স্যাণ্ডেল মা, তার আর কিছু ছিল না। পাকা রাস্তায় নিতান্ত খালি পায়ে হাঁটা যায় না, তালিতুলি দিয়ে কোনো রকমে তাই পায়ে ঢোকাত। একজোড়া কিনে দিতে হবে—অনেকদিন থেকে বায়না ধরেছে।

আমি নিয়ে এসেছি তার জুতো—

সে কি কথা। ছেঁড়া জুতো বয়ে আনতে গেলেন কেন মা? ছবি দিতে যাচ্ছিই তো আমি—সেই সময় নিয়ে আসতাম।

বনমালী গাড়ি থেকে জুতা এনে দিল। চকচকে বার্নিশ নতুন প্যাটার্নের জুতোজোড়া।

জয়ন্তী বলে, পায়ে হয় কিনা দেখে নিলে হত। পুরানো জুতোর মাপে কেনা অবিশ্যি। ছোট হলে বদল করে নিতে হবে। কোথায় বকুল?

বাড়ি আছে, জ্বর হয়েছে আজ কদিন।

পথ কোন্ দিকে?

ব্যস্ত হয়ে জয়ন্তী উঠে দাঁড়ায়। জনার্দন বাধা দিয়ে বলেন, আপনি কোথা যাবেন? আপনার যাবার মতন সে জায়গা নয়। আমি ডেকে তুলে আনছি। জ্বর হয়েছে তো কী হয়েছে!

এত বেশি জোরালো আপত্তি যে জয়ন্তী থমকে গেল। দারিদ্র্য ছাড়া আরো কিছু আছে হয়তো। সে যা-ই হোক, বাড়ির মালিক এমন করছেন, এ অবস্থায় যাওয়া চলে না। আজকে এই প্রথম দিনে তো নয়ই।

বসে রইল সে, জনার্দন সুঁড়িপথে ভিতরে চলে গেলেন। খানিক পরে ফিরে এসে বলেন, বকুল ঘুমিয়ে পড়েছে- জ্বরটা বেড়েছে। জুতো ঠিক হবে, পায়ের উপর খাটিয়ে দেখলাম। কী আর বলব মা, জেগে উঠে কত আহ্লাদ করবে যে জুতো পেয়ে—

কিন্তু জয়ন্তী শুনছে না। বকুলের জ্বর বেড়েছে—তা ও কানে গেল না বুঝি তার। থমথমে গম্ভীর মুখ। ছবি নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। বলে, পাঁচখানা আছে ছবি—দাম হল পঁচিশ টাকা।

টাকা দিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে অন্ধকারে সে মিশিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে জয়ন্তী ঘরের দরজা বন্ধ করল। জানলারও কবাট এঁটে দিল, কোনো দিক দিয়ে কেউ দেখতে না পায়। ছবির মোড়কটা খুলল এবার। তার মধ্যে ফোটোগ্রাফ একটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। চোখে জল ভরে আসে —এ কী হল, জয়ন্তী হেন মেয়েরও চোখে জল! কেউ দেখতে পাচ্ছে না—এই যা। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। না, বন্ধ ঘরে দেখবে কি করে অন্য কেউ? মরে গেলেও জয়ন্তী লোকজনের সামনে কাঁদতে পারবে না।

অমরেশের ফোটো। একটি হাসিমুখ মেয়ে তার পাশে! দেখলে সন্দেহ থাকে না, স্বামি-স্ত্রী তারা। আবার বিয়ে করেছে অমরেশ? তা যে রকম জ্বালাতন হয়েছে জয়ন্তর কাছে, যেমন অপমান পেয়েছে—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। জীবনে সুখী হতে চাচ্ছে—হোক, তাই সে হোক। অতি-শৈশবে জয়ন্তী মা হারিয়েছে। বাবাও গেলেন। ঈশ্বর, ছেলেটাও যদি থাকত, সেই মাংসের দলাটা দিনে দিনে বড করে মানুষের মূর্তিতে গড়ে তুলতে পারত যদি। একা থাকা তার ভাগ্যের লিখন, দোসর সে সইতেও পারে না। ঠিকই হয়েছে— তার পক্ষে সংসারের প্রত্যাশা করা অন্যায়।

উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট আলোয় আয়নার সামনে দাঁড়াল। আর ঐ ফোটো ধরল পাশে। অমরেশের একদিকে সে. আর এক দিকে চিত্রায়িত ঐ মেয়ে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। টানা-টানা চোখ, হাসি হাসি ঠোঁট—সরল সুন্দর মুখখানা। সতীনের প্রতি ঈর্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু স্নেহ মন ভরে যাচ্ছে। অমরেশকে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে, এমনি গর্ব আর আনন্দ ছবির মেয়েব মুখে। কপালে সিঁদুরেব ফোঁটা—পূর্ণিমাব চাঁদের মতো নিটোল গোলাকার। জয়ন্তী এমন করে সিঁদুর পরে নি তো কখনো। তার সিঁদুব—সিঁথির ফাঁকে সূক্ষ্ম একটু বক্ত রেখা, কালো চুলেব বোঝায় তা ঢেকে থাকে। কুমাবী পরিচয় দিলে অবিশ্বাস করতে পাবেবে না কেউ। আর দেখো না, এই বউটা যেন গলা ফাটিয়ে স্বামি সৌভাগ্যের জাঁক করছে। অমরেশকেও কত তরুণ ও মাধুর্যময় দেখাচ্ছে ঐ মেয়েটার সঙ্গে।

বলবে কি অমবেশকে কিছু? না কিছু নয়। কিছুই তাব আসে যায় না, এমনি ভাব দেখাবে। কিন্তু বাত্রি এত হল, বাড়ি আসছে না কেন? রোহিণী বনমালী, কুঞ্জ—সকলকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবল—তারাও কিছু বলতে পারে না।

জয়ন্তী বলে, আমাদেব দুজনের খাবাব ঘবে দিয়ে যাও—দিয়ে খাও গে তোমরা। আব কতক্ষণ বসে থাকবে? আমি জেগে আছি।

ঘুম আসে না, সমস্ত বাত্রি জেগে কাটাল।·· আবাব বিয়ে করে অমরেশ যুগলের ছবি বাঁধাতে দিয়ে গেছে ঐ দোকানে। ছবিটা চুরি করে আনা উচিত হয় নি জয়ন্তীব পক্ষে। এমন আত্ম অবমাননা কেন সে করল অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে? ফেরত দিয়ে আসবে কোনো একটা ছুতো করে—জনার্দনকে বলবে, পটের সঙ্গে মিশে ফোটোটাও চলে গিয়েছিল। কৌতূহল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবে কি, যারা ছবি বাঁধাতে দিয়েছে কোথায় তাদের ঠিকানা? ঘুরিয়ে এমন ভাবে প্রশ্ন করবে, বুড়ো কারিগর যাতে কিছু মনে করতে না পাবে। সেটা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু প্রশ্নটাই উচিত হবে কিনা? না ফোটোখানা শুধুমাত্র ফেরত দিয়ে আসবে, একটা কথাও এ সম্পর্কে তার জানবার প্রয়োজন নেই।

রাতটুকু পোহালে আরও খানিক ইতস্তত করে গাড়ি নিয়ে বেরুল। ঘুরতে ঘুরতে এলো সেই স্তূপীকৃত খোয়াব জায়গাটায়। পথটুকু পাব হয়ে ছবির দোকানে এলো। দোকান বন্ধ। বড সকাল সকাল এসে পড়েছে বোধ হয়। পায়চারি করছে জয়ন্তী এদিকে ওদিকে। রাস্তা ও আশেপাশের লোক তাকাচ্ছে, সুবেশা নারী জুতো খুটখুট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ হেন জায়গায়। এত লোকের দৃষ্টিবর্তী হয়ে বিষম অস্বস্তি লাগছে জয়ন্তীর।

একজনে এগিয়ে এলো, কাউকে খুঁজছেন?

জয়ন্তী বলে একটা ছবি বাঁধাতে দিয়ে গেছি। আজকে পাবার কথা।

লোকটা বলে, সকালবেলা আজকাল তো দোকান-খোলে না, ফেরি করে। তার উপরে অসুখ-বিসুখ চলছে। বাড়িতে রাত দুপুরে কাল ডাক্তার এসেছিল। কতক্ষণ আপনি পথে পথে ঘুরবেন? দাঁড়ান একটু,

বুড়োকে ডেকে দিই।

বাঁ-দিককার সেই সুঁড়িপথে লোকটা ঢুকে গেল। ডাক্তার এসেছিল বকুলের জন্য নিশ্চয়—তারই অসুখের কথা বলছিল। আজকে আর জয়ন্তী ছাড়বে না, সে-ও চলল লোকটার পিছু পিছু। কী অসুখ করেছে, কেমন আছে বকুল—একটি বার নিজের চোখে না দেখে চলে যাবে কেমন করে?

জনার্দনকে ডাকছে সেই লোকটা।

ভিতর থেকে জবাব আসে, ঘুমুচ্ছেন তিনি। সারা রাত্তির জাগতে হয়েছে কিনা ছেলেটাকে নিয়ে।

চমকে ওঠে জয়ন্তী। কে বলল কথা? মাথায় গোলমাল লেগে যায়। পাগলের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

চোখোচোখি অমরেশের সঙ্গে।

ব্যঙ্গ স্বরে বলল, এই অফিস বুঝি? বাঃ চমৎকার। অ্যাদ্দিন দিনে দিনে চলছিল, এখন অফিস রাতে দিনে চলবে?

অমরেশ হতভম্ব। জয়ন্তী এখানে, এ যে স্বপ্নাতীত! কথা বেরোয় না ক্ষণকাল। তারপর দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সহজ কণ্ঠে বলে, খবর না পাঠানো অন্যায় হয়েছে সত্যি। কিন্তু হুঁশ ছিল না—যমে মানুষে টানাটানি অবস্থা গেছে। আজকেই একবার যাব মনে করেছিলাম—

কাঁথা-চাপা-দেওয়া পাশের বস্তুটা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, না—তুমি যাবে না বাবা। কক্ষনো কোথাও যেতে পারবে না।

জয়ন্তীর এইবার নজর পড়ে। উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিল। এই বকুল—এমন হয়ে গেছে এই কদিনে। দৃষ্টি তার অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

আ মরে যাই—অসুখ তোমার বকুলবাবু?

এখনো প্রবল জ্বর। হাঁসফাঁস করছে। চোখ লাল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জয়ন্তীকে। ক্লান্ত স্বরে বলে, জল খাব।

পাথরের বাটিতে মৌরি-ভেজানো জল। বাটিটা তুলে অমরেশ একটুখানি জল গালে ঢেলে দেয়। হাত কেঁপে গিয়ে কষ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

জয়ন্তী বকে ওঠে, দিলে তো সৃষ্টিশুদ্ধ ভিজিয়ে? একেবারে আনাড়ি। সরো—সরে যাও দিকি। ঐ বালিশটা নিয়ে এসো।

ভিজে বালিশটা বদলে আর-একটা অতি যত্নে মাথার নিচে গুঁজে দিল। শুকনো বটে, কিন্তু তেল-চিটচিটে—অবস্থা অতি শোচনীয়। বকুল তাকিয়ে আছে, সহসা দু-চোখ তার জলে ভরে যায়। বলে, আমার বাবাকে তুমি নিয়ে যাবার জন্য এসেছ?

অনেকক্ষণ জয়ন্তী জবাব দিতে পারে না, সামলে নিল অনেক চেষ্টায়।

এই যে সেদিন বললে বকুলবাবু, বাবা নেই তোমার—খালি মা আর দাদু? আমায় মিথ্যে ক'রে বলেছিলে?

অমরেশের দিকে এক নজর চেয়ে আবার বলল, তা বেশ তো, থাক তুমি

বাবার কাছে। তোমার বাবাকে আমি নিয়ে যাব কেন ?

বকুল ঘুমিয়ে পড়লে অনেক বেলায় জয়ন্তী উঠল। আবার আসবে বাড়ির ডাক্তারকে নিয়ে। অমরেশও চলল। অনেক কষ্ট গেছে, ছেলে এখন শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে—জয়ন্তী গায়ে হাত বুলিয়ে বাতাস করে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে-ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। বাড়ি গিয়ে অমরেশ বিশ্রাম নেবে কিছুক্ষণ।

গাড়ির মধ্যে দুইজনে পাশাপাশি। জয়ন্তী কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আতঙ্কে অমরেশ চোখ ফিরিয়ে নিল। বজ্রপাত হল বলে, প্রলয়ের আগে-কার পরম নিঃশব্দতা।

সহসা দরদর-ধারায় অশ্রু নামল। ঝড়-ঝঞ্ঝা নয়, বৃষ্টির প্লাবন। এত কান্না জমানো ছিল দাম্ভিক মেয়েটার দুই চোখে।

অমরেশ মরমে মরে গিয়ে বলে, দোষ হয়েছে জয়ন্তী, আমায় মাপ করো। আগেকার সমস্ত কথা খুলে বলা উচিত ছিল।

জয়ন্তী বলে, ইচ্ছে করে বলো নি। আমার স্বামী—নিজেকে সঁপে দিয়েছি তোমার কাছে। এ কি একটা সামান্য কথা—কেন বললে না যে সংসার আছে, ছেলে আছে আমাদের ? খোকার বাপ তুমি, আর চক্রান্ত করে আমায় মা হতে দাও নি। যা খুশি করে এসেছ ছেলে নিয়ে। এক-গা ধুলো মেখে ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে সোনার পুতুল রাস্তায় রাস্তায় ছবি বেচে বেড়ায়, অসুখ হয়ে ভিজে মেঝেয় পড়ে থাকে—ওষুধ-পথ্যি জোটে না। দেখো, আমার উপর যা খুশি অত্যাচার করো গে—ছেলের হেনস্থা আমি কিছুতে সইব না।

অমরেশ মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি রাগ করবে জয়ন্তী, তাই এ সব কিছু বলতে পারি নি।

ঐ রাগটাই জেনে এসেছ শুধু। ছোটবেলা মা মরে গেল, কে আমায় করে ভালো হতে শিখিয়েছে ? হবই তো বদরাগি, বেহায়া— মানুষের যত দোষ তোমরা ভাবতে পার। তুমি ছাড়া কে আছে আমার—তুমি কি ভাল কথাই বুঝিয়েছ কোনোদিন, তেমন করে দুটো তাড়া দিয়েছ ? দোষগুলোই কেবল মনে মনে গিঁট দিয়ে দূরে দূরে রইলে।

আকুল কান্নায় সে ভেঙে পড়ল স্বামীর কোলের উপর।

অমরেশকে বাড়ি পৌঁছে ডাক্তার নিয়ে জয়ন্তী প্রায় তখনই ফিরল। আধ-অন্ধকার ঘরে পা দিয়েই ডাক্তার শিউরে উঠলেন।

সকলের আগে রোগি সরানো হোক এই জায়গা থেকে। তার পরে চিকিৎসা। হাসপাতালে পাঠাতে চান তো ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

মনোরমা বলে, হাসপাতালের কাণ্ড জানা আছে ডাক্তারবাবু। কিচ্ছু দেখে না, ফেলে রেখে দেয়—

আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল। জয়ন্তী থামিয়ে দিয়ে অধীর কণ্ঠে বলে, সে-কথা উঠছেই বা কিসে ? ছেলে হাসপাতালে দেব তো অত বড়

বাড়ি আগলে আছি কি জন্যে? আপনাকে নিয়ে এলাম ডাক্তারবাবু, ভালো করে দেখুন—এ অবস্থায় নাড়াচাড়া চলবে কি না। পরামর্শ দিন, কি ভাবে বাড়িতে ছেলে নিয়ে তুলব।

তাই হল। জয়ন্তীর বাড়িতে আছে বকুল—সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে। শিয়রের দু-পাশে দুজন—মনোরমা আর জয়ন্তী। তা যে পালা করে বসবে, সে হবার জো নেই। কেউ নড়বে না শিয়র থেকে।

দিন সাতেক পরে সকালবেলা জানালা দিয়ে প্রসন্ন রোদ এসে পড়েছে। ছেলের জ্বর নেই, সকলের মনে স্ফূর্তি। জয়ন্তী স্নানের ঘরে গেছে। মনোরমাকে একলা পেয়ে বকুল চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে, বলেছে কী জানিস? ও নাকি আমার মা—

হ্যাঁ।

যাঃ—। বকুল ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তার পর রাগ করে ওঠে, মিথ্যে বলবি নে তুই। মিথ্যে বললে ঠাকুর রাগ করেন। তুই তো মা আমার—

না রে বকুল, আমি হলাম মাসি—

বকুল মাথা নেড়ে জেদ ধরে বলে, তুই আমার মা। মাসি তুই কেন হতে যাবি? মাসি হতে তো, ও-ই হোক না?

বলে নিশ্চিন্ত আরামে সে ছোট্ট মাথাটা মনোরমার কোলের উপর তুলে দিল।

মনোরমা বলে, আমাদের বাসায় কত কষ্ট। মায়ের ছেলে হয়ে এখানে কত আরামে থাকতে পারবি। খাবি-পরবি ভালো, মোটর চড়ে বেড়াবি। আমি আর তোর দাদু মাঝে মাঝে দেখে যাব।

বকুল, না মা, তা হবে না। আমি কাঁদব তা হলে—কক্ষনো এখানে থাকব না, মোটর চড়ব না। দাদুর সঙ্গে আমি দোকান করব।

স্নান করে জয়ন্তী কখন পিছনে এসেছে, কেউ এরা টের পায় নি। জয়ন্তী বলে উঠল, আমি যে কাঁদব বকুলবাবু, তুমি চলে গেলে। একা-একা আমি কেমন করে থাকব?

বলতে বলতে সত্যিই চোখে জল এসে গেল। এ তার কী হয়েছে, কথায় কথায় কান্না।

বকুল একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে। তার পর শীর্ণ কম্পমান হাত তুলে ধীরে ধীরে চোখ মুছিয়ে দেয়।

না, কাঁদবি নে তুই এমন করে—

জো পেয়ে জয়ন্তী এবার জেদ করল, কাঁদবই। তুই যদি চলে যাস বকুল, রাতদিন আমি পড়ে পড়ে কাঁদব।

বকুল বলে, আমি তা হলে পড়ব না, খাব না, রাস্তায় রাস্তায় বেড়াব, কাচ ভাঙব—

জয়ন্তীও ঠিক তেমনি সুরে বলে, আমি কাঁদব—কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, তারপর মরে যাব।

মরার কথায় বকুল ভয় পেয়েছে। মরা সে দেখেছে একবার বাসার পাশে। বড় ভয়ানক। কেউ যেন না মরে কখনো!

ভয়ে ভয়ে বলে, একেবারে মরে যাবি? কথা বলবি নে?

কথা বলব না, নড়ব না, বেড়াব না। কাঁদতে কাঁদতে 'হরিবোল' বলে সবাই নিয়ে যাবে।

মনোরমার দিকে চেয়ে বিব্রত ভাবে বকুল বলল, তুই মা তবে এইখানে এসে থাক। চলে গেলে এই মা যে মরে যাবে! ভারি দুষ্টু কি না—তোর মতন ভালো নয়।

জয়ন্তী সজল চোখে হেসে বলে, ছেলে কী বলে শুনলে তো ভাই? তাই এসো চলে। আমার একলা বাড়ি আনন্দ-নিকেতন হয়ে উঠুক।

আবার বলে, মামীদেরও নিয়ে আসতে হবে। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বকুল খেলবে। নইলে মজা জমবে না।

———

সবুজ চিঠি

॥ এক ॥

বনবিহঙ্গিনী আপনি এসে খাঁচায় ঢুকেছ। মজা টের পাও এখন।

মুখ শুকনো করে ত্রিদিব বলে, সাত তারিখ হয়ে গেছে—এখনো মাইনে দিল না।

তা ঝুমাও কি হার মানবার মেয়ে।

বয়ে গেল না দিয়েছে। উনি টাকা দিলে তবে আমার সংসার চলবে। মাসের গোড়ায় মাইনে ওরা কবে দিয়ে থাকে?

দেয়ও কি পুরোপুরি? আজ দু-টাকা কাল পাঁচ টাকা—এমনি করে যদ্দূর যা হল। শেষটা জোড়হাত করবে ডোনেশান দিয়ে দিন বাকিটা।

ঝুমা বলে, গরিব ইস্কুল—পেরে ওঠে না তা কি করবে?

কিন্তু আমাকেও সংসার করে খেতে হয়। বাতাস খেয়ে দিন কাটে না।

ঝুমা রাগ করে।

বাতাস খাওয়াই নাকি তোমায়? কেন অমন কুচ্ছো করবে আমার সংসারের?

তাই তো অবাক হয়ে যাই—কেমন করে এত ষোড়শোপচার জোটাচ্ছ। কি মন্তোর জানো তুমি বলো।

এবারে হেসে উঠে ঝুমা বলে, মন্তোর বলতে নেই—তা হলে খাটে না। নিজের কাজ কর মাস্টার মশায়, ছেলেপুলের ট্রানশ্লেসনের ভুল কাটগে। আমার সংসারের কোন কথায় থাকবে না, এই বলে দিলাম।

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ। পান সেজে একটা খিলি ত্রিদিবের মুখে গুঁজে দিয়ে খরখর করে ঝুমা চলল রান্নাঘরের ...ট সারতে।

অনেক রাত হল। এগারোটার গাড়ি চলে গেল, গুমগুম তার আওয়াজ আসে। ঝুমা একটি মানুষ খোলা দরজায় চোখের উপর দিয়ে এসে ঢুকল, তা দেখ—মাস্টার মশায়ের একেবারে হুঁশ নেই। ট্রানশ্লেসনের খাতাগুলো যথারীতি বাণ্ডিল বাঁধা হয়ে আছে, এবং পড়েও থাকবে অনন্ত কাল। তাতে ঝুমা দোষ দেয় না—ফেল কড়ি, মাখ তেল—পয়সা যখন দেবে না, মানুষ অত

খাটতে যাবে কেন ? কিন্তু ঝুমা দেবী ঘরে এলো, মাছি-পিঁপড়ের সামিল মনে করবে তাকে ? কথা না বলো, মুখ তুলে হাসিমুখে একটিবার তাকাতে কি দোষ ছিল ?

ঝুমা এসেছে, খুটখাট করছে। চোখ না তুলেও ত্রিদিব টের পাচ্ছে সমস্ত। বিছানা ঝাড়ছে, ফুলদানির ফুলগুলো নামিয়ে জল ভরে আনল বাইরে গিয়ে। দেখছে সব, অথচ ত্রিদিব বই থেকে একটিবারও চোখ তোলেনি। হাই তুলছে ঝুমা বিছানার উপর বসে, জানলাটা উঠে ভাল করে খুলে দিয়ে এলো। স্বগতোক্তি করে, কী গরম !

আছে বসে বিছানায় চুপচাপ। জানলা দিয়ে বাইরে দেখছে। দেখছে কি জোনাকি ? ঝাঁকড়া-ডাল বাদামগাছটা জোনাকিফুলে ভরে গেছে, তাই দেখছে বুঝি মগ্ন হয়ে।

হঠাৎ ঝুমা কথা বলে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন।

বইটা খুব ভাল বুঝি ?

এর পর চুপ করে থাকলে ত্রিভুবন লণ্ডভণ্ড হবে। ঝুমার মুখে চেয়ে ত্রিদিব বলে, বড্ড ভালো—

হাসে। ঢোক গিলে একটি লাগসই কথা বলে এতক্ষণের অপরাধ মুছে ফেলতে চায়।

তুমি আরো ভালো ঝুমা। তোমার তুলনা নেই। লিখেছেও বইটায় তাই। দেহের রূপ দেখে অবাক হও, দেহের ভিতরের রূপ দেখে একেবারে পাগল হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের মধ্যে এত রোমান্স, কোথায় লাগে তার কাছে গল্প-উপন্যাস !

ঝুমা বলে, রক্ষে কর। সারাদিন খেটেখুটে রাত দুপুরে এখন হাড়-মাংসের গল্প শুনতে পারিনে। চোখে আলো লেগে ঘুম হচ্ছে না।

ত্রিদিব বলতে পারে, শোওনি তো মোটে, ঘুম কি বসে বসেই হবে ? কিন্তু কথা-কাটাকাটির সময় নয়, বইয়ে মন মজে আছে। তাজ্জব বই— বিজ্ঞানের নাম শুনে কেন যে ঘাবড়ে যায় লোকে ! একখানা পোস্টকার্ড গুঁজে দিল হেরিকেনের কাচে। বলে-এবারে চোখে লাগছে না।

এমন রাগ হয় মানুষটার উপর ! হাসিও পায়। মুশকিল বোঝ তা হলে ঝুমার ! এই অবুঝকে নিয়ে ঘর করা : শিশুর মতন, কিম্বা তারও বেশি। শিশুর দাপাদাপি ঘর-উঠান, বড় জোর এবাড়ি-ওবাড়ির মধ্যে। ত্রিদিব ছুটে বেরুবে তেপান্তরের পৃথিবীতে। গোয়ালাদের বাচ্চা ছেলে ছুটো সমস্তটা দিন, দেখতে পাও নদীর চরে গাঙশালিকের ছানা খুঁজে বেড়াচ্ছে—ও তেমনি খোঁজে বিপুল বিশ্বশক্তির কোন এক অনায়ত্ত উৎস। ঐ তার দিনরাতের ভাবনা। কখনো মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে, কখনো বা রাগ করে গোঁ থামাতে হয়। না, ঝুমা তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে বছর খানেক এই সংসার করতে গিয়ে।

এর উপর ঠাট্টা আবার যখন তখন। পিছন দিনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

খাসা ছিলে ঝুমা, রাজহংসীর মতো নিজের দেমাকে ভেসে ভেসে বেড়াতে। বুদ্ধির ভুল, আটক পড়লে ঘর-উঠানের বেড়ার মধ্যে।

প্রথম সেই দেখলে তুমি। চৌধুরি-দিঘী পাড়ি দিচ্ছিলাম। এপার থেকে ওপার, ওপার থেকে আবার এপার মুখো। পা-দাপাদাপি নয়, জল নড়ছে না একটুও—ভেসে ভেসে যাচ্ছি। দুপুর গড়িয়ে যায়। মা তারপর এসে পড়লেন। ভাল কথায় হয় না দেখে চেঁচামেচি লাগিয়েছেন। জলে* পড়লে ডাঙার কথা কি কানে যায়—মা অন্য কাকে যেন কি বলছে, আমায় কিছু নয়। তুমি আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিলে—শঙ্কর-দা'র সঙ্গে গিয়ে উঠেছিলে তাদের বাড়ি। স্নানের জন্য দীঘির ঘাটে এসে দাঁড়ালে। হংসীর উপমা মনে গেঁথে গেল বুঝি সেই থেকে?

আরও কত বিদ্যে, জানতে না তোমার ঝুমার। ঘর মাতে আটকায়! ঝুমা, ঝুমি, ওরে ঝুমঝুমি, দেখ দিকি মা, মেয়েটার জ্বর এখন কত?… বলিস কিরে, মাথা ধুইয়ে দেবো এই অবস্থায়?

হাত চেকে বলারই অপেক্ষা রাখত কিনা সে!

পুজোর আগে যে আসলে এই গাঁয়ে যদি আসতে, শেষরাত্রে ঠিক ঘুম ভেঙে যেত। দমাদম চ্যা-চুঁচ্যাচ—ঢেঁকির পাড় পড়েছে বাড়ি বাড়ি। চিঁড়ে-কোটার ধুম। চিঁড়ে মজুত রাখতে হবে এসো-জন বসো-জন সকলের জন্য। ঝুমা চোখ মুছতে মুছতে ছুটে বেরুত।

সরো দিদি, আমি একটু পাড় দেব—

উঁহু, তুমি কেন?

বলছি, দাও। পারবে আমার সঙ্গে গায়ের জোরে?

তা সত্যি। সব মেয়ে-বউ একসঙ্গে হলেও অসুরটাকে এঁটে উঠা যাবে না। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে, তার চেয়ে আপসে ঢেঁকি থেকে নেমে যাওয়াই ভালো।

ঝুমা ভীমবিক্রমে পাড় দিচ্ছে। নিচে বসে এলে দিচ্ছিলেন শঙ্করের পিসি। তিনি বললেন, তুমি তো বাছা নাছোড়বান্দা হয়ে পড়। তোমার মা ভাবে, পাড়ার দশজনা ভুজুংভাজুং দিয়ে আহ্লাদি মেয়েকে খাটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ঝুমা বলে, ক্ষেপিও না বলছি পিসি। বেতালা পাড় পড়ে তোমার হাত ছেঁচে যাবে—

তা ও-মেয়ের পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। স্বচ্ছন্দে মনের সুখে হাত ছেঁচে দিতে পারে। ভয়ে ভয়ে বুড়ি আর দ্বিরুক্তি করে না।

ঘণ্টাখানেক হয়তো চলল এমনি। মেয়েটার পায়ে ব্যথা ধরে না, ক্লান্তিও নেই। হঠাৎ কি হল—ঢেঁকিশাল থেকে এক লাফে নামল উঠানের

উপর। এক ছুটে উধাও।

বাগিচার ভিতর কামরাঙা-গাছ—চলে গেছে সেখানে। ঢেঁকিশাল থেকেই অতদূর নজর গেছে। উপর-ডালে কিছু ফল আছে, নিচের দিককার সব লোপাট। কামরাঙা-লোভী কয়েকটা মেয়ে আঁকশি নিয়ে এসে জুটেছে। নানা রকম কসরৎ করছে, নিচের গুঁড়ি থেকে ডাল উঠেছে—সেই ডালে চড়েছে একজন। কিছুতে তবু নাগাল পায় না।

ঝুমা এসে ধাক্কা দেয় মেয়েটাকে। পড়ে যাবার ভয় দু-হাতে মেয়েটা ডাল জড়িয়ে ধরে। খিলখিল করে হাসে ঝুমা।

উঠে পড়্ ঐ দোডালার উপর। পা ঝুলিয়ে আরাম করে বসে আঁকশি ধর্।

মেয়েটা অনেক-উঁচু সেই জায়গার দিকে চেয়ে সভয়ে বলে, সর্বনাশ!

দেখ্ তবে—

কাঠবিড়ালি যেমন চলে বেড়ায়, তেমনি আলটপকা উঠে গেল ঝুমা। একেবারে মগডালে। আঁকশির ধার ধারে না, হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কামরাঙা ফেলছে। তলায় মেয়েগুলোর মধ্যে হুটোপাটি লেগে গেছে।

সেদিনটা তুমি চোখে দেখনি—রাজহংসীর সঙ্গে কাঠবিড়ালির উপমাও দিতে তবে নিশ্চয়।

কি রকমে টের পেয়ে অকুস্থলে মা এসে পড়লেন। এসে তিনি মাথা ভাঙছেন।

নেমে আয় হতভাগী। পড়ে হাত-পা ভাঙবি, ঠুঁটো-জগন্নাথ কেউ ঘরে নেবে না। কী যে করি, কোথায় তোকে গছিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি পাই।

মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, মেয়ের জ্বালায় এক তিল শান্তি ছিল না। বিয়ের পরে সেই ঝুমা আর একরকম। মা, তুমি দেখছ কি আকাশের পার থেকে, কিম্বা ঐ জোনাকি-ভরা বাদামগাছ-তলায় অদৃশ্য দাঁড়িয়ে? তোমার সে ডাকাত মেয়ে মরে গেছে, এ আর একজন। শান্ত চালচলন, কথা বলে এখন কত আস্তে—ত্রিদিব মাস্টারের বউয়ের প্রশংসায় পাড়ার মানুষ পঞ্চমুখ।

পড়ছে ত্রিদিব। হুঁশ নেই, রাত্রি কত হয়েছে। আছে এক গ্রামে পড়ে। ইস্কুলে তার সহকর্মীদের দিকে কৌতুক ও অনুকম্পার চোখে তাকায়। আহা, কতটুকু নিয়ে আছে এরা সংসারে, দৃষ্টি কত সঙ্কীর্ণ। অমুকের এক টাকা অধিক মাহিনা-বৃদ্ধি ঘটেছে, কিম্বা হেডমাস্টার অমুকচন্দ্রকে একঘণ্টার জন্য উঁচু ক্লাসে পড়াতে দিয়েছে—এই নিয়েও হিংসা। মানুষগুলোও তেমনি এই জায়গার। ঝুমার কাছে কখনো সখনো পাড়ার বউ-গিন্নির এসে বসে, সেই সময়ের কথাবার্তা কিছু কিছু সে শুনেছে আড়াল থেকে। কি কি রান্না হল বউ—সজনে রেঁধেছ তো সরষে ফোড়ন দিলে না কেন? পাঁচীর শাশুড়ী কানবালা দিয়ে বউয়ের মুখ দেখেছে—ফাঁকিজুকি, ঐ মরাসোনা দু'দিনে

দেখো রূপোর মতন সাদা হয়ে যাবে। পুরুষদের মধ্যে গিয়েও শোন, এক কাঠা বাড়তি জমি কে ঘিরে নিয়েছে কিম্বা কোন্ মেয়েটা হাসে ফ্যা-ফ্যা করে—এইসব আলোচনা। ত্রিদিব পঙ্গু হয়ে রয়েছে এই একটুখানি গাঁয়ে ঐ সমস্ত লোকের একজন হয়ে; হাত-পা বেঁধে কারাগারে রেখে দিয়েছে তাকে। বইয়ের মধ্যে মুক্তি পায়। এদেশ আর ওদেশ, একাল আর সেকালের মাঝে সেতু হল এই বই। জড় পুতুলের মতো চেয়ারে বসে আছে—মন ছুটে বেড়াচ্ছে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানীর সঙ্গে—বিশ্বের অপরিজ্ঞাত শক্তিপুঞ্জ লাগামে বেঁধে ফেলে হুকুমের নফর বানানো যাদের জীবন-সাধনা। বিশ্বভুবনই বা কত ছোট ও সামান্য হয়ে গেছে আজ—প্রাচীন উপমা দিয়ে বলা যায়, হাতের মুঠোয় এক আমলকি। এ নিয়ে আর কুলাচ্ছে না মানুষের।

তারপর এক সময় আলো নিভিয়ে দিয়ে ঝুমার পাশটিতে সে শুয়ে পড়ে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে একবার।

ঝুমা তো ঘুমুচ্ছে বিভোর হয়ে। অনেকক্ষণ থেকেই ঘুমুচ্ছে—তবু ঝিন-মিন করে চুড়ি বেজে উঠল, কোমল হাত এসে পড়ল ত্রিদিবের গায়ে।

জেগে আছ ঝুমা?

তোমার নিশ্বাস পড়ল কেন তাই বলো?

এমনি—

ঝুমা বলে, এমনি নয়—আমি জানি। আমি এক ভারবোঝা হয়েছি তোমার— আমি আনন্দ নই, দায়িত্ব।

তোমার কথা নয় ঝুমা। ভাবছিলাম, আরও একটা দিন মিছামিছি কেটে গেল, মৃত্যুর এক দিন কাছাকাছি এসে গেলাম।

জানি গো জানি—পাশে থেকেও তুমি অনেক দূরের। সমস্ত জানি। তবু অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিরস্ত হবার মেয়ে নয় ঝুমা। বই ছেড়ে শুয়ে পড়েছ —এবারে আমার। পুরোপুরি আমার তুমি। কোন চিন্তা মনে থাকবে না একমাত্র আমি ছাড়া। ঝুমা-ময় হয়ে থাক।

ঝুমা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ভালবাসার অতলে তলিয়ে গেল ত্রিদিব ঘোষ—ভাবনা-বেদনার অতীত লোকে। তার পৃথিবী এখন এই ঝুমা—ঝুমার চুড়িপরা নিটোল বাহু দু'খানি…ঘন কালো মেঘের মতো ঝুমার আলুল চুল…মেঘের বুকে বিদ্যুতের মতো কথায় কথায় ঝুমার ঝিকমিকিয়ে হেসে ওঠা। রাতের অন্ধকারে দু'জনে ওরা চেয়ে থাকে এ-ওর দিকে। চোখে নয়, মনের আলোয় দেখতে পাচ্ছে।

।। দুই ।।

একদিন ঝুমা বলল, দেখ—হাসতে পারবে না কিন্তু। একটা কথা বলছি তোমায়।

কি?

হাসলে দেখো কি করি।

ত্রিদিব বলে, এমন লোভ দেখাচ্ছ ঝুমা, হাসি না পেলেও যে হাসতে ইচ্ছে করছে।

ঝুমা অতএব ভূমিকা না বাড়িয়ে সোজাসুজি বলে, এত ছাত্রের ট্রানশ্লেসন দেখ। বোঝার উপর শাকের আঁটি। আর একজনের ইংরেজি লেখা একটু দেখেশুনে দাও না।

ত্রিদিব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

না, না, কক্ষণো নয়। সন্ধ্যার পরে কয়েকটা মাত্র ঘণ্টা আমার নিজের আছে, কোন দামে তা বেচব না। রাতের টুইশনি আমি নিতে পারব না।

বলতে বলতে থেমে যায় সহসা। আগুনে জল পড়ে। বলে, সংসার চালাতে পারছ না ঝুমা? তা সত্যি—যে ক'টা টাকা আসে, তাতে একজোড়া মুরগি পোষাই যায় না। এ তবু দু-দুটো মানুষ!

এবারে ঝুমার পালা।

সব কথায় ঘুরে ফিরে আমার ঘর-গৃহস্থালী নিয়ে আসবে কেন বল তো? সর্বক্ষণ যেন হাত পেতে বসে আছি। টাকা চেয়েছি আমি কোনদিন?

চাওনি, কিন্তু চোখ আছে আমার। সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে বিকেলবেলা একটুখানি অবসর, তখনও শক্তিসংঘের মেয়েগুলোর সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ-প্যারেড করা—

ঝুমা বলে, ক'টা করে টাকা দেয় বটে, কিন্তু টাকার জন্যে নয়। ও যে চিরকেলে স্বভাব আমার। শঙ্কর-দা ওঁদের বড় চিন্তা, মস্তবড় আদর্শ— আমার সে সব কিছু নয়। ঐ অছিলায় মেয়েগুলোর সঙ্গে হাত-পা খেলিয়ে একটু বাঁচি

শঙ্করের প্রসঙ্গে ত্রিদিব হো-হো করে হেসে ওঠে।

ভারী ভারী কথা বলে বুঝি শঙ্কর? তোমায় সুদ্ধ তাক লাগিয়েছে—অন্তত কথা বলার ক্ষমতাটা আছে, মানতে হবে।

ঝুমা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, অমন বলতে নেই ঐ মানুষের সম্বন্ধে।

ত্রিদিব বলে, তিন-তিন বারেও পাশ করতে না পেরে সভাসমিতির চেয়ার -বেঞ্চি বয়ে বেড়াত, নেতারা বক্তৃতা করতে উঠলে পাখার বাতাস করত। গাঁয়ে এসে—খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, একটা-কিছু নিয়ে তে থাকা চাই! সংঘ গড়ে তাই দশের মধ্যে হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছে। এই অবধি বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু ইদানীং আদর্শের বুলি কপচাচ্ছে—শঙ্করও হাফ-নেতা হয়ে পড়ল—এতে না হাসলে দম ফেটে মরে যাব যে!

ঝুমা বলে, পাশের কথা বলছ—পাশ করতে ও-মানুষের আটকায় নাকি? কিন্তু কলেজের বই পড়বার সময় কোথা?

গলা নামিয়ে বলে, দিন নেই, রাত নেই সর্বক্ষণ কাজ নিয়ে আছেন। দেশের মুক্তি ওর জীবন-সাধনা।

বটে। এস. ডি. ও. সাহেবকে বলে আসতে হবে তো এইবার সদরে গিয়ে।

ঝুমা বলে, খবরদার, ঠাট্টা করেও অমন কথা বোলো না। বড্ড ধড়-পাকড় নানা দিকে।

ত্রিদিব বলে, শঙ্কর মিত্তিরকে তা বলে কেউ ধরতে যাচ্ছে না। লাঠি না হলে যে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, সে হল স্বদেশি সেনাপতি। এস. ডি. ও. শুনেও হেসে গড়িয়ে পড়বে। নিশ্চিন্ত হবে এদের দেশ-উদ্ধার সম্পর্কে।

তখন ঐ পর্যন্ত। ইস্কুলের পর ত্রিদিব বাসায় ফিরেছে। ঝুমা সংঘের কাজে বেরুবে ... হবে—সে-ও ...বি। ত্রিদিবকে সামনে বসে খাবার খাইয়ে তবে সে সংঘে যায়। আজকে খাবারের প্লেট এবং সেই সঙ্গে ভারী ওজনের এক খাতা।

ত্রিদিব সভয়ে বলে, খাতায় কি? সংসারের হিসেব বোঝাতে এসেছ নাকি? ওরে বাবা!

মুখ নেড়ে অপরূপ ভঙ্গিতে ঝুমা বলে, উনি আমার হিসেব বুঝবেন—ভারি কিনা বুদ্ধি।

ত্রিদিব সায় দেয়, ঠিক তাই। একবর্ণ বুঝিনে। সত্তর টাকা আয়ে এক শ' টাকা খরচ করে মাসে মাসে পঁচিশ হিসেবে কেমন করে ... নো যায় —এ অঙ্ক মাথায় ঢোকে না আমার। যাক গে, হিসেব-নিকেশ নয় যখন, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কি তবে?

সেই যে বলেছিলাম—ট্রানস্লেশন আছে কয়েক পাতা। একটু যদি চোখ বুলিয়ে যাও। খুব ভাল ছাত্রী আমি—মাস্টার মশায়ের নগদ মাইনে। কেমন চন্দ্রপুলি তৈরি করেছি সারা দুপুর বসে বসে। খেয়ে দেখ, ভাবছ কি? খেয়ে বলতে হবে কেমন হয়েছে।

চন্দ্রপুলি তো করেছ—তারও চেয়ে তাজ্জব করেছ......বাঃ বাঃ, চমৎকার!

ট্রানস্লেসনের পাতা ওলটাচ্ছে আর তারিফ ...ছে উচ্ছ্বসিত ভাবে। ঝুমা লজ্জিত মৃদুস্বরে বলে, খেয়ে নাও দিকি আগে।

খুব ভাল হয়েছে, বাড়িয়ে বলছিনে। কদ্দিন এসব করছ, কিছু তো জানিনে।

সাড়ে-দশটায় বেরিয়ে যাও, কোন্ খবরটা রাখ তুমি? উঁহু, মন দিয়ে দেখছ না। তাহলে দাগ-টাগ দিতে নিশ্চয়।

দাগ দেবার জায়গা পাইনে যে। খাসা ইংরেজি লিখেছ, আমি এমন পারি নে। ঝুমা, তোমার তুলনা নেই।

মুগ্ধ হয়ে দেখছে তাকে। এত পরিশ্রম, এমন অধ্যবসায়, এতখানি নিষ্ঠা—ঝুমার আর এক নতুন রূপ।

না, না, যাও…এ কি বল তো?

এমন সুন্দর কাজ—পুরস্কার না পেলে ছাত্রীর স্ফূর্তি আসবে কেন?

কিন্তু রাগের ভান করাটাও চলল না, হাততালি দিয়ে ঝুমা হেসে ওঠে। হাসির দমক সামলাতে সামলাতে বলে, একটুখানি পাউডার বুলিয়েছিলাম—তোমার ঠোঁটে-মুখে তা লেপটে নিলে। খাসা চেহারা খুলেছে, হি-হি-হি!

তারপর থেকে ঝুমাও ঘুমিয়ে পড়ে না রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর। ঘরের দুই প্রান্তে দুই হেরিকেন। এদিকে পড়ছে ত্রিদিব, ওদিকে পাতার পর পাতা ঝুমা ট্রানশ্লেসন লিখে যাচ্ছে। ঝুমা এ সময়টা পড়ে না। তার হল পাশের পড়া—শব্দ করে পড়তে হয়। ত্রিদিবের তাতে বিঘ্ন ঘটবে।

যে লোকে তুমি বিচরণ কর, তোমার ঝুমাও উঠে যাবে সেখানে। ভিন্ন এক জীবনে পড়ে থাকবার মেয়ে আমি নই। দু'জনে পাশাপাশি আমরা—দেহে যেমন, অন্তরে অন্তরেও তেমনি। ঝুমা দেবী কি আলাদা ত্রিদিব থেকে?

ইস্কুলে অবসর-ঘণ্টায় ত্রিদিব অবিরত চিঠি লেখে। সব মাস্টারের নজরে পড়েছে। তাই নিয়ে টীকা টিপ্পনীও চলে খুব।

থার্ড পণ্ডিত ঘাড় লম্বা করে দেখে নেবার চেষ্টা করেন। ইংরেজি চিঠির কি বুঝবেন তিনি! প্রশ্ন করলেন, চাকরির দরখাস্ত?

তা বই কি!

নিতান্ত মিথ্যাও নয়। জানাশোনা যে যেখানে আছে, ত্রিদিব চিঠি লিখে পরিচয় ঝালিয়ে নিচ্ছে। কাজের ব্যবস্থা যদি কেউ করে দিতে পারে, তুচ্ছ এই মাস্টারি জীবন থেকে মুক্তির কোন উপায়।

চিঠির জবাব কদাচিৎ আসে। তা-ও দু-চারি ছত্রের মধ্যে মোটা রকমের উপদেশ। দিনকাল অতিশয় খারাপ—তা-বড় তা-বড় লোকে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, বাজার-সরকারি কাজেও পাঁচ শ' গ্রাজুয়েটের দরখাস্ত। আছ কোথায় বাপু? মাসান্তে তবু যৎকিঞ্চিৎ আসছে—এই বা ক-জনের ভাগ্যে ঘটে! যা আছে তাইতে খুশি থাকো, দুরাকাঙ্ক্ষার শান্তি নেই……

থার্ড পণ্ডিত বলেন, যে ক'টি টাকা পাও, সবই দেখছি ডাকটিকিটে খরচা কর। দরখাস্ত বেয়ারিং-পোস্টে ছাড় এবার থেকে। নগদ পয়সার উপর দিয়ে গেল না—সেইটুকু মুনাফা।

ছেলে হবার পর ঝুমার পড়া-লেখা বন্ধ। মাংসের একটা দলা—বেঢপ গড়ন, ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছে অষ্টপ্রহর। জেগে উঠলে পিটপিট করে তাকায়, অথবা কাঁদে ট্যা-ট্যা করে। ঝুমার উল্লাসের অবধি নেই এই বস্তু নিয়ে। দেমাকে ফেটে পড়ছে সে যেন। কখনো কখনো ত্রিদিবের কোলে দেয়, ছেলে কেঁদে ওঠে অমনি। লিকলিকে ঐ যন্ত্রের আওয়াজ দেখে অবাক হতে হয়। ঝুমার এত আদরের ছেলে—তাই মুখে কিছু বলা যায় না, সয়ে থাকতে হয় দুটো-পাঁচটা মিনিট। কাজের অজুহাতে তারপর কোল থেকে নামিয়ে দেয়—দিয়ে বেঁচে যায়। ছেলের উপর মানুষের দরদ—দরদ যে কিসে আসে, ত্রিদিব কিছুতে ভেবে পায় না।

দশ মাস এক বছর কেটে যায়। আশ্চর্য তো! সেই বেঢপ বাচ্চা কোন্ সময় সুন্দর হয়েছে—কেমন তার ফুটফুটে চেহারা। দুধে-দাঁত বেরিয়েছে গোটা চারেক, সেই দাঁতের অহঙ্কারে বাঁচেন না, হাসির নামে দাঁত বের করে দেখানো হয় কথায় কথায়। থপথপ করে বেড়ায়—গায়ে এক কড়ার বল নেই, কিন্তু স্থির থাকবে না এক মুহূর্ত। দিনের মধ্যে এমন বিশবার আছাড় খাবে। ছুটে যায় ত্রিদিব, ধরে তোলে। বকুনি দেয় কখনো সখনো।

বড্ড খারাপ হচ্ছ তুমি খোকা। সর্বক্ষণ দুষ্টুমি। পড়াশুনো-কাজকর্ম হবার জো নেই তোমার জন্য।

এক বছরের ছেলে কত যেন বোঝে। ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়ায়, চোখের পাতা কাঁপে দু-একবার। কিন্তু দুষ্টু কি কম! কান্নায় ত্রিদিব বিরক্ত হয়—তাই বুঝি কান্না সামলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মুহূর্তকাল। শেষে মুখ উঁচু করে তোলে। অর্থাৎ আদর কর। কম ছেলে—দোষ করবে, আবার আদর না কেড়ে ছাড়বে না।

কান্নার মধ্যে ঝুমা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। ত্রিদিব বললে, দেখ কি, মায়ের ছেলে একেবারে! থমথমে মুখ করে দাঁড়ানো হবে, অন্য মানুষের দোষঘাটের যেন অন্ত নেই। আদর ষোলআনা না হওয়া পর্যন্ত হাসি ফুটবে না।

ঝুমা বলে, হিমসিম হয়ে যাই একরত্তি ঐ দস্যি সামলাতে। আমার আবার কিছু হবে। বই খাতা তাকে তুলে দিয়েছি। ঘরে মন বয় না বাবুর, অহরহ পালাই-পালাই। পুরোপুরি বাপের স্বভাব। একটু বেসামাল হয়েছি তো পথ অবধি ধাওয়া করবেন।

ছোট্ট দু'টি ঠোঁট—ফুলের কুঁড়ির আদল আসে। নাম হয়েছে মুকুল। আধেক-ফোটা কী মিষ্টি কথা যে! আর কী বুদ্ধি! ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে কথা শুনতে ইচ্ছে করে।

নাম কি তোমার?

মুন্ম—

মুখখানি সুঁচাল করে শেষ অক্ষরে অদ্ভুত রকম জোর দিয়ে বলে অপরূপ

ভঙ্গিতে। না হেসে পারা যায় না। হাসিতে কি শোধ যায়, কোলে তুলে নাচতে হয় খানিকক্ষণ। নয় তো তৃপ্তি লাগে না।

আচ্ছা মুন্ম বাবু, ভয় দিয়ে দাও তো এবার।

এক কলের পুতুল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাঁশির আওয়াজের মতো—আ-আ—আ—

বড্ড ভয় পেয়েছি। আর নয়, আর নয়। কোথায় লুকুই যে এখন! কোন তক্তপোশের তলায়, কোন পিঁপড়ের গর্তে।

বাপের ভাবে-ভঙ্গিমায় মুকুল খিলখিল করে হাসে। ঝুমাকে দেখিয়ে ত্রিদিব বলে, কে বল দিকি?

ঝুম্মা—

দেখ, সব জানে ছেলে। কেমন তোমার নাম ধরে বলে দিল।

ঝুমা বলে, ছোট্ট বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। তিনিই ফিরে এলেন। বাপে মেয়ের নাম ধরবে ছাড়া কি।

ত্রিদিব বলে, ঝুমা বড় দুষ্টু হয়েছে—যখন তখন দুঃখের কথা তোলে। ঝুমাকে মেরে দাও মুকুল।

কলের পুতুল টলতে টলতে গিয়ে মায়ের কোলে ঝুপ করে বসে পড়ল, তুলতুলে হাতখানি তুলে তার গালে ঠেকায়।

ঝুমা পুলক ভরা কণ্ঠে বলে, মারছ তুমি আমায়? নাওয়াই-খাওয়াই, কোলে তুলে নাচাই—আর তুমি পরশুরাম পিতৃআজ্ঞা পেয়েছ, তবে আর কি!

তখন ত্রিদিব সদয় কণ্ঠে বলে, ঝুমা কাঁদছে তুমি মেরেছ বলে। আদর করে দাও মুকুল।

ছেলে আদর করবে তো একটু-আধটু নয়। উঠে দাঁড়িয়ে মুখখানা কোমল ভাবে ছোঁয়াল মায়ের গালে। এক গালে হবে না—মুখ ঘুরিয়ে ধরে ও গালেও দিল স্পর্শ। তারপর বাপের কাছে গিয়ে তাকেও ঐ রকম।

ত্রিদিব জড়িয়ে বুকে তুলে বারম্বার চুমা খাচ্ছে। এতখানি মুকুলের পছন্দ নয়—হাত-পা ছুড়ছে, মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে প্রবল-ভাবে। ছটোপুটি করে ত্রিদিবের কোল থেকে সে নেমে দাঁড়াল।

আঙুল দিয়ে মাকে দেখিয়ে দেয়, আধো-আধো সুরে বলে, বাবা—ঝুম্মা—আদো—

অর্থাৎ তার যথেষ্ট হয়েছে, মাকে আদর করো এবার।

হেসে উঠে ত্রিদিব বলল, ছেলে কি বলে শুনছ? পিতৃভক্ত ছেলে—আমার সব কথা শোনে, ওর কথাটাও আমার রাখা উচিত। কি বল?

আনন্দে আত্মহারা ঝুমা হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়।

যাও—

ইস্কুলে যেতে হেডমাস্টার একখানা খামের চিঠি হাতে দিলেন। শেখর-

নাথ তবে জবাব দিয়েছে চিঠির। শেখরনাথের চিঠি—খাম-কাগজ অতএব অসাধারণ হবেই। কলেজি বন্ধুদের মধ্যে শেখরের বরাতই ভালো সকলের চেয়ে! বড়লোকের একমাত্র মেয়ে বিয়ে করে রাজার হালে আছে। বউকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মাসে মাসে নিয়মিত বাড়িভাড়ার টাকা আসে হাজার কয়েক, পা নামক একটি অঙ্গ আছে—গাড়ি চড়ে চড়ে প্রায় সে তা ভুলে যেতে বসেছে। কিন্তু এ সব কারণে নয়—বউ-অন্তপ্রাণ সে বিয়ের সময় থেকেই, যখন তার শ্যালক জীবিত ছিল, এত সম্পত্তি হাতে আসবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। মঞ্জু, মঞ্জুলা, মঞ্জুভাষিণী, মঞ্জুলেখা—কত রকম সম্বোধন করে চিঠি দিত বউকে। অভিন্নহৃদয় বন্ধু ত্রিদিব, সে দেখেছে অনেক প্রেমপত্র। শেখরনাথই দেখাত।

এমন বন্ধুর কাছে ছোট হয়ে দায় জানানো ঠিক হবে কি না—ত্রিদিব অনেক ইতস্তত করেছে। নিরুপায় হয়ে অবশেষে লিখেছিল। জবাব সে নিশ্চয় দেবে, এবং সাধ্যমত করবেও। কিন্তু মান খুইয়ে তার কাছে সাহায্য নিতে হচ্ছে, এই বড় দুঃখ।

জবাব পড়ে কিন্তু মন রি-রি করে জ্বলে। ক্লাসে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, পড়াবার অবস্থা নেই। টাকা হয়ে শেখর তুমি এমনি হয়ে গেছ! তোমার ত্রিসীমানায় যাবে না ত্রিদিব। ঐ চিঠি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেও বুঝি তৃপ্তি হবে না…উঁহু, ছিঁড়ে ফেলবে না চিঠি ঝোঁকের মাথায়। লেকপাড়ায় নতুন বাড়ি করেছে, তার ঠিকানা রয়েছে। মর্মঘাতী একখানা চিঠি দেবে ঐ ঠিকানায়—কলমের আগায় যত গালিগালাজ আসে। চিঠিটা রেখে দেওয়ার দরকার, বড়লোক হয়ে শেখর যে কেমন হয়ে গেছে, তার বিচিত্র পরিচয়। আর যাই হোক, [illegible] গা কখনো যেন না হয় ত্রিদিবের।

সেই রাত্রে। বই বন্ধ করে ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। মাথায় কিছু যাচ্ছে না, এমন পড়ায় লাভ কি? হেরিকেনের ক্ষীণ আলো পড়েছে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন মা আর ছেলে দু'টি মুখের উপর। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে বিলীন হয়ে আছে মুকুল।

ত্রিদিব দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। বিনুনি করবার সময় নেই ইদানীং ঝুমার—বিস্রস্ত চুলের বোঝা শিয়র আচ্ছন্ন করে আছে। ক্লান্তির সুস্পষ্ট রেখা মুখে। সারাদিনের এত কর্তৃত্ব ও খবরদারি এখন সেই রাত্রিবেলা বাহারের পোশাকের মতো খসে গিয়ে এক করুণ অসহায়তা ফুটে বেরিয়েছে মনোরম দেহভঙ্গিমায়। বাইরে যাবে ত্রিদিব—কিন্তু পা আটকে গেছে যেন মেজের সঙ্গে। কোন অপরিচিতা রূপসীকে দেখছে সে এখন, দেখে দেখে কূল পায় না। দিনমানে যে কর্মচঞ্চলাকে দেখে থাকে, সে নয়—এ হল এক নতুন মানুষ। সেই যে তখন মুকুল কি বলছিল—নিশুতি রাতে ঝুমারও অজান্তে ছেলের সেই কথাটা রাখতে বড় লোভ হয়।

ঝিঁঝি ডাকছে—ঘর-কানাচে কালকাসুন্দের জঙ্গলে কোন সখীর দল ঘুঙর বাজিয়ে ভারি নাচ লাগিয়েছে রে! শিয়াল ডেকে ডেকে প্রহর জানাল। কুয়োপাখী একটানা ডেকে চলেছে তেঁতুল-ডালে বসে। বাদুড়ের ঝাঁক দেবদারু-ফল খেয়ে উড়ছে এদিক-ওদিক। হাওয়া আসে বাঁওড়ের দিক থেকে—গুমট ভেঙে ঠাণ্ডা জোলো হাত সর্বাঙ্গে কে বুলিয়ে দেয়।

বাঁধনের উপর বাঁধন পড়ে যাচ্ছে ত্রিদিবনাথের। ঝুমা ছিল, আবার এই মুকুল। টলতে টলতে এগিয়ে এসে কচি হাত আগলে দাঁড়াবে, পালাতে পার দেখি কেমন। দিনের বেলা মাস্টারি, রাতের ক'ঘণ্টা ছিল তোমার নিজের ...এখনই যে লোকের বাড়ি বাড়ি ফিরি করতে হবে রাতের ট্যুইশানি একটা জোটে কিনা! নয়তো কষ্ট পাবে মুকুল—তার দুধের কমতি হবে, জুতো-মোজা হবে না। ঝুমা মুখ ভারি করবে—নিজের জন্য কিছু বলে না, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে তিলেক ত্রুটি ঘটলে ক্ষেপে যায়।

কলকাতা থেকে মাসে মাসে বই আনানো শেষ এইবার। ভাল করে বেঁধেছেঁদে কাগজে মোড়ক করে বই বরঞ্চ তাকে তুলে দাও। বেচতে পারলে যা-হোক কিছু উশুল হত। কিন্তু এখানে কিনবে কে? ইস্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়া বাজে বইর এখানে খদ্দের নেই।

জোর বাতাস উঠল। জানলার কবাট ঠকাস করে ঘা মারল দেয়ালে। বাঁশবাগান ক্যাঁচকোঁচ করে ওঠে, সুপারিগাছ বিষম বেগে মাথা দোলায়। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—নিঃসীম জ্যোতির্লোকে ধরিত্রী দোল খাচ্ছে যেন উন্মাদের মতো।

॥ তিন ॥

ঝুমা দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে। ফ্রেমে-বাঁধানো এক ছবি। গাছের ফাঁক দিয়ে নতুন রোদের কুচি পড়েছে এখানে-ওখানে। দু'টি হাত ঝুমা চৌকাঠের দু-দিকে রেখে একটু কাত হয়ে আছে ত্রিদিবের দিকে চেয়ে। যেতে যেতে ত্রিদিব পিছন তাকিয়ে দেখে বার বার। থমকে দাঁড়ায়। না দাঁড়িয়ে পারা যায়?

বেশি দিন নয় ঝুমা। তোমাদের নিয়ে যাবো একটু-কিছু সুবিধা হলেই। সুবিধা না হলে ফিরেই তো আসছি। বিচ্ছেদ ক'দিনেরই বা! ইস্কুলের এ আমার পাকা চাকরি। আজ দু'টাকা, কাল পাঁচসিকে—এমন মাইনেয় কার পোষাবে? মায়ামন্ত্র-জানা ঝুমা নেই তো তাদের! এ মাস্টারি আর কেউ নিচ্ছে না। কলকাতায় যাচ্ছি—দেখে আসি একটুখানি বাইরের পৃথিবী।

এমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা চলবে না। দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে যে দেখবে, ঝুমার কৌতুক-চঞ্চল চোখ দুটোয় কেমন করে বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসে, তার উপায় নেই। ভয় করে। ডাকাত জেগে উঠবে এখনই। এক বছরে

ডাকাত। কিন্তু কি শক্তি এক বছরের কচি হাতদুটোয়! ত্রিদিব রোগা অশক্ত নয়। ঝুমা তো পালোয়ান মেয়ে। কিন্তু মা-বাপের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে মুকুল। জড়িয়ে ধরলে সাধ্য কি সেই বন্ধন ছাড়িয়ে চলে যাবে। ঝুমার চেয়ে বেশি ভয় মুকুলকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি চল, পা চালিয়ে চল হে ত্রিদিবনাথ।

শহর কলকাতা। মানুষ গিজগিজ করছে। সভ্য মানুষ, সুন্দর মানুষ—কিন্তু মনের দোসর মানুষ নেই। বড় বড় অট্টালিকা ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে। একটা গাছ পাওয়া যায় না, যার ছায়ায় একটুখানি বসি।

সহপাঠী ও পুরানো বন্ধুরা আছে। কিন্তু ভয় করে শেখরনাথের সেই চিঠি পাবার পর থেকে। কার কোন্ মূর্তি হয়েছে ঠিক কি। যেমন খুশি হোক গে—ত্রিদিব তা জানতে চায় না। মরে গেলেও সে চেনাজানা কারো কাছে যাচ্ছে না।

অতএব চৌরঙ্গির হোটেলে উঠল। এটা নতুন এক রাজ্য—তার পুরানো কলকাতা থেকে একেবারে আলাদা একতলায় বড় বড় হল—লাউঞ্জ, অফিস, খানাঘর, বার, বিলিয়ার্ড-রুম…. দোতলা থেকে ছ'তলা অবধি ছোট্ট ছোট্ট অগুন্তি খোপ। মৌচাকের উপমা মনে আসে। তারই একটা খোপ নিয়ে সে আছে।

হপ্তা দুই কাটল। তার পরে প্রয়োজন হল মনিব্যাগ উপুড় করে গণে দেখবার। অবস্থাটা এখন ভাল করে ভেবে দেখতে হয়। সার্ট-ট্রাউসার বাক্সবন্দি করে ফেলে অঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি চাপাবে নাকি? উঁহু, দেখাই যাক। দেখতে যাবে কোথায় বা! সেই সনাতন মেস—ছ' বছর আগে একদিন যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল মুটের মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে।

গলির গলি তস্য গলিতে মেস—বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। বিস্তর বস্তি ছিল—বস্তি ভেঙে এখন বড় বড় বাড়ি। রাস্তার নতুন চেহারা হয়েছে। সত্যই সেই গলিটা কিনা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠাহর করে নিতে হয়। মেসবাড়ি কিন্তু সেই যা দেখে গিয়েছিল অবিকল সেই বস্তু। সব জায়গায় ইলেকট্রিক আলো, শুধু ঐ বাড়িতে নয়। যেন অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে আছে, নতুন শহরকে এই বাড়ির ভিতর নাক গলাতে দেবে না।

ছয় সিটের বড় ঘরে হেরিকেনের আলোয় তাস চলছে। বাকি ঘরগুলো অন্ধকার। সেকালেও ঠিক এমনি ছিল। মানুষ রয়েছে কিন্তু ঐ-সব অন্ধকার ঘরে—শুয়ে আছে, শুয়ে শুয়ে গল্প করছে অযথা কেরোসিন না পুড়িয়ে। দেয়ালের ভাঙাচুরো জায়গাগুলোয় আর বালির জমাট ধরানো হয়নি, চুনের একটা পোঁচ টানা হয়নি বাড়ি তৈরির পরে। হোলির দিনে সেবার মানুষ তাক করে পিচকারি মারতে গিয়ে একটা জায়গায় রং লেগে গিয়েছিল—

সেই চিহ্ন অবধি নজরে আসছে। মানুষগুলোও সে আমলের। আশুবাবু, তারিণীবাবু, সতীশবাবু···আরে, বিনুই তো! তখন কলেজে পড়ত—এই আড্ডায় সকলের সঙ্গে সমস্বরে যখন হাঁকছে, বিনুও তবে ইতিমধ্যে কোন অফিসে ঢুকে পড়েছে।

দরজার সামনে ছায়ামূর্তির মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে, কিন্তু ঘরের মানুষদের ফুরসত নেই বাইরে তাকিয়ে দেখবার। ত্রিদিব একবার ভাবল যাই ফিরে যেমন এসেছি চুপিচুপি। এমন সময় খড়ম খটখট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন জংবাহাদুর অর্থাৎ ভুজঙ্গ বাড়ুয্যে।

জংবাহাদুরও, দেখা যাচ্ছে অফিসের কাপড় ছেড়ে কোমরে চেককাটা লুঙি বেড় দিয়ে ডাবা-হুঁকো টানতে টানতে সেই সে-আমলের মতো উপরে নিচে ঘুরে বেড়ান। খবরের কাগজে চাকরি করতেন ভদ্রলোক, এখনো হয়তো তাই। আগেকার মতোই প্রতি ঘরে ঢুকে খবরবাদ নেন, কার শরীর কি রকম, চিঠিপত্র এল কিনা—বাড়ির কে কেমন আছে?—বড়বাবু গোলমাল করেছে শুনে সদুপদেশ ছাড়েন, গঙ্গার ইলিশ ও ল্যাংড়া-আম হুজুরে পৌঁছে দিয়ে আসতে। এরই মধ্যে একবার বা রান্নাঘরে ঢুকে চাটনিতে কিসমিস দেবার তালিম দিয়ে এলেন ঠাকুরকে।

ত্রিদিবকে দেখে জংবাহাদুর হৈ-হৈ করে উঠলেন, পথ ভুলে নাকি ভায়া? গোঁ ভরে সেই বেরিয়ে পড়লে, রোজই তারপরে খবরের কাগজ খুঁজি—রাজা-উজির কি হয়েছ না জানি এদ্দিনে! আছ কোথায় আজকাল?

পরিপাটি পোশাকের দিকে বারম্বার দৃষ্টি দিচ্ছেন। আর কেউ হলে কথাগুলো ব্যঙ্গ বলে ভাবা যেতো, কিন্তু জংবাহাদুরের সঙ্গে একত্র সে থেকে গেছে। নিজের সম্বন্ধে ত্রিদিবের যে ধারণা—তিনিও ত্রিদিবকে ঠিক তেমনি কেষ্টবিষ্টু ভেবে আসছেন বরাবর।

খেয়ে যাবে ভায়া, এখান থেকে—

আপসে নিমন্ত্রণ জুটে গেল। দয়াময় তুমি ভগবান। তা বলে এক কথায় হ্যাঁ বলা যায় না। ঘাড় নেড়ে সে বলে, আজ থাক। ডিনার সেরে তবে তো এসেছি।

জংবাহাদুর জোর দিয়ে বললেন, আজকেই। খেয়ে এসেছ তো আবার খাবে। ফিস্টি আজ আমাদের। মাংস আর ইয়া-ইয়া গলদাচিংড়ি—

ত্রিদিব বলে, আবার এক মুশকিল। দশটায় হোটেলের দরজা দিয়ে দেয়। বিষম চুরি হয়ে গেছে এর মধ্যে কিনা!

তা এখানেই থেকে যাবে, এটা কিছু জঙ্গল নয় ভায়া। ঘরবাড়ি বটে—মানুষজন থাকে। ছিলেও তুমি কতদিন। আলাদা সিট দিতে পারব না। সিট খালি নেই। একটা রাতের মামলা—আমার সিটেই জড়াজড়ি করে দু-ভায়ে থাকব।

হাঁক দিয়ে বললেন, ঠাকুর মশায়, ফ্রেণ্ড আছে আমার।

ঠাকুর গজর-গজর করে, রাত দুপুরে ফ্রেণ্ড—এখন আবার ভাত চড়াব নাকি? মাছও গোণাগুণতি।

জং বাড়ুয্যের সঙ্গে চোপা করবে না বার দিগর। চাকরি থাকবে না ঠাকুর—এই একটা কথা বলে দিলাম। মাছ না থাকে, আমার ভাগের মাছ দিয়ে দিও ফ্রেণ্ডকে।

হঠাৎ হুঙ্কার থামিয়ে নরম সুরে বললেন, রামা-শ্যামা নয়, একডাকে-চেনা মানুষ। এই মেসে থাকতেন। চারটে মেস আছে আমাদের রাস্তায়—আর কোন মেস বুক চিতিয়ে এমন গরব করতে পারে। শুধু বড় হয়েছেন তা নয়- বড় হওয়ার পরও খেয়ে যাচ্ছেন আজ এখানে। রাত্রিবাস করতেও রাজি।

ইতিমধ্যে অনেকেই বেরিয়ে এসেছেন ভূতপূর্ব মেম্বার এক-ডাকে-চেনা মানুষটাকে দেখতে। বড় যে হয়েছে, বেশভূষাতেই মালুম। ঠাকুরও শিলের হলুদ-বাটা নেবার অজুহাতে বাইরে এসে আর নড়ে না—ফ্রেণ্ডের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করছে। নড়বড়ে এই ভাঙা বাড়িতে হেন পোশাকের মানুষ এই প্রথম ঢুকল।

জাঁক করেছেন জংবাহাদুর, কিন্তু ত্রিদিবের হালফিলের খবর তাঁরও জানা নেই। কথাটা মনে হল তাঁর। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি করা হয় ভায়ার আজকাল?

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে পড়েছি।

ঠোঁটের আগায় যা এসে গেল। নামটা ঘর-ব্যাভারি নয় অতএব শক্ত ব্যাপার হবে কোন-কিছু। এমন অদ্ভুত কর্মের মধ্যে থেকেও মানুষটা আর দশজনের পাশাপাশি মেজেয় বসে খাচ্ছে—সকলের বড় চিংড়িটা তার পাতেই পড়ল অতএব।

সকালবেলা ত্রিদিব বলে সেই সব পুরানো দিন মনে আসে জং বাহাদুর। কী আনন্দে যে ছিলাম।

আনন্দে এখনো থাকা যায়। রুখছে কে? মনে চাইলেই হল।

বললেন যে সিট খালি নেই।

আমার সিট আছে। আপাতত এক সিটে চলুক। খাটে কাল অসুবিধা হচ্ছিল, খাট ছাতে বের করে দিচ্ছি। মেজেয় শোব দু-ভাই, তা হলে পড়ে যাবার ভয় নেই।

ঠাকুরকে ডেকে বললেন, ত্রিদিববাবু খাবেন। আজকে ফ্রেণ্ড নয়। ম্যানেজারকে বল, নামপত্তন করে নিতে। আমিই গিয়ে বলছি। নাম লিখিয়ে দিয়ে এসে বাজারে যাব। পাঁচটা টাকা দাও দিকি ভায়া অ্যাড-ভান্সের দরুন।

পাঁচ-টাকা দশ-টাকা এখনো দেওয়া চলে অক্লেশে। কিন্তু জোর লাগাও ত্রিদিবনাথ। টেলিফোনের গাইড দেখে ফর্দ করে ফেল, কোথায় কি সুবিধা

হতে পাবে। এক-একটা রাস্তা সারা করে ফেল এক-এক দিনে।

ল্যাবরেটারি চাই একটা। পুঁথিপত্র পড়ে এবং হিসাব কষে যা পাচ্ছে, সেই বস্তু পরখ করে দেখতে চায় হাতে-কলমে। মিথ্যা নয়, দিনের আলোর মতোই সত্য—পরখ করবার প্রতিটি প্রক্রিয়ার মধ্যে কি ঘটবে সমস্ত সে জানে। কিন্তু আপাতত ত্রিদিবনাথ তুচ্ছ এক মানুষ, লক্ষ কোটির একজন—কে দেবে তাকে সুযোগ? এতদিনে যা ঘোরাঘুরিটা হয়েছে, যোগ করলে পায়ে হেঁটেই তো রাদারফোর্ড-চাডউইকের কাছ বরাবর পৌঁছান যেত। অথচ আমল পাচ্ছে না কোথাও। বাজার সরকারি বা কেরানিগিরির প্রার্থী নয়—তার প্রস্তাব বোঝেই বা ক'টা লোকে? মুখ তুলে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, হয়তো বা মনে মনে পাগল ঠাওরায়। বোঝে যারা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে নানান কথা শোনে—শুনে নিয়ে তারপর বিদায় করে দেয়। বটেই তো। ওঁরা ঐ কয়েকটি বিজ্ঞানবিশারদ আসর জমিয়ে আছেন—তার মধ্যে আর একটি এসে মাথা তুলতে চায়, কোন মূর্খ হেন ব্যাপার বরদাস্ত করবে?

কিন্তু ফিরে যাওয়া হবে না মুখ ভোঁতা করে। কিছুতে নয়। না হয় শহরের পাপুরে রাস্তায় মুখ থুবড়ে মরে থাকবে কোন এক জনশূন্য দুপুরে। কীটপতঙ্গ প্রতি মুহূর্তে কতই তো মরছে। ঝুমা আর মুকুল অনেক দূরের—মনে হচ্ছে আর এক জীবনে ছিল তারা।

॥ চার ॥

জংবাহাদুর একদিন কড়া হয়ে বললেন, এত যে ভারী ভারী কাজ-কর্ম—তা মাংনা খেটে মরছ নাকি? দেয়-পেয় কি?

ত্রিদিব ভরসা দিয়ে বলে, দেবে। দিতে শুরু করলে তখন লাখে লাখ—

ধারে কারবার? তা দশ টাকা বিশ টাকা নগদ ছাড়ুক না আপাতত। লাখ থেকে সেটা তখন বাদ দিয়ে দেবে। ম্যানেজার মুখ কালো করছে—আমাকেও ভাই মিথ্যুক-ধাপ্পাবাজ বলছে তোমার সঙ্গে সঙ্গে।

অর্থাৎ শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজছে না আর। টাকার দরকার। লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা মানুষে রোজগার করে, আমোদ স্ফূর্তিতে দু-হাতে উড়ায়,—আর ত্রিভুবনের সব চেয়ে সস্তা মেসে নানান্ কথা শুনতে হচ্ছে দু-বেলা দুটি পেটে খাওয়ার খরচা দিতে না পারায়। কথা শুনিয়েই যদি দেনা শোধ হয়ে যেত, ত্রিদিব তাতে গররাজি নয়। মানুষের মুখ তো—আজ যাকে থুতু দিচ্ছে, কালকেই ঝরণাধারার মতো চাটুবাক্যে অভিষেক করবে তাকে। সে কিছু নয়। কিন্তু ম্যানেজারের মেজাজ উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে—যা গতিক, শেষ অবধি গলদেশে হস্তার্পণ না ঘটে। যাবে কোনখানে তা হলে? মুফতে খেতে দেবে, পাপ কলিযুগে এমন গুণগ্রাহী কে? টাকা

আয়ের পথ কেউ বাতলে দিতে পার? ধর্মাধর্মের কথা ছেড়ে দাও—যীশুকেই তো পেরেক ঠুকে মেরেছিল অধর্মচারী বলে। বোকারাই ভেগে পড়ে ধর্ম-অধর্মের নাম শুনে। কিন্তু মুশকিল হল, দুস্তর জন-সমুদ্রের মাঝে কোথায় যে চর—কিছুতে সে ধরতে পারে না। ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, ভর দিয়ে দাঁড়াবার জায়গাটা নিশানা করতে পারে না।

বিষম ঘুরছে। একটা কিছু জোটাবেই। খবরের কাগজের অফিস দেখে থমকে দাঁড়াল। দরজার ওপর বোর্ড টাঙানো—'চাকরি খালি নাই'। ক্ষেতে ক্ষেতে যেমন শিয়াল তাড়ায় চুন-মাখানো খোলা হাঁড়ি টাঙিয়ে দিয়ে। তা হোক—চাকরি নয়, অনেক বেশি জরুরি কাজ এখানে।

সেই কখন থেকে বসে আছে কাগজের অফিসে। নিষ্কর্মা আছে বসে পাখার তলে। আমেরিকার অ্যানুয়াল রিভিয়ু-অব-ফিজিক্সে তার লেখা বেরিয়েছে প্রোটিন সম্পর্কে, লেখাটার তারিফ করেছে ওদেশের মানুষ—এই খবর বাংলা কাগজে ছাপা হওয়া চাই। বিদেশের হাততালি না শুনলে দেশি কুম্ভকর্ণদের ঘুম ভাঙে না যে। কিন্তু সম্পাদকের আজকে হল কি বল তো? এগারোটা বাজে—কুম্ভকর্ণ হয়ে বাসাবাড়িতে মগ্ন এখনো সুখনিদ্রায়।

বার তিনেক ইতিপূর্বে খবর নিয়েছে। চতুর্থবারে করুণার্দ্র বেয়ারা বলে, আমি ঠিক বলতে পারব না। ঢুকে পড়ুন দরজা ঠেলে।

একটি মেয়ে—কি আশ্চর্য, উৎপলা বসে সম্পাদকের চেয়ারে!

সম্পাদক আজ আসবেন না। বলুন কি দরকার।

খসখস করে কি লিখে যাচ্ছিল। মুখ তুলে দেখে কলম [illegible]। আর ত্রিদিবই বা কাজের কথা কি বলবে এর কাছে? উৎপলা দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। চোস্ত পোশাক, ব্যাক ব্রাশ-করা চুল, জুতোর পালিশে মুখ দেখা যায়—পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ত্রিদিব ঘোষ, বছর চারেক আগে ঠিক যেমনটি দেখত! বয়স একটুও বাড়েনি তারপর। একটুও সে বদলায়নি।

এসেছ ক'দিন?

তা মাস তিন-চার হল বই কি!

এত দিনের মধ্যে মনে পড়ল না আমাদের?

অভিমানের সুর কণ্ঠে। সে তো হবেই। কিন্তু উৎপলার ভাই সুবোধ তো নেই, যাবে এখন কার কাছে? ও বাড়ি পা দিতে মন কি চায়! সে আমলের এক ফোঁটা খুকি তুমি—পড়াশুনা, গানবাজনা ও অমনি দশটা ব্যাপার নিয়ে থাকতে। গান শুনবার জন্য কালেভদ্রে একটু-আধটু যা আমল দিয়েছি। আজকেই দেখা যাচ্ছে, বুলি ফুটেছে তোমার মুখে। অবাক হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু এসমস্ত মুখে বলা যায় না, ত্রিদিব তাই কৈফিয়ত বানাচ্ছে।

সময় কোথা? ডক্টর অমর পালের নাম জান—তাঁর কাছে কাজ করছি।

কাঁধে জোয়াল দিয়ে খাটান। রাতে ক'ঘন্টা বাসায় এসে থাকি, তা ঐ সময়টুকুও ল্যাবরেটারিতে শুয়ে থাকলে খুশি হন বোধ হয়। এর থেকে আন্দাজ করে নাও, দরদ ঘনীভূত কি প্রকার।

অমর পাল মহা পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু স্বভাবে অত্যন্ত পাজি। তার নামটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—হেন ক্ষেত্রে ত্রিদিব থুথু ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করে। থুথুর সঙ্গে ধুলোয় পড়ে যাক পাল, মুখের মধ্যে ও-নামের একটু স্পর্শ না থাকে। কাজকর্মের জৌলুস দেখে ওসব মানুষকে দূর থেকে মাথা নোয়াও—সে ভাল, কিন্তু পরিচয় করতে অধিক কাছে এগিয়ো না। কত ছাত্রের গবেষণা যে মেরে বসে আছেন—মেরে মেরেই তিনি অমর পাল।

পালকে ছেড়ে ত্রিদিব তাড়াতাড়ি অন্য কথায় আসে। পালের প্রসঙ্গ বিরক্তিকর তো বটেই, তা ছাড়া জেরায় পড়বার আশঙ্কা আছে। পলিকে সেই ছোট বেলা থেকে দেখছে তো—বড্ড ডেঁপো মেয়ে, ভারি বুদ্ধি।

খবর কি তোমার? পাশ করেছ এম. এ.? গান-টান চলছে কি রকম?

উৎপলা বলে গানে মন ভরে। পেট ভরাবার জন্য কাগজে ঢুকেছি—এই তো দেখতে পাচ্ছ।

পাশ-করা মেয়েদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ পথ মাস্টারি। তার বদলে জার্নালিজম নিয়েছ, বুদ্ধির তারিফ করি। নশ্বর সংসারে কাম্য শুধু নামযশ; আর নাম বাজানোর জয়ঢাক হল খবরের কাগজ। 'ক' লিখতে কলম ভাঙে সেই মানুষেরা মান্য হয়ে যাচ্ছে কাগজের মহিমায়। যিনি যত বড় হোন, তোমাদের তোয়াজ না করে উপায় নেই।

শুধু বড়রাই বুঝি। ডাইং-ক্লিনিঙের ধোপা অবধি কাপড় কেচে দাম নিতে চায় না। বলে, আমাদের নামে এক কলম লিখে দেবেন কাগজে।

উৎপলা খিল-খিল করে সেই আগের দিনের ছেলেমানুষি হাসি হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে, রাত্রে খাবে আমাদের বাড়ি।

উঁহু, ডক্টর পাল বলে দিয়েছেন—

রাগ করে উৎপলা বলে, বুঝতে পেরেছি। বড় সমাজে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আমাদের নিচু দরজায় টুপি খুলে ঢুকতে অপমান হবে।

ত্রিদিব কলরব করে ওঠে, বল কি গো। অপমান করতে যাব কোন্ সাহসে! ঢাক পেটাব কাকে দিয়ে তুমি যদি চটে থাক? ডাইং-ক্লিনিঙের ধোপার যে বুদ্ধি—বলতে চাও, সেটুকুও আমার নেই?

তারপর তার মুখের উপর দৃষ্টি তুলে বলল, বরাবর আমায় 'আপনি' বলতে পলি। হঠাৎ যে 'তুমি' শুরু করে দিয়েছ?

আর তুমি আমাকে 'তুই' বলতে ত্রিদিব-দা। আজ দেখলাম, মান্যগণ্য 'তুমি' হয়ে গেছি।

সে তো অনেক দিনের কথা। এখন প্রায় পুরোপুরি এক মহিলা হয়ে দাঁড়িয়েছ—'তুই' বলতে মুখে আটকে যায়।

ঠিক তাই। দিন বদলে গেছে। দাদা মারা গেলেন। জান, একজন আপন মানুষের জন্য বাবা হাহাকার করে মরছেন। দাদাকে 'তুমি' বলতাম—তোমাকেও ত্রিদিব-দা 'আপনি' বলে দূরে রাখতে মন চাচ্ছে না।

ত্রিদিব যেন অভিভূত হয়ে যায়। মুখে ভালমন্দ কথা নেই। তারপর বলে, দূরে থাকতে দিতে তোমার আপত্তি সেই ছেলেবেলা থেকেই—যখন জুতো লুকিয়ে রেখে বাসায় আটকাতে। কিন্তু আটকে রাখা যায় না চেষ্টা করে। কত চেষ্টাই হয়েছিল—রাখতে কি পারলাম আমরা সুবোধকে?

উৎপলার ঘনপক্ষ্ম চোখ দুটোয় ছায়া নেমে আসে। কাতর কণ্ঠে সে বলে, থাকগে ত্রিদিব-দা। যা চুকে-বুকে শেষ হয়ে গেছে, সে সব কেন ঘুলিয়ে তুলছ আবার?

তবু কিন্তু ভাবছে সেই দুর্যোগ-রাত্রির কথা। দু-জনই ভাবছে মনে মনে। সন্ধ্যা থেকে ঝড়-জল। গলিতে এক হাঁটু জল জমে গেছে, বৃষ্টির তবু বিরাম নেই। জল ভেঙে ত্রিদিব গেল ডাক্তারের বাড়ি। ফলাফল বোঝাই যাচ্ছে. তবু হাতে পায়ে ধরে ডবল ফী কবুল করে ডাক্তারকে নিয়ে এল। হরিদাস এক সময়ে নামজাদা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে কি রকম হয়ে গেলেন—বুদ্ধির আলো নিভে গেল যেন একেবারে। একমাত্র ছেলের এখন-তখন অবস্থা, নিচের ভাড়াটে ঘরের মেয়েটা পর্যন্ত এদের সঙ্গে সমানে রাত জাগছে, তিনি কিন্তু নিজের ঘরে নিঃসাড়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারের সাড়া পেয়ে উঠে চলে এলেন।

ভাল আছে, কি বল ডাক্তার? সারাদিন দিব্যি ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমুচ্ছে।

ডাক্তার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সায় দিলেন, ভাল—

হরিদাস প্রসন্ন হাস্যে বললেন, বল তাই। আমিও সেই কথা বলছিলাম এদের। আজকে আর জেগে বসে থাকতে হবে না, ঘুমুতে যা।

বলে আবার নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে খিল এঁটে দিলেন।

শেষ রাত্রে বৃষ্টি-বাতাস থেমেছে। মৃতদেহ আগলে আছে তারা—এপাশে ত্রিদিব, ওপাশে উৎপলা ও নিচের ভাড়াটে ঘরের মেয়েটি, নাম তার সুধাময়ী। শিয়রে ধোঁয়ায় কালিতে আচ্ছন্ন হেরিকেন। আলো দপদপ করছে, দেয়ালে ছায়া পড়েছে—ছায়া নড়ছে নিঃশব্দচারী প্রেতদলের মতো। ভেজানো ছিল দরজা—হঠাৎ খুলে গেল। কি জানি হঠাৎ কিসে হরিদাসের ঘুম ভেঙে গেছে। থপ-থপ করে তিনি এলেন। উস্কোখুস্কো চুল—সেই এক ভয়াবহ বিচিত্র মূর্তি। ঘাড় কাত করে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তাকালেন এদের সকলের দিকে। মড়ার গায়ের উপর সন্তর্পণে হাত রাখলেন।

ঘুমুচ্ছে। ভাল আছে খোকা, কেমন শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। পরশু-তরশু অন্নপথ্যি দেওয়া যাবে, কি বলিস? সেই যে ঘরে গেলাম—তারপর বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ডেকেছি ঠাকুরকে। হঠাৎ এখন স্বপ্নে কে বলে

দিল, একেবারে সেরে গেছে। তাই দেখতে এসেছি।

ধরা গলায় ত্রিদিব বলেছিল, হ্যাঁ মেসোমশাই, সেরেছে একেবারে।

সকালবেলা মড়া শ্মশানে নিয়ে যাবে, উৎপলাকে তখন আর কিছুতে ঠেকানো গেল না। ভাই আর বোন—ঐ যেমন উপমা দিয়ে বলে থাকে, এক বৃন্তে দুটো ফুল। বুকফাটা আর্তনাদ করতে লাগল সে পাড়া মাথায় করে। হঠাৎ নজর পড়ল, বারান্দায় প্রতিবেশীদের ভিড়ের মধ্যে হরিদাস। হতভম্ব হয়ে গেছেন তিনি, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন—কিছুই বুঝতে পারছেন না যেন। ধপ করে তারপর বসে পড়লেন দেয়াল ঠেশ দিয়ে। সম্বিৎ নেই।

এর পরে ত্রিদিব দু-পাঁচ দিন মাত্র দেখেছে হরিদাসকে। মাটির মানুষ তিনি চিরদিনই—কত পাণ্ডিত্য, কথার মধ্যে জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়, কিন্তু দম্ভের আঁচ নেই। সেই মানুষ পর পর দুই বিষম শোকে জড়পুত্তলি হয়ে উঠলেন। স্ত্রী বা ছেলের নাম মুখাগ্রে আনেন না, কাঁদেননি তিনি কোন দিন—কিন্তু অন্য লোকের চোখে জল আসে, যারা আগে তাঁকে দেখেছিল।

ত্রিদিব নিজে থেকে আর কখনো হরিদাসের বাড়ি যায়নি। সুবোধ নেই, যাবে কার কাছে? উৎপলা বাপের নাম ধরে ডাকাডাকি করত, মান-অভিমান করত। কিন্তু ভয় করে। ওদের ছোট্ট বাড়িটা যেন শোকে থমথমে হয়ে আছে,—যত হাসি-মুখ নিয়ে যাও, উঠানে পা দিলেই নিংড়ে মুছে যাবে হাসি, বুকের উপর বিশ-মনি বোঝা—দম আটকে ভুঁয়ে পড়ে যাবে, এমনিতরো অবস্থা।

আজকেও উৎপলা বাপের কথা তুলল। বলে, তোমায় দেখলে বাবা বড্ড খুশি হবেন। যাবে কিন্তু।

ত্রিদিব ভয়ে ভয়ে হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিল তার উপরে এত বছর টিকে রয়েছেন, সে-ই তো পরমাশ্চর্য।

জবাব দিল, রাত একটু বেশি হয়ে যায় তো রাগ কোরো না পলি। কাজের বড চাপ। ডক্টর পাল কি রকম মানুষ, বললাম তো তোমায়।

ঠিক বটে। কাজের যখন আদি-অন্ত নেই, নিমন্ত্রণ-বাড়ি সকাল সকাল যাওয়া কিছুতে হতে পারে না। সন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালের সামনে গড়ের মাঠের একটা বেঞ্চিতে বসে মনে মনে হাসছিল ত্রিদিব। কাজ নয় তো কি, মনোরথে বিশ্ব-বিচরণ। রাত্রের এই সময়টুকু একেবারে তার নিজের। যেমন সেই স্কুলের চাকরির সময়ে ছিল। তখন বই পড়ত —এখন পড়াশুনো বড় একটা হয় না, সেকালের সেই সব পড়া জিনিস নিয়ে নিঃশব্দ রোমন্থন। একটা দিন অতীত হয়ে যাচ্ছে। আকাশের তারা ফুটে গেল, তাই কেবল চেয়ে চেয়ে দেখছে ত্রিদিব ঘোষ। সময়ের বালি ঝুরঝুর করে নিঃশেষ হয়ে যায় যে ওদিকে! কোন সুরাহা হয় না। সমাজের যাঁরা মাথা, তার দরবার সেখানে প্রতিদিন। তাঁদের অতি-মূল্যবান সময় থেকে

দু-পাঁচ মিনিট ছিনিয়ে নেওয়া সহজ কথা! বিস্তর খোশামুদি ও হাঁটা-হাঁটির ফলে তা-ই যদি বা হল, শেষ অবধি কথা শুনবার ধৈর্য থাকে খুব কম জনার। উপহাসের হাসি হেসে মাঝপথেই আবেগ থামিয়ে দেন। আচ্ছা, বলুন তো—যে অলস ছেলেটা আনমনে কেটলির ধোঁয়া নিরীক্ষণ করত, কিম্বা আপেল মাটিতে না পড়ে আকাশমুখো কেন ছোটে না—হেন আজগুবি প্রশ্ন মাথায় ঘুরত যে সৃষ্টিছাড়া লোকের, গোড়ায় কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল তার অসামান্যতা? বড় বিজ্ঞানী মাত্রেই কবি। পড় জগদীশ বোসের লেখা, কিম্বা শোন মাদাম কুরীর কাহিনী।

টং-টং করে গির্জার ঘড়িতে ন'টা বাজতে ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। সময় হয়েছে। ডক্টর পাল যত কাজ-পাগলাই হোন, এতক্ষণে সহকারীকে ছুটি দেওয়া উচিত।

ছোট্ট বাড়ি। আলো নেভানো। একেবারে নিশুতি হয়ে গেছে। কড়া নাড়ছে ত্রিদিব। নাড়ছে তো নাড়ছেই। নীলমণি অবশেষে দরজা খুলে দিল। তখনই নীলমণি বুড়ো ছিল, এখন প্রায় অথর্ব। এ বাড়ির সঙ্গে মানিয়েছে বেশ ভাল। দন্তহীন মাড়ি বের করে—এই বোধ হয় তার হাসি—বলল, এত দেরি করলি, খুকি রাঁধাবাড়া করে আমাদের খাইয়ে দিয়ে, বসে বসে শেষটা ঘুমিয়ে গেছে। আছিস ভাল? খুব নাকি বড় হয়েছিস, সকল জায়গায় খাতির? রাতে ভাল দেখিনে—দিনমানে যদি আসতিস, একটাবার ভাল করে দেখে নিতাম।

প্রতিবাদ করে নীলমণির কাছে ছোট হবার মানে হয় না। অবশ্য বিনয় দেখানো উচিত। ত্রিদিব বলে, খাতির যেখানে যতই হোক, আমাদের কাছে তার কি। এই তোমার কাছে, মেসোমশায়ের কাছে! সময় পাইনে নীলমণি-দা। তা আসব একদিন বেলাবেলি—তুমি যখন বলছ, আসতেই হবে।

অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে ভিতরে। পা ফেলতে ভয় হয়। বাইরের ঘর। ভাইবোনের জুলুমবাজিতে অনেক রাত কাটিয়ে যেতে হয়েছে এ-বাড়ি। খাওয়া দাওয়া সেরে এসে এই বাইরের ঘরে শুতো। সুবোধ আর সে এক বিছানায়। সারারাত গল্পগুজব চলবে—হরিদাস টের পেয়ে তাড়া দেবেন, তাই এই নির্বিঘ্ন ঘরে তারা নেমে আসত।

নিচে আজকাল ভাড়াটে নেই বুঝি?

নীলমণি বলে, ভাড়াটে ছিল আবার কবে। খোকা একজনাদের নিয়ে এসেছিল—তাদের কষ্ট দেখে ঠাঁই দিয়েছিল। ভাড়া না দিয়ে কিছুতে থাকবে না, তাই হাত পেতে নিতে হত কিছু কিছু।

খোকা হল সুবোধ। আ-মৃত্যু সে খোকা ছিল নীলমণির কাছে। ত্রিদিব এই যে নীলমণি-দা বলে ডাকছে, সে-ও সুবোধের দেখাদেখি

নীলমণি বলে, এখন তাদের দিন ফিরেছে। পচা বাড়ীতে থাকতে যাবে কি জন্য ? তেমহলার উপর আছে শুনতে পাই—ভাল কাজকর্ম করে।

সে মেয়ে সুধাময়ী। ত্রিদিবের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছিল। নেত্রকোণার সেই বড মারামারি-কাটাকাটির সময় তারা চলে আসে। সুবোধ আর শেখরনাথের কাছে ত্রিদিব তাদের অবস্থার কথা শোনে। সুবোধদের দরিদ্র-ভাণ্ডার তখন জোর চলছে, শেখরনাথ দরিদ্রভাণ্ডারের বড পৃষ্ঠপোষক। মেয়েটা কিন্তু সাহায্য নিল না কিছুতে। বাপে মেয়ের তাই নিয়ে কী ঝগডা ! সুবোধ তখন হরিদাসের মত নিয়ে ভাডাটে হিসাবে তাদের বাড়ি এনে আশ্রয় দিল। তা বেশ হয়েছে—ভাল আছে তারা, আনন্দের সংবাদ। সুধাময়ী মেয়েটা বড ভাল, বড সরল ও আত্মসম্মানী।

আলো জেলে দাও নীলমণিদা, সিঁডি দেখতে পাইনে।

নিচের বাতিটা খারাপ হয়ে গেছে, নতুন আর লাগানো হয়নি। দরকার হয় না তো—সন্ধ্যের পর কেউ নামে না। তা দেখি, ম্যাচবাক্স আছে বোধ হয় আমার ঘরে।

যাকগে, অত হ্যাঙ্গামা করতে হবে না। অভ্যাস নেই, তাই একটু ছোপ-ছোপ লাগছে। ঠিক আছে, ব্যস্ত হয়ো না তুমি।

উঠে গেল ত্রিদিব। সিঁডির প্রত্যেকখানা ইট, রেলিঙের প্রতিটি শিক, দরজা-জানলা, কডি-বরগা, দেয়ালে-পোঁতা পেরেকটি অবধি তার সুপরিচিত। চোখ বুজেও সারা বাড়ি ঘুরে বেডাতে পারে। দুমদাম করে কতদিন এই সিঁডি থেকে চেঁচাত, চায়ের জল চাপা রে পলি। আর কি দিবি—তৈরি আছে কিছু ? শুধু জোলো চায়ে হবে না কঠিন কিছু চাই।

অনেক দিনের পর কিনা ! সুবোধ নেই, এ বাড়ির উপর তাই জোরও নেই তেমন। উঠছে নরম পায়ে চোরের মতো। সিঁডি আরো তো পুরানো হয়েছে, ভেঙেচুরে না পডে। দরদালান—দালানের প্রান্তে গোলাকার পুরানো টেবিলটা রয়েছে। ঐ টেবিলে খাওয়া দাওয়া হত। আজকেও টেবিলে খানা পাতা, বাটিতে বাটিতে ঢাকা-দেওয়া তরকারি। তাই তো, দর বাডাতে গিয়ে অসুবিধা ঘটানো হয়েছে বড্ড বেশি। পলি বেচারীর ভারি কষ্ট হয়েছে, বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে বড ঘরে খাটের উপর।

ঘরের মাঝখানে কম-জোরের সবুজ আলো। বাতাসে বিদ্যুৎ-আলোর তার দুলছে, আলো যেন ঢেউ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে উৎপলার আলুল চুল, ক্লান্তি-ভরা মুখ ও সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে। নিশিরাত্রে নিষুপ্ত ঘরে সঙ্কোচ-হীন দৃষ্টি মেলে দেখছে মেয়েটাকে। রঙে গোলাপি আভা বরাবরই—তার উপর অঙ্গে অঙ্গে ছাপিয়ে পডছে ভরা যৌবন। এমনি হয়েছে উৎপলা এই ক-বছরে ! বিধাতাপুরুষ ভেঙেচুরে নতুন করে গডে তুলেছেন। সামান্য গয়না—ডান হাতে তিনগাছা চুড়ি, বাঁ-হাতে একগাছা। তার মানে ঘড়ি পরে বেরোয় ঐ বাঁ হাতে। কানে দুল—ঝিকমিক করছে, হীরে-বসানো বোধ হয়। কিম্বা

ঐ মুখখানার পরে যা-ই কিছু ঝুলিয়ে দাও, হীরে হয়ে ওঠে। চোখ ফেরানো যায় না রূপবতীর দিক থেকে। আহা, নিজে রাঁধাবাড়া করেছে কতক্ষণ ধরে। খাবার সাজিয়ে আরো কতক্ষণ পাহারায় ছিল। তারপর ঢুলতে ঢুলতে ঐকসময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

শব্দসাড়া করছে, তবু ঘুম ভাঙে না। বলিহারি এদের বুদ্ধি-বিবেচনা। বাড়ির মধ্যে বুড়ো বাপ আর কচি মেয়ে। আর পাহারাদার হল নীলমণি—বিনা লাঠিতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তাকে কে দেখে ঠিক নেই। এই যে ত্রিদিব দাঁড়িয়ে আছে—মানুষের মন অরণ্যবিশেষ, হঠাৎ যদি হিংস্র জন্তু বেরিয়ে এসে হামলা দিয়ে ওঠে! বড ঘরের দরজাটা অন্তত বন্ধ করে ঘুমানো উচিত ছিল উৎপলার। বোকাসোকা এরা—যেদিন অঘটন ঘটবে, টের পাবে তখন।

মাঝের কোঠায় সম্ভবত হরিদাস। বরাবরই থাকতেন তিনি ঐ-ঘরে। দালান পার হয়ে দরজার কাছে এসে ত্রিদিব ডাকে, মেসোমশায়—

এক ঘুম এতক্ষণে হয়ে গেল উৎপলার। এতদূরের ঐটুকু ডাকে সে ধড়মড করে উঠে বসল।

এসে গেছ? উঃ, বড্ড দেরি করেছ। বাবাকে ডেকে কি হবে, তাঁর তো রাত দুপুর।

দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল।

দুপুররাতের বাকিও নেই বড। ল্যাবরেটারির কাজ এই রাত্রি অবধি?

রাত্রিবেলাটা ডক্টর পালের সঙ্গে নিরিবিলি আলোচনার সময় পাওয়া যায়। ছাড়তে চান না মোটে তিনি।

উৎপলা দ্রুত স্টোভ ধরাল। ত্রিদিব দেখছে ঘুমটুম কোথায় উড়ে গেছে, লুচি ভাজতে বসল সে এখন।

ত্রিদিব বলে, খাসা লুচি বেলে দিতে পারি আমি।

উৎপলা বলে, আমি বেলতে পারি আর ভাজতে পারি একসঙ্গে এক হাতে। বসে পড এবার। হারিয়ে দাও দিকি কেমন পার। লুচির যোগান যখন দিতে পারব না, তখনই হার।

তার চেয়ে দেরি করি আর একটু। দুজনে একসঙ্গে বসব। খেয়ে কে কাকে হারাতে পারে, দেখা যাবে!

উৎপলা রাগ করে বলে, ভারি অবাধ্য হয়ে এসেছ ত্রিদিব-দা। ঠাণ্ডা লুচি খাওয়া যায়? তা হলে তো ভেজেই রেখে দিতাম। যা হয় না, মিছে বকো না তা নিয়ে। হাত ধুয়ে বসে পড বলছি।

খাওয়ার সময় যেসব কথা উঠবে, ত্রিদিব আগে থেকে তার আগাগোড়া মনে মনে তালিম দিয়ে এসেছে। খুব তারিপ করল সে নিজেকে নিয়ে। উৎপলার সঙ্গে বিস্তারে বলল এই ক'বছরের জীবন কথা, এবং এখনকার

যাবতীয় কাজকর্ম। অর্থাৎ নিছক গল্প কথা, আসলের সঙ্গে একটুও মেলে না। গল্প-রচনার এতদূর ক্ষমতা—যা সমস্ত অনর্গল বলে গেল, লিখে ফেললে দিব্যি এক উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। মিথ্যে বলতে পারে বটে বেধড়ক, কিন্তু ইনিয়ে বনিয়ে লিখবার যে ধৈর্য নেই। তা হলে লেখক হিসাবেও অসাধারণ হওয়া যেত। মস্ত এক গবেষণা ফেঁদে বসা গেল পলির কাছে অ্যাটম-তত্ত্ব সম্বন্ধে। দেখা গিয়েছে, যে যত কম জানে—কথায় সে তত নিরঙ্কুশ। একটুখানি বই-পড়া বিদ্যে, একটু বা মুখে শোনা—দুই বিদ্যের মাঝখানে মন গড়া গল্পের সংযোগ করে দাও, শুনতে চমৎকার হবে।

পলির তাক লেগে গেছে, মুখ-চোখের ভাব দেখে বুঝে নিয়েছে। অ্যাটম-তত্ত্বের পর ভ্রমণ-কাহিনী—ভারতবর্ষের হেন জায়গা নেই, যেখানে না গিয়েছি দুষ্প্রাপ্য জাতের মৃত্তিকা-সংগ্রহের জন্য। অনুপরমাণুর মধ্যে অমোঘ শক্তি—সেই শক্তি টেনেহিঁচড়ে আদায় করবার জন্য জীবনপাত করছি। এই আমার দিন-রাতের কাজ। উৎপলা নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছে, সন্দেহ করেনি।

কিন্তু আসল পরিচয় জানতে যদি—মফস্বল শহরের ইস্কুল-মাস্টারটির কথা। মোনাজাইট বালু নয়—টাস্কের খাতায় ট্রানশ্লেসনের ভুল খুঁজে বেড়িয়েছি আমি এতাবৎ।

রাত্রি অনেক—তা কি হবে! তুমি উল্লাসিনী গান শোনালে খাওয়ার পরে। তোমার ঘরখানায় ছবি নেই, আসবাবপত্র নেই, পলস্তারা খসে দেয়ালের ইটগুলো হাঁ করে আছে—ঘর বোঝাই শুধু বই-কাগজ আর বাজনার যন্ত্রপাতি। কাজের মাঝখানে গান গেয়ে ওঠ হঠাৎ। গানের অনন্ত নীলাম্বর—মনের খুশিতে আলোক ধারায় সেখানে স্নান করে বেড়াও। অন্ধকার বাড়ির কক্ষ থেকে সুরের প্লাবন বয়ে যায় অলক্ষ্য গিরিদরী থেকে থেকে প্রবহমান স্রোতস্বতীর মতো, বনান্তরালের অদৃশ্য নীড় থেকে পাখির কাকলীর মতো। সংসারের বেদনা ও দারিদ্র্য নিস্তব্ধ করতে পারেনি তোমায়। চতুর্দিকের এরা সব সামান্য ও সাধারণ—এদের অনেক উপরের মানুষ তুমি উৎপলা। তুমি উৎপলা এবং পথে পথে ঘুরে-বেড়ানো আমি ত্রিদিবনাথ—অসামান্য দু-জনেই।

মেসের দরজায় এসে পৌঁছল ত্রিদিব। মাঠের হাওয়া খেতে খেতে দিব্যি পায়ে পায়ে চলে এসেছে। এত রাত্রে ট্রাম-বাস নেই, কি করবে? থাকলেও অবশ্য কি করত বলা যায় না। মস্তিষ্কে বিদ্যাবুদ্ধির অফুরন্ত ভাণ্ডার সন্দেহ নেই, কিন্তু পকেট-ভাণ্ডারে সাকুল্যে আনা আষ্টেক। আসা এবং ফিরে যাওয়া, দুইবার ট্রামের বিলাসিতা এই অবস্থায় সম্ভব নয়।

ত্রিদিবের আলাদা সিট—মেসের পুরাদস্তুর মেম্বার সে এখন। জং-বাহাদুরের সঙ্গে এক ঘরেও নয়।

ঝুম···ঝুমারাণী—দরজার ফ্রেমে-আঁটা সেই ছবি সারারাত ত্রিদিবকে স্বপ্ন

দেখিয়েছে। আর মুকুল—মুখের ভিতর দুটো আঙুল পুরে বড বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে মায়ের গা ঘেঁসে। একবার বা এগিয়ে আসে একটু। ধরতে যাও—কোলে ওঠায় তার বিষম আপত্তি, পিছলে যাবে, মা'কে বেড দিয়ে ঘুরে-বেড়াবে। দাও না ধরে ঝুমা। আমি পারব কি করে ওর সঙ্গে? পা যেন পাখির দুটো পাখনা—হেঁটে নয়. উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সোনার পাখি নাগালে পাচ্ছিনে—ধরে দাও, একটু আদর করি···

সকালবেলা জংবাহাদুর এসে ধরলেন। মেসের মবলগ বাকি, ম্যানেজারকে ভাঁওতা দিয়ে দিয়ে ঠেকাচ্ছি। বাইরে মেরে ঘর সামলাচ্ছ—সে-ও তো নয়। তোমার দেশের বাড়িতেও ছুঁচোর কেরাত্তির—

ত্রিদিব চমকে তাকায়। গাঁয়ের খবর ইনি জানবেন কেমন করে?

জং-বাহাদুর বলেন, বউমার চিঠি এসেছে। টাকা পাঠাও না—করবেন কি না লিখে? পুরানো ঠিকানা বলে চিঠি এইখানে ছেড়েছেন। আমাদের লিখেছেন, এই দেখ 'কোথায় আছেন জানা থাকিলে সেইখানে পত্র পাঠাইয়া দিবেন।'

পোস্টকার্ডের চিঠি। ঝুমার মতো মেয়ে অভাব জানিয়ে লিখল—আহা, কী দশায় পড়েছে তা হলে!

তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে ত্রিদিব ভ্রূকুটি করে বলল টাকার কথা কোথা?

আছে—আছে বই কি ভায়া! পড়ে দেখ ভাল করে। এই যে···'যাওয়ার পর কোন খবর দাও নাই—'মেয়েমানুষের অভিধানে খবর মানে হল টাকা। খবর কথাটার জায়গায় টাকা বসিয়ে নাও. তা হলেই মিলে যাবে। আরে, টাকার টান না থাকলে এমন আন্দাজি চিঠি লিখতে যাবেন কেন ভদ্রলোকের মেয়ে?

॥ পাঁচ ॥

মেসের তাগিদ কড়া হয়ে উঠল। সকালে সন্ধ্যায়—এমন কি রাত দুপুরেও জংবাহাদুর ফিঙে লেগে আছে। আগে বলত হেসে হেসে, এখন মুখ কালো করে। কথার সুরও পালটে গেছে।

অতএব নিরুদ্দেশ ত্রিদিব। যেন কর্পূর হয়ে বাতাসে উবে গেল। মেসের এতগুলো মেম্বার—কেউ কোথাও তার ছায়া দেখতে পায় না। ফোলিও ব্যাগটা হাতে করে শুধু গেছে। বিছানাপত্র যথারীতি সিটের খাটিয়ায়, বৃহৎ স্যুটকেশ শিয়রে।

হয়তো গেছে কোন বন্ধুর নিমন্ত্রণে। কিম্বা টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছে। দিন দুয়েক এমনি আশায় কাটল। না, ফিরবার লক্ষণ নেই। পাকাপাকি ডেরাডাণ্ডা তুলল নাকি মেস থেকে? তা-ই বা কি করে হয়—জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে এখানে। গাড়ি চাপা পড়ল রাস্তায়? পড়ে পড়ুকগে, কিন্তু

দেনা মিটিয়ে গেলে ভদ্রতা হত। মবলগ টাকা বাকি। আর বি'দ হয়েছে জংবাহাদুরের—মুখ ছোট হ'য়ে যাচ্ছে সকলের কাছে।

কোথায় ফৌত হলেন আপনার এক-ডাকে-চেনা মানুষটা—

কাজে-কর্মে আটকে পড়েছে কোথায়। সর্বস্ব ফেলে গেছে—আসবে বই কি, নিশ্চয় আসবে। টাকা মারা যাবে না।

সকলকে প্রবোধ দিচ্ছেন, নিজের মনে ভরসা পান কই? একদিন সকলের অলক্ষ্যে ত্রিদিবের গুটানো বিছানা ছড়িয়ে ফেললেন। কি কাণ্ড—শ্মশান থেকে মড়ার সম্পত্তি কুড়িয়ে এনেছে না কি? তেল-চিটচিটে শতচ্ছিন্ন তোষক—ছুঁতেও ঘৃণা হয়। অথচ, দেখ, নিচে উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি, উপরে মনোরম বেড-কভারে মোড়া। ঠিক ঐ ত্রিদিবেরই মতো—বেশভূষা ও কথাবার্তায় মালুম হবে নবাব খাঁজে-খাঁর নাতি। এক নাগাড় এতগুলো চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে—এতখানি শোচনীয় দশা তা কে ভাবতে পেরেছে?

তারপর সুযোগ মতো একদিন তালা ভেঙে স্যুটকেশও খুলে ফেললেন। অবস্থা তথৈবচ। জীর্ণ কোট একটা, গোটা তিনেক ছেঁড়া সার্ট আর বিস্তর খাতাপত্র। মেসে আসার প্রথম মুখটায় রকমারি স্যুট পরত ত্রিদিব, হাতে ঘড়ি বাঁধত, কলমের ক্লিপ ঝিকমিক করত পকেটের মাথায়—ইদানীং সে সব কিছুই দেখা যেত না। স্যুটকেশে কিছুই তো নেই—গেল কোথায়? বেচে খেয়েছে তবে?

কাগজগুলো জংবাহাদুর নেড়েচেড়ে দেখলেন—বর্তমান আস্তানার যদি হদিস মেলে। হিজিবিজি অঙ্ক আর পাতার পর পাতা অর্থহীন ইংরেজি লেখা। এই পাগলামিতেই মেতে ছিল, কাজকর্মের সময় কোথা? স্রেফ ভাঁওতা দিয়েছে। মুশড়ে গেলেন জংবাহাদুর। স্যুটকেশ আর বিছানা বেচে কত হবে—টাকা পনের বড় জোর। পাওনা যোগ করে দেখেছেন—বিরাশি টাকা কয়েক আনা। সর্বনাশ, এত বড় দেনা চেপে পড়ে যে এখন তাঁর ঘাড়ে। তিনি মেসে এনে ঢুকিয়েছেন—যত্রতত্র জাঁক করে বেড়িয়েছেন—কিছু জানি না বললে এখন কে মানবে? দশের চোখে কেবল বেকুব বনে যাওয়া।

ম্যানেজারকে বললেন, জরুরি খবর পেয়ে ত্রিদিব দেশে চলে গেছে। ঘাবড়াবার হেতু নেই—তাকে না পাওয়া যায়, ভুজঙ্গ শর্মা রয়েছেন। তিনিই দেবেন টাকা।

কলিকাল—মানুষ যা বলে, তার বেশি কিছু ধরে নিতে হয়। জংবাহাদুরের কথায় বোঝা যাচ্ছে, ত্রিদিব যাবতীয় হিসাব তাঁর কাছে মিটিয়ে গেছে। টাকা মেরে উনিই এতদিন ধানাইপানাই করছিলেন—আড়ালে ভুজঙ্গের সম্বন্ধে সবাই এইরকম বলাবলি করে। মান বাঁচাতে গিয়ে এ যে আবার উল্টো ফ্যাসাদ। অতগুলো টাকার দায় চেপেছে ঘাড়ে, উপরন্তু বদনামের ভাগী হলেন। মাসে কিছু কিছু করে দেবেন, সে প্রস্তাবে ম্যানেজার রাজি হয় না। অর্থাৎ ত্রিদি-

বের হয়ে টাকা দিয়ে দিচ্ছেন না উনি—ত্রিদিবের টাকা উগরে দেওয়ার গড়িমসি।

অনেক ভেবেচিন্তে জংবাহাদুর চিঠি লিখলেন মাধবীলতা দেবীকে। মাধবীলতা অর্থাৎ ঝুমা আমাদের। চোখে দেখেননি ঝুমাকে, তাই লতা বলে লিখতে কলম আটকাল না।

কল্যাণীয়া বধূমাতা, তুমি আমায় চিনিবে না। ত্রিদিবনাথ ভায়ার সহিত আমার সবিশেষ দহরম মহরম। তোমার চিঠি পাইবার পর ব্যস্ত হইয়া বোধ হয় সে দেশে চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন তাহার সংবাদ না পাইয়া নিরতিশয়—

জবাব এসে গেল ঝুমার কাছ থেকে। ত্রিদিব এই কলকাতা শহরেই আছে, ঠিকানা দিয়েছে। সর্বনেশে মানুষ বটে! আছে বহাল-তবিয়তে, অত দূরে পরিবারের সঙ্গেও চিঠি চালাচালি হচ্ছে—ভুলে মেরেছে কেবল এই মেসের পথটুকু। পেলে হয় একবার—আর তা পাবেনই তো। ঠিকানা যখন মিলেছে. নিশ্চয় পাবেন। এমনি ভাল মানুষ, কিন্তু রাগ হলে জংবাহাদুরের জ্ঞান থাকে না। আচ্ছা করে শোনাবেন, দরকার হলে পুলিশ নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে ভুজঙ্গ ঝুমার চিঠি পেলেন। তারপর তিলার্ধ আর দেরি নয়। অফিসের কাপড় ছাড়বার সবুর সয় না, প্রায় ঐ ধুলো-পায়েই উঠলেন ট্রামে। অনেক দূর—কলকাতা শহরের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হয়। শহরতলীর পতিত জায়গা ছিল আগে—এখন নতুন শহর গড়ে উঠছে। ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে হয় অনেকখানি। তা ঠিক জায়গাই বেছেছে—এখানে কোন খোলার বস্তিতে মাথা গুঁজে থাকলে যমরাজও খুঁজে বের করতে পারবে না। সারা পথ জংবাহাদুর কথায় সান দিয়ে এসেছেন—কি বলবেন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। চেঁচামেচি হবে—তা কিছু হতে পারে বই কি। কিন্তু রেহাই দেবেন না আজ কিছুতেই। ওদের দফা সেরে এসে জুয়াচোরটা আবার কোন্ ভাল মানুষকে ফাঁসাবার তালে আছে, ঠিক কি।

এ পাড়ায় শহর জমবে যখন এই সব রাস্তা তৈরি শেষ হবে, দু'ধারে বাড়ি উঠবে, ঝকঝকে থামের উপর বসানো বিদ্যুতের বাতিগুলো জ্বলবে রাত্রিবেলা। অনেক দেরি তার এখনো। মাটি খুঁড়ে পাহাড় জমিয়েছে, ইট-পাথর খোয়া গাদা করেছে এখানে-ওখানে—পা ফেলে এর মধ্য দিয়ে এগুনো দায়। তার উপর বাড়ি এখানে একটা আর ওখানে একটা—সাবেক বাস্তুগুলো আছে, আবার নতুন বাড়িও উঠছে। নম্বর এখনো ঠিক হয়নি। কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবে—কিন্তু মানুষ কোথা? নির্জন শহরতলী অন্ধকারে থমথম করছে।

শেষটা মিলল এক পান-বিড়ি সিগারেটের দোকান। মাধবীলতার চিঠি বের করে কেরোসিন-কুপির আলোয় জংবাহাদুর ঠিকানাটা আর একবার

দেখে নিলেন। দোকানের সামনে বেঞ্চির উপর বসে জন-তিনচার আড্ডা দিচ্ছে আর বিড়ি ফু কছে। ঠিকানা শুনে একজন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

কি মুশকিল, অনেক দূরে ফেলে এসেছেন সে বাড়ি।

দোকানদার সদয় হয়ে বলে, ওঠ তুই গোপলা, সঙ্গে করে নিয়ে যা। বুড়ো মানুষ বিস্তর কষ্ট করেছেন।

গোপাল উঠে,দাঁড়িয়ে বলে, চলুন।

যেতে যেতে জংবাহাদুর প্রশ্ন করেন, মেস-বাড়ি ওটা?

এই গোপাল নিজে এক সময় মেসের চাকর ছিল। সে আশ্চর্য হয়ে বলে, মেস কেন হবে? সাহেব মেসে থাকবেন—কী যে বলেন!

এখনো তবে সেই প্রাথমিক পর্ব চলছে, ত্রিদিব যে সময়টা ঘোরতর সাহেব, টাকা খোলামকুচির মতো ছড়ায়। জংবাহাদুরের মেসে গিয়ে গোড়ায় তার এই পদ্ধতিই ছিল। টের পাওনি তো বাছা, সাহেবের জৌলুষের তলে শুধুই খড় আর মাটি। জৌলুষ ধুয়ে গিয়ে বেরোক আসল মূর্তি, তখন বুঝবে।

নতুন পাকা বাড়ি—একতলা—বাড়ির কাজ শেষ হয়নি, ভারা বাঁধা আছে বাইরে। চুনকাম করা দেওয়াল ঝিকমিক করছে। বারাণ্ডায় পা দিয়ে জংবাহাদুর আরও তাজ্জব। এমন বাড়িতে এসে রয়েছে শুধু মাত্র কথার ঝকমকি খেলিয়ে? তা হতে পারে না। একটা-কিছু জুটিয়েছে ঠিক। মন ঘুরে যায় মুহূর্তে। এলেমদার ছোকরা—তাতে তো সন্দেহ নেই। টাকা-কড়ি হয়েছে, তা নইলে এতদূর ঠাটঠমক হয় না।

কে কে থাকে এ বাড়ি? শাড়ি-পরা ঐ যে একজন—

গোপাল বলে, মেম সাহেব। সাহেব—আর মেমসাহেব—আর কেউ নেই। আর এই আমরা ক'জন।

ধাঁধা লেগে যায়। মেম সাহেবটি কে হলেন আবার? চিঠিতে মাধবী-লতা ভুল ঠিকানা দেয়নি তো? না, নিজেই সে বাসায় এসে উঠেছে ইতি-মধ্যে? কিন্তু আজকে চিঠি পাওয়া গেল, চিঠির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় এসে পড়ে কি করে?

বাবুর নাম ত্রিদিব ঘোষ তো বটে—হ্যাঁরে গোপাল?

জবাবের প্রয়োজন হল না, সুসজ্জিত বৈঠকখানা থেকে ত্রিদিব হাঁক দেয়, কদ্দুর গিয়েছিলি রে? এতক্ষণ লাগে এক টিন সিগারেট আনতে?

জংবাহাদুরকে দেখে বলে উঠল, এসে গেছেন আপনি? বড্ড ভাল হল। ক'দিন থেকে যাব-যাব করছি, সময় করে উঠতে পারিনে। ল্যাবরেটরির কাজে একদম ফুরসৎ নেই। আবার বাইরে যাবারও একটা তালে আছি, তার তোড়জোড় করতে হচ্ছে। সে যাক গে। মেসের কিছু দেনা রয়ে গেছে—কত হবে বলুন তো? শ'খানেকের বেশি বোধহয় নয়—

তড়বড় করে বলে যাচ্ছে—যেমন ত্রিদিবের স্বভাব। কিন্তু কথাবার্তায়

শোধ নয় আজকে—ড্রয়ার থেকে মনিব্যাগ বের করল। এবং আরও আশ্চর্য, ব্যাগের ভিতর এক গাদা নোট। একশ' টাকার একখানা নোট অবহেলায় জংবাহাদুরের হাতে দিয়ে বলে, কুলিয়ে যাবে তো, না বেশি?

জংবাহাদুর ঘাড় নাড়লেন। হেন তাজ্জব দেখে মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। কিছু কায়দা-কানুন শিখে ফেলল নাকি, যাতে রমারম নোট বানানো যায়? বলি, জাল নোট নয়তো এখানা? এই কয়েকটা মাসের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে, বাদশা বনে গেছে পুরোপুরি।

অনেক রাতে জংবাহাদুর ফিরলেন। না খাইয়ে ছাড়ল না ত্রিদিব। আর রাত্রিবেলা উপস্থিত মতে যে খাওয়ান খাওয়ালো তাতে ঐ ট্রাম রাস্তা অবধি অতটুকুও হাঁটা দায়। ট্রামে যেতে ত্রিদিব বারণ করে দিয়েছে; ওদের এই নির্মীয়মাণ রাস্তায় গাড়ি আসতে পারে না—বলে দিয়েছে, বড় রাস্তায় উঠে ট্যাক্সি নিতে। ট্যাক্সি ভাড়া আন্দাজ মতো আলাদা দিয়েছে মেসের দেনা ঐ একশ' টাকা বাদে। জংবাহাদুর ট্যাক্সি নেননি, ট্রামের কয়েকটি পয়সা বাদে বাকিটা মুনাফায় দাঁড়াবে। মুনাফা আরও আছে—মেসের দেনা একশ'র পনের-বিশ টাকা কম। মনে তাঁর অশেষ স্ফূর্তি; সকালবেলা ম্যানেজারের নাকের ডগায় সগৌরবে মেলে ধরলেন ত্রিদিবের নোটখানা। কি হে, বলিনি আমি, ত্রিদিব ঘোষ হল কোহিনুর-মণি? কয়েকটা দিন কেবল কাদা-চাপা পড়ে ছিল।

যাকে পাচ্ছেন তার সঙ্গে সবিস্তারে গল্প করছেন ত্রিদিবের ঘরবাড়ি ও সাজসরঞ্জাম ও ঐশ্বর্যের কথা। দেশের সীমানার মধ্যে অত বড় প্রতিভা সামলে রাখা যাচ্ছে না—সমুদ্রপারের তা-বড় তা-বড় বিশজন ডাকাডাকি লাগিয়েছে—এ ঠিকানাতেও ক'দিন থাকে, তাই দেখ। কিন্তু এত বড় আনন্দের বার্তা শুধু বাইরের লোককে বলে শান্তি পাওয়া যায় না—সহধর্মিণীকে জানানো আবশ্যক। ঘরে তিনি মাধবীলতার নামে এক চিঠি ফাঁদলেন—কল্যাণীয়াসু, বউমা—

।। ছয় ।।

ইতিমধ্যে ত্রিদিব পুরী গিয়েছিল ক'দিনের জন্য। উত্তাল সীমাহীন সমুদ্র—কিন্তু এক ঢোক তেষ্টার জল পাবে না। শান্ত হয়ে অবগাহন স্নান চলবে না—সতর্ক চোখে কখনো লাফাতে লাফাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, কখনো পালাতে হয় পিছনমুখো। উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ—ঢেউয়ের পিঠে চড়ে তীব্রবেগে অনেক দূর ছুটে যাওয়া, আবার ফিরে চলে আসা। যেন সৈন্য হয়ে লড়াই করছে সে—ঘরবাসী মানুষ নয়। প্রিয়জন নেই—আছে বিরুদ্ধ প্রতিযোগী, নিতান্ত পক্ষে উদাসীন জনতা।

উঁহু রয়েছে একজন—তাঁর নাম সুধাময়ী। ছায়ার উপমা মনে আসছে

পারে। ছায়া কিন্তু ঠিক-দুপুরে কিম্বা রাত্রিবেলা থাকে না—সুধাময়ী দিনরাত্রি সর্বক্ষণের। তবু ত্রিদিবের মন ফাঁকা, ঝুমাকে বড্ড মনে পড়ে। দিনমানে পল্লীতে বিস্তর মিস্ত্রিমজুর খাটে, বিষম হৈ-চৈ—সন্ধ্যার পর একেবারে নির্জন। দু-পাঁচটা বাড়ি খাড়া হয়েছে—নতুন প্ল্যানের ঝকঝকে বাড়ি ছবির মতো। মালিকের এসে বসত করবার মতো হয়নি এখানে—বাতিল কাঠকুটো জ্বালিয়ে হয়তো বা একটা ঘরে রুটি বানাচ্ছে পশ্চিমা পাহারাদার। জনহীন নিঃশব্দ প্রান্তরের মধ্যে তাবার আলোয় এ অঞ্চলটা রূপকথার রাক্ষসে-খাওয়া পুরীর মতো মনে হয়।

আজকে ভারি দুর্যোগ। কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! বিকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে—পৃথিবী ভাসিয়ে একাকার করে দিয়ে যাবে, থামবার কোন লক্ষণ নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অন্ধকারের ঝিকমিকে দাঁতের মতো।

বৈঠকখানায় ত্রিদিবনাথ পড়াশুনো করছে—দেয়ালের ধারে পেট্রোমাক্স জ্বলছে একপ্রান্তে। কিন্তু কি পড়ছে মনে তার স্পর্শ লাগে না। পাতা জুড়ে আছ বসে তুমি ঝুমা। ঘর আর ল্যাবরেটরি, বই আর গবেষণা, আরাম আর আলস্যের মধ্যে পাগল হয়ে আপন-জন খুঁজে বেড়াই। ঝুমা তুমি হেসে ওঠ খিলখিল করে। আমাদের এই বড় বড় ভাবনা কত যে অসার, বুঝিয়ে দাও তোমার এক হাসিতে…

দরজা ঠেলে ঝুমা ঢুকে পড়ল। কি আশ্চর্য, মনের ভাবনা মূর্তি হয়ে এল নাকি? ঝুমা এই রাত্রে গ্রামের ঘরে শুয়ে আছে—সে গ্রাম তো তিন শ' মাইল এখান থেকে। একা নয়—মায়ের কোলে চড়ে মুকুলবাবুও এসেছেন দেখি। বৃষ্টি-বাদলায় ভিজে গেছে। এলে তোমরা কোত্থেকে—বাসা চিনে আসতে পারলে?

যাকগে, জিজ্ঞাসাবাদ পরে হবে, পরে শোনা যাবে। ভিজে কাপড় বদলাও আগে ঝুমা। কিন্তু মুকুলবাবু পরবেন কি? ব্যাগ-পেঁটরা সঙ্গে দেখছি নে যে?

সে সব রেখে এসেছি তোমার পুরানো মেসে ভুজঙ্গবাবুর ঘরে।

তাই বল। জংবাহাদুর ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়েছেন। নইলে এ জায়গায় আসা চাট্টিখানি কথা নয়।

ত্রিদিব তাড়াতাড়ি সুধার শাড়ি একখানা এনে দিল। আর আলোয়ান একটা—মুকুলের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হোক, নইলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে।

ঝুমা শাড়ি পরল না, পা দিয়ে সরিয়ে দিল। ভ্রূকুটি করে তাকাল ত্রিদিবের দিকে।

এ শাড়ি কার?

একটা মেয়ের—

মেয়েরা শাড়ি পরে, তা জানি। কে মেয়েটা?

ত্রিদিব কঠিন হয়েছে। তুমিও ঝুমা আর দশটা নীচমনা মেয়ের মতো—দেহ-সঙ্গ যেন জগতের সমস্ত-কিছু, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা। এর উপরে কিছু আর থাকতে নেই!

মেয়েটির নাম হল সুধাময়ী। তার বেশী জেনে লাভ আছে?

ঝুমা বলে, লাভ কিছুই নেই, সেটা জানি। শুধু চোখের দেখা দেখতে এসেছিলাম।

দেখা তো হয়নি এখনো। সুধা, রান্না-বান্না রেখে এস একটু এদিকে। দেখে যাও কারা এসেছে, তোমায় দেখতে চায়।

সুধাময়ী কথাটা বুঝতে পারেনি। উঠানের ওদিক থেকে জিজ্ঞাসা করে, কি বলছ?

ঝুমার গলা কাঁপে। বলে, দরকার নেই—আসতে হবে না। ভুজঙ্গবাবুর চিঠির পরেও একেবারে ভরসা ছাড়িনি, খবর হয়তো বা মিথ্যে! পরের ভাল যারা দেখতে পারে না, তাদেরই চক্রান্ত। ডেকো না ওকে—যাচ্ছি আমরা, চলে যাচ্ছি। এসে হয়তো অপমান করে তাড়িয়ে দেবে ঘর থেকে।

সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ঝুমার মতো মেয়ে—তার ভাবনা হচ্ছে, পড়ে না যায় ত্রিদিবের সামনে এই মেঝের উপর। তাতে অপমান, বিষম অপমান। এসেই দরজার খিল এঁটে দিয়েছে জলের ঝাপটার জন্য। আরও কি ভেবেছিল, কে জানে। খিল খুলে ফেলল—ঝড়ের কি মাতামাতি বাইরে! দড়াম করে দেয়ালে আছড়ে পড়ল কপাট দুটো। উল্টোপাল্টা বাতাসে কপাট এদিক-ওদিক ঘা দিচ্ছে। ঝুমা নিস্পন্দ এক প্রতিমার মতো। কে যেন তবু নিদারুণ ব্যথায় দাপাদাপি করছে ত্রিদিবের চোখের সামনে, মাথা খুঁড়ছে ত্রিদিবের পায়ের তলে।

ঝড়ের মত্ততা, মেঘের হুঙ্কার, বৃষ্টির প্লাবন—তারই মধ্যে ঝুমা নেমে পড়ল। কোলে মুকুল। চক্ষের পলকে একেবারে অদৃশ্য। ত্রিদিব বাধা দেবে, দরজা আটকে দাঁড়াবে—কিন্তু কী যেন তাঁর হয়েছে, উঠতে পারল না চেয়ার ছেড়ে, দেহ যেন আটকে আছে কাঠের চেয়ারের সঙ্গে। মানা করবে ঝুমাকে—কিন্তু গলা কাঠ। অনেক কষ্টে অর্থহীন আর্তধ্বনি বেরুল, কোন কথা নয়।

বহুক্ষণ পরে বিস্তর চেষ্টায় দাঁড় করাল দেহটাকে। আহ্বানও বেরিয়েছে কণ্ঠে—ঝুমা, ঝুমা-আ-আ—

ছুটে বেরুল রাস্তায়। আকাশে ঝিলিক দিল—অনেক দূর অবধি নজরে আসে সেই আলোয়। ঝুমা নেই কোন দিকে। সোজা রাস্তা অনেক দূর অবধি গেছে—বাঁকচুর নেই। ঝড়ের বেগে ঝুমা বোধ হয় ছিটকে পড়েছে কোন বিপথে। আড়াই বছরের খুমন্ত মুকুল বুকে। জল খেয়ে বাঁচবে কি

বাচ্চা ছেলেটা ? পাষাণী মা—ঈশ্বর, এমন মায়ের কোলে কেন দাও অবোধ নিষ্পাপ শিশু ?

সুধাময়ী এল এতক্ষণে।

কে এসেছে ?

ত্রিদিব ফিরে এসে যথারীতি মুখের উপর বই ধরে বসল। বলে, দরজায় ঠকঠক করছিল—ভাবলাম কেউ এল বা।

সুধা বলে, রাতের মধ্যে বৃষ্টি থামবে বলে মনে হয় না। পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে। এমন অবস্থায় মানুষ বেরুতে পারে।

ত্রিদিব ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

আমিও তাই বলি। মানুষ কি করে হবে ? ভূত প্রেত—হয়তো বা একটা দুঃস্বপ্ন—

তুমি ভালবাস, এতক্ষণ বসে বসে পেস্তার বরফি করছিলাম।

ত্রিদিব বলে, কবোগে তাই। একটু ক্ষীর দিও, খেতে আরও ভাল হবে। কাল সকালে চায়ের অনুপান তোমার ঐ নতুন খাবার।

॥ সাত ॥

কী দুর্যোগ। সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হবে গেল। খরবেগে জল পড়ছে—আকাশের জল, পাতালের জল। সর্বগ্রাসী জলস্রোত দংষ্ট্রা মেলে অট্টহাসি হাসছে যেন। গাছের মাথায় ঘরের চালে, অট্টালিকার চূড়ায় মানুষ। অসহায় দৃষ্টি মেলে মানুষগুলো তাকাচ্ছে চতুর্দিকে—এই বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যায় শেষ আশ্রয় থেকে।

রাতের গাঙে ডিঙি বেয়ে যায়—ঠিক সেই রকম বোঠের আওয়াজ। দিগন্তে দেখা যায় কি যেন। আসছে এ দিকে—তর-তর করে চলে আসছে এক ভেলা। জীবনে যাদের কলঙ্কের রেখা মাত্র নেই, এমনি সব মানুষ খুঁজে খুঁজে ভেলায় তুলছে। বোঝাই ভেলা অদৃশ্য হল দৃষ্টি সীমানার পারে—উন্মত্ত আবেগে আছড়ে পড়ে সাত সমুদ্রের সকল জল। বিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবী বড় নোংরা হয়ে গেছে—মহাবন্যায় ধুয়ে মুছে সাফ সাফাই হচ্ছে।

খাপছাড়া এমনি সব স্বপ্ন দেখছে ত্রিদিব। ঘুম ভেঙে গেছে বারম্বার মেঘের ডাকে, আচমকা এসে-পড়া বৃষ্টির ঝাপটায়। আবার এসেছে ঘুম। অন্ধকার নিশীথে বেগবান রেলগাড়ির জানালার আলোর মতো কত অলীক স্বপ্ন পিছলে পিছলে গেছে। তারই মধ্যে…ঐ যে ঝুমা, ঐ আমার মুকুল। নাম ধরে আর্তনাদ করে উঠেছে। মনে হল বটে আকাশ-ভাঙা হাহাকার—কিন্তু গলা দিয়ে ক্ষীণতম শব্দ বেরোয় না। যন্ত্রণা আরো অসহ সেইজন্য। মা আর ছেলে অন্ধকারের আবর্তে নিঃশেষে তলিয়ে গেল—ছুটে গিয়ে ধরতে পারল না, মুখ ফুটে একবার ডাকতেও পারল না অসহায় ঘুমন্ত মানুষ…

শেষরাতে ঝড়বৃষ্টি থামল। উঠে বসল ত্রিদিব; ভেবেছে, সকাল হয়ে গেছে। জানালা খুলে দিল। ঝিকমিকে তারা ফুটেছে আকাশে। সকাল না হলে বেরুনো যাবে না, ভয় করে—জনহীন অঞ্চলটা অশরীরী প্রেতের আস্তানা বলে মনে হচ্ছে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সে রাতটুকু কাটিয়ে দিল।

ভোরের আলোয় তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিককার অবস্থা দেখে। পাড়াটা যেন হামানদিস্তায় ছেঁচে রেখে গেছে। গাছ উপড়ে পড়েছে, বস্তি-বাড়িগুলোর টিন গেছে উড়ে। খানাখন্দ ঘোলা জলে ভরতি—মহানন্দে ব্যাঙ উল্লু দিচ্ছে তার মধ্যে। জলস্রোত কলকল শব্দে ছুটেছে রাস্তার উপর দিয়ে। জলকাদা ভেঙে বিস্তর কষ্টে ত্রিদিব ট্রাম-রাস্তায় এসে উঠল।

ট্রাম চলছে না, তার ছিঁড়েছে কোথায়। মেরামত না হওয়া পর্যন্ত মূল-শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। ট্যাক্সিও মেলে না এত সকালে এদিকে। হাঁটো ত্রিদিবনাথ—কি এমন হঠাৎ-নবাব হয়ে গেলে এই কয়েকটা মাসে।

অবশেষে জংবাহাদুরের মেসে পৌঁছানো গেল। রোদ উঠে গেছে। জংবাহাদুর গভীর মনোযোগে বাজারের ফর্দ করছেন।

আপনার অতিথিজনেরা কোথায়?

গলা শুনে ভুজঙ্গ চমকে উঠলেন। এ যেন অচেনা কে একজন বলছে। বড় ছুটে এসেছে—হাঁপাচ্ছে তাই।

অবাক হলেন যে—বলুন, যাদের চিঠি লিখে আনিয়েছেন কোথায় তারা? মুকুল আর তার মা। ঝুমা—ঝুমা—আপনার বউমা, মাধবীলতা গো।

জংবাহাদুর বলেন, চলে গেছে। সন্ধ্যের সময় এসে জিনিস-পত্র রাখল আমার ঘরে। তোমার বাসা কোথায় জেনে নিল ভাল করে। আমি সঙ্গে যেতে চাচ্ছিলাম, তা বলল, দরকার হবে না। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—তখন আবার দরজা ঝাঁকাচ্ছে। কি বৃত্তান্ত? না, কাজকর্ম মিটে গেছে—চলে যাচ্ছি।

যেতে দিলেন কেন? কুকুর-বিড়াল বেরোয় না ঐ অবস্থায়—আর দেড় জন ওরা এসেছে অজ পাড়াগাঁ থেকে। কিছু জানে না, কিছু বোঝে না।

জংবাহাদুর চাপা উল্লাসে সংশোধন করে দেন, উঁহু, আড়াই। তোমার বাচ্চা হল আধ। আর রইলেন বউমা, আর তোমার বড় সম্বন্ধী।

কে?

বউমার দাদা। তিনিই তো সর্বেসর্বা দেখলাম। হুকুম-হাকাম ঝাড়ছেন, তাঁর কথা মতই সমস্ত হচ্ছে। তা আটকানো তোমারই উচিত ছিল ভায়া। কাজ না মিটিয়ে দিলেই আটক হয়ে থাকতেন, আবার কি।

ভুজঙ্গর কাছে কাজের অর্থ টাকাকড়ি। অসঙ্গত নয়—বিস্তর দেখে শুনেই সার বস্তু বুঝে নিয়েছেন। কথাটা আরও প্রাঞ্জল করে বলেন, ওই যত দেখছ ভায়া, টাকার মত আঠা কোন কিছুতে নেই। হাতে যতক্ষণ টাকা, সবাই

লেপটে আছে—তাড়ালেও যাবে না। টাকা ছেড়ে দিয়েছ কি, কোন শর্মার আর টিকি দেখবে না।

মেম্বাররা যে যেখানে ছিল, এসে জমেছে। ত্রিদিবের ঐশ্বর্যের কথা জং-বাহাদুর শতকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন এই ক'দিন। তাকে ঘিরে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে কেন ত্রিদিববাবু, বসুন। না হয় চলে আসুন আমার ঘরে। গদি-আঁটা চেয়ার আছে, বসে বেশ জুত পাবেন।

বিনু বলে, চা এনে দেব ত্রিদিব-দা? মোড়ে ত্রিভঙ্গমুরারীর দোকানে বেড়ে চা করছে আজকাল।

ত্রিদিব কাউকে যেন চোখে দেখছে না, কারো কথা কানে যাচ্ছে না তার।

তারা কোথায় চলে গেল, জানেন কিছু?

যেমন প্রত্যাশা করে গিয়েছিল, তাই ঘটেছে তবে? এই রকমটাই ভুজঙ্গ আন্দাজে ভেবেছিলেন। কণ্ঠস্বরে একটা উদাসীন ভাব এনে বললেন, মেয়ে-ছেলে যাবে আর কোথায়? গাঁটে টাকাপয়সা বেঁধে আবার গিয়ে কোটে উঠেছে। তোমায় কিছু বলে যায়নি ভায়া?

গ্রামের কোটরবাসী কবুতর কলকাতার বাড়ি-গাড়ি-আলোর অরণ্যে হারিয়ে গেল। কোন্‌খানে, সে খুঁজে খুঁজে বেড়াবে? তার চেয়ে জং-বাহাদুরের আশ্বাসই মেনে নেওয়া যাক—গেছে ফিরে আবার তাদের গ্রামে। যেমন আর দশটা মেয়ে অদৃষ্টের লিখন শান্ত ভাবে মেনে নিয়ে দিনগত ঘরকন্না করে। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের আদিকাল থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—কোন্ বাঘ নিরামিষ শী হয় বলো? সদাসতর্ক হবে তারাই, পশুকে যারা ঘরে নিয়ে বাঁধে, পশুকে পোষ মানাতে চায়।

ঝুমা আলাদা মেয়ে, সৃষ্টিছাড়া—কিন্তু যে দাদাটি সঙ্গে এসেছে, সে কিছু বুঝসমঝ করে দেবে না? দাদাটি কোন ব্যক্তি, সেটা আপাতত মালুম হচ্ছে না। ত্রিদিবের এই শহরবাসের আমলে দাদা রূপে কে সমুদিত হলেন ঝুমা হেন মেয়ে যার হুকুম নিয়ে চলে?

লেক-পাড়ায়, মনে হবে, এক জলের জাহাজ টেনে তুলে পিচঢালা রাস্তার ধারে বসিয়ে দিয়েছে। এ পথে চলতে গেলে এক নজর চাইতেই হবে জাহাজ-বাড়ির দিকে। ত্রিদিবের হাসি পায়—অসহ্য লাগে টাকাওয়ালা মানুষগুলোর রুচির এই স্থূলতা। আরে বাপু, জাহাজ এমন দুর্লভ বস্তু যে ইটে-গাঁথা নকল জাহাজে বসবাস করতে হবে? যাও না সমুদ্রে—দু-মাস বা দু-বছর জলের উপর জাহাজের দোলা খেয়ে এসো। সমুদ্র পাহাড় আকাশ—কোন্‌টা আজ মানুষের অজানা—কোথায় যেতে আজ সে ভয় করে?

বাইরে যেমনই হোক, তবু রক্ষা, ভিতরেও জাহাজের ডেক-ক্যাবিন বানায়নি। ঝকঝকে সুমসৃণ মেজে—এক কণিকা ধুলো-ময়লা নেই-সারা-

বাড়ির মধ্যে। মার্বেল-পাথরে মোড়া সিঁড়ি সোজা গিয়ে উঠেছে উপরের হলঘরে। সব লোকের জন্য হয়তো নয়—কিন্তু ত্রিদিব সোজা গিয়ে উঠে বসে সেখানে। শেখরনাথ আর সে কলেজে চিরকাল পাশাপাশি বসেছে। সেই খাতির ইতিমধ্যে ভাল রকম ঝালিয়ে নিয়েছে। আগের চেয়েও বেশি।

যতবারই ত্রিদিব এবাড়ি আসে, তাজ্জব হয়ে শেখরনাথের তারিফ করে। মুখে যেটুকু বলে, মনে মনে বলে তার শতগুণ। কলেজি আমলে নিতান্ত গোবেচারা শেখরনাথের থাকবার মধ্যে চেহারাটাই ছিল শুধু। তা সে চেহারার ষোলআনা মূল্য সে উশুল করেছে। রায় বাহাদুর কীর্তিশ্বর চাটুজ্যে মেয়ে দিলেন তার ঐ চেহারার গুণে। তার বুড়ো সুবিবেচকও বটে। বিয়ের পরে চটপট দেহত্যাগ করে মেয়েকে যাবতীয় ঘরবাড়ি ও টাকাকড়ির মালিক করে গেলেন। এবং মেয়ে মানে জামাইও। যা জামাই শেখরনাথ, আলাদা করে কিছু দিতে গেলে সে-ই আড় হয়ে পড়ত। মঞ্জুলার সঙ্গে দেহ আলাদা করে দিয়েছেন ঈশ্বর—তার উপরে হাত নেই—সেজন্য যেন মরমে মরে আছে সে।

বাবু কোথায় রে?

প্রশ্নের উত্তরটাও সুনির্দিষ্ট— কালেভদ্রে কদাচিৎ হেরফের হয়।

মায়ের কাছে—

মঞ্জুলার অয়েল পেন্টিং দেয়ালটার আধাআধি জুড়ে। বিশাল ছবি —দৈত্য-দানো ছাড়া মানুষ কখন অত বড় হতে পারে না। সামনা-সামনি না হলেও ত্রিদিব দেখছে মঞ্জুলাকে। ছোটখাট মানুষটি—বার মাস একটা না একটা রোগ আছেই। রোগ না থাকলেও বলতে হয় আছে রোগ—নইলে সে শান্তি পায় না? অথচ সেই রোগী মানুষটা যখন হাঁক পাড়ে, বাড়িসুদ্ধ লোকের থরহরি কম্প। এমন যে শেখরনাথ—তিনি অবধি। সুধাময়ী মঞ্জুলার কাছে নার্স হয়ে ছিল কিছুদিন—তার কাছে ত্রিদিব শুনেছে : সুধা বাজে কথা বলবে না। রূপকথায় আছে সূতোশঙ্খ সাপের কথা—সুতোর মতো দেহধারী এক জীবের গলা দিয়ে শাঁখের আওয়াজ বেরোয়। সুধাময়ী হেসে হেসে বলে, সেই জীব হল শেখরনাথের বউ মঞ্জুলা। বিয়ের পর যাকে শেখরনাথ মঞ্জুভাষিণী সম্বোধন করে হামেশাই চিঠি লিখত। এ সব কবিত্বে ঠাসা অনেক চিঠি দেখেছে ত্রিদিব।

এ বাড়িতে এসে কাউকে কিছু বলতে হয় না—ত্রিদিবকে দেখলেই দারোয়ান ছুটে যায় ভিতরে খবর দিতে। রকমারি খাবার চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে, না খেলে শুনছে কে? আমাদের উপর বাবু তা হলে বিষম খাপ্পা হয়ে যাবেন। সেবা করুন যাহোক কিছু—করতেই হবে।

আজকে হাজার অনুনয় বিনয়ে ত্রিদিব একঢোক চা-ও মুখে তুলতে পারল না। অভিমানী ঝুমা শিশুকে বুকে চেপে কোন পথপ্রান্তে হয়তো মরে পড়ে আছে—তাদের কি গতি হল না জেনে খাবার কেমন করে সে মুখে

দেয় ?

ঘণ্টাখানেক পরে শেখরনাথ এলো। অন্য দিনের তুলনায় এসেছে তাড়াতাড়িই। ঐ যে চোখাচখি নামে পাখি আছে—দিনরাত্রি জোড় বেঁধে থাকে, এরা হল তাই। এ ব্যাপারটাও সুধাময়ী রটিয়ে দিয়েছে। কথাবার্তা বিশেষ নেই, বিয়ের পর এই তিনটি বছর চুপচাপ মুখোমুখি বসিয়েই তারা কাটিয়ে দিল। শেখরনাথ শুনে লজ্জা পায় না—বলে, মঞ্জুলাকে সামনে করে তিনশ' বছরও এমনি ধারা কাটাতে পারি, কিন্তু বড় দুঃখ যে ততদিন বাঁচা চলবে না। মঞ্জুলাকে ছেড়ে এই বৈঠকখানায় যেটুকু সময় বসতে হয়, চেয়ারের সামনাসামনি তখনও দেখ মঞ্জুলা—ছবির ঐ সুবিশাল মঞ্জুলা। আর নিতান্ত যদি কাজের গতিকে বাড়ির বাইরে যেতে হয়, আর এক অতি-ক্ষুদ্রা মঞ্জুলা বুকের উপর দুলবে—ঘড়ির লকেটে আঁকা-মঞ্জুলা।

আর এ বাড়ির এক রেওয়াজ হয়ে গেছে—যত জরুরি ব্যাপারই হোক, কথাবার্তার গৌরচন্দ্রিকা হবে, কেমন আছেন আজকে? অর্থাৎ মঞ্জুলার স্বাস্থ্যের খবরাখবর নেওয়া।

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শেখরের চোখে জল আসবার মতো হয়, কণ্ঠস্বর গদ-গদ হয়ে ওঠে।

ঐ মেয়ে বলেই মঞ্জু হেসে ছাড়া কথা বলে না। আমি তো জানি আর ডাক্তারেও বলছে—অহরহ কি জলুনি বুকের ভিতরে।

সুধা কিন্তু মুখ বাঁকিয়ে বলে, ছাই। জলুনি বাট—সেটা অম্বলের নয়, মানুষজনের উপর হিংসা আর ঘৃণা—সমস্ত বিষ হয়ে রি-রি করে জ্বলে।

এ কিন্তু সুধার গায়ের ঝাল মেটানো। চিররুগ্ন মঞ্জুলাকে দেখে ভেবেছিল এখানকার নার্সের এই চাকরি তার পাকা—চিরজীবন ধরে চলবে। কিন্তু একদিন কি কথা-কথান্তরের পর মঞ্জুলা মেজাজ হারিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল। সেই থেকে সুধা তার নামে নানান কথা বলে বেড়ায়। কিন্তু কে কানে নিচ্ছে কীর্তিধরের মেয়ের নামে হেন অপবাদ? ইদানীং শেখর তো অর্ধেক-নেতা হয়ে উঠেছে—দিন রাত্তির আছে দশের কাজ নিয়ে। কিন্তু কিছুই তার নিজের নয়। মঞ্জুলার ইচ্ছা, মঞ্জুলার পরিকল্পনা, টাকা মঞ্জুলা দিয়েছে—মঞ্জুলাই সমস্ত। মঞ্জুলা নিজে বাইরে না এসে তাকে দিয়ে করায়। মঞ্জুলার দেহ ও মনের সঙ্গে মিশে শেখর একেবারে অভিন্ন হয়ে গেছে।

•

কেমন আছেন ইত্যাদি চুকিয়ে ত্রিদিব বলে, কাল রাতে এসে পড়ল হঠাৎ—

কারা ?

যাদের জন্য ভয়ে কাঁপি। দুনিয়ায় ভয়ের বস্তু তো আমার ঐ দু-জন। তা অহরহ শঙ্কায় থাকার চেয়ে চুকেবুকে যাওয়া মন্দ নয়। তাই কাল হয়ে

গেল।

ব্যাপারটার আঁচ করে নিয়ে শেখরনাথ দুঃখ বোধ করে। আস্তে আস্তে বলে, কি বললেন?

আমার বাসার মধ্যে ঢুকে বেশি কি বলতে পারে? মেয়েলোকে পুরুষকে মুখে মুখে বলেই বা কতটুকু? অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যে ছিটকে বেরিয়ে গেল—সেই তো বড় বলা, দুশ্চরিত্র স্বামীকে সব চেয়ে যে কঠিন শাস্তি দিতে পারে নির্মম স্ত্রী।

একটু থেমে আবার বলে, ঝুমার চোখে জল নয়, ছিল আগুন। কিন্তু কোলের ছেলেটা অবোধ কিনা—সেই সময়টা খিলখিল করে হেসে উঠল। কি মিষ্টি যে হাসল শেখর। হাসতে হাসতে মায়ের কোলে চড়ে ঝড়ের মধ্যে নেমে পড়ল—ছেলের হাতের অপমানটা মুলতুবি রয়ে গেল বোধ হয় বয়সে বড় হবার অপেক্ষায়। অবশ্য, বড় হবার দিন অবধি বেঁচে থাকে যদি। মাথার উপরের ঐ ঝড়-জল কাটিয়েও বেঁচে যাবে, এ তো মনে হয় না। অতএব আমি রক্ষে পেয়ে গেলাম।

শেখর বলে, কলকাতায় থাকা তোমার কিন্তু বুদ্ধির কাজ হয়নি। দূরে —অনেক দূরে কোনখানে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আমি বলেছিলামও তাই।

কিন্তু এখানে ডক্টর পাল, তাঁর ল্যাবরেটারির কাজ—লাভের খাতে আমার অনেক বেশি জমা ক্ষতি-লোকসানের চেয়ে।

কাজ করতে দেবে কি আর এখানে? এই ধর—কাজ করতে পারবে এখন পাঁচ-সাত দিন ল্যাবরেটারি গিয়ে? কুৎসা-অপবাদ আগুনের চেয়েও তাড়াতাড়ি ছড়ায়। বোঝ না কেন—কোন্ ধাপ-ধাড়া গাঁয়ে ওঁরা থাকেন সেখানে পর্যন্ত কথাগুলো পৌঁছে গেছে।

পারসোন্যাল সেক্রেটারি অতুল এসে বলল, ইস্কুলের একটা মিটিং ডাকা দরকার—প্রেসিডেন্ট বলছিলেন। এইখানেই হোক তবে? কবে আপনার সুবিধা হবে, একটা তারিখ দিয়ে দিন—

শেখর বলে, এই দেখ, তোমাদের কাছে এনগেজমেন্ট বই, তোমরাই মালিক—আমার কাছে আবার কি করতে এসেছ? মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করে দিয়ে দাও একটা তারিখ।

ত্রিদিবের দিকে চেয়ে আগেকার কথার জের ধরে বলল, মঞ্জু তোমার কথা বলছিল—এতবড় প্রতিভার মর্যাদা এখানে কে বোঝে? বাইরে চলে যাও তুমি। পাসপোর্ট তো হয়েই আছে—চিঠি তো যা লিখেছ জবাব আসেনি কিছু?

ত্রিদিব বলে এসেছে কয়েকটা। বাজে, উৎসাহ পাচ্ছিনে।

আমি বলি, বেরিয়ে পড় তুমি। ঘরে বসে যারা ঢেউ গোণে, ঘরেই পড়ে থাকে তারা চিরকাল। ঝাঁপিয়ে পড়লে কিনারা মিলে যায়। ট্রাভেল-এজেন্টদের সঙ্গে কথা বল, জাহাজের খবরাখবর নাও। মঞ্জুর বড় ইচ্ছে।

॥ আট ॥

ত্রিদিবনাথ নামল তাদেরই সেই গাঁয়ের স্টেশনে। জংবাহাদুর বলছিলেন, ঝুমারা দেশে গিয়েছে ফিরে। তাই ঠিক, নিশ্চয় তাই—তা ছাড়া যাবে আর কোথায়, কোন্ জায়গা চেনে সে? এই রাত্রে এখন তারা ঘুমুচ্ছে—ঝুমা আর তার ছেলে। যেমন সেবার হয়েছিল সেক্রেটারির ছেলের বিয়ের সময়? ত্রিদিব বরযাত্রী গিয়েছিল, সেক্রেটারির বাড়ির কাজ, না গিয়ে উপায় নেই! মফস্বলের বিয়ে—তিন দিন ধরে পড়ে পড়ে খাওয়া কনের বাড়িতে। সাজো-বিয়ের ভোজ, বাসি-বিয়েব ভোজ, বাসি ভোজ। তা ছাড়া আরও বিস্তর খুচরা খাওয়া—সেগুলো ভোজের হিসাবে পড়ে না। কী একটা পর্ব ছিল, সেই উপলক্ষ্যে ইস্কুলের ছুটি। আর না থাকলেই বা। সেক্রেটারির ছেলেব বিয়ে, মাস্টাররা বরযাত্রী—মফস্বল ইস্কুলে সেই তো সকলের চেয়ে বড় পরব। এত বড় ব্যাপারে তিনটে দিন ইস্কুলের ছুটি এমনিই হতে পারে। সে যাই হোক. ব্যাপার কিন্তু অন্য রকম দাঁড়িয়ে গেল। দেনা-পাওনার ব্যাপাবে ববকর্তা-কন্যাকর্তার লাঠালাঠি হতে হতে থমকে গেল—সে কেবল ববপক্ষ সংখ্যাল্প বিধায় তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে পড়লেন বলেই। বরকে ঘিরে বেখেছে। ছাদনা তলায় একক সে বেচারী—কোন রকম হেরফের হলে গুরুতর পরিণাম ঘটবে, চতুর্দিক চেয়ে চেয়ে তাই সে নির্ভুল মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। সময়টা আবার বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে ভিজে আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গে জলকাদা মেখে ত্রিদিবনাথ এসে পৌছে তো বাড়ির দরজায় ঘা দিল। ঘুমুচ্ছিল ঝুমা, ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তারপর সেই রাত্রে সে রান্না চাপাবেই। ত্রিদিব মিথ্যে করে বলে, খেয়ে এসেছি গো—। মিছামিছি ঢেকুর তোলে; কপ করে ঝুমাবই একটা সাজা-পান মুখে ফেলে দেয়। কিছুতে ঠাণ্ডা করা গেল না ও মেয়েটাকে…

স্টেশন থেকে বাড়ি বেশ খানিকটা দূর। এগারোটার গাড়ি—ঠিক এগারোটা-সাতে এসে পৌছবার কথা। আজকে ঘণ্টাখানেকের মতো দেরি করে এসেছে। ভাল, এই ভাল। নিশুতি, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। ত্রিদিব একটু বা যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে কোন গাছগাছালি ঠেসান দিয়ে, বসে পড়ছে হয়তো বা ভুঁয়ের আ'লের উপর। কি গরজ তাড়াতাড়ি পৌছবার? গোলযোগের মুহূর্তগুলো বরঞ্চ যতখানি পিছিয়ে নেওয়া যায়। কি বলবে ঝুমাকে, প্রবোধ দেবার আছেই বা কি? যা-সমস্ত দেখে এলে ঝুমা, মিথ্যে বলি তা কি করে? চলে যাচ্ছি অপরিচয়ের পৃথিবীতে অনেক—অনেক দিনের জন্যে। তোমার পুণ্য গৃহস্থালীর মধ্যে বসবাস করব বলে আসিনি। যাবার আগে একটুখানি চোখের দেখা—তোমাকে তো বটেই, আর আমাদের মুকুলকে। আমার উচ্ছৃঙ্খলতা ভুলে যেও না কিন্তু, বড় করে আরো ভারী করে মনে গেঁথে রেখো। বিদেশে ছুটোছুটির মধ্যে ঝগড়ার চোখাচোখা কথাগুলো মনে উঠবে: একজনেরা ভাবে এখনো আমাকে—ভাবছে ভালোবাসায় নয়, মনের ঘৃণায়।

কিন্তু যা ভাবছে, তেমনটা যদি না ঘটে। ঝগড়া না করে যদি আজকে কেঁদে ফেলে ঝুমা, অশ্রুর বন্যা নামে দাম্ভিক বধূর কপোল বেয়ে। যা হবার হোক, যেতে দেব না আর তোমায়। দরজার ফ্রেমের মধ্যে অপরূপ এক ছবি হয়ে পথ আটকে দাঁড়ায় যদি ঝুমা, আর মুকুলকে চোখ টিপে দেয় —দু-খানা বাহু মেলে তাড়া করে আসে মুকুল।

কী অপূর্ব জ্যোৎস্না ফুটেছে। জুঁইফুলের স্তূপ যেন আকাশ ভুবন ব্যেপে। হাটখোলার রাস্তায় হয়তো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তারা বলবে ও মশাই, ফিরে এলেন যে বড়। কী লাটবেলাট হয়ে এলেন? রাত্রিবেলা হলেও ঠাহর করা যাবে, ব্যঙ্গের হাসি প্রচ্ছন্ন ঠোঁটের কোণে। মুরুব্বিয়ানার সুরে বলবে হয়তো, ঢের তো দেখে-শুনে এলেন। আর কেন। এসে পড়লেন তো নড়বেন না। হেন মজা পাবেন না আর কোনখানে।

না হে, পরাজিত হয়ে সে আসেনি—ত্রিদিবনাথ পরাজয় মানবে না জীবনে। এই বদ্ধ গাঁয়ে ঝুমা আর মুকুল আবার ফিরে এলে পারে তো তাদেরই উদ্ধার করে নিয়ে যাবে নগরে। বড় রাস্তা ছেড়ে ত্রিদিব সঙ্কীর্ণ গলিপথে ঢুকল — ঢুকে পড়ল কারো ভয়ে নয়—বিষম বিরক্তিকর এখানকার বাজে বাসিন্দাগুলো। কি বোঝে ওরা, কার যোগ্যতা আছে ত্রিদিবের সমকক্ষ হয়ে তার সঙ্গে কথা বলবার।

পাড়ার ভিতরে এসে পড়েছে, এরা ঘোষেদের কানাচ ও বাগিচার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ঘরবাড়ি সব নিশুতি। তবু ত্রিদিব পা টিপে টিপে সন্তর্পণে এগুচ্ছে। পদশব্দ কারো কানে না যায়, কেউ কিছু প্রশ্ন না করে। পুরানো জায়গায় কতদিন পরে যেন সে চোর হয়ে ঢুকল।

উঠানের মাঝে বাদাম গাছ। পাতা ঝরে ঝরে তলায় রাশীকৃত হয়ে থাকে, পায়ের পাতা ডুবে যায়। পাতা উড়ে উড়ে [illegible] উঠানে। ঝুমার এই এক বড় কাজ, ঝাঁটপাট দিয়ে দিনের মধ্যে [illegible] দশ বার উঠান সাফ করা। যেন পাল্লাপাল্লি চলে প্রতিদিন। গাছ কত পাতা ঝরাবে ঝুমার উঠানে, আর ঝুমাদের গাছকোমর বেঁধে কত সাফ করবে উঠানের পাতা। কিন্তু আজকে এত পাতা উঠানে—ত্রিদিবের পায়ে পায়ে পাতা ছিটকে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না কাউকে, দাওয়ায় উঠে দরজায় দেওয়া অনাবশ্যক। ঝুমারা ফিরে আসেনি। সেই কালরাত্রে কোথায় যে চলে গেল—আর কি আসবে না কোন দিন এ বাড়ি?

ক্ষিধে পেয়ে গেছে ত্রিদিবের। এ-বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে ডাকলে সোনা হেন মুখ করে খেতে দেবে। কিন্তু কি জন্যে যাবে সে নিজের ঘর উঠান ছেড়ে? অভিমান আসে নিষ্ঠুর সেই দূরবর্তিনীর উপর। সেই কখন বেরিয়েছি বলো তো। কত ঝঞ্চাট পোহায়ে গাড়ি বদলা বদলি করে এসেছি —ক্ষিধে পাওয়াটা অন্যায় হল নাকি? যাকগে—আমার ক্ষিধে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না তো কারো।

হাতের কাছে ছেঁড়া-মাদুর পেয়ে সেইটে বিছিয়ে ত্রিদিব গড়িয়ে পড়ল। দরজায় তালা দেওয়া—মাদুরটা না পেলে গড়িয়ে পড়ত মাটির উপরেই। এই মাটিতে—যেখানে থপথপ পা ফেলে মুকুল ঘুরে বেড়াত, ঝুমা শতেক কাজে এই জায়গা দিয়ে নিচের ঐ পৈঠা দিয়ে উঠা-নামা করত। আঙুলে কর গণে হিসাব করছে ত্রিদিব। মঙ্গলে মঙ্গলে আট—আর এক মঙ্গলে পনেরো; বুধ বিষ্যুৎ শুক্কুর মোট আঠারো হল। আঠারো দিনের মধ্যে এমন সোনার বাড়ি পুরোপুরি শ্মশানভূমি।

ঘুম হচ্ছে না। দিনমান বলে মনে হয়, এত জ্যোৎস্না! ত্রিদিব দিনে ঘুমোয় না। চাঁদের জ্যোৎস্না নয়—মাটি থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে জ্যোৎস্না যেন, গাছের পাতা থেকে পিছলে এসে পড়ছে। ঘুম আর জাগরণের মধ্যে দোল খাচ্ছে সমস্ত রাত। এক একবার মনে হয়, মরে গিয়েছে সে বুঝি। প্রাণ দেহ ফেলে মহাব্যোমে উধাও হয়, সেই চরম বিদায়ক্ষণে সে নাকি বাসভূমি বারকয়েক ঘুরে ঘুরে দেখে যায়। যতদূরে যে জায়গায় মরুক, আসতেই হবে একবার তাকে। নিশ্বাস ফেলতে পারে না, সে ক্ষমতা নেই যখন—জীবন্তকালে প্রিয় বস্তুগুলোর উপর শুধু একবার দৃষ্টির করুণস্পর্শ বুলিয়ে যাওয়া। ত্রিদিবেরও তাই হয়েছে, দেখাশুনা তো হয়ে গেল—চিরকালের মতো কালকেই সে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

ফিরতি ট্রেন অনেক বেলায়। রাতারাতি পালিয়ে যাওয়া অতএব ঘটে উঠল না। ঐ যে দাওয়ায় উঠে পড়েছিল, সেই জায়গা থেকে নামেনি আর মোটে। মুখ গুঁজড়ে বসে রইল এক জায়গায়। ঘণ্টা তিনেক এমনি কাটিয়ে দিয়ে যথাসময়ে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে।

তাই কি হবার জো আছে? মুখ-আঁধারি থাকতেই মানুষ। খালপারের হরেন ভদ্র অভিভাবক স্থানীয়। বরাবর দৃষ্টিমুখ দিয়ে এসেছেন। বাতাসে যেন খবর হয়ে গেছে: ঐ সাত সকালে বোধ করি সাঁতরে খাল পার হয়েই উঠানে এসে তিনি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন।

কখন এলে বাবাজি? বউমা তো মামা না মাসি কার বাড়ি চলে গেছেন। তা সারা রাত্তির এখানে পড়ে আছ, আমাদের ওখানে গিয়ে উঠলে না কেন?

ত্রিদিব আশ্চর্য হয়ে যায়। মামা বা মাসি কেউ নেই ঝুমার। একমাত্র মা—মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তিনি কাশীবাসী হয়ে আছেন। ত্রিভুবনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় বলতে ঐ একজনকেই জানে শুধু। ত্রিদিব ছিল না—সেই ফাঁকে বিস্তর আপন লোকেরা আবির্ভূত হয়েছেন। কোন্ এক দাদাকে নিয়ে কলকাতার রায়বাহাদুরের মেসে উঠেছিল। তার উপরে শোনা যাচ্ছে এই সব মামা-মাসি।

এই সব বলে হরেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন; আসল কথা তিনি প্রকাশ করতে চাননি। কিন্তু প্রকাশ হল সেটা অন্য দশজনার মুখে। হল অনতি-

পরেই। ছোটখাট এক ভিড জমে উঠল। নানান জনের নানা রকম প্রশ্ন।

, ভাল আছ বাবাজি?

মুখ তুলে বিবস দৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে ত্রিদিব ঘাড নাড়ল।

কি করা হয় এখন? সুবিধে-টুবিধে হল কিছু?

কথার জবাব তবু সে দিল না। ঠোটের উপর নিঃশব্দ হাসি। এর থেকে যা বোঝার বুঝে নাও।

কায়দায় পেয়ে গেছেন—সহজে কি রেহাই দেবেন ওঁরা? বটা চাটুজ্জে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দাওয়ার উপর উঠে অন্তরঙ্গ ভাবে পাশে এসে বসলেন।

ঘরবাড়ি ক'দিনের মধ্যে কসাড় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। হা রে সংসার!

অর্থাৎ সেই কথা আসন্ন হয়ে উঠেছে, এতক্ষণ ধরে যা এড়াবার চেষ্টা করছে। আর ঠেকানো যায় না।

শক্ত হও বাবাজি, মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে নিশ্বাস ফেলে আর হবে কি।

ত্রিদিব হেসে ওঠে।

বেঁচে থাকতে হলে নিশ্বাস তো ফেলতেই হয়। কিন্তু মাথায় হাত দিয়ে বসতে কখন দেখলেন আমায় কাকা?

গ্রামসুদ্ধ মানুষ মাথায় হাত দিয়েছে, তুমি দেবে সে আর বড় কথা কি। বলিহারি স্ত্রীবুদ্ধি—পদ্মবন ছেড়ে পাঁকে বসত। তুমি কলকাতায় চলে গেলে, শঙ্কর তারপর একেবারে ষোলআনা হয়ে জেঁকে বসল। দাদা বলতে বউমার দোলায় জল সরে, তখনই সব মানুষ হয়েছিল—

হরেন ভদ্র প্রবোধ দেন, কি এল গেল তাতে? গেছে চলে—নিজের কপাল নিয়ে গেছে। তোমার কাঁচকলা। কালকের ছেলে তুমি—আবার বিয়েথাওয়া করে সংসারি হও। ঘায়ের দাগ দু-দিনে মুছে যাবে।

আরও খানিকক্ষণ বসে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু আর চলে না—কানের ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করে শুনতে শুনতে। এত জনের দুশ্চিন্তা তাকে নিয়ে, এমন সব আত্মীয়সুহৃদ এই জায়গায় রয়েছেন পড়ে, ত্রিদিবের কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। দাওয়া থেকে সে নেমে পড়ল—হন-হন করে চলেছে, পিছনে তাকিয়ে দেখবার ভরসা নেই। হয়তো বা ছুটে এসে জাপটে ধরবেন, ভদ্র-মহোদয়গণের ভালবাসা এতদূর। সোজা চলে যাবে একেবারে স্টেশনে। সেখানেও বসবে না। গাড়ির দেরি থাকে তো হাঁটতে হাঁটতে পরের স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে উঠবে।

নিচু চোখে দেখত ঐ সব মানুষজন—এইবারে তারা দিন পেয়েছে। এ ভারি তাজ্জব—ঝুমা যদি কদাচারী হয়, তার জন্য ত্রিদিব ছোট হয়ে গেল কিসে? তার অনুপস্থিতিতে শঙ্করের সঙ্গে ঝুমার মেলামেশা বাড়াবাড়ি

রকমের হয়েছে—দল বেঁধে এসে চাপা উল্লাসে ত্রিদিবকে কেন তা শোনাতে এসেছ? তোমাদের কথা যদি ঠিক হয়, ভালই তো, পৃথিবীর পথ নিষ্কণ্টক হল ত্রিদিবের পক্ষে—পিছনে ডাকবার কেউ রইল না। মুকুলও নেই—বেরিয়ে গেছে মায়ের সঙ্গে। সেই দুর্যোগের মধ্যে চলে যাবার সময়—কই, কেঁদে ওঠেনি তো সে একবার, দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে ত্রিদিবের কোলে উঠতে চায়নি।

মাসখানেক পরে।

হাওড়া স্টেশন। বোম্বে-মেল প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কামরার সামনে বড় সোরগোল। মানুষজনের অবধি নেই। মেয়েরাই বা কত! বছর বাইশ-চব্বিশের সুশ্রী সুঠাম এক ছোকরা বিলাত যাচ্ছে। কত মালা পরাচ্ছে তাকে, তোড়া হাতে দিচ্ছে। সবিনয়ে উপহার গ্রহণ করে সমস্ত একটা জায়গায় নামিয়ে রাখছে—ফুলের পাহাড় হল বার্থের উপরটায়।

ত্রিদিবও যাচ্ছে এই গাড়িতে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওদিকে, আর হাসে। কি রঙ্গ করছে এ ছেলেমানুষটাকে নিয়ে। তার বয়স বেশি, দেখাশুনা বিস্তর—হেন কাণ্ড তাকে নিয়ে হলে বরদাস্ত করত না কখনো। আর মানুষই বা কোথায়, তাকে ঘিরে ধরে অমন ভালবাসা জানাবার। ভাগ্যিস নেই—নইলে প্লাটফরমের উপর শত চক্ষুর সামনে এমন তো এক নির্লজ্জ নাটকের নায়ক হত। বাসা থেকে বেরিয়ে হাওড়ায় কি লিলুয়ায় যাই—কোন সম্বর্ধনার কারণ ঘটে না। আর হাওড়া স্টেশন থেকে বোম্বে, সেখান থেকে কয়েকটা সমুদ্র পার হয়ে বাইরে যাওয়া এমন কি বীরত্বের কাজ, যার জন্য গাড়িভর্তি ফুল আর চোখ-ভর্তি প্রেমাশ্রু বয়ে এনে হুল্লোড় করতে আসে। হাসি পায় ত্রিদিবের। শিশু—নিতান্তই ছেলেমানুষ এরা মনে মনে। বাইরের জগৎ সম্পর্কে এখনো অজ্ঞাত আশঙ্কা আর বিচিত্র বিস্ময়। অনেক কাল আগে সে এক দৃশ্য দেখেছিল অযোধ্যা ছাড়িয়ে এক গ্রাম্য স্টেশনে। স্টেশন-ভরতি মানুষ—মেয়েমানুষই বেশির ভাগ—হাউ-হাউ করে সকলে কাঁদছে। কি বৃত্তান্ত—না, জনকয়েক কলকাত্তা শহরে যাচ্ছে কামকাজের খোঁজে। মানুষগুলোকে যেন শূলে চাপানো হচ্ছে, এমনি চেঁচামেচি লাগিয়েছে। তাদের চেয়ে অধিক কি এগিয়েছে এরা?

ত্রিদিবের আপন-জনের মধ্যে একমাত্র সুধাময়ী। হোল্ড-অল খুলে বিছানা করে দিচ্ছে রাত্রের মতো, কুঁজোয় জল ভরে আনল, কিছু ফল কিনে ভরে দিল বাস্কেটে—ছুরিটা ধুয়ে মুছে ফলের সঙ্গে রাখল। একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দেবে, বিষম ব্যস্ত সুধাময়ী। ঐ একটি মানুষ ছাড়া আর কেউ আসেনি ত্রিদিবকে বিদায় দিতে। আসার কথাও নয়—চলে যাচ্ছে সে খবর জানে ক'জনই বা। কী এমন অসামান্য ব্যাপার যে ঢাক পিটিয়ে জানান দিতে হবে? শেখরনাথের বাড়ি আজ যেচে গিয়ে অভিনন্দন নিয়ে এসেছে।

ফুল নয়—সত্য বস্তু, টাকা; ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ড্রাফট। আর মঞ্জু-বউ দিচ্ছে। জানিয়েছেন—যেমনটা বরাবর হয়ে থাকে—শেখরের মারফতে। ওঁদের ঐ দুজনের সদিচ্ছাটুকু বজায় থেকে তামাম জগৎ বিগড়ে গেলেও ত্রিদিব ডরায় না।

সুটকেস টেনে এনে ত্রিদিব তাড়াতাড়ি চাবি খুলছে। সুধাময়ী অবাক হয়ে বলে, কি?

একটা চিঠি দিয়ে যাব তোমার কাছে—

বের করল এক সবুজ খাম। সবুজ রঙের দামি কাগজে পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা অক্ষরে ছবির মতো করে লেখা সুদীর্ঘ চিঠি। আগাগোড়া একবার চোখ বুলিয়ে ত্রিদিব হাসিমুখে চিঠিখানা সুধার হাতে দিল।

ভুল করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার গরজটা কি? আর, গরজ পড়লে রইল তো তোমার কাছে। খুব যত্ন করে রেখে দিও, না হারায়।

সুধা হাত সরিয়ে নেয়। তীব্রস্বরে বলল, আমি ছোঁব না।

ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলে, ছিঃ গরিব মানুষের রাগ করতে নেই। বোকারাই রাগে অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। কি শিখলে তবে অ্যাদ্দিন আমার মতন মহৎসঙ্গে থেকে?

চোখ বড় বড় করে সুধাময়ী ত্রিদিবের দিকে তাকাল। চোখে অশ্রুর আভাস।

কি করব আমি এ চিঠি নিয়ে?

যত্ন করে রেখে দিও। পর, বিদেশ-বিভূঁয়ে আমি মরে গেলাম। আর তোমার অল্পবয়স—কিছুই বলা যায় না সুধা—

খাটি করে সুধাময়ী বলে কি?

পৃথিবীর পথ অতি পিচ্ছল। কার কি গতি হবে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। এইটুকু বয়সে কম তো দেখলে না। সবুজ চিঠি হল দলিল। এটা যতক্ষণ আছে, আর যা-ই হোক, তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটবে না।

উৎপলার মতো—হ্যাঁ উৎপলাই তো। প্রসঙ্গ বন্ধ হয়ে গেল। উৎপলা হন-হন করে অতি দ্রুত আসছে।

খবর পেলে কি করে উৎপলা?

খবরের কাগজের লোক, সেটা ভুলে যেও না ত্রিদিব-দা। খবর আমাদের খুঁজে বেড়াতে হয়।

ত্রিদিব হেসে বলে, নগণ্য অতি নিন্দিত এক ব্যক্তি—আমায় নিয়ে খবর হয় নাকি কাগজের?

উৎপলা বলে, আজকে না-ই হোক, একদিন তুমি খবর হয়ে উঠবে—আমি নিশ্চিত জানি। এখন ছাপা না হোক, আর একদিন দরকার পড়বে তোমার এই বিদেশ যাবার বৃত্তান্ত—কি করে, কেমন অবস্থায় তুমি রওনা

হয়েছিলে। সঠিক তারিখ নিয়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি হবে। সেদিন খ্যাতিমানের সঙ্গে আমার সামান্য নামটাও লোকের চোখে আসবে—সেই লোভে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

সন্ধানটা দিল কে? হাত গুণে টের পাও নাকি উৎপলা?

অভিমানের সুরে উৎপলা বলে, অদৃষ্টে ছিল তুমি ঠেকাবে কি করে ত্রিদিব দা? এসপ্লানেডে সেই দেখা—আজে-বাজে কত কথা বললে—মুখ ফসকে একটা বার বেরুল না যে তুমি বাইরে চলে যাচ্ছ। সাংঘাতিক মানুষ তুমি! ভাগ্যিস গিয়েছিলাম শেখরনাথের ইস্কুলে। প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউসন সেখানে—নেমন্তন্ন করে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, রিপোর্ট ভাল ভাবে যাতে বেরোয়। নিজ মুখেই তিনি বললেন, গুণের সমাদর করেন তিনি কত। তোমার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ দেখে টাকা খরচ করে বাইরে পাঠাচ্ছেন।

উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে ওঠে উৎপলা। বলে, শুনেই মীটিং ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম স্টেশন-মুখো। শেখরনাথ কটমটিয়ে তাকাচ্ছিলেন—নেহাত অশোভন না হলে হাত ধরে টেনে ফের বসিয়ে দিতেন।

ঘন্টা দিল. এইবার গাড়ি ছাড়বে। ত্রিদিব চকিতে তাকাল ছোকরার কামরার সামনে সেই জনতার দিকে—প্লাটফরমে নেমে এসে ছোকরা গুরুজনদের প্রণাম করল। কোলাকুলি করল সমবয়সি অনেকের সঙ্গে। একটি সুন্দরী মেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে—চোখে জল টলটল করছে। কাছে গিয়ে কি বলছে—ঝর-ঝর জল পড়ল মেয়েটির দু-গাল বেয়ে। সলজ্জে তাড়াতাড়ি মুছে সে হাসবার মতো ভাব করে।

ত্রিদিব এদিক-ওদিক তাকায়। আরও একজন খবর পেয়ে থাকে যদি দৈবাৎ! একজন কেন—মা ও ছেলে, ওরা দু-জন। হঁ্যা—মুকুলও জ্ঞানবান বুদ্ধিমান শক্তিমান মানুষ একজন। প্লাটফরমের জনারণ্যে মুখ লুকিয়ে চুপি-চুপি দেখছে হয়তো তারা। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ত্রিদিবের ব্যাকুল দৃষ্টি চারদিকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

॥ নয় ॥

হল কত দিন? রওনা হবার সালটা অবধি ভেবে বলতে হয় এখন। তারপর আঙুলের কর গুণে হিসাব কর, ক'বছর হয়ে গেল। উদ্দাম তরঙ্গ-তাড়নায় ত্রিদিব ভেসে বেড়িয়েছে নানান দেশের ঘাটে ঘাটে। অবশেষে আবার একদিন বোম্বের বন্দরে এসে নামল। কত দিন—দেখ এবারে হিসাব কষে। দশ দশটা বছর পাখির ঝাঁকের মতো একের পিছনে আর এক—পাখনা মেলে উড়ে পালিয়ে গেছে।

এখনকার এই নতুন কাল। ত্রিদিবের নামে বুক ফুলে ওঠে একালের ছেলেমেয়েদের, তার গৌরব সকলে ভাগ করে নেয়। কিন্তু সেই কালের

জানাশুনো লোকগুলো? নিতান্ত ভদ্রতা বশে গায়ের উপরে থুতু না ফেললেও ঘৃণা ছুঁড়ে মারে বুঝি চোখের দৃষ্টিতে। অত্যন্ত ইতর তুমি ত্রিদিবনাথ, নিরীহ স্ত্রী আর নিষ্পাপ শিশুকে অকূলে ভাসিয়ে সরে পড়েছিলে—মুখে আগুন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার, তোমার মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

একালের সম্ভ্রম আর সেকালের কুৎসা—এরই মধ্যে পা ফেলে ফেলে স্বদেশে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে।

হাওড়া স্টেশনে নেমে সে এদিক-ওদিক তাকায়। কাকে দেখতে পাবার প্রত্যাশা করছে? আসবার খবর জানায়নি কাউকে—পরম উপকারী শেখরনাথকেও নয়। বিদায়ের দিনে তবু তো দুটো মানুষ এসেছিল—সুধাময়ী আর উৎপলা। খবর দিলেও কি আসতে পারত আজ তারা? সুধার এখন গ্রামে বসতি—গোড়ার কয়েকটা বছর চিঠি লেখালেখি চলছিল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল, ত্রিদিবই সুধার চিঠির জবাব দেয় নি। ভুবনের ডামাডোলের মধ্যে হারা মেয়েটা মন থেকে পিছলে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল, আজকে নির্বান্ধব নিজ দেশে পা দিয়ে আবার তার খোঁজ পড়েছে।

আর উৎপলা দেবী—সে-ই বা কোথায়, কে জানে। বিয়েথাওয়া করে খুব সম্ভব পুরোপুরি সংসারী সে এখন, চাইনে বাঁয়ে ট্যাঁ-ভ্যাঁ করছে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। হরিদাস সেই তখনই তার বিয়ের জন্য হুলস্থূল লাগিয়েছিলেন —ত্রিদিবকেই বলেছেন কতবার। স্ত্রী মারা যাবার পরে ছেলের বিয়ের জন্য একবার লেগেছিলেন, সে তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! ফাঁকা সংসারে হরিদাস থাকতে পারেন না। চতুর্দিক হৈ চৈ গণ্ডগোল, দেবাসুরের লড়াই চলবে—তবেই তাঁর পড়াশুনা ও দার্শনিক সাধনা। শ্মশানভূমির মতো নিঃশব্দ ঘরবাড়িতে থেকে থেকেই তো তাঁর মাথা খারাপ হয়ে উঠল। বাপ সোহাগী উৎপলা। আর কিছু না হোক, বাপের জন্য সে ঘরসংসার জমিয়ে তুলেছে। তাহা হোক তাই। শান্তির গৃহস্থালি গড়ে সকল মানুষ সুখ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাক। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে জীবন পাত করছ তুমি ত্রিদিবনাথ— বিপুল পরমাণুশক্তি খুঁজে বের করেছ। নরহত্যার জল্লাদ বানিয়ে তুলো না তাকে, আলাদিনের দৈত্যের মতো সে মানুষের হুকুমদার হোক। তোমাদের সাধনায় সুখের বন্যা বয়ে যায় যেন মানুষের সমাজে, অসুখ-অশান্তি দূর হয়ে যায় চিরকালের মতো।

শহর কলকাতায় এসে কোথায় এবার ডেরা ধরবে, কিছুই সে জানে না। অতএব মালপত্র স্টেশনে জমা রেখে বেরুল। যাবে কোথা—কোন এক হোটেলে, না পরম গুণগ্রাহী শেখরনাথের কাছে? ট্যাক প্রায় খালি। এদিক-সেদিক করতে করতে দেখা গেল, শেখরনাথের জাহাজ-বাড়ির সামনেই ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে।

নতুন সব লোকজন—তারা কেমন-কেমন চোখে তাকায়। কিন্তু ত্রিদিবের

সিঁড়ি ভেঙে ওঠার রকম দেখে মুখ ফুটে কিছু বলল না। বৈঠকখানায় মঞ্জু-বউর ছবি- তেমনি হাসছে সমস্ত দেয়ালখানা জুড়ে দাঁড়িয়ে। সে আমলের চেনা মানুষ দেখা যাচ্ছে না যে নিজে থেকে ভিতরে গিয়ে ত্রিদিবের নাম বলবে। ছাপা কার্ড তাই পাঠিয়ে দিল।

স্লিপিং-গাউন পরা অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে শেখর ছুটে এলো। সবে ঘুম থেকে উঠেছে—চোখ কচলে দেখে সত্যি সত্যি সেই ত্রিদিব ঘোষ কিনা।

কবে এসেছ, কোন ট্রেনে? কাউকে জানতে দিলে না—চিরকাল একই ভাব তোমার। এত বড় হয়ে এসেছ, তবু এখনো তাই—

ত্রিদিব নিশ্বাস ফেলে ঘাড় নাড়ল উঁহু—অনেক আলাদা।

সেইটে মনে রেখো। সেই আগের ত্রিদিব আর তুমি নও।

ও-ও মব কার্ডটা মেলে ধরে হাসতে হাসতে বলে, আগে-পিছে কত অক্ষর জুড়ে নাম এখন ডবল হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেই ওজন বুঝে সব সময় চলবে। বোম্বে নেমেই তার করা উচিত ছিল, আমরা স্টেশনে উপস্থিত থাকতাম।

বিয়ের বর আসছি যেন—তাই খবর দিতে হবে। বাজি বাজনা করে বর তোমরা ঘরে তুলে আনবে।

ঠিক তাই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে এসেছ তুমি।

ব্যঙ্গের সুরে ত্রিদিব বলে, বটে?

ঠাট্টা নয়। বাইরের লোকের চোখে তুমি আমাদের ভারতকে বড় করে তুলেছ।

ত্রিদিব নিরীহ ভাবে বলে, বিশ্বাস করো ভাই, সে মতলব আমার ছিল না। চেয়েছিলাম শুধু নিজেকে বড় করতে। নিজেকে ছাড়া কাউকে আমি চিনিনে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঘরে বসে অত শত খবর তোমরা টের পাও কি করে?

শেখরনাথ বলে, স্টকহলমের নোবেল-ইনস্টিটুটে তুমি পেপার পড়লে, প্রোফেসর ব্লাকেট শতমুখে তার ব্যাখ্যান করলেন, চারিদিকে হৈ-হৈ। মঞ্জুলা খবরের কাগজ থেকে আমায় দেখিয়ে দিল—দেখ ডক্টর ঘোষের কাণ্ড। চিঠি লিখেছেন এই বক্তৃতার ঠিক চার দিন পরে। হল্যাণ্ডে কাঠের জুতো পরে বেড়ানো, ইন্টারলাকেনে স্কি করা—চার পৃষ্ঠা জুড়ে বর্ণনার ঠাসবুনানি, আর সবচেয়ে বড় ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ চিঠির কোনখানে নেই। আমাদের কি ভাবেন, তা হলে বোঝ। মঞ্জু সেদিন অনেক দুঃখ করেছিল।

চোখ বড় বড় করে ত্রিদিব বলে, বলো কি হে, দেশের ভোল বদলেছে তবে তো। রাজনীতির আর গণনায়কদের কথা ছাড়াও এইসব বাজে ব্যাপার ছাপে খবরের কাগজে, আর পড়ে তা মানুষে? বড় মুশকিল, কিছুই লুকো-ছাপা থাকে না ছোট্ট পৃথিবীটার ভিতর।

শেখর বলে, সকলের আগে যে মানুষটি সেই খবর পড়েছিল, সবচেয়ে যার

বেশি আনন্দ, সে আজকে নেই।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। পিছনে ফিরে তাকায় অয়েল-পেন্টিং এর দিকে। বলে, মঞ্জু বউ নেই এমন দিনে। এত আনন্দে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে ভাই। সে থাকলে এতক্ষণ কি কাণ্ডটা করত, দেখতে পেতে।

কাণ্ড হয়তো করতেন, কিন্তু দেখতাম কি করে। যখন বেঁচে ছিলেন, কখনো তো চোখে দেখিনি।

পাষণ্ড ত্রিদিব—এমন কথা এই জায়গায় বেরলো মুখ দিয়ে। আবার টিপ্পনি কাটে, অবশ্য ত্রিদিবনাথ ঘোষের সামনে বেরোননি বলে যে ডক্টর ত্রিদিব ঘোষের সামনেও আসতেন না সেটা নিশ্চিত বলা যায় না।

শেখর খোঁচা দিয়ে বলে, চোখে না-ই দেখে থাকো, তোমায় বাইরে পাঠাবার মূল সে—এটা তোমার না জানার কথা নয়।

ত্রিদিবও ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, তিনি মূল—সে তো একশবার মানি। আরও জানি, তাঁর সঙ্গে আমার চোখাচোখি না হয়, মুখোমুখি কোন কথা বলতে না পারি, সেটাও বরাবরের ইচ্ছা তোমার। আজকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত—এতক্ষণ ধরে গা এলিয়ে এখানে বসে তাই এত কথা বলতে পারছি।

দুই বন্ধুর নিতান্ত সাধারণ কথাবার্তা, কিন্তু এক তিক্ত অন্তর্ধারা বয়ে চলেছে নিচে নিচে। শেখর নাথ ভ্রুকুটি-দৃষ্টিতে তাকায়। ত্রিদিব আমলে আনে না। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল স্ত্রীকে তুমি অত্যন্ত ভালবাসতে, যাকে বলে প্রেম-ভরা ভালবাসা—তাই না?

যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠে শেখর বলে, বাসতাম মানে? ভালবাসি এখনও। চিরকাল বাসব। সাধারণ যাদের সর্বদা দেখতে পাও, মঞ্জুলা সে দলের নয়। স্বর্গের মেয়ে

পাপ কলিযুগের মেয়ে নয়, সে কথা মানি। অত সম্পত্তিও চোখ বুজে তোমার হাতে সঁপে দিলেন, তাকিয়েও দেখতেন না। আধুনিক মেয়েরা তো শুনতে পাই, বাসর-ঘরেই বরের টাকাগুলোর হিসাব নিতে লেগে যান। না, ভুল হল—তার বহুৎ আগে থেকেই—

উচ্ছ্বাস ভরে শেখর বলে চলেছে, ভরা সংসার ফেলে চলে গেল। একদিন কুলব একমুখো বেড়িয়ে পড়তাম—কিন্তু পথের কাঁটা দুই মেয়ে। মঞ্জুলার স্মৃতি, ভাঙা বুকের উপর তাদের আঁকড়ে ধরে কোন রকমে বেঁচে রয়েছি।

ত্রিদিব তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। বলে, টাকাকড়ি নামযশ স্বাস্থ্য অফুরন্ত তোমার। কি জন্যে ভাঙা বুক বয়ে বয়ে বেড়াবে? মেরামত করে ফেল ভাই, তোমার পক্ষে তা মোটেই শক্ত হবে না।

শেখর বলে, তুমিই আগে চেষ্টা দেখ। আমার তো দুটো মেয়ে রেখে গেছে। তোমার কে আছে? ছেলেটাও তো সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

মুখের মতন জবাব। ত্রিদিবের মুখে যেন ছাই মেখে দিয়েছে। কেমন, যাবে লাগতে শেখরের সঙ্গে? সকলের চোখে বড় হয়েছে ত্রিদিব—কিন্তু

শ্রান্ত অবসরের সময় কাছে এসে দাঁড়াবার একজন কেউ নেই।

না, আছে বই কি! সুধাময়ী। জোর তাগিদ দিয়ে সেই দিনই ত্রিদিব চিঠি লিখল—

চলে এসো। শেখরনাথের কাছ থেকে চাবি এনে ঘরের তালা খুলেছি। ছোবড়া বেরিয়ে-আসা খাটের গদিতে শুয়ে শুয়ে আরামে এতক্ষণ দেয়ালের জালের মধ্যে মাকড়সার নিঃশব্দ শিকারের কায়দা দেখছিলাম। আর কি কাজ! শুধুমাত্র তিন কাপ চা খেয়ে এসেছি বাইয়ের দোকানে গিয়ে। গোপলার আজও পাত্তা পাইনি—আছে কি এতদিনে মরে ভূত হয়েছে, কে জানে? যাই হোক, তুমি তো বেঁচেবর্তে রয়েছ—শহরে এসে আবার রাজত্ব জমাও। অভাজনের নইলে ভারি মুশকিল…

সেই পুরানো বাড়ি—বিলেত যাবার আগে যেখানে থাকত। ঝড়ের সেই তার ছেলে নিয়ে দুর্যোগ রাত্রে সহসা যার জন্যে এসে উঠেছিল। বাড়ির মালিক মঞ্জুলা দেবী অর্থাৎ শেখরনাথ। এই একটা মাত্র নয়, তাদের এমন গোটা সাতেক বাড়ি উঠেছে এই পাড়ায়। একটা দরোয়ান গোছের লোক আছে বাড়িগুলোর খবরদারি ও ভাড়া আদায়ের জন্য। এ বাড়ি কিন্তু ভাড়া দেয়নি, দশ দশটা বছর তালা দিয়ে রেখেছে। আশ্চর্য বন্ধুপ্রীতি বলতে হবে শেখরনাথের—এ বাজারে এমনটি আর দেখা যায় না।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সুধাময়ী এসে পড়ল। জমে উঠছে আস্তে আস্তে। ছিন্নসূত্রগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে আজকের জীবনটা কেমন আবার বেঁধে ফেলছে দশ বছরের পুরানো অতীতের সঙ্গে। সুধা বুড়িয়ে উঠেছে. বয়সে ত্রিদিবকে ছাড়িয়ে গেছে যেন।

গাঁয়ে যাবার উদ্ভট খেয়াল হল কেন সুধাময়ী? এখানে থাকলে নিশ্চয় এমন দশা হ'ত না।

থাকার জায়গা অবশ্য ছিল, কিন্তু খাওয়া জুটত কেমন করে?

খাওয়ার দুশ্চিন্তায় চলে গেলে? কি তোমার বুদ্ধি। কামধেনু দিয়ে গেলাম, দোহন করলেই তো সমস্ত-কিছু মিলত—

বুঝতে না পেরে সুধা অবাক হয়ে তাকাল।

ত্রিদিব বলে, ভুলেই মেরে দিয়েছ। সবুজ খামের সেই যে চিঠি দিয়ে গেলাম হাওড়া স্টেশনে।

সুধাময়ী জ্বলে উঠে বলে, সেই চিঠি দেখিয়ে টাকা আদায় করব, এত নীচ আমায় মনে করো?

নীচ তুমি নও—কিন্তু বোকা এক নম্বরের। ন্যায্য পাওনা ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়ে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়িয়েছ। তারই আবার গুমর হচ্ছে বড় গলায়। কিন্তু গাঁয়েই বা খাবার জুটত কি করে, জিজ্ঞাসা করি?

হঠাৎ ত্রিদিব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সুধাই এখন ঠাণ্ডা করে।

না খেয়ে কেউ বাঁচে না—অতএব খেয়েছি নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

ত্রিদিব বলে, নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছ, তার উপর লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ছ— বেঁচে যে রয়েছ তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু খাওয়ার উপায়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করছি।

কাজকর্ম করতাম এবাড়ি ওবাড়ি। গাঁয়ের মানুষ বড় ভাল।

অর্থাৎ ধান ভানা, থালাবাসন মেজে দেওয়া, ছেলে ধরা—এই আর কি। তুমি আর আমি একেবারে আলাদা ধাঁচের সুধাময়ী, একটুও মিল নেই— অথচ কি আশ্চর্য দেখ, ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় মিলে গেছি।

একটা ল্যাবরেটারি মতন হবে বাড়িতে। এমন-কিছু ব্যাপার নয়— প্যাকিং বাক্স ভরতি যা সমস্ত কাস্টমস থেকে উদ্ধার করে আনছে সেইগুলো বাইরের ঘরে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। শেখর কিন্তু এইটুকুতে খুশি নয়, মঞ্জুলার বিহনে সে আরও বেশি দরাজ হয়েছে। যত নাম বেরুচ্ছে, দশের কাজে ততই মেতে উঠেছে আরো। তার ঢালাও হুকুম, ল্যাবরেটারি সাজাও তুমি মনের মতো করে, যা-কিছু দরকার কিনে ফেল। খরচের দায় আমার। নিজে যদ্দুর পারি দেব, বাকি টাকা বাইরে থেকে যোগাড় করে আনব। তোমার ভাবনা নেই।

কয়েকটা দিন ধরে কাস্টমসে খুব টানাপোড়েন চলছে। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে ত্রিদিব দেখল, টেবিলের উপর বড় এক লেফাফা তার নামে। খুলে ফেলল—মূল্যবান কিছু নয়, খবরের কাগজের একগাদা কাটিং। একখানা তুলে নিল। সংবাদ তাজ্জব বটে। একবার পড়ে মাথায় ঢুকছে না, আর একবার পড়ল। তারপর আবার ..

সুধা জলখাবার নিয়ে এসেছে। ত্রিদিব চুপচাপ বসে। চেহারা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে, দাদা—

মুখ তুলে ত্রিদিব সুধার দিকে তাকাল। বুঝি তার সম্বিত নেই। কাঁদো-কাঁদো হয়ে সুধা বলে, কি হয়েছে আমায় বল—

ডাকে এল। কে পাঠাল ধরতে পারছিনে—

লেফাফাটা তুলে ধরে ত্রিদিব আবার উল্টে পাল্টে দেখে। বলে, দেওঘর থেকে কোন্ সুহৃৎ পাঠাল—নামটা খিচিমিচি করে লেখা, পড়া যাচ্ছে না।

উৎপলা পাঠিয়েছে। আমাকেও চিঠি দিয়েছে আজ। সমস্ত জানিয়েছে। চিনতে পারলে না? নাঃ, তুমি যেন কী। সুবোধ বাবুর বোন—সেই যে স্টেশনে গিয়েছিল তোমার যাবার দিনে। তেমন মনে হয় না। কী ভালো যে বাসে তোমায়—তোমার বাহাদুরি যেখানে যা-কিছু বেরিয়েছে, কেটে কেটে সব তুলে রাখে।

বাহাদুরি, তাই বটে।

কান্নার মতো হাসি হেসে ওঠে ত্রিদিব। একটা কাগজ তার চোখের সামনে মেলে ধরা—সুধা সেটা নিয়ে নিল।

এই দেখ, বার্মিংহামে ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেসের খবর—রাদারফোর্ড-চাডউইকের পাশাপাশি তোমারও নাম রয়েছে—

আর ও-পিঠে? উল্টে ধরো কাগজখানা—

ও পিঠ তোমার পড়বার নয়।

পড়বার নয় কি বল? জবর খবর ঐখানে। এই যে মোটা হরফের হেডিং—'বিপ্লবিনীর শোচনীয় মৃত্যু'—

জায়গাটা পড়ে সুধা প্রশ্ন করে, মাধবীলতা দেবী মেয়েটা কে দাদা? তোমার আপন কেউ?

ত্রিদিব বলে, পরিচয় তো দিয়েই দিয়েছে। শঙ্কর মিত্তিরের স্ত্রী—আমার আবার কে হবে।-

খাবার স্পর্শ করল না, দ্রুত সে বাগানে নেমে গেল।

রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে, দুনিয়াসুদ্ধ নিষুপ্ত। এই ভাল, নিরিবিলি নিজেকে নিয়ে থাকা যায়। নিজেকে ছাড়া কার দিকে কবে চেয়ে দেখছ ত্রিদিবনাথ? ভাল ভাল বাক্য তো আউড়েছ মুখে—বিজ্ঞান, প্রগতি, বিশ্বমানবের কল্যাণ—এ সব শুনতে খাসা, আসরের মধ্যেও পসার বাড়ে। কিন্তু গতানুগতিকতায় গা না ঢেলে আলাদা ভাবে ভেবে দেখেছ পরিণামটা? দেশে দেশে শিল্প-বিপ্লব—পুরো বছর লাগত যে কাজে, গায়ে ফুঁ দিয়ে লহমার মধ্যে তা সমাধা হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির বিপুল শক্তি ভাণ্ডার—হাজার-লক্ষ কুঠুরি সেই ভাণ্ডারের। এত দিনে মানুষ তার দুটো-পাঁচটা মাত্র খুলতে পেরেছে। তাতেই বিস্ময়ের অন্ত নেই, দম্ভ আকাশছোঁয়া। কিন্তু বন্দী দৈত্যদানবদের মুক্ত করে এই যে কাজে লাগিয়ে দেওয়া—হাজার মানুষ মিলে যা করত, দানবীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে তাই করাচ্ছে, যন্ত্রচালক একটি মাত্র মানুষ—তা হলে ন'শ নিরানব্বই জন যে বেকার হয়ে রইল, তাদের উপায় কি? বেকার হয়ে, গণ্ডগোল পাকিয়ে বেড়াবে—অতএব কমাও মানুষ, মার, কেটে ফেল। এরই আইনসম্মত প্রক্রিয়ার নাম হল লড়াই।

ধরণীর বুক ক্ষতবিক্ষত করে বিশ গুণ ফসল আদায় করেও মানুষের দুঃখ ঘোচে না। একদিন কিন্তু সর্বংসহা মাটিও মুখ ফেরাবে—এক কণিকা ফসল দেবে না। বিজ্ঞানীরা এখন থেকে সেই ভাবনা ভাবতে লেগেছেন। গোপন পাতালপুরীর যেখানে যেটুকু সম্পত্তি লুকানো আছে, দামাল মানুষ সমস্ত টেনে টুনে নিয়ে এসে ভোগ করতে চায়। গুপ্তধন একটু একটু করায়ত্ত হচ্ছে, মানুষ আরো ক্ষেপে যাচ্ছে সহস্রগুণ। সেই শিশুদলের মধ্যে ত্রিদিবও একটি, অভিধানের চোখা চোখা বিশেষণে আসল মূর্তি যতই চাপা দিতে চাও না কেন। দিনমানে দশের মুখে প্রশংসা বাক্যগুলো মন্দ লাগে না, জীবনের ক্ষতি ও বেদনা দিব্যি ভুলে যাওয়া যায়। কিন্তু এই নিশিরাত্রে ব্যাপার এখন আলাদা। স্তাবকের চাটুবাক্য বিহনে—কি মনে হচ্ছে ত্রিদিবনাথ, খুব নাকি

ভিতে আছ তুমি? সভায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল, সম্প্রতি সে মালা ইজিচেয়ারের হাতলে ঝোলানো। সকালবেলা গোয়ালা ঘর ঝাঁট দেবার সময় ধুলা আর আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেবে। একজন কেউ নেই, যার গলায় নিভৃতে এ মালা পরানো যেত ঐ চেয়ারের হাতলে না রেখে।

সামনের জমিটায় এখনো বাড়ি ওঠেনি। এক প্রান্তে বাঁশ পুঁতে তার উপর খান কয়েক পুরানো টিন ফেলে আইসক্রীম সিং গোয়ালা বসবাস করে। বছর দুই-তিন আছে এমনি, কেউ কিছু বলে না—অস্থায়ী ঘর, জমির উপরে পাকা বাড়ি তোলবার উদ্যোগ হলেও এই ঘর ভেঙে নিয়ে চলে যাবে। ঘরের একদিকে হাত তিনেক জায়গা নিয়ে ওদের খাটিয়া ও তৈজসপত্র, বাকি সমস্তটা গোয়াল। আইসক্রীম কিছুই নয় লোকটার বিচিত্র নামই শুধু—আসল হল বউটা। সারাদিন ধরে কি খাটুনিই খাটে। দুবেলা তিনটে গরুর নানান রকম খেজমৎ এবং ঐ গরুর মতোই নিরীহ স্বামীটিরও। স্বামী শুধু ফড়ফড় করে হুঁকো টানে আর ঘুমোয়। কদাচিৎ ভুসো-খড়ে খোল মিশিয়ে গরুর জাবনা মাখতে বসে। সেও ভাল হয় না, বউ তাকে ঠেলে দিয়ে কনুই অবধি ডুবিয়ে দেয় জাবনার পাত্রের ভিতর। আইসক্রীম আর কি করতে পারে—শুয়ে পড়ে খাটিয়ার উপর, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পা নাড়ে প্রবল ভাবে। ঘরে বেড়ার হাঙ্গামা নেই বাইরে থেকে সমস্ত কিছু নজরে আসে। হাতে যখন কাজ থাকে না, এই সমস্ত বসে বসে দেখে ত্রিদিবনাথ। বেশ ফড়িবাজ বউটা—তিনটে গাইয়ের সবটুকু দুধ [illegible] মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। সে কাজটাও বউ নিজের উপর রেখেছে। দুধ দিতে এসে হেসে হাত দুলিয়ে সোহাগপনায় গদগদ হয়ে ওঠে। ওই ফাঁকে দুধের গাঁজলাসুদ্ধ ঢেলে ভরে মাপে কম দেবে, ফাঁক পেলে জল মিশিয়ে দেবে—বজ্জাতির অন্ত নেই। ত্রিদিবনাথ, কেমন হ'ত বল দিকি যদি ঐ আইসক্রীম সিংয়ের বউ তা হতে পারতে? প্রায় তো তাই হয়ে গিয়েছিলে—মন্দির বানিয়ে সেকালে শিব-স্থাপনা কাণ্ড, তাই তো প্রায় করে তুলেছিল তোমায় ঝমা। ভাবছ কি ত্রিদিব, ঘর ছেড়ে ভুঁইয়া মানুষ হয়ে গিয়ে? ভেবে দেখ দিকি এখন একবার।

খবরের কাগজের সেই টুকরো বের করে ঠাণ্ডা মাথায় আবার পড়তে লাগল। বিপ্লবিনীর শোচনীয় মৃত্যু—

যুদ্ধের সময় জনসাধারণের নিকট সত্য গোপন রাখা হইত. যুদ্ধান্তে এখন চমকপ্রদ বহু বৃত্তান্ত জানা যাইতেছে। চারি বৎসর পূর্বে ডায়মণ্ডহারবারে জোড়া খুন হয়. তৎসম্পর্কীয় বিবরণ যথারীতি আমাদের স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকবর্গের স্মরণার্থে সংক্ষেপে ঘটনার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

শঙ্করনাথ মিত্র নামক এক ব্যক্তি এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে লইয়া নদী-তীরবর্তী এক গৃহে বাস করিতেছিল। ক্রমশ প্রকাশ পাইল, যুবতী শঙ্করের

বিবাহিতা স্ত্রী নহে, উহাকে শঙ্কর হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। ভদ্রপল্লী-তে এই শ্রেণীর লোকের বস-বাস বাঞ্ছনীয় নহে, এই জন্য পল্লীবাসীরা পুলিশে খবর দিল। পুলিশও বিভিন্ন সূত্র হইতে সন্দেহের কারণ পাইয়াছিল। ১৮ই জুলাই প্রত্যূষে পুলিশবাহিনী স্থানীয় কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া খানাতল্লাসি এবং প্রয়োজনবোধে গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বাড়ি ঘেরাও করে। শঙ্কর সেদিন গৃহে ছিল না, স্ত্রীলোকটি একাকী অবস্থান করিতেছিল। অকস্মাৎ সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে রিভলবার বাহির করিয়া গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে নদীর দিকে ছুটিয়া যায় এবং জল মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সুতীব্র স্রোতে মুহূর্তে সে জলতলে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। গুলির আঘাতে সাব-ইন্‌স্পেক্টর কৃষ্ণহরি সরকার এবং পতিরাম নাথ নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। উভয়েই পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। শঙ্করের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই; খানাতল্লাসী সূত্রে স্ত্রীলোকটির নাম জানিতে পারা গিয়াছে—মাধবীলতা দেবী।

এইরূপ বৃত্তান্ত আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন জানা যাইতেছে প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। শঙ্করনাথ মিত্র ও মাধবীলতা দেবী দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ দম্পতি; উভয়েই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরম অনুরাগী বিশ্বস্ত সৈনিক। আজাদ-হিন্দ ফৌজ দলের কয়েকজনকে নেতাজী সাবমেরিন যোগে ভারতে পাঠান. পুরীর নিকটবর্তী কোন স্থানে তাঁহারা অবতরণ করেন। গোয়েন্দা পুলিশ অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের ধরিতে পারে নাই। জরুরি কাগজপত্র ও বেতারের যন্ত্রপাতি তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারও সন্ধান হইল না। এদিকে যুদ্ধের অবস্থা সঙিন হইয়া ওঠায়, ইংরেজ চতুর্দিক হইতে বিপন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদের রণনীতি ফাঁস হইয়া গিয়া সোনাঙের আজাদ-হিন্দ রেডিও হইতে বিশ্বময় প্রচারিত হইতে থাকে; সামরিক উপকরণবাহী জাহাজের উপর নির্ভুল হিসাব মতো বোমা পড়িয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। গোপন সংবাদ কাহারা সরবরাহ করে, বুঝিতে না পারিয়া ইংরেজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, এমনি সময় সংবাদ পাওয়া গেল একটি ট্রানস্‌মিটার ও কিছু কাগজপত্র শঙ্করনাথ মিত্রের গৃহে রহিয়াছে। পুলিশের জালবদ্ধ মাধবীলতা দেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ট্রানস্‌মিটার ও কাগজপত্র সহ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বঙ্গের বীরকন্যার এইরূপে শোচনীয় সলিল-সমাধি হইল। দেশের মানুষ কিন্তু সেই সময় তাঁহাদের সম্পর্কে অন্যরূপ ভাবিয়াছিল। বস্তুত মাধবীলতা দেবী শঙ্করনাথ মিত্রের বিবাহিতা স্ত্রী—ইংরেজ সুকৌশলে কুৎসা রটনা করিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণের ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। আঠারোই জুলাই খরস্রোত নদীগর্ভে নির্ভয়ে আত্মদান করিয়া মাধবীলতা দেবী দেশ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, ভারতের ইতিহাসে ঐ দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য……

আর, কি আশ্চর্য আঠারোই জুলাই স্মরণীয় ত্রিদিবের জীবনেও। ঝুমা মরে অব্যাহতি নিয়ে গেল—সে তো আছেই। প্যারিসে সি-তে য়ুনিভার্সিটির বিজ্ঞান-পরিষদে তার বক্তৃতা হয়েছিল ঐ দিনেই ; —বছরটা অবশ্য আলাদা। তারিখ মনে ছিল না, মনের মধ্যে গেঁথে রাখবার মানুষ ত্রিদিব নয়। কিন্তু হাজার মাইল দূরে থেকে উৎপলা তাঁকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করেছে, পলির সংগ্রহ থেকেই নির্ভুল তারিখটা পাওয়া গেল। বিজ্ঞান-বিচারে ঈশ্বরের ঠাঁই নেই—তবু কিন্তু মনে হয়, কোন এক বিষম শক্তির রসিকতা করছেন তাকে নিয়ে। শঙ্কর মিত্তিরের স্ত্রী মাধবীলতা পথ নির্বাধ করে নিয়ে মরে গেল, ঠিক সেই তারিখটাতেই ধরণী সমাদরের বাহুতে তাকে সকলের মাথার উপর তুলে ধরল। কেমন, এই চেয়েছিলে কিনা জীবনে, বল ত্রিদিবনাথ।

বস্তু আর শক্তি এ যাবৎ আলাদা বলেই জানা ছিল অকাট্য রূপে, এবারে দেখানো যাচ্ছে, একেবারে এক তারা। বস্তুই রূপ পালটে হয় শক্তি, শক্তি হয়ে দাঁড়ায় বস্তু। আশ্চর্য ব্যাপার। তাবৎ ভুবনে যত কিছু ছড়ানো, সমস্ত যেন এক হয়ে আসছে। রূপে আর অরূপে একাকার।

বক্তৃতা বলবেন না তাকে—যেন সে সেদিন ঝুঁটি ধরে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নাড়া দিয়ে দিল। বক্র বিদ্যা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো—কি মূর্খ হয়ে ছিলে সকলে এতকাল। আর দুনিয়ার এই মজা, যে যত বেপরোয়া গালি-গালাজ করে, তার তত পসার। পশ্চিম জগতে কা হৈ-হৈ শুরু হল পর পর। কাগজে ছবি আর গজের মাপের প্রবন্ধ। ভারতের এই মানুষটিকে বৈজ্ঞানিক না বলে কবি বলাই বোধ হয় সঙ্গত। ভারতের যাদুকর ও যোগীদের মতোই ডক্টর ঘোষের বিচিত্র কার্যকলাপ—আলবার্ট আইনস্টাইন—সেই শক্তিতে আগে-ভাগেই সে পূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, যুক্তিগুলো পরে আসে সুড়ঙ্গ অলিগলি হাতড়ে তাকে এগুতে হয় না। গবেষণা হয়তো অনন্যসাধারণ বলা চলে না, কিন্তু থিয়োরির উপর আশ্চর্য দখল—বিক্ষিপ্ত ঘটনাপুঞ্জ এক অবিভাজ্য নিয়মে চালিত হচ্ছে, যেন তৃতীয় নেত্রে সুস্পষ্ট দেখে নিয়ে সে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করে।

যা হবার হয়েছে। কিন্তু বাইরের ভিড় থেকে পালিয়ে নিতোল নিজ দেশে চলে এল, সেখানেও সে প্রায় সেই অবস্থা। ছোটখাটো এক ল্যাবরেটারি তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে—শেখরনাথের সাহায্যে; সেটা আস্তে আস্তে বড় করে তোলাও কঠিন হবে না। কিন্তু সময় কোথা কাজ করবার? সারাটা দিন এবং অনেক রাত্রি অবধি গুণমুগ্ধেরা ঘিরে থাকেন। ভরসা ছিল, এমন জোয়ারের বেগ বেশি দিন থাকবে না, সমাদর স্তিমিত হয়ে আসবে। কিন্তু পুরো মাস কেটে যায়, উৎসাহ কমে নাই মানুষের? ওদেশের মানুষ তবু বুঝে-সমঝে প্রশংসা করত, এদের একেবারে নির্জলা স্তাবকতা। বিদেশে হাততালি পেয়ে এসেছে, সে-ই যথেষ্ট। কেন, কি জন্য—জানবার প্রয়োজন

নেই। বিদ্যাবুদ্ধিও নেই অধিকাংশের, সার্টিফিকেট দেখেই এবা সম্রাটের সমতুল্য আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

এ বজ্জাতি উৎপলার। যখন ছোট্ট ছিল সর্বদা তাদের পিছনে লাগত, কত রকমের শক্রতা করেছে তার অবধি নেই; সোয়াস্তিতে থাকতে দিত না। বেরিয়ে যাবে—দেখে, জুতো নেই। তারপরে খোঁজাখুঁজি এঘরে ওঘরে উপরে-নিচে। আবার বসে পড়তে হয়। ঘন্টা কয়েক পরে শেষ ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে—তখন মালুম হল, পায়ের কাছেই তো জুতো; খাটে বসে অন্যমনস্ক ভাবে পা দোলাতে দোলাতে জুতোর উপর পা ঠেকে গেল। রাত্রিটা থেকে যেতে হল ও বাড়ি। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচের ঘরে এসেছে সে আর সুবোধ। নতুন দাবাখেলা শিখেছে তখন, জবর নেশা। দু'জনে দাবা খেলে কাটিয়ে দেবে সারা রাত, সেই মতলব করে নিচে আসা।

খেলা জমেছে। ত্রিদিবের অবস্থা কাহিল—দুটো নৌকাই যায়-যায় ঠেকানোর উপায় দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ পিছন দিক দিয়ে গম্ভীর গলায় দৈববাণীর মতো শোনা গেল, ঘোড়া মেরে আগে গিয়ে বোসো—

কি সর্বনাশ, শীতের নিশিরাত্রে হরিদাস কোন সময় এসে দাঁড়িয়েছেন? এক নজর তাকিয়ে দেখে দু'জনের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে। উঁচু দরের খেলোয়াড় হরিদাস—ত্রিদিবের সঙ্কটে স্থির থাকতে না পেরে জুত দিচ্ছেন। ছেলেকে বলেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে আর কি করবি? ঘোড়াটা দিতে হল, নয়তো মাত। বলতে বলতে বসেই পড়লেন ত্রিদিবের পাশে। তাড়া দিয়ে ওঠেন, কি চাল দিবি দিয়ে ফেল। সারা রাত বসে বসে ভাবলে হবে?

সুবোধই বেকায়দায় এখন। বাপে বেটায় ধুন্দুমার লেগে গেল। ত্রিদিব হরিদাসের হুকুম মতো হাত দিয়ে ঘুঁটি সরাচ্ছে, এই মাত্র। বাজিটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাস মারমুখী হলেন। রাত জেগে দাবা খেলা—আমি ভাবছি, শ্রীমানেরা নিরিবিলি একজামিনের পড়া পড়ছেন।

খুক-খুক—একটুখানি আওয়াজ দরজার বাইরে। বোঝা গেল, বিচ্ছু মেয়েটার কাজ। হরিদাসের চেঁচামেচি বেড়েই চলেছে। ঘুম ভেঙে নীলমণি ছুটতে ছুটতে এল। কর্তা মশায়, আপনি উপরে চলে যান। আলো নিভিয়ে আমি পাহারায় রইলাম, দেখি কে আর জেগে থাকে। উৎপলার মা তখন বেঁচে, তিনিও এসেছেন। ত্রিদিবের সঙ্কুচিত মুখের দিকে চেয়ে স্বামীর উপর রুখে উঠলেন। কতদিন পরে দু-জনে এক বিছানায় শুয়েছে—একটু খেলাধুলো কি গল্পগুজব করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে নাকি? নিজেরা করনি এই বয়সে? আর এই যে হাড়বজ্জাত মেয়ে হয়েছে—দেখ দিকি কাণ্ড, বকুনি খাওয়াবার জন্যে ঘুমন্ত মানুষটাকে এই রাত্রে টেনে নামিয়ে আনল।

পলি ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল, মায়ের

বকুনি খেয়ে তবে ঠাণ্ডা হল।

এখন এত বড় হয়েছে পলি, দুষ্টু বুদ্ধি কিন্তু ঠিক তেমনি। অন্যকে বিপদে ফেলে মজা দেখে দূর থেকে। সমুদ্র-পাহাড়ের ওপারে ভিন্ন রাজ্যে কি করে এসেছে না এসেছে, কে তার খবর রাখত। কিন্তু তা কি হতে দিল? খবর কেনাবেচা বাছাই-ছাঁটাই বানানো বদলানো যাদের পেশা, এতকাল তাদের ভিতরে থেকে সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরি নিয়েছে। যেন সে অদৃশ্য সহচরী হয়ে ত্রিদিবের সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়েছে এই দশ বছর। তারপরে নিষ্ঠুর জনতার উল্লাস-বন্যার মধ্যে নিঃসহায় তাকে নিক্ষেপ করে নাগালের বাইরে সুদূরবর্তী হয়ে আছে। প্রায় সেই হরিদাসকে ভিতরে পাঠিয়ে খুক-খুক করে হাসির মতন। উত্যক্ত হয়ে মরুক এখানে ত্রিদিবনাথ, আর সে ওদিকে দেওঘরের বেলাবাগানে নিরীহ ভালমানুষ হয়ে ঘরকন্না করছে। সে হচ্ছে না, তোর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবে—

ফটকের মুখে দেখা। বাজার করে ফিরছে উৎপলা তখন। মুটের মাথায় গন্ধমাদন তুল্য বোঝা। তাতেও কুলোয়নি। নিজের দুটো হাত ভরতি, কাঁধ থেকে ঝোলানো ব্যাগের ভিতরেও টুকিটাকি জিনিস। ঘেমে গিয়েছে রোদে। তেঁতুলতলায় থমকে দাঁড়িয়ে ত্রিদিব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার দিকে।

সওদাগুলো দুম করে মাটিতে ফেলে উৎপলা কাছে চলে আসে।

চিনতে পারছ না? দেখ দিকি ভাল করে।

ত্রিদিব তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখে ঘাড় নাড়ে। উঁহু, সে পলি আর নও তুমি। রোগা হয়ে গেছ, বিধাতা-পুরুষ ফ্যাক্টরিতে নিয়ে চোয়াল দুটো আর একবার পিটিয়ে দিয়েছে বুঝি। রঙও যেন একটু বেশি ফর্সা—

উৎপলা হেসে বলে আমি ঠিকই আছি ত্রিদিবদা—অবিকল সেকালের মতো। তোমার চোখ বদলেছে তাই চিনতে পারছ না।

ত্রিদিব আঙুল দিয়ে দেখায়, কপালের এ ফুটকি ফুটকি দাগগুলোও সেকালে ছিল নাকি পলি?

মা শীতলা অনুগ্রহ করে ছিলেন—যার নাম বসন্ত। একেবারে পাদপদ্মেই ঠাঁই দিতেন. কিন্তু দিদি টেনে হিঁচড়ে ধরল। লড়াইয়ে হেরে কিছু কিছু করুণার চিহ্ন দেবী গায়ে মুখে ছিটিয়ে গেলেন।

ত্রিদিব আশ্চর্য হয়ে বলে, দিদি? তোমার আবার দিদি কেউ আছেন, জানিনে তো।

উৎপলার কণ্ঠ গভীর হয়ে ওঠে: এ জন্মের না হোক, জন্ম-জন্মান্তরের দিদি। রক্তের সম্বন্ধ তার সঙ্গে নয়, প্রাণের সম্বন্ধ। আর পাঁচটা দিন আগে এলে দেখা হত ত্রিদিবদা। ইস্কুলে কাজ করে—সোমবারে ইস্কুল খুলেছে, রবিবারে চলে গেল। আমিও যাব চলে এবার। অনেকদিন হয়ে গেল—

বাবা আর থাকতে চাচ্ছেন না। কলকাতায় এখন গরম কমে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছে—না?

ত্রিদিব বলে, আছেন কেমন মেশোমশায়?

চোখেই দেখতে পাবে এসে পড়েছ যখন।

হঠাৎ সে হেসে উঠল। খিল খিল করে—সেকালের সেই পলির মতন। সত্যি, এটা কি হচ্ছে—বিশ্ববন্দিত ডক্টর ঘোষের সঙ্গে পথের উপর দাঁড়িয়ে কথা! ভিতরে চলো ত্রিদিবদা।

চেনা মুটে আগেই রোয়াকের উপর উৎপলার সওদা নামিয়ে দিয়েছে। ঘর বেশি নয়, কিন্তু কম্পাউণ্ড যেন গড়ের মাঠ। ফটকের দু-পাশে প্রকাণ্ড দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ। কাঁকর-বিছানো পথ ফুল-বাগিচার ভিতর দিয়ে। পিছন দিকে আম-লিচু-আতার৷ বাগান। কতগুলো মালি খাটছে না জানি—এতবড় বাড়ি এমন ঝকঝকে তকতকে রেখেছে!

উৎপলা বলে, দুলালচাঁদ নাগের বাড়ি এটা। আমাদের থাকতে দিয়েছেন মানিকচাঁদ নাগের ছেলে। বাপ মরে গিয়ে ইনি এখন কর্তা। চিনতে পারলে না, সেই যে—

বাংলা দেশে জন্মে মাণিকচাঁদকে চিনবে না কোন মূর্খস্য মূর্খ? যত দোর্দণ্ডপ্রতাপই হোন, ঐ একটা জায়গায় সকলে কেঁচো। খবরের কাগজের মালিক তিনি। প্রথম জীবনে নিছক সাহিত্যসেবার খাতিরে এক চটি মাসিক-পত্র বের করেন। সেই সঙ্গে তিনজন কম্পোজিটার নিয়ে এক ছাপাখানা। মেসিন ছিল না, ছাপিয়ে আনতেন অন্য প্রেস থেকে। সাহিত্য-ব্যাধি তার পরে সম্পূর্ণ-আরোগ্য হয়ে গিয়ে ভদ্রলোক ধাতস্থ হলেন। মাসিক ছেড়ে বের করলেন সাপ্তাহিক কাগজ—ক্রমশ দৈনিক। তা-বড় তা-বড় সাহিত্যিক তখন পদতলে গড়াগড়ি দেয়। সাহিত্যিক তো ছার, লাটবেলাট অবধি টেলিফোনে খোশামোদ করে মাণিকচাঁদকে। রাজনীতি হোক আর দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সঙ্গীতই হোক সকল সভায় সভাপতি হবার ডাক আসে—আর কিছু না হোক, কাগজে ফলাও করে ছবি ও খবর বেরুবে। একটা জীবনে মানিকচাঁদ যে তাজ্জব দেখিয়ে গেছেন তা লোকে দশ জীবনে পারে না। ছেলে এখন সেই সুখ ভোগ করছে।

উৎপলা বলে, দুলালবাবুর আসবার কথা আজকে, কলকাতা থেকে সোজা মোটরে আসছেন। তাই এত বাজার। নইলে বাপ আর মেয়ে—আমাদের এত কি দরকার? বাবা খাওয়াদাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন একরকম। ফাঁকি দেবেন এবারে হয়তো—সংসারে কেউ আমার থাকবে না ত্রিদিবদা।

গলা ভারী হয়ে উঠল। ত্রিদিব ইতস্তত করে বলে, বিকেলের গাড়িতে আমি তবে ফিরে চলে যাই পলি। অত বড়লোক দুলালচাঁদের পাশে নিতান্ত বেমানান।

উৎপলা বলে, আমিও ঠিক এই কথা বলতাম তুমি যদি সেকালের ত্রিদিব

ঘোষ হতে। কিন্তু ডক্টর ঘোষ ভিন্ন মানুষ। ঐ দুলালই দেখো কত জ্ঞানের কথা বলবে তোমার সঙ্গে। হেসে ফেলো না কিন্তু খবরদার, আমাদের অন্নদাতা—চাকরি ওর কাগজে।

॥ দশ ॥

উৎপলার কাছে ত্রিদিব হঠাৎ প্রগলভ হয়ে উঠল। অনেককাল আগেকার সেই তরুণ ছেলেটি। সুবোধের সঙ্গে যখন এদের বাড়ি আসত, ছোট্ট মেয়ে উৎপলা ঘুরঘুর করে বেড়াত আর জ্বালাতন করত নানারকম দুষ্টামিতে। ঝঞ্ঝা আসে নি তখন জীবনে, নামযশ হয় নি। আজকে এতদিন পরে আবার একবার সম্মান ও পাণ্ডিত্যের খোলস খুলে চলে এসেছে। দেওঘরের এই জনবিরল বেলাবাগানে তার মহিমা কে জানে? ভাগ্যিস জানে না, তাই বাঁচোয়া।

উৎপলা তাকে বাপের ঘরে নিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায় ত্রিদিব। আর্তনাদ গলা চিরে বেরুতে চায়, জোর করে চেপে নিল। শয্যার প্রান্তে পর পর গোটা তিনেক তাকিয়া সাজানো—তার উপরে গড়িয়ে আছে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার এক দেহ। ও চোখে ঢাকা বাঁধা।

এ কি হয়েছে উৎপলা? এই নাকি মেসোমশায়?

আর বলতে যাচ্ছিল, বেঁচে আছেন? কথাটা ঘুরিয়ে বলল, জেগে আছেন তো? উহুঁ, জাগিয়ে কাজ নেই। চল—

উৎপলার কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে ওঠে এই হল বাবার সব চেয়ে সজাগ অবস্থা। সেই মানুষ আজ কি রকম হয়ে গেছেন দেখ।

কাছে চলে গেল। মধুর মৃদু কণ্ঠে ডাকে, বাবা, বাবা গো কে এসেছে জান?

পা থেকে মাথা অবধি যেন বিদ্যুৎস্পর্শে কেঁপে উঠল। চিৎকার করে উঠলেন। না শুনলে কিছুতে প্রত্যয় হয় না ঐ কণ্ঠের এমনিতরো আওয়াজ।

চোখে ঠুলি পরিয়ে বেঁধে দিয়েছিস—জানবার উপায় আছে?

কানের কাছে মুখ নিয়ে উৎপলা বলে, ডক্টর ত্রিদিবনাথ ঘোষ—পৃথিবী ঘুরে এতদিনে দেশে ফিরলেন।

ডাক্তার? হরিদাস আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন: এদেশের যত ডাক্তার সারা হয়ে গিয়ে এবার বুঝি বাইরের আমদানি শুরু হল?

বাইরের কোথা? আমাদের ত্রিদিবদা যে।

এবার হরিদাস খাড়া হয়ে ওঠেন।

ত্রিদিবনাথ? বলিস কি। ওরে ত্রিদিব, তুই ডাক্তার হয়ে এলি নাকি? হেসে বললেন, কি সর্বনাশ। যা চটপটে, মানুষ ভুগে মরবে না তোর হাতে।

তারপর ব্যাকুল অনুনয়ের সুরে বললেন, চোখ খুলে দে পলি। ত্রিদিব এলো এত কাল পরে, তাকে একটা নজর দেখতে দিবিনে?

উৎপলা বলে, দুলালচাঁদ আজকে আসছেন বাবা, যে ডাক্তার চোখ বেঁধে গেছেন তাঁকেও নিয়ে আসছেন। ওঁদের বলব চোখ খুলে দেবার কথা।

তখন হরিদাস ত্রিদিবের কাছে অনুযোগ করেন, তারা ডাক্তার নয়—ডাকাত। চোখ দুটোয় এমনি যদিই বা ঝাপসা রকম দেখতাম, ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একেবারে সাবাড় করছে। তুমি ডাক্তার হয়ে এসেছ বাবা ত্রিদিব, বুড়ো মেসোকে বাঁচাও ওদের হাত থেকে। চোখ যাবার হয় তো নিজের লোকের হাতেই যাক।

ত্রিদিব বলে, ডাক্তার আমি বটে কিন্তু ফোঁড়া কাটার বিদ্যেও শিখে আসিনি মেসোমশায়, দুটো টাকা দিয়েও কেউ রোগ দেখাতে ডাকবে না। বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছি খানকয়েক ভুয়ো কাগজপত্র—

কিন্তু কানেই নিলেন না হরিদাস। বিড়বিড় করে বকতে লাগলেন আপন মনে। বিশ্বসংসারের উপর বিষম তিতবিরক্ত, এমনি একটা ভাব।

সেই পুরানো সেকালের কথা ত্রিদিবের মনে পড়ে যায়। কাজের খাতিরে হরিদাসকে শহরে কাটাতে হল, তার জন্যে চিরকাল দুঃখ করেছেন। বাপ-ঠাকুরদা গ্রামে থেকে চতুষ্পাঠী চালিয়ে গেছেন, পনের-বিশটা ছেলেকে বিদ্যাদান শুধু নয়, সেই সঙ্গে অন্ন এবং বসতি। কলকাতা শহরে এতদূর অবশ্য চলে না, তবু নিচের ঘর দুটোয় তিন-চারটে ছাত্র থেকে পড়াশুনো করত, হরিদাস তাদের খরচপত্র যোগাতেন। বলতে হবে হরিদাসের নাম করেই, কিন্তু আসল কর্তা উৎপলার মা। হরিদাসের অবসর কোথা সংসারের খবরদারি করবার? উৎপলার মা সেই ছেলেগুলোরও মা হয়েছিলেন। তেতলার ছাতের কোণে ছোট্ট ঘরখানা—পুঁথিপত্র বই-কাগজে বোঝাই, হরিদাস বাড়ি ফিরেই ঐ ঘরে ঢুকে পড়তেন। কেউ বড়-একটা সেদিকে যেত না, আপন মনে তিনি পড়াশুনোয় ডুবে থাকতেন। সে একদিন গেছে। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে হরিদাস আর একরকম হয়ে যেতে লাগলেন। আজকে অবশেষে এই হাল। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। সে মানুষটি একেবারে মরে গিয়ে বোধশক্তিহীন নিতান্ত এক শিশু।

দুলালচাঁদ বিকাল নাগাদ আসবেন, আন্দাজ করা গিয়েছিল। এসে পৌঁছুতে রাত দুপুর। দু'খানা মোটরে ছোটখাট এক বাহিনী। মোটর শব্দসাড়া করে ফটক পেরিয়ে কম্পাউণ্ডে ঢুকল। উৎপলা বারান্দায় বেরিয়ে এসে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে, আসুন, আসুন, সমস্তটা দিন পথ তাকাচ্ছি। এই এতক্ষণ অবধি বাইরে বসেছিলাম—সবে কেবল দোর দিয়েছি। এত দেরি—কোন গোলমাল ঘটেনি তো পথে?

ত্রিদিবেরও ঘুম ভেঙেছে। নিতান্তই মরে গেলে এত সোরগোলে তবে ঘুমানো যায়। কিন্তু শয্যা ছেড়ে উঠল না সে। তার কি মুনাফা, রাত দুপুরে বেরিয়ে সে কেন যাবে খাতির জমাতে? শুয়ে শুয়ে শুনছে মজার কথাবার্তা। ভাগ্যিস যায়নি বাইরে! যা কাণ্ড—উৎপলার ঐ তোয়াজ দেখে হেসেই ফেলত হয়তো। অভিনয় করতে জানে বটে! গোটা মেয়েজাত ধরেই বলছে—অভিনয়ে ওদের জুড়ি নেই।

কি সব বলছে, শোন, ঐ উৎপলা। সমস্ত বিকাল ও অনেকটা রাত্রি অবধি তারা তো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। হাঁটুজল ভেঙে ধারোয়া নদী পার হয়ে রেল-লাইনের ধারে ধারে চলে গিয়েছিল প্রায় যশিডি অবধি। একবার বটে উঠেছিল দুলালের কথা। ঐ বাঁক পার হয়ে দুলালের নেভি-ব্লু কার হঠাৎ যদি সামনাসামনি এসে পড়ে! ঠিক আছে, হতভম্ব হয়ে যাবার পাত্র তারা নয়।—আপনার দেরি দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়লাম দুলাল-বাবু, ঘরে আর থাকতে নারলাম। পায়ে পায়ে এদ্দূর এই এগিয়ে চলেছি।

ঠিক এ কথারই রকমফের করে উৎপলা বলছে, এই এতক্ষণ অবধি বাইরে বসেছিলাম, সবে ঘরের দোর দিয়েছি…

দুলালের কথা একবার উঠে পড়ল তো সেই প্রসঙ্গই চলেছিল কিছুক্ষণ ধরে। কোনদিন কেৎত্র না লিখেও পিতৃপুরুষের ব্যবস্থায় সে নামজাদা সম্পাদক। লিখতে যাবে কোন দুঃখে (পারেও না অবশ্য)—দুটো দশটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিলে পরের নামে লিখে দেবার বিস্তর মানুষ আছে। ও বছর এক কাণ্ড হয়েছিল—

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি লাগছিল। উৎপলা আর ত্রিদিব বসে পড়ল যশিডির রাস্তার পাশে এক আমগাছের ছায়ায়।

শোন, এই বছর দুই আগে ভারি এক মজার ব্যাপার হয়েছিল ত্রিদিবদা। আমেরিকার একদল সাংবাদিক এলো কলকাতায়। এমনি তো দুলালের নাম খুব—তাকে এগিয়ে দিল সকলের মুখপাত্র হিসাবে। সে যে কী কষ্ট! কথাবার্তা বাড়ি থেকে আন্দাজি বানিয়ে দু-দিন ধরে মুখস্থ করে গিয়েছিল। ফিরিস্তির বাইরেও তবু দু-চার কথা এসে পড়ে। আমাকে তাই সঙ্গে নিয়ে-ছিল। সর্বক্ষণ আগলে ছিলাম, দুলাল কিছু বলবার আগেই তার হয়ে সমস্ত বলে দিই। খাতির কি সাধে করে?

ত্রিদিব বলে, শুধুই খাতির? তার উপরে কিছু নয় তো?

পলি প্রশ্ন করে, আর কি হতে পারে বল?

মনে করতে পারে, উৎপলা যদি চাকরি ছেড়ে আর কোথাও চলে যায়! তখন অমন করে আগলে বেড়াবে কে? তার চেয়ে এমন কিছু হোক, কোন দিন যাতে ভেগে পড়তে না পারে।

মুখ টিপে হেসে, উৎপলা বলে, সে যাই হোক উৎপলাকে দিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন ত্রিদিবদা। সে মরুক, জীবন্ত থাক, কিম্বা দুলালচাঁদ চিবিয়ে

চিবিয়ে খেয়ে ফেলুক, তোমার তাতে কি যায় আসে ?

এমনি সব কথাবার্তা। আর এক সময়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে উৎপলা বলেছিল, এলো না দুলালচাঁদ—উঃ, বাঁচা গেল। তার নাম শুনেই তো তুমি চলে যাচ্ছিলে ত্রিদিবদা। মোটর অ্যাকসিডেন্ট হয়ে কোথায় হাড়গোড় ভেঙে পড়ে আছে—কালকের কাগজে দেখো ছবি বেরুবে। নিজের কাগজ, তাই সকলের চেয়ে বড় খবর হবে ঐটা।

সেই উৎপলা রাত দুপুরে উঠে এসে কি বলছে শোন। গদগদ হয়ে উঠছে—পদাবলী-গানের নির্ভেজাল শ্রীরাধিকা—'পথ চেয়ে চেয়ে অন্ধ দু'আঁখি।' উঃ, এতও পারে মেয়েরা পুরুষ মানুষ হলে হেসে ফেলত ঠিক।

ঝুমাও এমনি। কত রকমারি ভূমিকায় অভিনয় করে এটুকু জীবনে। কিশোরী মেয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে গ্রামময় ছুটোছুটি করে বেড়াত, ক্ষণে ক্ষণে উলু দিয়ে উঠত উল্লাসিনী। ঢেঁকিশালে চিঁড়ে কুটছে—ভাড়ানিকে সরিয়ে দিয়ে নিজে উঠল ঢেঁকির উপর, পাড় দিচ্ছে দমাদম শব্দে, আবার তখনই দেখ কামরাঙা-গাছের মগডালের উপর। বাগের পুকুরে ভাঙা-রানার উপর ত্রিদিব ছিপ নিয়ে বসেছে, চারে মাছও লেগেছে, ফাতনা নড়ছে অল্প অল্প—এমনি সময় টুপ করে এক কামরাঙা পড়ল ফাতনার গোড়ায়।

এইও বাঁদর মেয়ে, দেখাচ্ছি মজা—

ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে ঝুমা পালাচ্ছে, ত্রিদিবও ছুটছে ধরবে বলে। হঠাৎ ঝুমা দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে পড়ল। থমকে দাঁড়ায় ত্রিদিব—কান্না প্রত্যাশা করা যায়নি ঐ মেয়ের কাছে। ও হরি, কান্না তো নয়—হাসি লুকিয়ে কান্নার অভিনয়। হাঁপিয়ে পড়েছিল—খানিকটা দম নিয়ে নিল এমনি কৌশলে। আবার দৌড়—

আর, ঝোড়ো রাতে ছেলে কোলে চেপে সেই ঝুমা যে বেরিয়ে গেল। পৃথিবী ঘুরেছে ত্রিদিব—কত দেশ, কত বিচিত্র মানুষের সমাজে তার গতিবিধি—তারই মধ্যে ঝিলিক দিয়েছে মেঘান্ধকার আকাশে বিদ্যুতের মতো স্ফুরিতাধর এক মা, কোলে সদ্য ঘুম-ভাঙা বাচ্চা ছেলের সাদা দু'পাটি দাঁতের হাসি। আবার অনেক দিন পরে কাগজে পাওয়া গেল আদর্শ দম্পতি শঙ্করনাথ মিত্র ও মাধবীলতা দেবীর অশেষ গুণবর্ণনা। খরস্রোত নদীগর্ভে মাধবীলতার গৌরবময় আত্মবিসর্জন। উঃ, এইটুকু জীবনে এতও পারে একটা মানুষ। মেয়েমানুষ বলেই পেরেছে।

সকালবেলা ত্রিদিবের মোলাকাত হল দুলালচাঁদের সঙ্গে। বারাণ্ডায় দলবল নিয়ে সে টেবিল ঘিরে চায়ের অপেক্ষায় বসেছিল। ত্রিদিব দেখেই চিনল, পরিচয় করিয়ে দিতে হল না। নামের সঙ্গে চেহারার এমন মিল কদাচিৎ ঘটে। এরা এসেছে সাকল্যে পাঁচটি মানুষ—তাজার জন্ম থাকলেও

তার মধ্য থেকে দুলালকে বেছে নেওয়া যায়। দু-হাতের আঙুলে মোট ছ'টা আংটি—দুটো বুড়ো এবং দুটো কড়ে আঙুল মাত্র বাদ। কিন্তু হাতে ঐ আংটিই শুধু মাত্র, মনের মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। ত্রিদিব বেরিয়ে আসতে দুলাল চেয়ার ছেড়ে একরকম ছুটে এসে তার হাত জড়িয়ে ধরল।

আপনার নামই শুনেছি এতকাল, আমার কাগজে রোজই প্রায় নাম দেখেছি. আজকে এই চোখে দেখলাম। পথে কাল বড় কষ্ট পেলাম। চাকা ফাটল। সেটার ব্যবস্থা করে হন্তদন্ত হয়ে এক নদীর ধারে এসে, স্যর, পাক্কা চার ঘন্টা। মাঝি মেলে তো নৌকো মেলে না; আবার অনেক কষ্টে এক নৌকো জোটালাম তো পাড়ার মধ্যে তখন একটা মাঝি নেই, সবাই কাজে গেছে। তা সে যা-ই হোক, সব কষ্ট সার্থক, অনেক লাভ হল এখানে এসে।

ভদ্রলোক ক'টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল একে একে। এই দু'জন হলেন ডাক্তার আর ঐ দু'টি দুলালেরই কাগজের লোক। দুলালচাঁদ ছাড়া কারো সাধ্য ছিল না ডাক্তারবাবুদের এতদূর টেনে হিঁচড়ে এনে হরিদাসকে দেখানো। একজন হলেন নাম-করা চোখের ডাক্তার, অপর জন মানসিক ব্যাধির। হরিদাসের চোখের ভিতরেও বসন্তর গুটি উঠেছিল, সেই জের মিটছে না কিছুতে। আর সুবোধ মারা যাওয়ার পর থেকে মাথার গোলযোগ দেখা যায়, সেটা ইদানীং বাড়াবাড়ি রকমের হয়েছে।

ডাক্তারের ব্যাপার অবশ্য বোঝা গেল, কাগজের লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছে কেন? যেমন-তেমন লোকও নন, গাল-ভরা নামের চাকরি। আর চেহারায় মালুম হচ্ছে, মাইনেও ওজনদার বটে। উৎপলাও এসে জুটল এর মধ্যে। সেজে-গুজে বের হয়ে আসতে দেরি হয়ে গেছে। পলিটা ইচ্ছে করলে এমন সুন্দর হতে পারে—ঝিকমিক করছে যেন দুলালচাঁদ আর এই লোকগুলোর সামনে। এমন রূপে দেখিনি তো আর কোন দিন—চোখ ফেরানো দায়। উঁহু, চোখ খুলে সোজাসুজি তাকানোই মুশকিল আকাশের সূর্যের দিকে যেমন। আড়-চোখে বেখে ঢেকে দেখতে হয়। আর এমন সমস্ত কথাবার্তা বলছে দুলাল-চাঁদের সম্পর্কে—আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় এমন স্তাবকতা বেরোয় কি করে মুখ দিয়ে? সুবোধের বোন হরিদাসের মেয়ের কিছু মর্যাদাজ্ঞান থাকা উচিত। ত্রিদিব যে হাসি চেপে প্রাণপণে গম্ভীর হচ্ছে, সেটুকু অন্তত টের পাওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ দুলালের কাগজের এরা যে দু'টি মোসাহেব এসেছে, উৎ-পলাও সেই ঝাঁকে মিশে গেছে। দুলালচাঁদের অনুগৃহীত তিন জন কর্মচারী—কোন রকম তফাত নেই ওদের মধ্যে।

চা খেতে খেতে দুলালচাঁদ জিজ্ঞাসা করে, জায়গাটা কেমন লাগছে ডক্টর ঘোষ?

চমৎকার।

সকলের দিকে সগর্ব দৃষ্টি হেনে দুলাল বলে, এই যে বাড়িটা দেখছেন, আমি নিজে মতলব খাটিয়ে বানিয়েছি। ইঞ্জিনিয়ার ডাকিনি, আগাগোড়া

সমস্ত প্লান আমার নিজের।

ত্রিদিব বলে, রাস্তার যত ধুলো তাই ঘরের মধ্যে ঢোকে। আর পিছনে কসাড় জঙ্গল হয়ে উঠেছে—বাঘ লুকিয়ে আছে কি না কে জানে? কি বিশ্রী বাড়ি করেছেন এমন ভাল জায়গায়? সামনে বাগান করে ঘরগুলো পিছিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

দুলাল একটু মুশড়ে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ সে ভাবে থাকবার মানুষ নয়। জায়গাটা ভাল তো বটে! ঝিরঝিরে ধারোয়া নদী, ওপারে উঁচুনিচু তেপান্তর মাঠ, পিছনে নন্দন-পাহাড়—এরই মধ্যে প্লটখানা খুঁজে পেতে আমিই বের করেছি। বাড়ি করা সার্থকও হয়েছে। নতুন বাড়িতে উৎপলা দেবীরা সর্বপ্রথম এসে রইলেন। কর্তার যা অবস্থা হয়েছিল, এখন তো অনেকটা সেরেসুরে উঠেছেন। আপনি বাইরে ছিলেন ডক্টর ঘোষ, চোখে দেখেননি—ওরকম ভয়ানক বসন্ত ভাবতে পারা যায় না। বাপে মেয়ে বিছানায় পড়ে, এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই।

উৎপলা ঘোরতর প্রতিবাদ করে, কি বলছেন? আমার দিদি—

দুলালচাঁদ তাড়াতাড়ি বলে, তা সত্যি। নার্স আনা হল মণিমালা দেবীকে, শেষটা ওঁর দিদি হয়ে পড়লেন, তাঁকে না পাওয়া গেলে কি যে অবস্থা হত!

উৎপলা হেসে বলে, ভাগ্য বড় ভাল। সমস্ত দায় আপনারা ভাগ করে নিলেন। দু-দুটো রোগীর খেদমত আর সংসারের সকল দেখাশুনোর ভার দিদি এসে কাঁধে তুলে নিল—আর আপনার জন্যে রাজার হালে চিকিৎসা-পত্তোর চলল, কোন দিন টাকা-পয়সার ভাবনা ভাবতে হয়নি। আপনার চেষ্টা-যত্নও কোনদিন ভুলতে পারব না দুলালবাবু।

দুলাল না না—করে ঘাড় নাড়ে। সে কি কথা! যত্ন এমন আর কি করেছি? ইচ্ছে থাকলেও কাজকর্মের ভিড়ে পেরে উঠিনে। দু-মাসে ছ-মাসে একটু খবরাখবর নেওয়া—তাই বা হয়ে ওঠে কোথায়?

উৎপলা বলে, তবু তো বার পাঁচেক এই এদ্দুর অবধি এসে দেখে গেলেন। ডাক্তারবাবুরাও বার বার কষ্ট করে আসছেন।

সকলেরই কিঞ্চিৎ অনতিস্ফুট প্রতিবাদ। দুলাল জোর দিয়ে বলে, এক বছরে পাঁচ বার আসা—সেটা খুব বড় কথা হল নাকি? অন্য অভিভাবক নেই,—সামনে বসে থেকেই দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশুনো করা উচিত। শুনুন একটা কথা—মণিমালা দেবী চলে গেছেন, আমি ঠাকুর-চাকর নিয়ে এসেছি—এবার রেখে যাব ওদের। রোগের দুর্বলতা যায়নি, সংসারের খাটাখাটনি করলে আবার আপনি বিছানায় পড়বেন।

খিলখিল করে হেসে ওঠে উৎপলা।

বছর হতে চলল, মুটিয়ে দিনকে দিন পর্বত হচ্ছি, এখনো রোগ?

রোগ বই কি!—কি বল হে ডাক্তার? বাইরে অমনি দেখা

দুপুরবেলাটা নিরিবিলি হল। গুরু ভোজনের পর দুলালচাঁদেরা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় ত্রিদিব চুপচাপ বসে। উৎপলা টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে এসে দাঁড়াল।

আজকেই যাচ্ছ ত্রিদিব-দা ?

সন্ধ্যের গাড়িতে—

তাই যাও, কি আর বলি। সত্যি সত্যি এসে গেল যে ওরা। কষ্ট করে এসেছে, দু পাঁচ দিন না থেকে নড়ছে না। তুমি কেন কষ্ট করবে এর মধ্যে পড়ে থেকে ?

ত্রিদিব জবাব দেয় না। কানেই শুনছে না যেন। তা বলে উৎপলা থামে না। বলে, আমরা দয়া নিচ্ছি, মানুষটাকে তাই সইতেই হবে। না সয়ে উপায় কি ? একটা কথা বলতে এসেছি ত্রিদিব-দা, তোমার কাছে এক প্রার্থনা। তুমি এসে গেছ, অকূল সাগরে ডাঙা দেখতি পাচ্ছি এবারে যেন।

একটু থেমে জোর করে সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বলে, বাবা সেই যে কথা বললেন, বাবার মেয়ে আমিও ঠিক তাই বলছি—বাঁচাও আমাদের। ইচ্ছে যদি কর, একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পার।

পাষাণ ত্রিদিব—সে বিচলিত হয় না। কৌতুক-চোখে চেয়ে অবস্থা পর্যালোচনা করছে। অর্ধোন্মাদ হরিদাস কি ভাবে বলেছেন, আর চতুরা মেয়েটা ঠিক সেই কথাই অন্য কি ভাবে বলে।

দুলালচাঁদ প্রেমে পড়ে গেছে মনে হয়—

বড়মানুষ—না খেটে আপনা-আপনি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে। কি করবে বসে বসে, একটা কিছু কাজ তো চাই।

একটু ম্লান হেসে উৎপলা আবার বলে, আমার তরফ থেকেও হয়তো গরজ ছিল প্রেমে পড়বার। সংসার ভারি কঠিন জায়গা। মানুষ দয়া করে কাউকে কিছু দেয় না, দায়ে পড়ে দেয়। দুলাল প্রেমে না পড়লে মুশকিল হত বাবাকে বাঁচিয়ে তোলা।

ত্রিদিব তখন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উৎপলার দিকে তাকিয়ে আছে। মৃদু মৃদু ঘাড় নেড়ে বলে, তা দোষ দেওয়া যায় না বেচারাকে। ভাল করে নজর করিনি কখনো, কিন্তু মনে হচ্ছে দেখতে নিতান্ত খারাপ নও তুমি উৎপলা।

উৎপলা হেসে বলে, খারাপ নই—তা বলে ভাল ? বাইরে থেকে ফিরে হঠাৎ বুঝি তোমার চোখ খুলে গেল ত্রিদিব-দা ?

চোখের সামনে এক যে বিদ্যুৎ ঝলসাত আগে, কোন-কিছু দেখতে দিত না। একেবারে অন্ধ হয়ে ছিলাম পলি—

হাহাকারের মতো শোনায়। উৎপলার চমক লাগে, কথা ঘুরিয়ে নেয়।

রূপের চেয়ে কিন্তু আমার ক্ষমতাটাই দেখেছে দুলাল। চটপট ইংরাজি বলা, এক এক জবান ছেড়ে বিদেশি সাংবাদিকদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। রূপ কি আছে আমার ? নেই। নইলে ধরো—

দ্বিধা হল একটু। কিন্তু আজকে উৎপলা মরীয়া। জীবন-মরণ ঝুলছে এই সুযোগটুকু ব্যবহারের উপর।

ধরো, সেই দশ বছর আগেকার একটা রাত। তোমায় নেমন্তন্ন করে-ছিলাম—মনে থাকবার কথা নয়—আছে মনে ত্রিদিব-দা?

ত্রিদিব ঘাড় নাড়ল।

আমি ঘুমিয়েছিলাম। বাবাও তাঁর ঘরের মধ্যে ঘুমে অসাড়। নীলমণি নিচের তলায়, দরজা খুলে দিয়ে সে শুয়ে পড়েছে। তুমি চুপিচুপি এসে বসে পড়লে আমার পাশে—

ত্রিদিব বলে, চমৎকার ঘুম তো তোমার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এত সমস্ত টের পেয়ে গেলে—

উৎপলা বলে চলেছে, পাশে এসে বসলে দশ বছর আগেকার সেই নিরালা রাতে। তখন তো বয়স আরও কম—চেহারায় জৌলুস ছিল। গালের উপর হাত রাখলে তুমি আমার রোমাঞ্চ হল।

রোমাঞ্চ নিতান্ত অকারণ—

উৎপলা রাগ করে বলে, হয়ই যদি, তুমি আমি তা ঠেকাব কি করে? বয়স কম, মনে তখন কত রকমের রং—

ত্রিদিব বলে, তোমার কানে ছিল হীরের দুল। আবছা আঁধারে দুলের গোড়াটা ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না। শখ করে গালে হাত বুলোতে যাব কেন?

বলছি তো তাই। কাঁচা হাতের চুরি—বড্ড ব্যথা দিয়েছিলে তুমি দুল খুলতে গিয়ে। দুল পকেটে পুরেই বাবার ঘরের সামনে এসে গিয়ে হাঁক পাড়তে লাগলে—

ফিক করে হেসে বলে, বড্ড রাগ হয়েছিল তোমার উপর ত্রিদিব দা। গয়না নিলে সে জন্য নয়—আলতো ভাবে হাত রেখে অমনি যদি বসে থাকতে আরও খানিক

লক্ষণ ভাল নয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তোমার এমন সব মতলব পলি।

বৈরাগী পরমহংস মানুষ যে তুমি—তোমার তাতে কি যায় আসে?

ত্রিদিবনাথ উৎকট হাসি হেসে উঠল।

আজব সার্টিফিকেট দিচ্ছ—আমি নাকি বৈরাগী মানুষ। সকলে যা বলে তার একেবারে উল্টো।

সকলের চেয়ে বেশি জানি বলে।

তোমাদের বাড়ির সেই ভাড়াটে মেয়ে সুধাময়ী—মনে নেই তার কথা?

কেন থাকবে না? তুমি দেশে ছিলে না, তখন কতবার গিয়েছি তার কাছে।

তাকে আর আমাকে জুড়ে সারা শহর ছি-ছি করত এক সময়ে। শহর ছাপিয়ে কেচ্ছা গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নির্বিকার কণ্ঠে উৎপলা বলে, সমস্ত মিথ্যে ত্রিদিব-দা—

অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারবে না। সুধার গর্ভের সন্তানটা মরে গেল বটে, তবু হাসপাতালের খাতায় আমার পিতৃপরিচয় রয়েছে।

ভ্রূভঙ্গি করে উৎপলা বলে, হাসপাতালওয়ালারা অমন কত কি লেখে।

আমার নিজের হাতের সই। অন্য লোকের লেখা নয়।

উঃ, মজাদার এক গল্প বচে তার নিচে সই মেরে সকলকে কি ধাপ্পাটাই দিয়েছিলে ত্রিদিবদা—

ত্রিদিব চটে গিয়ে বলে, তা তো বটেই। আমার দোষ তুমি কিছুতে দেখবে না। তারই এস্পার-ওস্পার করতে এতদূর এলাম। খবরের কাগজ কেটে কেটে পাহাড় জমিয়েছ—তার দুটো-পাঁচটা পড়লে অতি-বড় শত্রুকেও ঘাড় নেড়ে মানতে হবে, বিস্তর মহৎ কর্ম করে এসেছি নানান দেশে—

করেছ, সে কি মিথ্যে?

আমার গবেষণার ভুল বের করে টিটকারি দিয়েছেন পণ্ডিতেরা পচা-ডিম ছুঁড়ে মেরেছিল ছাত্রছাত্রীরা এক সভায়, ভাল ভাল কাগজে ফলাও করে কত গালি দিয়েছে--কই, এ সবের একটাও তো নেই তোমার সংগ্রহে?

ভাল মানুষের ভাবে উৎপলা বলে, কই দেখিনি তো।

দেখবেই তো না? তোমার কাটিংসের মালমশলায় ও-সমস্ত থাকলে নিষ্কলুষ মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় যে। সত্যি বলো পলি তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন আমায় নিয়ে?

জান না, সেই যে আমাদের চিরকালের বিরোধ। যখন ছোট এতটুকু ছিলাম তখন থেকে। কতবার জব্দ করেছি। এ-ও হল তাই, পাল্লা চলেছে আমাদের দুজনের। মহাস্ফূর্তিতে। তারপর বিদেশে চলে গেলে—আমি সেই সময় ফাঁক পেয়ে গেলাম।

উৎপলা সোজা হয়ে দাঁড়াল। রাজরাণীর মতো সগর্ব গ্রীবাভঙ্গিতে বলে, দেখা যাক কে হারে কে জেতে? এই বনবাসে পড়ে থেকে সুবিধে হচ্ছে না। তুমি ফিরে এসেছ, কোন ভয়ে আর পালিয়ে থাকব?

ত্রিদিব বলে, কবে যাচ্ছ বল দিকি?

হাওড়া স্টেশনে থাকবে?

উহুঁ, তার আগে লম্বা দিতে হবে—

তীব্র শ্লেষের সুরে উৎপলা বলে, এমন ভয় আমাকে?

একজনে এত ভাববে আমায় নিয়ে, এ আমি সইতে পারিনে পলি। পুরানো পিপাসা আমার মিটে গেছে। খ্যাতি যশ চাইনে, সকলে ভুলে যাক, আমার মৃত্যু হোক।

॥ এগার ॥

সেই সবুজ চিঠির খোঁজ পড়ল আজকে। ত্রিদিব বলে, চিঠিটা দাও আমাকে সুধা।

হঠাৎ ?

ছিঁড়ে ফেলে দেব। জীবনে যা চেয়েছিলাম, সমস্ত পেয়ে গেছি। এর পরে চিঠি রাখবার মানে হয় না। তোমারও আর দরকার নেই!

সুধা বলল, আমার দরকার কোনদিন ছিল না! তুমি চলে যাবার পর কত কষ্ট পেয়েছি, কত রকম উঞ্ছবৃত্তি করেছি। চিঠি বের করিনি তবু। বাক্সেই রয়েছে, হাত ছোঁয়াতে ঘৃণা হত।

ত্রিদিব হা-হা করে হাসে।

লোকে শুনলে বিস্তর সাধুবাদ দেবে তোমায় সুধা। এমন মহৎ আত্মত্যাগ কলিযুগে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু আমি জানি, এক নম্বরের হাঁদারাম তোমরা—ভাল ভাল কথা আউড়ে ঘাড় নামিয়ে দাও। তুখড় ব্যক্তিদের তাই কাঁধে পা রেখে উঁচু হয়ে উঠবার সুবিধা হয়।

নিঃশব্দ দৃষ্টির এক খোঁচা দিয়ে সুধা চিঠি আনতে গেল। ত্রিদিব চেঁচিয়ে বলে, এক কাপ চা ও এনো সুধারাণী। চিঠির দেরি হলেও ক্ষতি নেই—গলা খুসখুস করছে, চায়ের আগে দরকার।

একখানা মোটা বই সামনে খোলা। সাবধানে ভাব পেকে নোট টুকে-টুকে নিচ্ছে খাতায়। মুহূর্তে আবার নিবিষ্ট হয়ে গেল।

কতক্ষণ কেটেছে। টং করে ঘড়ি বাজতে চমক লাগল। চায়ের পিপাসা জেগে উঠল আবার।

গোপলা '

ডাক দিয়েই হুঁশ হল, গোপাল তো বাজারে গেছে। মিষ্টি করে ডাকে, অ সুধারাণী, ভুলে বসে আছ কি দরবার করলাম ?

চায়ের পিপাসা অদম্য হয়েছে। উঠে চলল সুধার খোঁজ নিতে, কি করছে সে এতক্ষণ ধরে ?

বারান্দা পার হয়ে উত্তরের প্রান্তে সুধার ঘর। ট্রাঙ্ক ও সুটকেশের সমস্ত জিনিসপত্র মেঝেয় ঢেলে ফেলেছে। তার পাশে সুধা গালে হাত দিয়ে বসে।

চায়ের কি হল ?

সুধার যেন সম্বিৎ ফিরে এল। বলে, তাই তো। উনুনে জল চাপিয়ে এসেছিলাম, এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে।

তার পরে কেঁদে ফেলে আর কি! পাচ্ছিনে তোমার সে চিঠি—

কি সর্বনাশ!

স্পষ্ট মনে আছে, সুটকেশের খোপে ছিল। তুমি যত চিঠি দিতে সমস্ত ঐ একটা জায়গায় রাখতাম।

খোপের ভিতর থেকে চিঠি বের করে করে দেখায় : এই দেখ, যাবার সময়

এডেন থেকে লিখেছিলে, জেনোয়া থেকে লিখেছিলে—সেই সমস্ত চিঠি অবধি রয়েছে। কত চিঠি! ঐ একখানাই শুধু নেই।

ত্রিদিব বিরক্ত সুরে বলে, আমার চিঠিপত্তোরের যাচ্ছেতাই হোকগে—কিছু যায় আসে না—সে চিঠি যে শেখরনাথের।

মনের উদ্বেগে নিজেও ঐখানে বসে পড়ে কাগজপত্র হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করছে।

কি ভয়ানক চিঠি, তোমার অজানা নেই। শেখর জানে, সব চিঠি পোড়ানো হয়ে গেছে। হয়েছেও তাই—এ একখানা ছাড়া। তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে নমুনা হিসাবে রেখে দিয়েছিলাম। যদি কোন দিন কাজে আসে।

বাইরের দিক থেকে হাঁক আসে, ঘোষ মশায় আছেন? ত্রিদিবনাথ, আছ নাকি বাড়িতে?

সুধার মুখের দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে ত্রিদিব বলে, মতলব করে সরিয়ে রাখনি তো?

এত বড় কথা বলছ তুমি দাদা?

হয় তো ভাবলে, এখন না হোক পরে কোন না কোন সময় কাজে লাগবে। তুমি বেহাত করতে চাও না। নয় তো পাখনা বেরিয়েছে কি চিঠির, উড়ে গেছে? খুঁজে দেখ, চিঠি আমি চাই-ই।

কি আশ্চর্য, বাইরের ঘরে ভুজঙ্গবাহাদুর। এত কাণ্ডের পরেও বাড়ি বয়ে এসে তিনি আপ্যায়ন করছেন।

কি আনন্দ হয় যে ভায়া তোমায় দেখে। মেসের সেই একটা সিটে দু-ভাই জড়াজড়ি করে ঘুমিয়েছি। আজকে তুমি কত বড়। দেখে আনন্দ, শুনেও আনন্দ।

ত্রিদিব বলে, বড় হই যা-হই, আপনি করেছেন। নিরাশ্রয় হয়ে পথে ঘুরেছিলাম, মুখ ফুটে না বলতে আপনি জায়গা দিলেন।

ভুজঙ্গ বাড়ুয্যে হেঁ-হেঁ করে হাসেন, ওসব তুলে লজ্জা দাও কেন ভায়া? কত পুরানো ভাবসাব আমাদের! একটুখানি অসুবিধায় পড়েছিলে বটে—কিন্তু আমি নির্ঘাৎ জানতাম, আগুন ছাইচাপা থাকবে না, দপ করে জ্বলে উঠবে। হলও তাই।

ত্রিদিব একই সুরে বলে চলেছে, উপকারের কি অন্ত আছে? ঝুমা—আপনার বউমা, মাধবীলতা বললে চিনতে পারবেন—পাঁয়ে পড়ে ছিল, চিঠি লিখে আনলেন তাকে। এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে ছেলেসুদ্ধ তাকে পাঠিয়ে দিলেন ঝড়বাদলের মধ্যে—

ভুজঙ্গ প্রতিবাদ করে ওঠেন: আমি চিঠি লিখেছিলাম? কোন্ আহাম্মক বলে এমন কথা? শত্রুরে তোমার কান ভাঙাচ্ছে ভায়া।

বলেছিল ঝুমা নিজেই। আহা, চাপতে চাচ্ছেন কেন? ভালই করেছেন—মেসে থাকতে দিয়ে যা করলেন, তার চেয়ে বেশি ভাল। আমার পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়ে মা আর ছেলে সরে পড়ল। অত বড় কাজটা কত সহজে কেমন কৌশলে আপনি করে দিলেন। আরও এক সুখবর দিই জংবাহাদুর, মা টা একেবারে সরেছে। ছেলের খবর সঠিক পাইনি, কিন্তু মা কি আর ফেলে গেছে সেটাকে?

বলতে বলতে ত্রিদিব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমার সম্মান প্রতিষ্ঠা ধরতে গেলে, আপনারই দয়ায় সমস্ত। বসুন, জুতো খুলে আরাম করে বসুন সোফার উপর। রবিবার—আজকে তো অফিসের ঝামেলা নেই। খেয়ে যান এখান থেকে। দু'জনে একসঙ্গে স্ফূর্তি করে খানাপিনা করি।

হাসছে ত্রিদিব। ভুজঙ্গ অস্বস্তি বোধ করছেন। বললেন, আজকে বড় ব্যস্ত। আর একদিন হবে ভায়া। তোমার এখানে খাব, তাতে আর কথা কি। রবিবার বলছ—রবিবার বলে রেহাই নেই আমার, নতুন বাবু চোখে হারান। এই দেখ, তাঁরই এক কাজ নিয়ে এসেছি।

নিমন্ত্রণ-পত্র ত্রিদিবের হাতে দিলেন। বড় সাইজের কার্ড, বাহার করে ছাপা। এপাশে-ওপাশে একটু ছবিও আছে। নজর করে দেখবার মতো। দুলালচাঁদ নিমন্ত্রণ করছে তার কাগজের বার্ষিক উৎসব—বিরাট রিসেপসান বরানগরের বাগানবাড়িতে। তাই বটে, মনে পড়েছে,—জংবাহাদুরের চাকরি দুলালের কাগজেই তো। হিসাব-বিভাগের এক কেরানি তিনি তখন। মানিক-চাঁদের আমল। বুড়ো মনিব মরে গিয়ে নতুন আমলে ভুজঙ্গ বেশ তালেবর হয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে। দুলালচাঁদ তাকে চোখে হারায়।

এক নজর চোখ বুলিয়ে ত্রিদিব চিঠিটা বাজে-কাগজের ঝুড়িয়ে ফেলে দিল। ভুজঙ্গ হাঁ হাঁ করে ওঠেন, যাবে না ওখানে?

হাঁ—

তবে ফেলে দিলে যে?

তুলে দেখুন, ঐ দিন ঐ সময়ে অমন দশ-বারটা নিমন্ত্রণ আছে। সমস্ত জায়গায় যাব।

বলে ত্রিদিব হাসতে লাগল। বলে, চিঠিপত্র ঐ এক জায়গায় রেখে দিই। গোপলা নিয়ে গিয়ে উনুন ধরায়। আজকাল সে কেরোসিন কেনে না, কেরোসিনের পয়সা ক'টা মেরে দেয়।

ভুজঙ্গ আহত কণ্ঠে বলেন, কিন্তু অন্যের সঙ্গে দুলালবাবুর চিঠির তুলনা?

ঠিক। চিঠিটা অনেক ভাল—মোটা কাগজে ছাপা, অনেকক্ষণ ধরে পুড়বে।

ভুজঙ্গ কাতর হয়ে বলেন, বাবু নিজে আসতেন, তা বড় মুখ করে আমিই তাঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এলাম। একলা একজন মানুষ তাবৎ শহর জুড়ে

নেমন্তন্ন করে বেড়াচ্ছেন। আগ বাড়িয়ে গিয়ে তাই বললাম, আমার অতি-আপন মানুষ—আপনার চেয়ে আমার যাওয়ায় কাজ বেশি হবে, নির্ঘাৎ তাকে আনতে পারব।

তারপর আর এক কথা মনে উঠল ভুজঙ্গর। একটু হেসে বললেন, চায়ের কথা লেখা চিঠিতে—তাই ভেবেছ বোধ হয় নিরামিষ চা! শুধু চায়ের নামে বরানগর অবধি যেতে চাচ্ছ না?

ভাল মানুষের ভাবে ত্রিদিব বলে, আছে নাকি কিছু চায়ের উপরে?

কিছু মানে? গিয়েই দেখো, ঠকবে না। অঢেল আয়োজন। আমার আবার মুশকিল হয়েছে, ইংরেজি খাদ্যাখাদ্যের নাম বিলকুল ভুলে যাই! খেয়েদেয়েই শেষ নয়—তারপরে গান-বাজনা। সারা সন্ধ্যে জুড়ে হুল্লোড়।

মজা লাগছে। চিঠি হারানোর উদ্বেগ ভেসে গেছে মন থেকে। ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে আরো অনেকক্ষণ শোনা যেত, কিন্তু উৎপলা দরজায়। হাসতে হাসতে সে এসে ত্রিদিবের পাশে বসল।

ত্রিদিব শিউরে ওঠার ভঙ্গি করে বলে, এসে গেছ কলকাতায়? আরে সর্বনাশ -হাঁড়ি অবধি চিনে নিয়েছে? যশস্বী মানুষের কী দুর্গতি। এত দূরে শহরতলিতে এসে বাসা বেঁধেও আস্তানা গোপন থাকে না। কর্মনাশিনী এতদূর অবধি যখন হামলা দিয়ে পড়েছে, কলকাতা না ছেড়ে কোন উপায় নেই।

কলকাতা ছেড়ে যাবে কোথা শুনি? পৃথিবীটা বড্ড ছোট। পালিয়ে বাঁচবার জো নেই। সেই যে সাধুসন্তরা বলে, পদ্মপাতায় জলের মতন এতটুকু জীবন—হেলাফেলায় তার অনেক গেছে, অনেক গেছে। আর তোমায় ফাঁকে ফাঁকে থাকতে দেওয়া হবে না ত্রিদিবদা।

শেষ দিকটায় কণ্ঠ অস্বাভাবিক রকম ভারী। মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে সামলে নিল উৎপলা। ম্লান হেসে বলে, যাক গে—পরের কথা পরে। আপাতত কোন কু-মতলব নেই। তোমায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

কার্ড বের করতে জংবাহাদুর বলে উঠলেন, আমারও ঐ একই ব্যাপার। আজে বাজে নানান কথা বলছে আমায়। দেখুন, আপনি যদি পেরে ওঠেন।

ত্রিদিব বলে, ওঁকে নাকচ করে দিলাম তো তুমি এসে হাজির। তোমায় নাকচ করলে বুঝি খোদ মনিব দুলালচাঁদ এসে উদয় হবে?

উৎপলা ঘাড় দুলিয়ে বলে, আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না ত্রিদিবদা। তাই জেনেই তো এসেছি।

কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো, আমার উপর এত হামলা কেন? টেনে-হিঁচড়ে আমায় না নিয়ে গেলে যজ্ঞপণ্ড হবে, এমনিতরো ভাব দেখছি।

জংবাহাদুর খোশামুদি সুরে বলেন, নিরতিশয় গুণী ব্যক্তি যে তুমি।

এমন গুণী হাজার হাজার আছে।

উৎপলা বলে, কিন্তু ত্রিদিবনাথ ঘোষ একজন—এই একটি মাত্র।

জংবাহাদুর ঐ সঙ্গে জুড়ে দেন, কী মায়ায় বেঁধে ফেলেছ আমাদের নতুন বাবুকে। গুণগরিমার যে ফিরিস্তি দিচ্ছেন, সে সব যদি নিজের কানে একবার শোন—

ত্রিদিব বলে, কিন্তু ত্রিদিব ঘোষ বিহনে তো উনিশটা উৎসব নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেছে। বিংশ বার্ষিকীতে না গেলেও দুলালের কাগজের রোটারি মেশিন অচল হয়ে থাকবে না।

উৎপলা বলে, যদি বলি আমারই জন্মবার্ষিকী ওটা—

তাই নাকি? কার্ডখানা ত্রিদিব উল্টে পাল্টে দেখে।

কার্ডে কি পাবে, ছাপার অক্ষরে থাকে কি সব কথা? আমি বেঁকে বসলাম, আমার নামে কিছুতে উৎসব হবে না। তখন ঐ কাগজের বেনামিতে হল। কাগজের জন্মতারিখ চলে গেছে দেড় মাসের উপর।

কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে ত্রিদিব বলে, বটে?

যা-ই ভাব তুমি, কথাটা সত্যিই এই। খবর নিয়ে দেখগে।

ভুজঙ্গকে দেখিয়ে বলে, ইনি তো অনেক কাল আছেন। বলুন দিকি, আর কখনো এই ধরনের উৎসব হয়েছে কিনা।

কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে উঠল। উৎপলা বলে আমার জন্মদিনে আশীর্বাদ কোরো ত্রিদিবদা, সুখ-শান্তি আসে যেন জীবনে। লড়াইয়ের সিপাইর মতন দৌড়-ঝাঁপ করে করে আর পারিনে।

টেলিফোনের আওয়াজ এল। ফোন ধরতে ত্রিদিব ভিতরে গেছে। জংবাহাদুর বলেন, আপনার সঙ্গে খাতিরটা বেশি দেখা যাচ্ছে।

উৎপলা ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, মোটেই দেখতে পারেন না আমায়।

তাই বললে শুনব? একই জিনিস—আমার চিঠি ছুঁড়ে দিল ঝুড়িতে আপনার চিঠি দু-দুবার পড়ে পকেটে পুরল। অথচ ধরুন, সেই যখন মেসে থেকে পড়াশুনা করত, ভাই ভাই এক ঠাঁই তখন থেকে। আজকের কথা? তার কোন খাতির হল না, রমণী বলেই আপনার এত সমাদর।

উৎপলা পুলকিত কণ্ঠে বলে, আপনার মেসে থেকে পড়তেন? আমাদের বাড়িতে খুব যেতেন সেই সময়টা। কলেজের কতটুকুই বা পড়া—কিন্তু বাইরের কত পড়াশুনো করতেন ঐটুকু বয়সে।

জংবাহাদুর বলেন, আর লম্বা-লম্বা কথা—হেনো করেঙ্গা, তেনো করেঙ্গা। কথা অবশ্য খানিকটা বজায় রেখেছে—দিগ্‌গজ হয়ে ফিরেছে বিদেশ থেকে। কিন্তু হলে কি হবে—অতিশয় হারামজাদা ব্যক্তি।

উৎপলা স্তম্ভিত হয়ে তাকাল।

জংবাহাদুর আরও জোর দিয়ে বলেন, এক দোষে সমস্ত মাটি। ওই যে বলে থাকে, কড়াই ভর্তি দুধে যৎসামান্য গোময়। বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে, অথচ খাতিরের মানুষ আপনিই কেবল জানেন না?

উৎপলা হেসে ফেলল। হেসে বলে, কেমন খাতির বুঝে নিন তবে।

জংবাহাদুর বলেন, গোপন করেছে আপনাকে। কিম্বা বিদ্যাধরী-ঘটিত ব্যাপার—লজ্জা হয়েছে আপনার কাছে বলতে। না-ই বলল—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কানে ছিপি এঁটে ঘোরাফেরা করেন? এত বড় ব্যাপার, নইলে তো, না শোনবার কথা নয়।

কানে শুনলেই কি সব বিশ্বাস করা যায়?

উত্তেজিত হয়ে ভুজঙ্গ বলেন, স্বচক্ষে দেখে নয়ন সার্থক করে আসুন তবে। আপনার ভিতরে যাবার বাধা নেই—ভিতরেই রয়েছেন দেবীটি। আমার সঙ্গে কত কালের চেনাজানা—তবু ছায়া মাড়াইনে। নতুন বাবু নেহাত বলে বসলেন—কি করা যায়—ঘেন্না-ঘেন্না করে আসতে হল।

· ত্রিদিব ফিরছে দেখে থতমত খেয়ে চুপ করলেন। ত্রিদিব বলে, কি হচ্ছিল আপনাদের?

ভুজঙ্গ সুর বদলে বলেন, যখন মেসে থেকে কলেজে পড়তে সেকালের সেই সমস্ত পুরানো কথা। শুনতে চাচ্ছেন ইনি। অতিশয় সৎ ছেলে—পানের খিলিটা অবধি মুখে দিতে না। এখনকার তাঁদোড় ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলো দেখে সে আমলের আন্দাজ মিলবে না। যে চারা বড় হবে, তার একটা পাতা দেখে বোঝা যায়। আমরা তখন থেকেই জানি এই মানুষের জুড়ি ভূ-ভারতে মিলবে না।

উঠে পড়লেন তিনি। ত্রিদিব বলে, আপনার নিমন্ত্রণ নিলাম জংবাহাদুর। যাব। দুলালচাঁদ বাবুকে বলবেন।

ভুজঙ্গ ভ্রূকুটি করে বলেন, আমার আর হল কোথায়? ছোট ভাইয়ের মতন আগলে রেখে ঝগড়া করে বেড়িয়েছি মেসের লোকের সঙ্গে। যাকগে যাকগে—যার নিমন্ত্রণে হোক, গেলেই হল। নতুন বাবুর বড্ড ইচ্ছে, তোমায় নিয়ে যাবার।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন - ত্রিদিব মনোরম গোছের কিছু বলে সান্ত্বনা দিত, তার সময় হল না। উৎপলা বলে, ভুল বলে গেলেন—উনি কিছু জানেন না। ইচ্ছে আমারই, আমার ইচ্ছেটাই বসিয়ে দিয়েছি দুলালচাঁদের মুখে।

মতলব কি বল দিকি?

নিয়ে গিয়ে উৎপলা দেবীর খাতিরটা দেখাব, বড় বড় লোকে কত তাকে সমীহ করে! দেখে শুনে তোমারও যদি কাণ্ডজ্ঞান হয়—মনের মধ্যে একটু-খানি যদি হিংসে আসে।

খিল-খিল করে তরঙ্গিত হাসি হাসে উৎপলা। ত্রিদিব বলে, ফোন করছিল কে জান? শেখরনাথ। সে-ও এক হাসির ব্যাপার। কোন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী ভর করেছেন তার শাঁসালো স্কন্ধে। অর্থাৎ, বোঝা গেল, বয়স যা ই হোক—বুড়ো হয়ে পড়েছে শেখরনাথ। এতক্ষণ ধরে সেই মহাপুরুষের অলৌকিক গুণ-ব্যাখ্যান। উক্ত মহাপুরুষের আশ্রমে আমায় একদিন নিয়ে

যেতে চায়।

যেও না ত্রিদিবদা, খবরদার! অতি ভয়ানক ঠাঁই। এই হল কায়দা। শিষ্যরা জপিয়ে জপিয়ে ভালমানুষ ভদ্রলোকের খপ্পরে নিয়ে ফেলে। আড়-কাঠির মতন ব্যাপার—কি পরিমাণ বখরা সেটা অবশ্য বাইরে প্রকাশ পায় না। তারপরে জ্ঞানবুদ্ধি ধনসম্পত্তি সর্বস্ব গুরুপদে সমর্পণ করে দিয়ে কোমর বেঁধে তোমায় নামজপে লাগতে হবে।

ত্রিদিব বলে, না নামজপের গুরু নয়। মডার্ন সাধু—ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের পাঞ্চ করে যাঁরা তত্ত্ব ছাড়েন। আদায় কাঁচকলায় বেমালুম এঁরা মিশ খাইয়ে দেন। শেখরনাথের ইস্কুলের বাচ্চাগুলো নিয়মিত এই ধর্ম-বিজ্ঞানের মিকশ্চার সেবন করবে, তারই আয়োজন চলেছে। কি পরিমাণ চিনি ও জল মিশ্রণে উদ্গার উঠবে না, আমার সঙ্গে তৎসম্বন্ধীয় নিগূঢ় আলোচনা।

উৎপলা বলে, সুধা কোথায়? ভিতরে বসে বসে করছে কি এখন?

চেন তাকে?

তোমার চেয়ে বেশি চিনি, মনে হচ্ছে। এ বাড়ি চিনে এলাম আজকে নয়। তুমি বিলেত ছিলে, কতবার এসেছি তখন। তার পরে সুধা দরজায় তালা দিয়ে সরে পড়ল। পাড়াগাঁয়ের ভাত খেয়ে কেমন মুটিয়ে এল দেখি। দেখে নয়ন সার্থক করি গে।

ত্রিদিবকে ডাকে, এস না। একা কেন বাইরে থাকবে?

না, যাও তুমি। আমার কি দরকার?

কেমন উদাস ভাব ত্রিদিবের। কি ভাবছে? মোটা বইটা আবার খুলে বসল।

॥ বারো ॥

থমথমে মুখ সুধার। উৎপলা গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

কি হয়েছে? বল, বলতেই হবে। আমায় গোপন করে দুঃখ পুষে বেড়াবে, তা কি হয় কখনো?

আবার বলে, চুপ করে থেকে এড়াতে পারবে না আমায়। পেরেছিলে সেই আর একদিন?

চিরুনি নিয়ে সুধার উস্কোখুস্কো চুলগুলো পরিপাটি করে দিচ্ছে। আদর পেয়ে সুধার দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রু গড়ায়। কত দিন পরে, আহা, কাঁদছে সে আবার উৎপলার মুখোমুখি বসে।

বল—

সুধা বলে, দাদা যাচ্ছে তাই করে বলেছে। একটা চিঠি হারিয়ে ফেলেছি —জরুরি চিঠি—তাই বলল, মতলব করে সরিয়ে রেখেছি নাকি আমি।

উৎপলা লঘুভাবে উড়িয়ে দেয়, এই ? আমি ভাবছি না জানি কি-একটা ব্যাপার—

সুধা আশায় আশায় তার দিকে তাকায়।

দেখেছ সে চিঠি? সবুজ কাগজে লেখা, সবুজ রঙের খাম। জান, কোথায় আছে—কে নিয়েছে?

চিঠি আমার কাছে। নষ্ট হয়নি—পরম যত্নে রেখে দিয়েছি।

তুমি পেলে কি করে?

চুরি করেছি—

সুধা স্তম্ভিত হয়ে গেল। চোরের কিন্তু লজ্জা নেই, আবও জাঁক করে বলে, মতলব আমার খারাপ গোড়া থেকেই। কি ভেবেছিলে বল তো সুধা? তোমার মতন নিখুঁত পুণ্যবতী এক মেয়ে—কবে কি একটু রোমান্স করেছিল, সে ভুলেব এখনো প্যানপ্যানানি গেল না—খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে আসতাম বুঝি নাকিকান্না শুনতে? কান্নার বড় অভাব কিনা সংসারে, কান্না শুনতে এতদূর তাই আসতে হয়।

সুধা বলে, আর দাদা ভাবলেন কিনা মতলব করে চিঠিখানা সরিয়ে ফেলেছি আমি। দাদাও এই যদি ভাবেন, সংসারে তবে কার মুখে তাকাই?

উৎপলার কোলেব উপর মুখ ঝেঁপে পড়ে। কান্নাব আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ক্ষণ পরে উৎপলা তার মুখ তুলে ধরে চোখের জল মুছিয়ে দেয়। গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, এত দিনেও বুঝলে না কি রকম খাপছাড়া মানুষ ত্রিদিবদা? রাগ করো না ওর উপর, করুণা করো। এত বড় প্রতিভা নিয়ে সকলের দরজায় দরজায় ঘুরেছে ছন্নছাড়া ভিখারির মতো। অবৈধ কথাটা নিয়ে চতুর্দিকে চি-চি পড়ে গেল, সকলে রংদার গল্প ছড়াচ্ছে। আমি চিনি ওকে—একা আমিই কেবল ঝগড়া করে বেড়াই— হতে পারে না কখনো এমনটা—

মুখ তুলে সুধা প্রশ্ন করে, কেন?

গাঁয়ের ইস্কুল থেকে পাশ করে সেই কলেজে পড়তে এল, তখন থেকে দেখছি ত্রিদিবদাকে। এই সব অতি সাধারণ পাপ-অন্যায় ও মানুষের দ্বারা হয় না। হয়নি যে—তার প্রমাণ আজকে আমার হাতের মুঠোয়। সন্দেহটা ঘোরতর হল তার নিজের উৎসাহ দেখে—নিজের দুর্নাম কেন অমন করে রটিয়ে বেড়ায়? ডাইনে বাঁয়ে যাঁকে পায় কীর্তি জাহির করছে তার কাছে। বুঝলাম 'কিন্তু' আছে। হাওড়া-স্টেশনে তোমায় পেয়ে গেলাম, নইলে খুঁজে-পেতে তোমার সঙ্গে পরিচয় করতে হত।

সুধাময়ী অভিমান ভরে বলে, মতলব নিয়ে ভাব করেছ উৎপলা— ভালবেসে নয়?

ভাল পরে বেসেছি। তাড়াতাড়ি চিঠি সরাতে হল—সাধু সদাশয় তোমরা, হয়তো বা ধর্ম রেখে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেবে। তোমার উপর যত অন্যায়

সেই কথাই বাইরে এসে ত্রিদিবের সঙ্গে হচ্ছে। উৎপলা বলে, বিষম অন্যায় তোমার—মিছামিছি সন্দেহ করেছ। এত দিন ধরে দেখছ—সন্দেহ আসে তবু ওর ওপর। এখনো সুধার রাগ পড়েনি।

ত্রিদিব বলে, রাগ করতে জানে তা হলে? ভাল, ভাল। আমি ভেবে-ছিলাম, বরফে-গড়া মেয়েটা—তাপে গলে যায়, অগ্নিকাণ্ড ঘটে না। কিন্তু এত বড় দুষ্কর্মে তোমার মতি হল কেন পলি? চুরি করা বড় দোষ, ছোটবেলা থেকে শিখে আসছ—

উৎপলা হেসে উঠল, কিছু না, কিছু না—মহাজনের পন্থা। দুলচুরির সময় তোমার হাত সাফাইয়ের কায়দাটা শিখে নিয়েছিলাম। শিক্ষাটা বড্ড কাজে এল। নইলে কি আর এমন মুঠোর ভিতর পেতাম তোমায়?

মুঠোয় গেছ পেয়ে? সরু সরু আঙুলগুলোর তো ভারি অহঙ্কার।

উৎপলা বলে চলেছে, চল্লিশ বছর বয়স হল—অপবাদ কাঁধে দিব্যি ফাঁকে ফাঁকে কাটিয়ে যাচ্ছ। চিঠি যে তোমার সকল ভণ্ডামি ফাঁস করে দেবে ত্রিদিবদা।

চিঠিতে আছে নাকি যে আমি নিষ্কাম নির্লোভ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির?

অমনভাবে না-ই থাকুক—সুধা আর নিজেকে নিয়ে পরম আনন্দে যা রটনা করে বেড়াতে, সেটা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেল। শেখরনাথ যে সে মানুষ নন। দাতাকর্ণ শেখরনাথ, সত্যসন্ধ শেখরনাথ, দেশ প্রেমিক শেখরনাথ, স্বজাতিবৎসল শেখরনাথ—যত রকম গুণ থাকতে পারে সমস্ত একাধারে একটি মানুষের মধ্যে। সেই শেখরনাথ চিঠির মধ্যে লিখিতভাবে বলে দিচ্ছেন—তুমি যতই গলা ফাটাও, কেউ তোমায় বিশ্বাস করবে না।

ত্রিদিব তর্ক ছাড়ে না তবু।

না হয় মিছেই হল সুধাময়ীর ব্যাপারটা। সুধা ছাড়াও মেয়ে আছে। দুনিয়ায় অন্নের অভাব—কিন্তু পুরুষের কাছে মেয়ে কোন দেশেই দুর্মূল্য নয়।

উৎপলা বলে, সে পুরুষ তুমি নও—আমি হলপ করে সাক্ষি দেব। নইলে, ধর, দশ বারো বছর আগেকার কথা—তখন হয়তো একেবারে খারাপ ছিলাম না দেখতে—তুমি দুল নিলে, কোমলভাবে গালের উপর হাত রাখতেও পারতে একটুখানি। আমি ঘুমিয়েছিলাম, কোন কিছুই জানবার কথা নয়।

ত্রিদিব হেসে উঠল, তবু এত সমস্ত জেনে রেখেছ। আমারও সন্দেহ হয়েছিল কপট ঘুম। হয়তো বলে দেবে। মনে মনে দুটো-একটা গল্পও ছকে রেখেছিলাম।

উৎপলা আবদার করে, একটা গল্প বল দিকি শুনি।

এতকাল পড়ে তাই আর মনে থাকে! তখন যা অবস্থা, একটা কলঙ্ক-টলঙ্কও দিতে পারতাম। এই ধর দুল বেচে একটা প্রেমোপহার কিনে দিচ্ছে বলেছ আমায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড তুমি পরের দিন বললে, দুল জোড়া

হারিয়ে-গেছে।

উৎপলা কপাল চাপড়ায়, হায় হায়—সত্যিকথা কেন বললাম না রে!

বললে কিছুই হত না। আমার জবাব পেয়ে মেশোমশায় লজ্জায় ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিতেন।

উৎপলা বলে, কিম্বা লজ্জা ঢাকবার জন্যে হয়তো বিয়েই দিয়ে দিতেন তোমার সঙ্গে।

সবনাশ, বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছিল নাকি?

হাসিমুখে স্থির কণ্ঠে উৎপলা বলে, ইচ্ছে তো এখনো—

স্তম্ভিত বিস্ময়ে ত্রিদিব নির্বাক হয়ে যায়। উৎপলাই কথা বলে প্রথম।

কি ভাবছ?

বিয়ের বয়সই বটে আমার। মোটে চল্লিশ। বরের সজ্জায় চেহারাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি।

এগারো বছর আগে তোমার বয়স ছিল উনত্রিশ, আমার বাইশ। সেই পুরানো ছবিটারও আন্দাজ নিও। ভাবনা নেই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বয়সে এগিয়েছি।

আশ্চর্য বটে। মেশোমশাইর টাকাকড়ি আছে, তুমি লেখাপড়া জান, দেখতেও—না, একেবারে দূর-ছাই বলা চলে না। এগারোটা বছর নবেলি কায়দায় নিশ্বাস ফেলে ফেলে বুড়িয়ে এলে—কোন-একটি প্রেমিকের টনক নড়ল না?

উৎপলা বলে, মিছে কথা বোলো না ত্রিদিবদা। হালফিল একটি তো চোখের উপরে দেখতে পাচ্ছ—দেওঘর অবধি পিছন ধরে গিয়েছিল, বেনামিতে আমার জন্মদিন পালন করছে। আর, যাচ্ছ যখন পার্টিতে—আরো হতাশ প্রেমিকের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে।

তবে?

পোড়াকপাল আমার। কাউকে পছন্দ হয় না। সেই যে আমাদের বাড়ি এক পাগল আসত, মনে আছে? কাপড় পরিস নে কেন পাগলা? না, পাড় পছন্দ হয় না। আমারও হল তাই। স্বামী বলতে মর্যাদায় বাঁধবে না, এমন মানুষ খুঁজে পাই নে।

একটু থেমে ফিক করে হেসে বলে, এক তুমি ছাড়া—

ত্রিদিবও হেসে বলে, লক্ষণ খারাপ।

শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় লক্ষণ মিলে যাচ্ছে ত্রিদিবদা। আমার ফুলের সঙ্গে সেদিন হিয়া মন-প্রাণও চুরি হয়ে গেছে বলে ঠেকছে।

খিল-খিল করে উচ্ছ্বসিত হাসি হাসে। তারপর হাতঘড়ির দিকে এক নজর চেয়ে উঠে পড়ল।

কাণ্ড দেখ! কত জায়গায় নেমন্তন্ন বাকি—এখানে আড্ডা দিয়ে আমি সময় কাটাচ্ছি।

যেন ঝড় তুলে দিয়ে উৎপলা চলে গেল। হাসি, কথাবার্তা কণ্ঠস্বর—সমস্ত আজ আশ্চর্য। চেনাজানা পলি থেকে একেবারে আলাদা আজকের এই উৎপলা। যা সমস্ত বলে গেল, সত্যি না ঠাট্টা, ধরা মুশকিল। মুখভরা হাসি দেখে মনে হয়, ভাবি এক রসিকতা। কিন্তু ঐ দৃষ্টিতে চেয়ে অমন উত্তপ্ত আকুল কণ্ঠে বলে যাওয়া—তখন নিসংশয় হতে হয়, কথা বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে নয়, গভীর অন্তর থেকে। অন্তর মিথ্যাবাদী হয় না মুখের মতো।

কত বেলা হয়ে গেল, তবু সেই একটা জায়গায় স্থাণু হয়ে আছে বসে। ভাবছে, হারানো কথা। এক ফোঁটা মেয়ে বাড়িময় দুষ্টু ম করে বেড়াত, সুবোধ আর তাকে অপদস্থ করবার জন্য কতরকম ছলাকলা, হরিদাস বকুনি দিলে হি-হি করে হেসে ফেটে পড়ত। বিচ্ছু মেয়ে বলত তারা পলিকে. ও-মেয়ের কান দুটো আচ্ছা করে মলে বাঙা করে দিলে তবে রাগ মেটে। কিন্তু গায়ে হাত ঠেকাবার জো ছিল না নিজের সহোদর ভাই সুবোধেরও। চেঁচিয়ে লাফিয়ে কান্নাকাটি করে পাড়াসুদ্ধ এমন জানান দেবে, যেন এক খুনখারাবি হয়ে গেছে। সেই পলি কত বড় হয়ে গেছে এখন। আর কি আশ্চর্য। মনের তলে অঙ্কুরের মতন ভালবাসা লালন করে আসছে এতকাল ধরে, ডালপালায় শতেক কুসুম ফুটিয়ে প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে কিছুই জানতে পারেনি। অন্য কেউ হলে নজরে পড়তো হয়তো, কিন্তু দুনিয়ার ক্ষণজন্মা মানুষগুলো ছাড়া কার দিকে তাকিয়ে দেখেছ ত্রিদিবনাথ? নিজেকে ছাড়া অন্য কারও কথা ভেবেছ কবে?

ঠিক দুপুরবেলা অস্নাত, অভুক্ত ত্রিদিবনাথ এসে হরিদাসের পুরানো বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে।

কে রে?

নীলমণির গলা। নীলমণি বেঁচে আছে, দেওঘরে উৎপলার কাছে শুনেছিল। বিক্রমও অপ্রতিহত আছে, গলার ঝাঁঝে সেটা মালুম হচ্ছে—

যা-যা. ভিক্ষে-টিক্ষে আজ আর হবে না। সারা দিন ধরে এই চলুক, আর কোন কাজকর্ম নেই।...এইও—আবার জ্বালাতন করবি তো লাঠি নিয়ে বেরুব এবার।

আমি ত্রিদিবনাথ। ভিক্ষে চাইনে—দুয়োর খোল দিকি।

হাতড়ে হাতড়ে নীলমণি খিল খুলে দিল। তারপর পুঁথি পড়ার মতন ত্রিদিবের মুখের উপরে চোখ দুটো রেখে দেখবার চেষ্টা করে। আরও বুড়ো হয়ে পড়েছে নীলমণি—ভ্রূ অবধি সাদা। দৃষ্টি প্রায় গেছে—সামান্য ঝাপসা রকম দেখতে পায়। থাকার মধ্যে আছে গলাখানি। তাই লাঠির ভয় দেখায়। লাঠি সত্যি সত্যি তুলে ধরতে গেলে বোধ করি সেই ভারে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়বে।

ত্রিদিব বলে, পলি বাড়ি আছে? ডেকে দাও একটুখানি—

নীলমণি চটে উঠল।

সে নেমে আসবে—কেন, তুমি উঠে-যেতে পারছ না?

. যাবো উপরে?

নীলমণি বলে, উপরে বাঘসিংহী বুঝি? ও-হো, পায়াভারি হয়েছে আজকাল তোমার বটে। তা আমি উপর-নিচে করতে পারবো না—গরজ থাকে, তুমি হাঁক পাড়ো এখান থেকে।

উৎপলা বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে। কলকণ্ঠে সেখান থেকে বলে, কি ভাগ্যি—কি ভাগ্যি।

ত্রিদিবের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বলল, খাওয়া-দাওয়া হয় নি তোমার?

সুধা চটে রয়েছে। খাবার চাইতে সাহস হল না তার কাছে গিয়ে। নাটের গুরু তুমি, তোমার চুরির দায়ে সে বেচারী অনর্থক বকুনি খেলো। তাই ভাবলাম, আড়াই প্রহর বেলায় তোমার বাড়ি অতিথি হয়ে জব্দ করে আসি। ও:, তোমার যে চাকরি আছে—অফিসে বেরুচ্ছ বুঝি?

উৎপলা আচ্ছন্ন ভাবে তাকিয়ে থাকে ক্ষণকাল।

বোসো ত্রিদিবদা। চুলোয় যাক চাকরি, উচ্ছন্নে যাকগে অফিস—

পাখা খুলে দিয়ে সহসা ত্রিদিবের হাত ধরে ফেলে বসাল পাখার নিচে। বলে, সরবৎ নিয়ে আসছি। এত বেলায় আর চান করে কাজ নেই। একটুখানি গড়াতে লাগো। চট করে আমি ওদিককার ব্যবস্থা সেরে আসছি।

সরবৎ দিয়ে ছুটে বেরুল। লঘু যেন এক পাখী যেন। ক্ষণপরে আবার এসেছে।

ভাত চাপিয়ে দিয়ে এলাম ত্রিদিবদা আধঘণ্টা লাগবে না—

ত্রিদিব বলে বান্নার হাঙ্গামে কেন গেলে? এসেছি গোটাকয়েক কথা বলতে। খাওয়াতে চাও, দোকানের দু-একটা মিষ্টি এনে দিলে পারতে।

খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে যত খুশি কথা বোলো। তখন শুনব। নিজে হাতে তোমায় রান্না করে খাওয়ানো, একে হাঙ্গামা বলছ। আমার কত কালের স্বপ্ন, এমনিধারা হাঙ্গামা পোহানো তোমার জন্য। এতখানি বয়স কাটিয়ে সেই ক্ষণ পেয়েছি আজকে ত্রিদিবদা।

ত্রিদিবও অভিভূত হয়ে পড়েছে। জোর করে সেই মনোভাব তাড়াতে চায়। বলে, আজকে হল কি পলি? সেই কতকগুলো কি বলে এলে। ঠাট্টা তো বটেই, কিন্তু ঠাট্টাচ্ছলেও মুখ দিয়ে এসব বেরুল কি করে?

ঠাট্টা? চলে যাচ্ছিল উৎপলা, ফিরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি তাকাল পুরো একটা জন্ম ধরে কেউ ঠাট্টা করে না ত্রিদিবদা। অবাক হয়ে গেছ—তাই বটে। আমার সকল লজ্জা ভাসিয়ে দিয়েছি তোমার কাছে। বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই সংসারের মধ্যে। তাঁর ঐ অবস্থা—আমার কথাগুলো কে তবে বলে দেবে আমি ছাড়া?

ত্রিদিব বলে, বাইরের জৌলুস দেখে সকলে তোমরা তাজ্জব হয়ে যাও।

সকলকে ঠকিয়ে বেড়াই। কিন্তু সত্যি বলছি—আমার মতন পাষণ্ড দুনিয়ায় দ্বিতীয় নেই। তুমি বড্ড ভালো পলি, তাই ভয় করছে। আমার সমস্ত কথা সকলের আগে তোমার জানা দরকার।

উৎপলা ব্যাকুল স্বরে বলে, না গো ত্রিদিবদা, না। অতীতের কবর খুঁড়ে লাভ নেই। তুমি চুপ করো।

নিষেধ মানে না ত্রিদিব। বলতে লাগল, একদিন নেশার ঘোরে বেরিয়েছিলাম ঘর থেকে। বড় হবো, হিমালয় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু হবে। পিছন ফিরে তাকাইনি। নিজেকেই শুধু ভালবেসেছি সংসারে। সংসারও তার শোধ নিল—প্রেতিনী হয়ে তাড়া করেছিল পিছু পিছু। জলে ডুবে মরেছে প্রেতিনী—আমি বেঁচে গেছি।

উৎপলা তাড়া দিয়ে ওঠে, আঃ—কি হচ্ছে? বাবা পাশের ঘরে, ঘুম ভেঙে যাবে যে তার—

ত্রিদিবের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কেমন সব আবোল-তাবোল কথা। উৎপলার ভয় করছে। কাছে এসে সে তার হাত জড়িয়ে ধরল।

কোন কথা নয়—হাত রাখো তুমি আমার মাথায়। জীবনভোর তপস্যা করে আজকে আমি বর পেয়ে গেলাম।

পদশব্দে সচকিত হয়ে তাকায়। যে ভয় করছিল, তাই। হরিদাসের ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভেঙে কখন নিঃশব্দে দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

উৎপলা চেঁচিয়ে ওঠে, সর্বনাশ করেছ বাবা, চোখের ঢাকা একেবারে যে খুলে ফেলেছ!

অর্ধোন্মাদ হরিদাস হি-হি করে হাসতে লাগলেন, চোখ আমার সেরে গেছে। চোখের ব্যারাম ছিল রে সত্যই—মেয়ের বিয়ের জন্য কত হারামজাদার তোয়াজ করে বেড়িয়েছি, আমার ঘরের মানিক চোখে দেখতে পাইনি।

ত্রিদিব এগিয়ে এসে বলে, বসুন মেসোমশায়। ঢাকাটা ভাল করে লাগিয়ে দিই।

না রে না—

হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে হরিদাস বললেন, মতলব বুঝেছি। চোখ-ঢাকা কলুর বলদ করে রেখে যুগল-মিলন দেখতে দিবিনে। ও চালাকি আর শুনছিনে।

॥ তেরো ॥

যেতে হবে—পলি নিজে এত করে বলে গেছে, যেতেই হবে দুলালচাঁদের উৎসবে। স্থূলরুচির ঐ মানুষগুলোকে সহ্য করা দায়। কানাকড়ির ক্ষমতা নেই—বাপ-পিতামহ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের জোরে সম্পত্তি করে গেছে, তাই

ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। খাওয়া শুধু নয়—সর্বগুণাধার হয়ে দশের উপর মোড়লি করে বেড়ায়। বড় বড় অনুষ্ঠানে সভাপতি কিংবা প্রধান-অতিথি—নিদেন পক্ষে সভা-উদ্বোধনের জন্য ডাক পড়ে। সে উপস্থিত থাকলে খবরটা ফলাও করে চিত্র সহযোগে সুনিশ্চিত ছাপা হবে। একটা বিপদ—সভাস্থলে দু-এক কথা বলতেও হয় কখনো-সখনো। সে যেন শ্রোতাদের জ্ঞান-বুদ্ধির মাথায় লাঠি মারা। নিতান্ত নির্বোধ ভদ্র বাঙালী বলেই লোকে বসে শোনে—বড় জোর বিড়ি খাওয়ার ছুতোয় বাইরে চলে যায় মাঝে মাঝে।

তাই দেরি করে গিয়েছে। বাজে ঝামেলাগুলো চুকে যাক। দুলালের সাঙ্গোপাঙ্গোগুলো সরে পড়ুক—দুলালকে সঙ্গে নিয়ে সবে পড়ে তো আরো ভালো। তার কাজ শুধু উৎপলার সঙ্গে। অন্য লোকের চোখ-কান এড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলে আসবে, ছোট্ট একটু ঘর খুঁজছিলাম, খ্যাতির দিকে পিঠ ফিরিয়ে যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারি। যেমন এক ঘর কতকাল আগে এক ভোরবেলা ছেড়ে এসেছিলাম। ঘর বাঁধার স্বপ্ন তুমি আবার মনে জাগিয়ে দিলে পলি। অখণ্ড তোমার পরমায়ু হোক—আমার মৃত্যুর পরেও আরো অনেক, অনেক বছর যেন বেঁচে থাক। মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকব সেই আমার চিরকালের চেষ্টা। বাঁচতে চাই সভাস্থলে হাততালি-পাওয়া গদগদ বক্তৃতাবলীর মধ্যে নয়, ইটপাথরের স্মৃতিসৌধে নয়—তুমি যদি দিনান্তে কাজকর্মের শেষে এক-আধ ফোঁটা চোখের জল ফেল আমার কথা ভেবে।

মনে এমনিতরো ভাবনা—প্রায় যে কবি হয়ে উঠলে ত্রিদিবনাথ। কাব্যের আর এক নমুনা, শ্যামবাজারের মোড়ে গাড়ি থামিয়ে মস্ত এক গোড়ের মালা কিনে নিল। উৎপলার জন্মদিনে নিরিবিলি একটু খুঁজে নিয়ে, এই মালা তার গলায় পরিয়ে দেবে।

যা আন্দাজ করে এসেছে, ঠিক তাই। সমস্ত লন জুড়ে চৌকো চৌকো বিস্তর টেবিল—টেবিল ঘিরে তিনটে চারটে করে চেয়ার। সাকুল্যে জন কুড়িক এখন—এখানে একটি ওখানে একটি—চা ইত্যাদি খাচ্ছে। বাকি সব চেয়ার খালি। উর্দিপরা খানসামারা প্লেট ধুয়ে ধুয়ে এক পাশে রাখছে। প্লেটের কাঁড়ি দেখে মালুম হচ্ছে—আয়োজন বিরাট, বিপুল জন-সমাগম হয়েছিল। উঃ, কি ফাঁড়াটাই কেটেছে বুদ্ধি করে এই দেরিতে আসার দরুন। যত মানুষ জুটেছিল, প্রতি জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ত দুলালচাঁদ—অল্পে রেহাই ছিল না। নমস্কার বিনিময় এবং সেকহ্যাণ্ড বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কথাবার্তার বিস্তর বাজে খরচ।

তা যেন হল। কিন্তু চেনা মানুষ একজন কেউ যে নেই এদিকে! উৎসব সেরে কর্তাব্যক্তি সবাই চলে গেছে নাকি নিজ নিজ কর্মে? পলিই বা কোথায়? ত্রিদিব তাকে কথা দিয়েছে—তার অন্তত থাকা উচিত। বিস্তীর্ণ বাগানের মাঝখানে বাংলো প্যাটার্নের একতলা পাকা বাড়ি। চতুর্দিকে

ঘোরানো বারান্দা—গোল গোল থাম। কি করি না করি—ভাবতে ভাবতে বারান্দার উপর উঠে পড়ল। ঘরের ভিতরে হয়তো মানুষ আছে। খুব বিরক্তি লাগছে এখন- হোক না দেরি, তা বলে আদর আপ্যায়নের জন্য একজন কেউ থাকবে না—এ কেমন কথা। বড়লোকি স্পর্ধা—এই জন্য এসব লোকের ছায়া মাড়াতে চায় না ত্রিদিব।

আছে বটে মানুষ—দশ-বারো বছুরে এক ছেলে ভিতর থেকে এসে বারাণ্ডা পেরিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডেকে তাকে জিজ্ঞাসা করবে—ডাকতে হল না, ছেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছে বারবার। মিষ্টি চেহারা, বড় বড় চোখ। ত্রিদিব কাছে এগিয়ে গিয়ে সকৌতুকে বলে, কি দেখছ খোকা? চেনো আমায় তুমি?

হাঁা, আপনি ডক্টর রায়—

'ডক্টর'—বেশ নিখুঁত উচ্চারণে বলছে। ভালো ইস্কুলে পড়ে নিশ্চয়, বেশবাসও পরিচ্ছন্ন। ইউরোপের নানান দেশে বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের দেখেছে। হিংসা হত, নিশ্বাস পড়ত নিজেদের কথা ভেবে। এ ছেলেটি কিন্তু হামেশাই যা দেখা যায়, সে দলের নয়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আনন্দস্মিত চেহারা।

কি করে জানলে বলো তো?

কাগজে ছবি উঠেছিল আপনার—

ভারি ভাল লাগে। এইটুকু ছেলে কত খবর রাখে, দেখ। ত্রিদিব হাত ধরে তাকে বসাল একটা সোফার উপর, নিজে পাশে বসল।

বলো দিকি, কি করি আমি—

খুব বড় বৈজ্ঞানিক আপনি। অনেক গবেষণা করেছেন, অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, জগৎ জোড়া নাম। বিজ্ঞানের ব্যাপার এখন আমি বুঝিনে, বড় হলে সব জানতে পারব।

তারপর চঞ্চল হয়ে ওঠে, এখন আমি যাই—

ত্রিদিব হেসে বলে, সে কি কথা? এত বড় একজনের দেখা পেয়ে গেলে; ডক্টর রায়ের সঙ্গে দুটো-পাঁচটা কথা বলে যাবে না?

গিয়ে পড়তে বসব। দেরি হয়ে গেলে হস্টেলে বকবে। আমার দেরি হয় না, কোনদিন আমি বকুনি খাইনি।

বেশ, বেশ! কোন হস্টেলে থাকো তুমি?

সার্কুলার রোডের কাছাকাছি একটা হস্টেলের নাম করল—মিশনারিদের নাম-করা হস্টেল। ত্রিদিব সবিস্ময়ে বলে, অদ্দূর একা একা যেতে পারবে?

কেন পারব না?

ভয় করবে না?

ভয়—ভয় আবার কিসের? বড়-রাস্তায় গিয়ে বাসে উঠব। বাস থেকে নেমে তারপর হেঁটে চলে যাবো এটুকু পথ।

কথাবার্তায় ত্রিদিবের আমোদ লাগে। ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না, গল্পে গল্পে দেবি করিয়ে দিচ্ছে।

ওবে বাসরে। ভীষণ বীর তবে তো তুমি। আচ্ছা, বাস না হয়ে জাহাজ হয় যদি। ধরো, জাহাজে করে সমুদ্দুরের উপর দিয়ে যাচ্ছ একা একা। তা হলে ভয় করবে না?

উল্লাসে ছেলেটার মুখ ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

সে তো আরো ভালো। বইয়ে নানান দেশেব কথা পড়ি—বড্ড ইচ্ছে করে আপনার মতন দেশ বিদেশ দেখে বেড়াতে। সমুদ্দরের উপর দিয়ে জাহাজ ভেসে ভেসে যাচ্ছে—মজা লাগে—নয়? যেদিকে তাকাই, কূলকিনারা নেই। একটানা চলেছে নীল জল—

ঝড়ের সময় যখন পাহাড়ের মতন বড় বড় ঢেউ উঠবে? ছোট ছেলে তবু ভয় পায় না। বলে, বেশ নাগরদোলার মতন দুলবে জাহাজ। এক ছবিতে দেখেছিলাম জাহাজ ঝড়ে ডুবে যাচ্ছে। ববিনসন ক্রুশোর অমনি জাহাজ-ডুবি হয়েছিল ভাসতে ভাসতে শেষে অজানা দ্বীপে উঠল। কী মজা।

ত্রিদিব বলে, খুব গল্প পড়ো তুমি?

গল্প আমাব বড্ড ভাল লাগে। নাবিকদেব গল্প, দৈত্যদানো-ভূতপ্রেতের গল্প, বাঘ শিকারেব গল্প—

কথার তুবড়ি ছেলেটা। ঘাড় দুলিয়ে, চোখ বড় বড় করে, কেমন সুন্দর কথা বলছে। জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাঘ দেখেছেন?

দেখেছি চিড়িয়াখানায়।

সে আমি কত দেখেছি। সে কথা হচ্ছে না এত জায়গায় বেড়ালেন—জঙ্গলের বাঘ দেখেননি?

জঙ্গলে যাইনি তো আমি, খালি শহরে শহরে ঘুরেছি। শহরকেও জঙ্গল বলতে পারো এক হিসেবে। যে-সব মানুষ থাকে, তারা বাঘের মতন নখ দাঁত মেলে তক্কে তক্কে বেড়ায় শিকার ধরবার আশায়।

এ সব ফাঁকি কথায় ছেলেটা উৎসাহ বোধ করে না। আবার বলে, ভূত দেখেছেন?

জমাতেই হবে এবারটা—অতএব দ্বিধাহীন ভাবে ঘাড় নেড়ে ত্রিদিব বলে, হ্যাঁ—

কোথায়?

ত্রিদিব চট করে মনে মনে গল্প বানিয়ে ফেলে।

আমিই তো ভূত একটা। জিব্রাল্টার কাছ দিয়ে যাচ্ছি। সে কি ঝড়-জল!

তারপর?

জাহাজ ডুবে গেল সাগরের জলে। যেমন তুমি ছবিতে দেখেছ।

আপনি তখন কি করলেন?

হেসে ত্রিদিব বলে, আমি মরে গেলাম। ইচ্ছে ছিল না, কি করব আর তখন? মরে ভূত হয়ে বেড়াচ্ছি সকলের মধ্যে।

গলা নামিয়ে বলে, কাউকে বোলো না একথা—খবরদার! ভূতের বড কষ্ট—আকাশে ভেসে ভেসে বেড়ায়—মাটির নাগাল পায় না, পা ছোঁয় না মাটির উপর।

ছেলেটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, এই তো মাটিতে পা। তবে ভূত হলেন কি করে?

ওটা লোক-দেখানো। অন্তত চুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে মাটির সঙ্গে। ঘর-বাড়ি নেই, আপনজন একজন কেউ নেই গোটা পৃথিবীর মধ্যে। তবে পুনর্জন্ম হয় কখনো কখনো ভূতের। আমিও চেষ্টায় আছি।

টং করে একবার দেয়াল-ঘড়ি বাজল। সাড়ে-ছ'টা। ছেলেটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

ওরে বাবা! দেরি হয়ে গেছে, আমি চললাম—

আরে কি করছে আবার দেখ। দু-হাত জোড় করে দিব্যি বুড়ো মানুষের ভঙ্গিতে নমস্কার করে বেরিয়ে যায়। ত্রিদিবের ছুটে গিয়ে কোলে তুলতে ইচ্ছে করে। ফুড়ুত করে পাখির মতন উড়ে বেরিয়ে তৎক্ষণে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

ছেলেটা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল—অতএব, ভিতরে নিশ্চিত মানুষ আছে। ঢুকে পড়ল ত্রিদিব। দু-দিকে খোপ-খোপ—মাঝখান দিয়ে পথ, দরদালানও বলা চলে। আশ্চর্য, জনমানবের চিহ্ন নেই! ভূতের কথা হচ্ছিল ছেলেটার সঙ্গে—সেই ভূতের বাড়ি যেন। ব্যাপারও তাই। দুলালচাঁদ দাঁও মেরে এই বাড়ি কিনেছে—বাজারদর যা হওয়া উচিত, তার অর্ধেকেরও কম। লোক পেলেই দুলাল জাঁক করে বাড়ি কেনার বাহাদুরি শোনায়। সেই একদিন দেওঘরে দেখা হয়েছিল, তখনই সবিস্তারে বলা হয়ে গেছে; কলকাতায় গিয়ে, ডক্টর ঘোষ, একদিন গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসব আমার বাগানবাড়িতে। কী এলাহি ব্যাপার, দেখতে পাবেন। তিনটে প্রাণী নাকি খুনোখুনি করে মরেছিল ওখানে—বড ছেলে, তার এক বন্ধু, আর একটা মেয়ে। বুড়োকর্তা তাই পণ করে বসলেন, টাকা দিয়ে কেউ না কিনতে চায় তো মাগনা বিলিয়ে দেবো। সেই সময়টা দুলাল গিয়ে পড়ে। কিনেছেও একরকম মাংনা বলতে হবে।

ভর-সন্ধ্যেবেলা ঘরগুলো পেরিয়ে যেতে গা ছমছম করে। হা-হা করছে—গিলে খাবার তরে হাঁ করে আছে যেন। ছেলেটা তবে যে ঘরের দিক থেকে বেরিয়ে এলো—দালান শেষ হয়ে আবার তো বাগান পড়বে, সেইখানে তবে আছে কেউ না কেউ।

দালানের প্রান্তে খাটের উপর বসে—মানুষই তো! স্ত্রী-মূর্তি। আলো

জলেনি—আঁধার ঘন হয়ে জমেছে ঘরের মধ্যে। বাইরের দিকে মুখ করে চেয়ে আছে—আবার কে? উৎপলা। উৎপলা রাগ করে ঐ ভাবে বসে আছে তার দেরি করে আসার জন্য। উৎসব-অন্তে সে-ই শুধু আটকা পড়ে আছে,* ক্লান্তিময় একটি মধুর ভঙ্গিমায় এলিয়ে আছে খাটের উপর। রাগ হয়েছে—চোখে জল এসেছে হয়তো বা!

পলি।

চমকে উঠে সেই মেয়ে মুখ ফেরাল। চোখাচোখি। ত্রিদিবের সর্বদেহ থরথর করে কাঁপছে। মাটিতে পড়ে যেত নিশ্চয়—একটা চেয়ার পেয়ে তার উপর ধপ করে বসে পড়ল।

ক্ষণপরে সম্বিত ফিরে এলে ডাক দেয়, ঝুমা!

ঝুমা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলে, চুপ চুপ। গাঙের জলে ডুবে মরেছি আমি।

ত্রিদিব বলে, তাই তো জানি। কাগজে বেরিয়েছে—দেশসুদ্ধ সকলে জানে। [illegible] পরে ভুতুড়ে এই বাগানবাড়ি এসেছ।

নেমতন্নে এসেছি, এসে দেখছি সমস্ত ফাঁকা।—

জ্যান্ত-মরা সকলকে এরা নেমতন্ন করেছে?

একটু আগে ত্রিদিব মরে যাওয়ার গল্প করছিল ছেলেটার সঙ্গে। হয়তো স্বপ্ন দেখছে—সেই গল্পই স্বপ্ন হয়ে এসেছে।

বলে, মৃত্যুলোকে আজকাল পুল বানানো হয়েছে নাকি—ইচ্ছে মতো এপার ওপার করতে পারো?

ঝুমা বলে, মরে গেছে সেকালের ঝুমা আর মাধবীলতা। কাটছাঁট হয়ে লতাটুকু রয়ে গেছে শুধু। আমি লতা [illegible]—লতিকা বী।

আর সেই এতটুকু মুকুলবাবু? ঝোড়ো রাতের অন্ধকারে [illegible]-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে মায়ের কোলে উঠে মুকুলবাবু চলে গেল—সে ছবি ভোলা যায় না। দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়িয়েছি—অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, মুকুল যেন অন্ধকারে হাসছে তেমনিভাবে। কত বড় হয়েছে ছেলে আজ?

ঝুমা বলে, এসেছিল সে এখানে, আমারই সঙ্গে ছিল। রাত হয়ে যাচ্ছে বলে হস্টেলে চলে গেল।

বলতে বলতে অপরূপ হাসি ফুটে উঠল মুখের উপর। বলে, মা হয়ে বলতে নেই—বাড়বাড়ন্ত হয়েছে একটুখানি আর-একটু হলে দেখা হয়ে যেতো—

ত্রিদিব সোল্লাসে বলে, আমি দেখেছি। কথার জাহাজ সেই ক্ষুদে ভদ্রলোকটি তবে মুকুলবাবু? দিব্যি ভারিক্কি হয়ে উঠেছেন। আর কি আশ্চর্য দেশে দেশে ঘোরবার বিষম শখ—ঐ বয়সে আমার অমনি ছিল।

সেই তো বড় ভয়—

ভয় আমারও হচ্ছে। বাপের মতন না হয়ে যায়। ডক্টর ঘোষের আদ্ভিনাড়ির খবর সে জানে, কেবল বাপকে চেনে না।

ঝুমা গম্ভীর হল—সেই দুর্যোগরাত্রির ঝুমা।

না, বাপের পরিচয় দেওয়া হয় নি। নামটা শুনেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ডক্টর ঘোষ আর সেই মানুষ এক তো নয়। হবে কি করে?

কেন?

একজনকে জগৎসুদ্ধ মানুষ শ্রদ্ধা করে। আর একজন—থাকগে, আমার মুখ থেকে না-ই শুনলে।

মুখ কালো করে ত্রিদিব ঝুমার কথাটা শেষ করে।

সকলে ঘৃণা করে সেইজনকে। নিজের ছেলেও করবে জানতে পারলে?

বুঝতে পারলাম। আশা করি, মায়ের ইতিহাসের কিছু বলোনি। বাপ-মা দু'জনকেই ঘৃণা করে ঐটুকু ছেলে বাঁচবে কেমন করে?

মনের অন্ধকারে পেঁচান কালসাপটা ফণা তুলে এতক্ষণ দুলছিল এদিক-ওদিক, হঠাৎ ছোবল দিয়ে বসল—

মাধবীলতা দেবী তো মরেছে। শ্রীল শ্রীযুত শঙ্করনাথ মিত্র—তাঁর কি অবস্থা?

ঝুমা বলে, দু-দুটো খুনের চার্জ মাথার উপর—অবস্থার ইতরবিশেষ হতে পারে? ফাঁসিতে না-ই যদি ঝুলোয়, চিরজীবনের কারাবাস। প্রতিহিংসার বড় সুযোগ কিন্তু, দেখ না চেষ্টা করে—

কিন্তু জমল না ঝগড়া—ত্রিদিবই ভেঙে পড়ে। মুকুল এত বড়টি হয়েছে, পাশে বসে এতক্ষণ ধরে কত বকবক করল তার সঙ্গে। ভূতের কথা হচ্ছিল, সে যেন সত্যি সত্যি তাই। ছেলের ঠিক পাশটিতে বসে ও হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে তোলবার উপায় নাই। পিতৃ-পরিচয় পেলে হাত-পা ছুঁড়ে আঁচড়ে-কামড়ে মাটিতে যেন নেমে পড়বে—সেই ছেলে-বয়সের এক ফোঁটা মুকুল এক একদিন যেমন করত।

অবিচার করেছ আমার উপরে ঝুমা, সকলে ভুল জেনে বসে আছে। যা শুনেছ, একেবারে মিথ্যে—

ঝুমা চকিতে তাকাল ত্রিদিবের দিকে। বিশ্ব-বিজয় করে এসেছে, সেই মানুষের উদ্ধত কণ্ঠ নয়—কঠিন বিচারকের কাছে এক জন সবরিক্ত যেন আকুতি জানাচ্ছে।

নিরুত্তাপ স্বরে ঝুমা বলল, অন্য লোকের রটনা তো নয়—তুমি নিজেই কত জায়গায় জাঁক করে বলেছ।

আমি মিথ্যেবাদী। বানিয়ে বানিয়ে বলেছি—

মিথ্যা বানালে নিজের চরিত্র সম্বন্ধে?

চুক্তি যে তাই। লোকে বাসনকোসন আংটি-ঘড়ি বিক্রি করে, জমাজমি ঘরবাড়ি বিক্রি করে। অভাবের ভিতর আমারও যা-কিছু ছিল সমস্ত বিক্রি

হয়ে গেল, তারপরে সুনামটা বেচে দিলাম। মোটা দামও পেয়েছি। এমন সজ্জন খদ্দেরকে ঠকানো যায় না—ঠকাইনি আমি। একটা দলিল দৈবাৎ রয়ে গেছে। সেই দলিল তোমাদের নাকের উপর ধরে এক লহমায় সমস্ত কুৎসা নস্যাৎ করে দিতে পারি।

ঝুমাও কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

একথা আর একদিন বলোনি কেন?

বলবার সময় দিলে কখন? ঝড়-জলের মধ্যে ছুটে বেরুলে—কোলে আড়াই বছরের ছেলে। নিজের যা হয় হোক, ছেলের কথাও ভাবলে না একবার। এমন পাষাণী মা কেমন করে হয়, জানিনে।

কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। একটু পরে সামলে নিয়ে বলে, সে যাকগে। বিশ্বাস না করতে পারো, কাজ নেই। কিন্তু বাপের জন্য ছেলে দুঃখ পাবে, চিরজীবন যে মাথা হেঁট করে বেড়াবে, এটা না হয়। ছেলেকে চাই আমি, তাকে কাছে আসতে দিও। ছেলের কাছে আমায় ছোটো কোরো না, দোহাই তোমাদের—

আর পারে না ঝুমা। সজল চোখে বলল, আমিও যে চাই সমস্ত। স্বামী চাই, সংসার চাই—একা-একা আর পারিনে। ঝড়ের মধ্যে কেন বেরুতে দিলে সেদিন? দোষ তোমারই—দুয়োর বন্ধ করে আটকালে না কেন আমায়?

এত বছরের জমানো কথা—কিন্তু উৎসমুখ পাষাণে কে আটকে দিয়েছে। হঠাৎ নজর পড়ল, ত্রিদিব যে মালা এনে রেখে দিয়েছে।

মালা কার?

তুমি দিয়ে পরো—

পুরানো ঝুমা আর নেই—ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো তবে তো সে ছিটকে পড়ত। মালা গলায় পরিয়ে দিল ত্রিদিব। আরে আরে—এ কি! ঝুমা প্রণাম করে তার পায়ের গোড়ায়।

ঝোড়ো রাতের সেই ঝুমা মরে গেছে তবে সত্যিই।

জংবাহাদুরের গলা।

অন্ধকারে কারা গো?

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে চোখ বড় বড় করে দুজনে চেয়ে রইলেন। কখন এসেছ ত্রিদিব-ভায়া? একটু জানতে পারিনি। বিষম কাণ্ড হয়ে গেল—আমাদের বাবু আর উৎপলার মধ্যে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। মেয়েটা অতি নচ্ছার—ফরফর করে বেরিয়ে গেল। তারপরে বাবুও গেলেন। শিবহীন যজ্ঞ।

ঝুমা সরে বসেছিল। কাছে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ঠাহর করে দেখে বললেন মা লক্ষ্মীকে যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে। মনে পড়েছে—মাধবীলতা যে! বেঁচেবর্তে আছ তা হলে? মিল-টিলও হয়ে গেছে—বেশ বেশ, সুখে থাকো,

পাকা চুলে সিঁদুর পরো। শঙ্করের সঙ্গে সরে পড়লে মা-জননী, সবাই নিন্দে-মন্দ রটাতে লাগল। আমি বলি—এ কিচ্ছু না—বয়সকালের ছুটোছুটি, আব-দুধ আবার মিলেমিশে যাবে দেখো। হল তাই—

॥ চৌদ্দ ॥

জংবাহাদুর রাহুর মতো হঠাৎ এসে জীবনের পরম ক্ষণটুকু কালিমাময় করে দিয়ে গেলেন। ত্রিদিব বেরিয়ে গেছে, একা ঝুমা কাঠ হয়ে বসে ভাবছে আকাশ-পাতাল। পুরানো খবর লোকটা প্রায় সমস্ত জানে। তার নজরে পড়ে গেছে যখন, লতিকা দেবীর পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠল। ত্রিদিব ঘোষ নামজাদা লোক—তার পারিবারিক কুৎসা, জংবাহাদুরের অধ্যবসায়ে, জানতে বাকি থাকবে কারো? আর নয় লতিকা. বাইরের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে চলো সংসারের অন্দরে। ত্রিদিব ফুলের মালা পরিয়ে ঝুমা-ঝুমি, ঝুমঝুমিকে অভিষেক করল। জংবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হওয়া নিয়তির ইঙ্গিতও বোধহয় তাই।

তবু সেই নির্জন ভূতের বাড়িতে একা বসে আছে উৎপলার আশায়। দুলালের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে গেছে—রাগ কমলে নিশ্চয়ই কাণ্ডজ্ঞান হবে, তার খাতিরে যারা নিমন্ত্রণে এসেছে তাদের খোঁজ-খবর নিতে আসবে।

অনেক বসে বসে তারপরে এক সময় ঝুমা উঠে পড়ল। আহা, ঝুমা কেন—লতিকা। যাচ্ছে উৎপলার বাড়ি—লতিকা ছাড়া কি? ঝুমা নামে কে চেনে তাকে এই রাজ্যে?

বাড়ি ঢুকবার সময় শোনে, ঘর ফাটিয়ে উৎপলা গান ধরেছে। কি মেয়ে—মনিবের সঙ্গে ঝগড়া করে আজকেই চাকরিটা খোয়ালো, মনে তার একটু আঁচড় কাটেনি। এক গাদা মানুষকে আহ্বান করে এনে নিজে সরে পড়া—এরই পক্ষে সম্ভব বটে!

হরিদাস নিচে। লতিকাকে বলেন বড় মেয়ে। আদর করে ডাকলেন, আয় রে—এত রাতে কি মনে করে? খবরবাদ ভাল তো মা?

কে বলবে, মাথার দোষ হরিদাসের! অন্যদিন কথাবার্তায় মধ্যে একটু-আধটু তবু মনে হতে পারে, আজকে পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ। লতিকা বলে, শুনলাম কি ঝগড়াঝাটি করে উৎপলা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

এক গাল হেসে হরিদাস বললেন, বেশ করেছে। বিয়ের পরে সংসার করবে না অফিস করবে? দু' নৌকোয় যারা পা দেয়, পাঁকের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় তারা—কিছুই পায় না জীবনে। আজকাল বিস্তর মধ্যবিত্ত সংসারে যেমন দেখা যাচ্ছে।

লতিকা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বলে, বিয়ে হচ্ছে উৎপলার?

হয়ে না গেলে বিশ্বাস নেই মা। মত ঘুরতে ও-মেয়ের কতক্ষণ? তুমি

উপরে যাও মা—আরো বেশ স্ফূর্তি দিয়ে এসো—

সে কি আর বলে দিতে হবে লতিকাকে! দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে সে উপরে উঠল। গান বন্ধ করে উৎপলা হাসছে।

লতিকা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, প্রণাম করো। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ—ছি ছি, কী মেয়ে তুমি! বরানগর থেকে আসছি—পায়ে বিস্তর ধুলো, পদধূলির অভাব হবে না।

উৎপলা বলে, কানে গেছে এর মধ্যে? তা-ও তো বটে! নিচে হয়ে এলে—সেখানে বাবা রয়েছেন। পায়ের জোর থাকলে বাবা খবরটা এতক্ষণে ত্রিভুবনে চাউর করে দিয়ে আসতেন।

লতিকা বলে, কত আনন্দ হয়েছে বুঝে দেখ তবে। ঐ যে মাথা খারাপ —তুমি অনেকখানি দায়ী তার জন্যে। এতদিনে সুবুদ্ধি হল—দেখো, কত শিগগির উনি ভাল হয়ে যাবেন। এখনই হয়েছেন—কী সুন্দর আজ কথাবার্তা বললেন, আমি অবাক হয়ে গেছি।

উৎপলা প্রশ্ন করে, খবরটা কি শুনে এখানে এসেছ, না এখানে এসে শুনলে?

আমি শুনেছিলাম আর এক খবর। দুলালচাঁদ বাবুর সঙ্গে খুব নাকি ঝগড়াঝাটি করেছ? কি ব্যাপার?

উৎপলা হাসে, জবাব দেয় না।

এমন খাসা চাকরিটাও নাকি ছেড়েছ—বলো না, কি হয়েছে?

উৎপলা বলে, কাব্য করে বলছি দিদি! দেবতার নৈবেদ্যে হনুমান মুখ দিতে চায়। তাই মুখ পুড়িয়ে একটু শিক্ষা দিয়ে দিলাম।

ফিক করে হেসে বলে, হাতে নাতে নয় অবিশ্যি—অতদূর করিনি। শুধু মুখের কথায়—দশের মাঝে অপমান করে।

লতিকা কঠিন হয়ে বলে, সব জায়গায় এই গতিক রে [illegible]। ষোল আনা কাজ পেয়ে খুশি নয় ওরা—তারও উপরে চায়। আর তা পেয়েও যায় সহজে, পেয়ে পেয়ে লোভ বেড়েছে। সেকালের সমাজ আর জীবনরীতি ভেঙে গিয়ে মেয়েদের ইজ্জতের ওরা কানাকড়ি দাম দিতে চায় না।

উৎপলা বলে, আমার বেলা এই একটু মান দিয়েছে—বিয়ে করতে চায়। বুকে হাত রেখে শুকনো মুখে ফোঁস-ফোঁস করে এমন নিশ্বাস ছাড়ে যে হাসি চাপতে পারিনি। হাসি দেখে ক্ষেপে গেল।

লতিকা বলে, হনুমান তো ঢের ঢের দেখিয়েছ। দেবতাটি দেখতে পাচ্ছি কবে?

দেখাব বই কি দিদি। এত বড় সংসারে দু, আমার আপন লোক—বাবা আর তুমি।

বলছে আর উল্লাসের ফিনিক ফুটছে চোখে-মুখে। বলে, দেবতাই বটে! কতকাল ধরে—ছোট্ট বয়স থেকে কামনা করে আসছি। প্রায় বুড়ি হয়ে গিয়ে

তপস্যার বর পেলাম। হঠাৎ একদিন তোমার কাছে জোড়ে গিয়ে দাঁড়াব, তখন দেখো।

লতিকা মুগ্ধ চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে। গভীর কণ্ঠে বলে, সর্বসুখী হও বোন। আজকের এই হাসি কোনদিন না মোছে যেন মুখ থেকে।

উৎপলার আনন্দ লতিকারও অন্তর ছুঁয়ে যায়। নিজের কথা এই পরম -আপন মেয়েটাকে না বলে পারে না।

শোন তবে। তুমি একা নও—বর পেয়ে গেছি আমিও।

বলো কি?

লতিকার স্বামী নিরুদ্দেশ—এই জানত উৎপলারা। স্বামী ফিরে এসেছে —আনন্দ ষোলকলায় পরিপূর্ণ হল। ধরণীর কোনখানে আজ বুঝি দুঃখ-বেদনা নেই, আনন্দের প্লাবনে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

উৎপলা বলে, বর দেখাবে কবে?

আগে তোমার বর—

না, তোমার বর পুরানো। তোমারটি আগে—

অবশেষে রফানিষ্পত্তি হল, দুই বরকে দাঁড় করানো হবে মুখোমুখি। এক সঙ্গে সকলের আলাপ-পরিচয় হবে।

পরদিন সকালে শেখরনাথ ত্রিদিবের বাসায় এল। আর কখনো আসেনি এখানে—আগেকার দিনে ভাবতেই পারা যেত না কষ্ট করে আসবে সে এতদূর। তাই কষ্ট হয়েছে বাসা খুঁজে বের করতে। বলে, এমন জায়গায় থাক, আমার ধারণা ছিল না। নতুন নতুন রাস্তা—মোটর থেকে নেমে কতবার কতজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে এসে পৌঁছেছি।

ত্রিদিব বলে, আসবার কি এমন দরকার? কথাবার্তা তো ফোনেই হতে পারত।

তা হলে আসতে যাব কেন। অন্দরের দিকে দৃষ্টি হেনে বলে, এ জায়গায় আসা আমার পক্ষে সহজ নয়, তা-ও জান তুমি। তোমায় নিয়ে এক্ষুণি পালাব। টেলিফোনে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে দিতে—জানি তোমায়। কিন্তু তা হবে না—আজকে এ-বেলাটা খাটতে হবে আমার সঙ্গে। বিষম জরুরি।

একরকম টেনে-হিঁচড়ে ত্রিদিবকে মোটরে পুরল। পোশাক বদলানোর সময় দেয় না। এমন উপকারী বন্ধুকে একটু চা খাওয়াবে, তারও ফুরসত দিল না। ত্রিদিব মনে মনে আরাম পায়। সুধা ভালো চোখে দেখে না শেখরকে—দেখবারও কথা নয়। অন্যদিন এতক্ষণে সে কতবার ত্রিদিবের ঘরে আনাগোনা করে, আজকে একে-বারে ডুব দিয়েছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে নিশ্চয় দেখেছে শেখরনাথকে—দেখে যেন অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে।

শেখরের বৈঠকখানায় গালিচার উপর ত্রিদিবকে নিয়ে বসাল। মঞ্জুলার

দেয়াল-জোড়া ছবি। সোনালি ফ্রেম ঝকমক করছে, নতুন করে তেলরঙ বুলিয়েছে ছবিতে—ফ্রেমের ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে মঞ্জুলা। মঞ্জুলার মৃত্যুর পর এ-ঘর থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিদেহী পুণ্যবতীর দৃষ্টির সামনে সঙ্কোচ হয় বুঝি সোফা-কৌচে গা এলিয়ে আরাম করে বসতে।

শেখরনাথ এক গাদা কাগজপত্র বের করে আনল। কি বিপুল সংগ্রহ। দেশে দেশে জ্ঞানীগুণীরা ভেবে বের করছেন মানুষ গড়ে তোলার নতুন নতুন পদ্ধতি। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা জানতে চায়, বুঝতে চায়, অল্পদিনের চেনা তাদের এই ধরিত্রীকে। এর জন্য অসীম আগ্রহ তাদের। এই তালে তাল দিয়ে চলবে নতুন কালের শিক্ষা-ব্যবস্থা। যত না পড়াশুনো, দেখাশুনো অনেক বেশি তার চেয়ে। শিক্ষা-ব্যাপারটা ভয়াবহ নয়—আনন্দের হয়ে উঠবে খেলাধুলোর মতন। বেকার হয়ে অকর্মণ্য দিন কাটাতে হবে না কারও পরজীবনে—প্রতিটি মানুষ প্রয়োজনীয় সমাজের পক্ষে, ফালতু কেউ নয়। সকলে কাজ পাবে, আর পাবে জীবনের শান্তি ও আনন্দ। শিক্ষানীতি এমনিভাবে সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ করে তুলতে হবে গোড়া থেকেই।

কত ভেবেছে শেখরনাথ, শিশুদের পড়াশুনো নিয়ে নিজেই বা পড়েছে কত। আলোচনার মাঝে হঠাৎ ত্রিদিব স্তব্ধ হয়ে যায় এক সময়, তাকিয়ে থাকে শেখরনাথের দিকে। তাকে নতুন চোখে দেখছে। একেবারে আলাদা এক মানুষ—নিরীহ, নিরহঙ্কার—তপস্বীর মতো অহরহ তার কল্পনার এই জগৎ নিয়ে আছে।

সমস্ত কিন্তু ঐ একটা নারীকে ঘিরে—ছবির মধ্যে দিয়ে সহাস্য মুখে যে তাদের দেখছে। মঞ্জুলা বেঁচে থাকতে ছোটখাট এক সাধারণ ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। তার নাম এখন মঞ্জু-বিদ্যায়তন। নামের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের ধাঁচও আগাগোড়া পালটে গেছে। শেখর চিরকাল ভাবপ্রবণ—সকল বস্তু একটু রঙিন হয়ে তার কাছে দেখা দেয়। যা বলে—অন্য লোকের কানে অতিশয়োক্তি বলে ঠেকে, তার কাছে কিন্তু পরম সত্য। তবু ইস্কুলের যে অভিনব পরিকল্পনার কথা বলছে, তার আধাআধিও ঘটলে তাজ্জব হবার ব্যাপারই বটে।

মনের বিস্ময় ত্রিদিব একসময় মুখে বলে ফেলে, মঞ্জুলা দেবী মারা যাবার পর তুমি একেবারে বদলে গেছ শেখর—

ব্যথিত দৃষ্টি তুলে শেখর বলে, মঞ্জু মরে নি তো।

সে কি?

তোমরা বিশ্বাস করবে না। অনুভূতির যে আশ্চর্য জগৎ, বিজ্ঞান সেখানে মাথা গলাতে পারে না। এই আমরা কথাবার্তা বলছি, কাজ করছি—সে-জগতও ঠিক এমনি সত্য। বিশ্বাস কর ভাই, একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না তোমাকে। মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে চলে যাই সেখানে। সামনে বসে

থেকেও তখন তোমরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাও। ডুবুরি সাগরে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা খোঁজে, আমারও হয়েছে তাই। কাজকর্ম চুকিয়ে ভুস করে আবার ভেসে উঠি, দশজনের একজন হই।

হবেও বা। শেখরের মুখ-চোখ দেখে অবিশ্বাস করা শক্ত। এই তো—কথা বলতে বলতে হঠাৎ ছবির দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে যায়। মনে মনে যেন জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছে, বলবার মুখে ভুল হয়ে যাচ্ছে কিনা কোথাও। জেনে বুঝে নেয় ছবির কাছ থেকে। গোড়ায় খুব এক তাচ্ছিল্য ছিল ত্রিদিবের মনে—তারপরে সে অবাক হয়ে যাচ্ছে। এমন করে সমস্ত দিক দিয়ে ভেবে রেখেছে, বলছে এমন ভাবে—আবাল্য জানা-চেনা শেখরনাথ যেন এ নয়, কোন অতি মানবিক শক্তি ভর করেছে তার মধ্যে। ছবি যেন সত্যি সত্যি বলে দিচ্ছে তাকে নিঃশব্দ ভাষায়।

ফোঁস করে সে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বলল, তোমাদের ধারণায় আসবে না, কিন্তু আমার কাছে মঞ্জু তেমনি জীবন্ত। সে এসে বসে আমার কাছে, কথা বলে, যুক্তি-পরামর্শ দেয়। আমি কখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নে, চলে গেছে সে আমাদের ছেড়ে।

কচি গলার মিষ্টি হাসি এল ভেসে। সিঁড়ি দিয়ে নামছে তারা। শেখর ডাক দেয়, অঞ্জু, রঞ্জু, বৈঠকখানা হয়ে যেও তোমরা।

ত্রিদিব বলে, অঞ্জু রঞ্জু—মায়ের নামের সঙ্গে মিল করে ছেলেমেয়ের নাম রেখেছ দেখছি।

পুরো নাম হল অঞ্জনা আর রঞ্জন। ছবির দিকে দেখিয়ে বলে, নাম ওরই রাখা। সেই যা বললাম—মঞ্জুকে আমি সব সময় কাছে কাছে পাই। পায় না ছেলেমেয়ে দুটো। বড় দুর্ভাগা ওরা, মায়ের আদরযত্নে বঞ্চিত হয়ে আছে—সংসারে আর কি পাচ্ছে তবে বল।

ছেলেমেয়ে ঘরে এল। ছেলে ছোট, মেয়েটা বড়। দুর্ভাগা হোক, যা-হোক—চেহারায় কিন্তু মালুম হয় না। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অতি সুন্দর চেহারা।

শেখরনাথ বলে, ইনি জ্যেঠামশায় হন তোমাদের। মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক। এক সরকারি কাজ নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

অঞ্জু-রঞ্জু গড় হয়ে প্রণাম করল। কিছু বলতে হল না। বড়লোকের বাড়ির ছেলেপুলে, কিন্তু শহবৎ শিখিয়েছে ভালো।

সঙ্গে অতুল নামে সেক্রেটারি ভদ্রলোক। অতুলের চুলে পাক ধরেছে। কাজ এখন আরও বিস্তর বেড়েছে দেখা যাচ্ছে। শেখরের বাইরের কাজ নয়, ছেলেমেয়ের দায়ও অনেকটা বর্তেছে তাঁর উপর।

শেখর প্রশ্ন করে, সাজিয়েগুজিয়ে কোথায় নিয়ে চললে অতুল?

অতুল কিছু না বলতেই নাচের মতন এক পাক দিয়ে বাপের দিকে ফিরে অঞ্জু বলে, নেমন্তন্নে যাচ্ছি বাবা। মাসিমা নেমন্তন্ন করেছেন আমাকে আর রঞ্জুকে।

কৌতুকস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে শেখর বলে, আমাকে নয়?

অঞ্জু অতুলের দিকে চেয়ে বলে, বাবার নেমন্তন্ন হয় নি—না কাকাবাবু? মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করব,—বাবাকে বাদ দিল কেন?

শেখরনাথ হেসে উঠে বলে, না অঞ্জু, খবরদার ওসব বলতে নেই। তোমাদের ভালবাসেন, তাই নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, ছবির বই, পুতুল কিনে কিনে দেন। আমায় মন্দবাসেন, তাই ডাকেন না। এসব কি জিজ্ঞাসা করবার কথা?

অতুলের দু'হাত ধরে দু-পাশে তারা লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

শেখরনাথ বলে, বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপাল মাসি হয়ে পড়েছেন। বড্ড ভালবাসেন তিনি এদের। নেমন্তন্ন লেগেই আছে। এরাও 'মাসিমা-মাসিমা' করে অজ্ঞান।

একটা ঠাট্টার কথা ত্রিদিবের ঠোঁট পর্যন্ত এসে গিয়েছিল—'মাসিমা' কেন, 'মা' বলে যাতে ডাকতে পারে, সেইটুকু করে ফেল না।

কিন্তু এমন ঠাট্টা চলবে না মঞ্জুলার ছবির সামনে। শেখরনাথ মজে আছে তার স্মৃতিতে—লঘু রহস্য রূঢ় শোনাবে।

অবশেষে ত্রিদিব উঠে পড়ল। নইলে সব কাজকর্ম মাটি হয়ে যায়। হাত ছাড়িয়ে জোর করে ওঠে। তবু রক্ষে নেই।

সন্ধ্যেবেলা যাব আমি তোমার কাছে ভাই—

সন্ধ্যেয় পাবে কোথা আমায়? রোটারি ক্লাবে বলব এ্যাটম-তত্ত্ব সম্বন্ধে। এতবড় শক্তি মানুষের হিতকাজে লাগাবার কত কায়দা রয়েছে।

শেখর, কাতর হয়ে বলে তবে কি হবে? স্বামিজীর কাছে নিয়ে যেতে চাই। তাঁকেও বলে রেখেছি।

ত্রিদিব হেসে বলে, লাভটা কি হবে বল তো। ধর্মকর্ম আমার ধাতে সয় না। তোমার স্বামিজী যত বড়ই হোক, অধর্মের ধর্মে মতি দেবেন— এত শক্তি ধরেন না তিনি।

শেখর বলে, কর্মই ধর্ম—স্বামিজী বলে থাকেন। সে দিক দিয়ে ষোল-আনা ধার্মিক তুমি। নতুন করে তোমায় কি ধর্মের পাঠ দিতে যাবেন? কিন্তু বাজে কথা থাক। শিক্ষানীতি নিয়ে যে সব কথা তুমি বললে, আমি অমন করে বোঝাতে পারব না স্বামিজীকে। সেই জন্যে তোমায় নিয়ে যাওয়া।

ত্রিদিব বলে, কাজ করছ তুমি, খরচপত্র তোমার—স্বামিজীকে তবে ঘটা করে বোঝাতে যাই কেন?

জিভ কেটে শেখরনাথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, কিছু না—কিছু না। আমি কেউ নই। তিনিই সব। তিনি আর মঞ্জু। মঞ্জুর 'পরে বড় অনুগ্রহ স্বামিজীর। সেই সুবাদে আমিও আশীর্বাদ পেয়েছি। এত বড় বিদ্যায়তন

প্রিন্সিপ্যালের কথা হচ্ছিল—সারা দেশ চুঁড়ে অমন আদর্শনিষ্ঠ সৎ মেয়ে আর একটি পাওয়া যাবে না। স্বামিজীই দয়া করে তাঁকে এনে দিয়েছেন।

এই এক কাণ্ড! বড়লোক হলেই গুরু তাকে পাকড়াবেনই। কালের গতিক বুঝে গুরুবাও আলট্রা-মডার্ন হয়ে উঠেছেন। ফিনফিনে গেরুয়া সিল্কের পোশাক, দীর্ঘ চিক্কণ চুল থরে থরে নেমেছে। ভস্মের বদলে মাখেন পাউডার। সুকণ্ঠ হতে হবে—হারমোনিয়াম সহযোগে কীর্তন ধরেন, আব ফুলের মালা পড়তে থাকে গলায়। মালা দান করেন মেয়েরাই বেশি। মাল্যের বোঝায় মুখ চোখ ঢেকে যায়। এমনি গণ্ডা দুই-তিন স্বামিজী দেখা আছে ত্রিদিবের।

শেখর বলে, আমাদের ভাবনা-চিন্তা সমস্ত স্বামিজীর কাছে পৌঁছে দিই। শেষ কথা তাঁর—তিনি যা বলবেন, তার উপরে তর্ক নেই। সংসারে ভণ্ড আছে জানি, কিন্তু সংসারসুদ্ধ সবাই ভণ্ড নয়। দেখাশুনা হোক আগে, বিচারটা ততক্ষণের জন্য মুলতুবি রাখ।

কিন্তু আজ তো আটক আমি সন্ধ্যের পর। আর একদিন যাব। কালও হতে পারে।

শেখর বলে, আজকেই। দেরি করবার জো থাকলে টানাটানি করে নিয়ে আসতাম না। কাল স্বামিজী বেরিয়ে যাচ্ছেন কুম্ভমেলায়। ওঁর তো স্নান করে চলে আসা নয়—সর্বসাধারণের ব্যবস্থা করতে করতে নিজের স্নানই হয়তো ঘটে উঠবে না। তারপর আবার কোন কাজে কোথায় বেরিয়ে পড়বেন, ঠিকঠিকানা নেই। আজই শুনিয়ে আসতে হবে। নইলে চাপা পড়ে থাকবে সমস্ত আয়োজন।

শেখর এমন করে বলছে, শুনে শুনে ত্রিদিবের আগ্রহ জমে স্বামিজীর সম্পর্কে। বলে, ঠিকানাটা দিয়ে যাও তবে। ক্লাব থেকে সোজা সেখানে চলে যাব। কিন্তু বড্ড যে রাত হয়ে যাবে—ধর সাড়ে ন'টা—

শেখর হেসে বলে, সাড়ে ন'টা স্বামিজীর সন্ধ্যাবেলা হে। যত রাত হবে, ততই ভাল। ওঁকে নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

॥ পনের ॥

পার্কের সামনে দক্ষিণ-খোলা বাড়িতে স্বামিজী থাকেন। চমৎকার বাড়ি, আরামে থাকেন বোঝা যায়। শেখরনাথ আগেই এসে দোতলার ঘরে বসে আছে। ত্রিদিব কলিং-বেল টিপতে চাকর এসে তাকেও উপরে নিয়ে গেল।

শেখর বলে, বলেছিলাম না? তাই দেখ, ধ্যানী সন্ন্যাসী নন—কর্মযোগী! সর্ব মানুষের কাজে আত্ম-নিবেদন করে বসে আছেন। কাজ নিয়ে পাগল, কাজেই মুক্তি।

সোফা-কৌচে সাজানো। দেয়ালের ছবির মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আছেন বটে, তৎসঙ্গে রয়েছেন দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী।

স্বামিজীর ঘরে বসে শেখর আরও গদগদ হয়ে উঠেছে, মঞ্জুলা যাবার পর আমি তো একেবারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি স্বামীজির উপর। তাঁর আদেশ ছাড়া কোন কাজে এগোই নে। সব কথা ওঁর সঙ্গে খুলে বলি, তিনি সমাধান করে দেন।

একটু থেমে বলে. নিজের ব্যক্তিগত কথাও বলে থাকি, তাঁর পরামর্শ নিই। শোন ত্রিদিব, তোমার কাছে কোন-কিছু তো গোপন নেই। একটা ব্যাপারে বড চঞ্চল হয়ে পড়েছি। স্বামিজীকে বলবার আগে তুমিই শোন সমস্ত।

স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে ত্রিদিব বলে, বল—

মঞ্জু আমার জীবন আচ্ছন্ন করে ছিল, সে তুমি জান। সে চলে যাওয়ার পর সংসার ফাঁকা হয়ে গেছে। কাজকর্ম নিয়ে ভুলে থাকতে চাই, কিন্তু আনন্দ না থাকলে কাজ শুধুমাত্র দায়িত্বের বোঝা হয়ে ওঠে—

ত্রিদিব হেসে উঠে বলে, সুলক্ষণা কন্যা দেখে পুনশ্চ পানিগ্রহণ কর। এ ছাড়া আর কোন পন্থা দেখিনে।

শেখর হাসে না, ঘাড নেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, শুনতে বেখাপ্পা হলেও কথাটা তাই বটে। তোমার কাছে বলতে কি—বিদ্যায়তনের লেডি-প্রিন্সিপ্যালটি বড ভাল। সেদিন তো দেখে এলে, আমার ছেলেমেয়ে দু'টিকে কেমন তিনি আপনার করে নিয়েছেন!

এবং দেখা যাচ্ছে তাদের বাপটিকেও—

শেখর বলে, প্রিন্সিপ্যালকে স্বামিজী এনে দিয়েছেন। স্বামিজীর কাছে কথাটা পাড়ব কিনা—আচ্ছা, তুমি কি বল এ সম্বন্ধে?

ত্রিদিব বলে, আজকালকার পাত্রী—তায় আবার লেখাপড়া-জানা—গার্জেনের কথায় মাথা নিচু করে সুডসুড করে ছাতনাতলায় এসে বসবেন, এমন তো মনে হয় না। তাঁর মতামত জেনে নাও আগে।

শেখর বলে, সঙ্কোচ লাগে—ভয়ও করে। ঠিক বোঝা যায় না ওঁকে। চটেমটে না ওঠেন আবার! কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি?

খপ করে সে ত্রিদিবের হাত জড়িয়ে ধরল।

তোমার অনেক ক্ষমতা ত্রিদিব। বড কাজের মানুষ তুমি, তা হলেও এর একটা কিনারা করে দিতে হবে। আলাপ-সালাপ করে তুমিই তাঁর ভাব বুঝে দেখ—

এতকালের উপকারী বন্ধু এমন ধরাধরি করছে—রাজি না হয়ে পারা যায় না। যাবে শিগগির একদিন সে বিদ্যায়তনে। বিজ্ঞান-বিভাগের নতুন বাড়ি হচ্ছে, সেটা দেখে আসবে—আলাপ-পরিচয়ও হবে প্রিন্সিপ্যাল মেয়েটার সঙ্গে।

স্বামিজীকে দেখে চমক লাগে। হাসবে কি কাঁদবে ত্রিদিব ভেবে পায়

না। হেসেই উঠল হো-হো করে।

গুলি-গোলা ছেড়ে এখন স্বামিজী হয়েছ বুঝি? বেশ করেছ, ওতে ঝামেলা বিস্তর। বেড়ে দেখাচ্ছে গেরুয়া পাঞ্জাবিতে। ভাল।

শেখর সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, ছি ছি—কি বলছ তুমি ত্রিদিব!

ত্রিদিব জিভ কাটল, তাই তো হে। তুমি পাশে বসে, সেটা খেয়াল ছিল না। তোমাদের গুরুদেব—আমার এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘরোয়া ব্যাপার আছে কি না। কি নামে ভেক নিয়েছ—শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ স্বামী?

পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা মাথায় উঠে গেছে, ত্রিদিবকে নিয়ে ভালয় ভালয় এখন সরে পড়তে পারলে হয়। স্বামিজীও অস্বস্তি বোধ করছেন। মোটামুটি কাজের কথাগুলো বলে শেখর উঠে পড়ল। ত্রিদিবের হাত ধরে টেনে বের করল এক রকম।

এরা বেরিয়ে যেতে যেতেই এল ঝুমা। স্বামিজী উঠে পড়েছিলেন—ঝুমাকে দেখে হেসে বললেন, এত রাত্তিরে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবা, কি ব্যাপার?

বড্ড দরকার আপনার কাছে। আপনি কুম্ভমেলায় চলে যাচ্ছেন। সকালবেলা তো লোকে লোকারণ্য। রাত্তিরে ছাড়া নিরিবিলি সময় কখন?

ভূমিকা না বাড়িয়ে ঝুমা বলল, চাকরিতে ইস্তফা দেব। সেই সম্বন্ধে বলতে এসেছি আপনার কাছে।

কাজটাকে আগে কোন দিন চাকরি বলেনি মা-বী। চাকরি বলে মনে হচ্ছে নাকি শেখরনাথের কোন ব্যবহারে?

ঝুমা ঘাড় নেড়ে বলে, সে কি কথা! শেখরবাবু বড্ড ভাল। আরও জোর দিয়ে বলে, আমার সম্পর্কে বরঞ্চ বেশি রকম ভাল বলে মনে হয়। অপদার্থ হলাম আমি, আমায় মুক্তি দিন।

স্বামিজী মৃদু মৃদু হাসেন। বুঝতে পেরেছি, অনেককে এখন এই রোগে ধরছে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে সর্বস্ব-ত্যাগের আহ্বান এসেছিল, তখন কেউ পিছপাও হয়নি। আজকের কাজ তার চেয়েও বড়, দেশ গড়ে তোলা। ইস্কুলের মেয়েদের নিয়ে তোমার দিন কাটে—এ কাজে উত্তেজনা নেই, শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করা। অবসাদ আসছে সেই জন্যে হয়তো।

ঝুমা অধীর হয়ে বলে, ও-সব কিছু নয়—ব্যক্তিগত ব্যাপার একেবারে। ঘর আমায় ডেকেছে। জানেন তো, ঘর না পেয়েই বাইরে এসেছিলাম একদিন।

তাই বটে! কপালের উপর সিঁদুর জলজল করছে, স্বামিজী তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, এখনই—একটু আগে ত্রিদিব এসেছিলেন। দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে? কথাবার্তা হয়েছে, রাগ মিটে গেছে?

আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে জীবনের সব আদর্শ ঢেকে দিয়ে। আপনার কাছে মুক্তি নিতে এসেছি।

প্রথম বয়সের সেই ভুলে-যাওয়া পথে নতুন করে যাত্রা শুরু। কেঁদেই ফেলল সে। বিদ্যায়তন সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা হল। স্বামিজী কুম্ভ-মেলা থেকে না ফেরা পর্যন্ত চলুক এমনি—ফিরে এসে তারপরে ব্যবস্থা করবেন।

রাত অনেক হয়েছে, ঝুমা বাসায় চলল। পার্কের মাঝখান দিয়ে সংক্ষেপ পথ আছে, অত দূর ঘুরতে হয় না। দ্রুত পায়ে যাচ্ছে—কে-একজন হঠাৎ এসে হাত এঁটে ধরল। অন্ধকারে অতটা ঠাহর করতে পারেনি—চেঁচাতে যাচ্ছিল। তারপরে দেখল—

উঃ, কি ভয় পেয়েছিলাম!

ত্রিদিব বলে, আবছা মতন দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। না—দৃষ্টি আমার ভুল দেখে নি। আধ ঘন্টা পার্কে বসে মশার কামড় খাচ্ছি।

কণ্ঠের রুক্ষ স্বরে ঝুমা অবাক হয়ে গেছে। বলে, স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

নিশিরাত্রি স্বামী-সন্দর্শনের উপযুক্ত সময়ই বটে!

ঝুমা আরও নরম হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে যায় কি করব—দিনমানে ফাঁক পাওয়া যায় না। মুক্তি চাইতে গিয়েছিলাম আমি তাঁর কাছে।

কিন্তু ত্রিদিবের গর্জনে কথা শেষ হতে পায় না।

মুক্তি—কোন্ নিগড় থেকে জিজ্ঞাসা করি?

মুহূর্তে ঝুমাও কঠিন হয়ে যায়। বলে, কাজ নেই সে সমস্ত শুনে।

শোনা আমার পক্ষে রুচিকরও নয়। তুমি শুনে রাখ, রোমাঞ্চক নাটক হয়েছিল সেদিন বরানগরে ভূতের বাড়ি। কিন্তু সেটা অভিনয় মাত্র।

বলছ কি তুমি?

তুমি নয়, আপনি বল। ডক্টর রায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—এমন কিছু অন্তরঙ্গতা সে স্বীকার করে না তোমার সম্বন্ধে।

ধ্বক করে আগুন জ্বলে ওঠে ঝুমার দু-চোখে। ঝুমা আর নয়, লতিকা। বেশ, তাই—তাই!

এদিকে-ওদিকে তাকায়। পাগলের চাহনি। সহসা শাড়ির আঁচল ঘষতে লাগল কপালের উপর। আক্রোশে কপালের সিঁদুর মুছছে। মুছে নিশ্চিহ্ন করবে। ঘষতে ঘষতে কপালের চামড়াও তুলে ফেলবে নাকি?

ত্রিদিবের ভয় হয়ে যায়। সিঁদুর তুলে ফেলছে, স্বপ্নও ঘষে ঘষে তুলছে যেন।

ঝুমা!

ঝুমা বলে, কোন লজ্জায় পরেছিলাম অপমানের সিঁদুর। ছি—

ছি—ছি—

ছুটে পার্ক পার হয়ে অলিগলির মধ্যে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হল। ত্রিদিব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ ষোল ॥

মাসখানেক পরে ত্রিদিব একদিন সময় করে মঞ্জু-বিদ্যায়তনে গেল। নতুন বিল্ডিং দেখবার জন্য শেখর আরও অনেকবার বলেছে। কিন্তু যেটা আসল ব্যাপার, সেটা সেই একবারই বলেছিল। বারংবার বলতে সঙ্কোচ হয়। লেডি-প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর মনের ভাবগতিক বোঝা; এবং তদ্বির করা—শেখরের ঘরণী হতে সম্মতি দেন যাতে।

তা হাঁকডাক করে দেখাবার মতোই নতুন বাড়িটা। বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, তাতেই তাজ্জব। দু-হাতে পয়সা ঢেলেছে। মঞ্জুলাকে প্রাণ দিয়ে শেখর ভালবাসে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার ইচ্ছা পূরণের জন্য বিশাল আয়োজন। এটা ত্রিদিব বিশ্বাস করে না যে ভালবাসলেই অমনি জনম ভোর ফোঁৎ-ফোঁৎ করে নাক-চোখ মুছতে হবে। ভালবাসা হল অম্লান দীপের মতো—ক্ষতি কি, দীপ জ্বালিয়ে পূজা-অর্চনা ছাড়া কিছু আমোদ-স্ফূর্তিই হয় যদি।

দারোয়ান বলে, দাঁড়িয়ে কেন হুজুর, ঘরের মধ্যে বসুন। ডেকে আনছি আমি বাবুকে।

শেখর এসেছে?

অনেকক্ষণ হুজুর। এই এতক্ষণ বসেছিলেন আপনার জন্যে। তারপর কন্ট্রাক্টর এসে পড়ল—

ত্রিদিব বলে, তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল কোথায়?

দিদিমণি তো চরকির মতো ঘুরছেন। সমস্ত দায় একটা মানুষের মাথায়। বসুন আপনি, খবর দিচ্ছি।

প্রিন্সিপ্যাল লতিকা। নতুন বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব ঠিক আঠারো দিন পরে। কাজের বোঝার উপরে এই এক শাকের আঁটি চেপেছে। বাচ্চা মেয়েরা মিলিত কণ্ঠে উৎসবের গান রপ্ত করছে—সেইখানে একবার গিয়ে সে দাঁড়াল। অঞ্জু এদের মধ্যে। গান ছেড়ে সে ছুটে এসে লতিকার হাত জড়িয়ে ধরে। হাত ছেড়ে তারপর ঘুর-ঘুর করে চারিদিকে একপাক নেচে নেয়।

মাসিমা, মাসিমামণি—

দেখাদেখি আরও অনেক মেয়ে ঘিরে ধরেছে। গান বন্ধ। লতিকা গাল টিপে চুল টেনে কয়েকটিকে আদর করে বলে, যাও—আমায় দেখলেই ছুটে আসবে, এ কেমন কথা! অমন উঠে আসতে নেই, গানের দিদিমণি [illegible]

বেরিয়ে এসে দেখে, শেখরনাথ দরজার ধারে। বলল, একটু আসুন লতিকা দেবী! কন্ট্রাক্টর ক্যাটলগ নিয়ে এসেছে—নতুন অফিস-ঘরের ফার্নিচার কি ধরনের হবে, বুঝিয়ে দেবেন তাকে।

মিটিমিটি হাসছে শেখরনাথ! একটু থেমে আবার বলল, মেয়েরা ঘিরে ছিল—ভারি ভাল লাগছিল আপনাকে। আশ্রমকর্ত্রীর অপূর্ব রূপ।

লতিকা হেসে বলে, আপনি আশ্চর্য মানুষ শেখরবাবু। ক'দিন পরে এত বড় এক ব্যাপার—এর মধ্যে কবিত্ব আসে কেমন করে জানিনে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শেখর। অঞ্জু হাত ধরে নাচছিল, হঠাৎ মঞ্জুলার কথা মনে এসে গেল। ছোট্ট ইস্কুল তখন। মঞ্জু এলে মেয়েরা অমনি তাকে ঘিরে নাচত।

একটু চুপ করে থেকে বলে, আমার মনে হয় কি জানেন, মঞ্জুই আপনাকে জুটিয়ে এনেছে তার কাজ করে দেবার জন্যে। কাজও তাই নিখুঁত হচ্ছে। মঞ্জু বেঁচে থাকলেও বোধ করি এমনটা হতে পারত না।

কেমন এক বিহ্বল চোখে তাকিয়েছে। লতিকা তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলে, বিজ্ঞান-বিভাগ নিয়ে অনেক ভাবনা ছিল—সেটাও চালু হয়ে যাচ্ছে। এবারে আমি বিদায় নেব। কলকাতা ছেড়ে একেবারে বাইরে চলে যাব।

তবে আমিও থাকব না। চলে যাব সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে।

কেন ?

উঠেই তো যাবে আপনি না থাকলে। ততদূর হতে দেব না—তার আগে মানে মানে সরে পড়ব।

লতিকা বলে, মঞ্জুলা দেবী নেই, তাঁর অভাবে কিছুই আটকে থাকছে না। আমি গেলেই অমনি উঠে যাবে ?

শেখর বলে, ওসব আমি ভাবতে পারি নে। ভাবতে গেলে নিজেকে অসহায় বোধ করি। যেন অকূল সমুদ্রে ভাসছি—এতটুকু আশ্রয় নেই, ভরসা করে যেদিকে হাত বাড়ানো যায়।

লতিকা কঠিন হয়ে বলে, কিন্তু যেতেই হবে আমাকে। থাকতে পারব না। কথাবার্তা আগেভাগে পরিষ্কার হয়ে থাকা ভাল। আপনারা অন্যলোক দেখতে লাগুন।

সত্যিকার জোর কিছু তো নেই—কী আর বলব। যার উপর জোর ছিল সে ছেড়ে চলে গেল—

গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে কয়েক পা গিয়ে শেখর বলে ওঠে, হ্যাঁ—বলবে তারাই, যাদের আপনি কিছুতেই ফেলতে পারবেন না। অঞ্জু-রঞ্জুকে জানিয়ে দেব, তোদের মাসিমামণি চলে যাবেন।

কাতর অনুনয়ের কণ্ঠে আবার বলে, অসহায় ছেলেমেয়ে দুটো মা'কে ভুলে আছে আপনাকে পেয়ে। পারবেন ছেড়ে যেতে ঐ মা-হারাদের ? কষ্ট হবে না ?

লতিকা আগে আগে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হল হঠাৎ। শাণিত অসিফলকের মতো হাসি মুখের উপর। বলল, শুধুই মা-হারাদের কথা? ঠিক করে বলুন, তাদের পিতাঠাকুর মহাশয়ের কিছু নয় তো?

প্রশ্ন শুনে শেখর হতভম্ব হয়ে যায়। সামলে নিয়ে তারপর মৃদু-কণ্ঠে বলে, মঞ্জু চলে যাবার পর ঘরবাড়ি সমস্ত খালি হয়ে গেছে—

এবং আপনার হৃদয়ও।

ঠিক তাই। আমি পাগল হয়ে যাব লতিকা দেবী। আপনি দয়া করুন।

কথায় ছেদ পড়ে গেল। দারোয়ান এসে খবর দেয়, এসেছেন সেই সাহেব। অফিস ঘরে বসিয়ে এসেছি।

অফিস ঘরে ঢুকল ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটি। মুকুল না? হ্যাঁ মুকুলই তো?

এস এস মুকুলবাবু। আমায় চিনতে পারছ না। জিব্রাল্টারে জাহাজ-ডুবির সেই যে ভূত আমি।

এত ডাকছে, মুকুল যেন কানে শুনতে পায় না। ত্রিদিব উঠে বাইরে এল। মুকুল আরও জোরে হাঁটে।

পালাচ্ছ কেন আজকে? কি হল? এখানে—বিদ্যায়তনে কি জন্যে তুমি?

দৌড়বে নাকি ধরবার জন্য? দৃশ্যটা উপভোগ্য বটে। বিশ্ববিখ্যাত ডক্টর ত্রিদিব রায় বাচ্চাছেলের পিছু পিছু ধাওয়া করেছেন। থপথপে দেহ নিয়ে ধরা যেত না। কিন্তু ওদিকটায় পথ নেই, দেয়াল। মুকুল ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়েও মুখে কথা নেই, হাত টানাটানি করছে ছাড়িয়ে নেবার জন্য।

বল না মুকুল, কি হয়েছে? রাগ করেছ আমার উপর?

কথা না বলে এবারে উপায় নেই। মুকুল বলে, ছেড়ে দিন।

না বললে ছাড়ব না। বল, আমি কি করেছি।

মুকুল বলে, মা রাগ করেছে—খুব বকেছে আমায়।

কি বলেছেন তোমার মা?

একটু ইতস্তত করে মুকুল। তার পরে বলেই ফেলল, আপনি ডাকলে কাছে যাব না—কথাও বলব না আপনার সঙ্গে।

ত্রিদিব মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, তা সত্যি। ডক্টর রায়ের মতো নৃশংস নরাধম দুনিয়ায় আর একটি নেই, তার কাছে গেলে খারাপ হয়ে যাবে। তোমার মা ঠিক বলেছেন, যাওয়া উচিত নয়।

ছেড়ে দিয়েছে মুকুলের হাত। মুকুল তবু তার মুখের দিকে চেয়ে। ত্রিদিব বলতে লাগল, সবাই সাচ্চা—সকলে ভাল। এই একটি মানুষই শুধু পৃথিবীর সেরা সেরা দোষগুলো করে আসছে। তার কাছে গেছে ছেলে-পুলে নষ্ট হয়ে যায়। দাঁড়িয়ে কেন মুকুল, পালাও। তুমি কেন গালি খাবে আমার জন্যে? দোষ-অপরাধের তো অন্ত নেই—মায়ের অবাধ্য হতে বলে আবার এক নতুন দোষ করব না।

[illegible]

পারে। যেন কোন সর্বনাশের কবল থেকে ছুটে পালাল। ত্রিদিব দু-চোখ বন্ধ করল—কেন হে, জল আসছিল নাকি? না—পৃথিবীখ্যাত ত্রিদিব রায় কাঁদতে যাবে কোন দুঃখে? ও কিছু নয়, এমনি চোখ বোজা।

বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, অফিস-ঘরে নিয়ে বসায় নি?

ঝুমা আর শেখর এসেছে। না, ঝুমা তো নয়—লতিকা। শেখর পরিচয় করিয়ে দেয়, বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপ্যাল লতিকা দেবী—যার কথা বলছিলাম তোমায়। কি ভাগ্যে যে এঁকে পেয়েছি। আর ইনি হলেন ডক্টর ত্রিদিব রায়—নামেই যথেষ্ট, পরিচয়ের দরকার হয় না। না, একটি পরিচয় দিতে হবে—আমার পরম বন্ধু। ইস্কুল থেকে এক সঙ্গে পড়াশুনো, এত বড় হলেও সেই একভাব। এমন উপকারী বন্ধু আমার আর নেই।

ত্রিদিব বলে, তুমি নিজে বড়, তাই এমন করে বলছ। যদি কিছু কাজ করে থাকি, তার মূলে তুমি। তোমার সাহায্য না পেলে ত্রিদিব রায় আজও গেঁয়ো ইস্কুলের মাস্টার হয়ে থাকত, তার বেশি কিছু নয়।

কন্ট্রাক্টর এসে বলে, স্যার, ফার্নিচার তো হল। আর আপনি বলছিলেন, হলের ভিতর টুকটাক কি সব কাজ।

উৎসবের আগেই সব সেরে ফেলতে হবে। চলুন, আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে শেখর নতুন বিল্ডিং-এর দিকে যাচ্ছে। লতিকাকে বলল, আপনারা অফিস-ঘরে গিয়ে বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি। ছাত্র-দের বিজ্ঞান শেখানো সম্বন্ধে ত্রিদিব দেশবিদেশে অনেক দেখে এসেছে, অনেক ভেবেছে। এ সম্বন্ধে পড়াশুনাও বিস্তর। আলোচনা করে আপনি খুশি হবেন লতিকা দেবী। ত্রিদিবের দিকেও ইসারা করল। অর্থাৎ দু-জন মাত্র রইলে—শুধুই ইস্কুলের ব্যাপার নিয়ে সুবর্ণ-সুযোগ নষ্ট কোরো না।

নিঃশব্দে অফিস-ঘরে এল পাশাপাশি দু-জনে। ঝুমা আর ত্রিদিব। উঁহু, ডক্টর ত্রিদিব রায় আর লতিকা দেবী। চেয়ারে সুখাসীন হয়ে হাসির মতো ভাব করে ত্রিদিব বলল, বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আছ তুমি? শেখর শতমুখে তোমার গুণগান করে।

লতিকা বলে, তুমি নয়, আপনি বলতে হবে।

ত্রিদিবের চমক লাগে। এ যেন অন্য কেউ বলছে, এ কণ্ঠ ত্রিদিব কোন দিন শোনেনি জীবনে। লতিকা বিশদরূপে বুঝিয়ে দেয়, অনাত্মীয় অপরি-চিতকে আপনি বলাই নিয়ম।

ত্রিদিব ঘাড় নেড়ে বলে, সিঁথির সিঁদুর একেবারে নিশ্চিহ্ন—অনাত্মীয় তো বটেই। কিন্তু অপরিচিত বলা চলে কেমন করে?

ব্যঙ্গের হাসি ঝিকমিকিয়ে ওঠে লতিকার মুখে। কোনদিন ছিল নাকি পরিচয়? কই, আমার তো মনে পড়ে না। সিঁদুর শুধু নয়—মনের উপরের

দাগও ধুয়ে-মুছে গেছে, এতটুকু চিহ্ন নেই কোথাও।

এই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিনে লতিকা দেবী। একটু থেমে আরও জোর দিয়ে বলে, ঠিক তাই, মুকুল বাপ দেখে পালায়—বাপের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে মানা। মনের মধ্যে দরদ না থাক, বিষ আছে। আনন্দ দেওয়া নয়, অপমান বেঁধানোর কৌশল। ভুলে যাওয়ার লক্ষণ নয় মোটেই এটা।

ছেলেকে আমি অসৎসঙ্গে মিশতে মানা করেছি। এরই মধ্যে মনের পাখনা বেরুচ্ছে—দেশের গণ্ডির মধ্যে তার আকাঙ্ক্ষা আটক থাকতে আর রাজি নয়। নানা রকম দুর্জন মানুষের নাম করে বলে, তাদের মতন হবে সে জীবনে।

ত্রিদিব উচ্চ হাসি হেসে ওঠে।

দুর্জন মানুষ একটাই। ওটা গৌরবে বহুবচন, বুঝতে পারছি। তা সে যাই হোক, বাপ-ছেলের সহজ সম্পর্কের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়ানো—নিশ্চয় অনধিকার-প্রবেশ সেটা।

লতিকা বলে, দায়িত্বের সঙ্গেই আসে অধিকার। বস্তুর যেমন ছায়া। ওটা স্বতন্ত্র কিছু নয়। ছেলের এতটা বয়সের মধ্যে যে কোন দায়িত্বই নিল না, অধিকার আসবে তার কিসে? মুকুলের বাপ-মা সমস্ত আমি—একলা আমি। আমি ছাড়া কোন আপনজন নেই সেই অভাগার।

কন্ট্রাক্টরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে শেখর ফিরে এল। দায় সেরে আসা কোন গতিকে—যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে বোঝানোর ধৈর্য নেই। লতিকার কাছে প্রস্তাবটা নিজেই আজ অনেকখানি এগিয়ে রেখে গেছে—তারপরে ত্রিদিব আর কতদূর কি করতে পারল, কে জানে! যথাসাধ্য সে করবেই। কাজ যত দুঃসাহসিক হোক ত্রিদিব কখনো পিছপাও হবে না, এটা শেখরের চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। ঘরে ঢুকেই দু-জনের দিকে দৃষ্টিপাত করে অবস্থার আন্দাজ নিতে চায়। থমথমে মুখ দেখে ঘাবড়ে গেল—বেশি সুবিধে হয়েছে বলে তো ঠেকে না। ঠোঁটের উপর কাষ্ঠহাসি এনে প্রশ্ন করে, আলাপ-সালাপ হল আমাদের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে? বাঙালি মেয়ের মধ্যে এমন মেধা আমি আর দেখি নি।

হেসে উঠে লতিকাই বলে ওঠে, বলেন কি শেখরবাবু? মঞ্জুলা দেবী—যাঁর নামে এই বিদ্যায়তন—তাঁর চেয়েও মেধা বেশি হল আমার? নাকি তিনি আর কানে শুনতে আসছেন না বলে?

শেখর অপ্রতিভ হয়। চকিতের মতো মনে আসে, বুদ্ধির এত প্রখরতা ভাল নয়। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে অবশেষে বলে, মঞ্জু ছিল হৃদয়ের দিক দিয়ে অনেক বড়—

আমার বুঝি সে বালাই নেই?

ত্রিদিবের দিকে চেয়ে হেসে উঠে বলে, ডক্টর রায়ের কি অভিমত?

আমাকে হৃদয়বতী বলে মনে হয় না আপনার ?

শেখর বলে, কি মুশকিল। দু-জনেই কি ভাল হতে পারেন না ? সংসারে কি দুই সমান ভাল থাকতে নেই। তুলনার কথা উঠছে কেন আপনার মনে!

লতিকা বলে, আজকে না হোক, উঠবেই তো দু-দিন পরে। যাঁর জায়গায় নিয়ে বসাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে অহরহ মনে মনে তুলনা করবেন। তার চেয়ে আগে থেকে স্পষ্টাস্পষ্টি হয়ে মনের বাষ্প কতক বেরিয়ে যাওয়া ভাল।

ত্রিদিব সবিস্ময়ে শেখরের দিকে তাকিয়ে বলে, একথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না শেখর—

লতিকা বলে, কিছু বলেন নি শেখরবাবু ? কি আশ্চর্য, আপনাকেও নয় ? আমিই তবে নিমন্ত্রণ করে রাখি। বিয়েয় আসতে হবে ডক্টর রায়

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে ত্রিদিব বলে, বিয়ে—কার বিয়ে ?

আমার-ওঁর—। অন্যের বিয়ের বলতে যাওয়ার কি দায় পড়েছে ? আপনার বন্ধুটি কি লাজুক ডক্টর রায়—আপনার কাছে খুলে বলতেও লজ্জা। বুঝতেই পারছেন—বেশি জানাজানি হতে দেবার ব্যাপার নয়. বেশি লোককে বলা হবে না। আপনাকে নিজে উপস্থিত থেকে শুভ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

বলে চক্ষের নিমেষে লতিকা বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে যেন বোমা মেরে চলে গেল। নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো দু-জনে মুখোমুখি তাকিয়ে—কথা বলতে পারছে না, ভাবনার শক্তি হারিয়েছে।

॥ সতেরো ॥

শেখরনাথ ক্ষণকাল দিশা করতে পারে না। তারপর ত্রিদিবের হাত জড়িয়ে ধরল।

তোমার কীর্তি বুঝতে পারছি। ঠিক তাই। চিরকাল জানি, অসাধ্য সাধন করতে পার তুমি। এই তার এক নমুনা।

আমি কি করলাম ?

দেখ কতকাল ধরে মনে মনে এই সব তোলাপাড়া করছি। এক পা এগোই তো তিন পা পিছুই। পনের-বিশ মিনিট মাত্তর তোমরা এক সঙ্গে ছিলে—তার মধ্যে কি হয়ে গেল. কেমন করে কি ভাবে কথাটা তুললে বলো দিকি।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নানা রকমে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে—থামানো যায় না। ত্রিদিব কিছু করে নি, লতিকার সঙ্গে এ সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হয় নি।

তা শেখর কানেই নেবে না। এক নম্বর হাঁদারাম—এরাই হল দেশনেতা, খবরের কাগজগুলো পঞ্চমুখ এদের প্রশংসায়।

ত্রিদিব বলে, সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চাও নাকি আধ-বুড়ি প্রিন্সি-

প্যালটাকে ?

শেখর বলে, আমার বয়সটারও হিসাব ধর। কচিকাঁচা কে আসবে আমার ঘরে—আমার ছেলেমেয়ের মা হতে ?

ভাল করে খোঁজখবর নিয়েছ তো কে মেয়েটা, কোথা থেকে এলো, কেমনধারা আগেকার জীবন ?

এতদিন ধরে কাছাকাছি রয়েছেন, অহরহ চোখের উপর দেখছি—পরের কাছে কি খোঁজ খবর নিতে যাব, পরে আর কোন্ নতুন কথা বলবে ? তা ছাড়া স্বামিজী যাঁকে এনে দিয়েছেন, তার কোন দোষত্রুটি থাকতে পারে না।

ত্রিদিবের মুখে চেয়ে শেখর কি দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করে, তোমার জানাশোনা নাকি ওর সঙ্গে ?

থতমত খেয়ে ত্রিদিব বলে, হ্যাঁ—একটু-আধটু আছে বই কি। যার জন্যে তুমি পাগল হয়ে উঠেছ—জান, এক ছেলে আছে তার ?

মুকুল—খুব জানি তাকে। ছি-ছি, কি ভেবেছ তুমি। শেখর উচ্চ হাসি হেসে উঠল। বলে, এক কুড়ানো ছেলে। ছেলেটাকে লতিকা দেবী মানুষ করেছেন, বোর্ডিং-এ রেখে পড়ান।

একটুখানি থেমে বলে, এ রকমটা হবেই। দেখ, লেখাপড়া শিখে বেশি বয়স পর্যন্ত বিয়েথাওয়া না করলে কি হবে, মাতৃত্ব মেয়েদের স্বভাব !

ওঃ, বিয়ে করেন নি বুঝি ? কুমারী ?

সহাস্যে ঘাড় নেড়ে শেখর বলে, হ্যাঁ কুমারী। অনাঘ্রাত একটি শতদল ফুল। বয়স কিছু বেশি হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে কিছুই বলবার নেই।

ত্রিদিব বলে, মুকুল ওরই গর্ভজাত ছেলে—কুড়িয়ে পাওয়া নয়। হ্যাঁ, ও-মেয়ে খুব সহজ ব্যক্তি নন—মিথ্যা-পরিচয়ে তোমার বিদ্যায়তনে ঢুকেছেন।

শেখর স্তম্ভিত হয়ে বলে, এ তুমি কি বলছ ত্রিদিব ?

ভাল রকম জানি বলেই। আমি ছাড়াও জানে অনেকে—এই কলকাতা শহরেই আছে তেমন লোক। প্রমাণ করে দেওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। কিন্তু আমি বলি কি—বাইরের লোক ডাকবার আগে তুমি নিজেই একবার স্পষ্টা-স্পষ্টি জিজ্ঞাসা করতে পার। দেখি কি জবাব দেন।

শেখর তাড়াতাড়ি বলে, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাব না। আর তোমার কথা সত্যি হোক মিথ্যে হোক—অনুরোধ করছি, এ ব্যাপার নিয়ে উচ্চবাচ্য কোরো না। তোমার মনের তলে কত ভারী ভারী জিনিস চাপা রয়েছে—এটাও চাপা পড়ে থাক তার পাশাপাশি।

অর্থাৎ লতিকা যেমন হোক, যত নোংরা হোক তার পিছনের ইতিহাস, বিয়ে তুমি করবেই।

সজোরে ঘাড় নেড়ে শেখর বলে, হ্যাঁ।

আমি তা হতে দেব না।

কেন, তোমার কি স্বার্থ বল তো?

সেটা না-ই বা শুনলে। কিন্তু আমায় শত্রু বানিয়ে তোমার অত্যন্ত অসুবিধে হবে। বিদ্যায়তন থেকে বিদ্যা কি পরিমাণ সরবরাহ হচ্ছে, সঠিক জানি নে। তবে তোমার নামযশ বিদ্যায়তনের এই অট্টালিকার মতো সকল মানুষের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে উঠেছে। লহমার মধ্যে আমি সমস্ত চুরমার করে দিতে পারি—আশা করি, মিথ্যে দম্ভ বলে মনে কর না।

রাগে গরগর করতে করতে ত্রিদিব চলে গেল। শেখর অবাক। কিসে হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল। মঞ্জুলাকে অতিরিক্ত রকম ভালবাসে বলে চারিদিকে রটনা - ধরা যাক সেটা একেবারে মিথ্যা। এবং এটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল, লতিকা দেবীর পদস্খলন হয়েছিল কুমারী অবস্থায়। কিন্তু এ সমস্ত শেখরের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ত্রিদিবের আগুন হয়ে উঠবার হেতুটা কি? যত বড় বন্ধুই হোক অভদ্রভাবে অমন ভয় দেখানো কথা বলা তার পক্ষে নিতান্ত বেমানান। একদিন ত্রিদিব উপকার করেছিল, কিন্তু ত্রিদিব আজ যে এত বড় হয়েছে তার মূলেও নিশ্চয় এই শেখরনাথ।

যা হবার হোক—ত্রিদিব যদি শত্রু হয়ে পড়ে, কি আর করা যাবে? মঞ্জুলা বেঁচে নেই, তেমন আর ভয়ের নেই কিছু এখন। সারা জীবন সে ভেসে ভেসে বেড়াবে না—না হয় কলকাতা শহর ছেড়ে কোথাও চলে যাবে লতিকা আর মুকুল-কে নিয়ে। দশের হাততালি, খবরের কাগজের কলম দু-এক লাইন কিম্বা এই বিদ্যায়তন—এ সবের চেয়ে লতিকার মূল্য তার জীবনে অনেক বেশি।

ভেবেচিন্তে মন স্থির করে শেখর চলল প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারে। কোয়ার্টার বিদ্যায়তন কম্পাউণ্ডের ভিতরেই। আজকে ছুটির দিন। ছুটির দিনে মুকুল মায়ের কাছে আসে। লতিকা এটা-সেটা বানিয়ে রেখে, ছেলেকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে খাওয়ায়। খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে সে বাইরে এলো।

এমন অসময়ে যে শেখরবাবু?

শেখর বলে, একটু আগে যা সমস্ত বলে এলেন, তারপরে সময়-অসময় বিচারের অবস্থা থাকে না লতিকা দেবী।

একটু চিন্তার ভান করে লতিকা বলে, এমন কি বলে এলাম। আমি তো কই ভেবে পাচ্ছি নে কিছু।

আমাকে জীবনে গ্রহণ করবেন। এ যে আমার কত দিনের স্বপ্ন—

কথা শেষ করতে দেয় না লতিকা। হেসে উঠে বলে, কি সর্বনাশ—আপনি সত্যি বলে ধরে নিয়েছেন? ঠাট্টার কথা বুঝতে পারেন না। তাই কখনো হতে পারে?

শেখর বলে, কেন হতে পারে না বলুন।

লতিকা বলে, আপনাকে ছোট হতে দেব না শেখরবাবু। পুরুষ বড় মিথ্যাচারী। তার মধ্যে একজন অন্তত আমার চোখের সামনে রইলেন,

একনিষ্ঠ ভালবাসায় চিরদিন যিনি মঞ্জুলা দেবীর স্মৃতির মধ্যে ডুবে আছেন।

শেখর তর্ক করে, বিয়েথাওয়া হলে আপনি আর পালাই-পালাই করতে পারবেন না। মঞ্জুলার বিদ্যায়তন আরও বড় হবে, ভাল চলবে। ওপার থেকে দেখে খুশিই হবে সে।

ভ্রূকুটি করে লতিকা বলে, এই জন্যে?

শেখর ইতস্তত করে বলে, একেবারে আসল কারণ না হলেও এ-ও একটা কারণ বই কি।

লতিকা ব্যঙ্গস্বরে বলে, শুনেছি মঞ্জুলার আত্মার সঙ্গে হামেশাই আপনার দেখাশুনো চলে। ভাল করে এবারে জেনে নেবেন তো, বিদ্যায়তনের খাতিরে সতীন তিনি সহ্য করতে পারবেন কি না।

শেখর রাগ করে বলে, খুব যে ঠাট্টা করছেন লতিকা দেবী।

ভণ্ডামি ঠাট্টারই জিনিস। আপনি আমার ধারণা ভেঙে দিলেন শেখর-বাবু। মঞ্জুলার কাজের খাতিরে আপনি বিয়ে করতে চাচ্ছেন, কখনো তা আপনার মনের কথা হতে পারে না।

শেখর বলে, কিন্তু আপনার মনেই যদি ভিন্ন কথা, ত্রিদিবের সামনে কেন অমন করে বানর নাচালেন?

ঘৃণাভরা তীব্রকণ্ঠে লতিকা বলে, বানর দেখলেই নাচাতে ইচ্ছা করে। নাচিয়ে মজা পাওয়া যায়।

অপমানে শেখরের মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি সামলে নেবার চেষ্টা করে: নাচাবারই মতলব ছিল শেখরবাবু। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে আপনাকে নয়।

তবে কে? আর ছিল সেখানে ত্রিদিব। তার পরেই বা এত আক্রোশ কিসের? আপনার কৌমার্যকাহিনী কিছু কিছু তার জানা আছে, সেই জন্যে না কি?

লতিকা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখে দেখে শেখর খানিকটা আনন্দ পায়। আশাভঙ্গের শোধ তুলে নিচ্ছে নিষ্ঠুর আঘাত হেনে। বলতে লাগল, কি আশ্চর্য—এতদিন রয়েছেন, আপনাকে একটু চিনতে পারি নি। পিছনের কলঙ্কের এতটুকু খোঁজখবর নিই নি।

কি আমার কলঙ্ক? ডক্টর রায় কি বলেছেন আমার সম্বন্ধে?

আপনি বলেছিলেন মা-বাপ মরা কুড়ানো ছেলে মুকুল। কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন।

আস্তে, আস্তে বলুন শেখর বাবু। জোড়হাত করে বলছি, অত চেঁচাবেন না।

সশঙ্কে লতিকা পিছনে ঘরের দিকে তাকায়। কি সর্বনাশ, যা ভয় করেছিল তাই। গোলমাল শুনে মুকুল কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। রক্ত-লেশবিহীন পাংশু মুখ। ছেলের দিকে তাকিয়ে লতিকার অন্তরের মধ্যে

হাহাকার করে উঠল।

শেখরের দৃক্‌পাত নেই, তেমনি কঠিন কণ্ঠে বলে চলেছে, বলুন যে এই মুকুল আপনার কুড়ানো ছেলে, সত্যিকার ছেলে নয়। দয়া করে তাকে পালন করেছেন। অবিশ্যি বললেই যে পার পেয়ে যাবেন তা নয়। ত্রিদিব রায় এই কলকাতা শহরে বসেই প্রমাণ করে দেবে।

কিছু প্রমাণ করতে হবে হবে না। স্বীকার করছি, মুকুলের মা আমি—সত্যিকার মা।

কুমারীর সন্তান। আর তাই গোপন রেখে পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে আছেন এতদিন। শহরের বিশিষ্ট ভদ্রঘর থেকে এখানে মেয়ে পাঠায়।

বাঘিনীর মতো লতিকা গর্জন করে ওঠে, বাড়ি বয়ে এসে অপমান করছেন শেখরবাবু। অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। আপনার পশুবৃত্তিতে আমার ছেলে হাঁপিয়ে উঠেছে।

হাত বাড়িয়ে বাইরের পথ দেখিয়ে দিল। শেখর বলে, আমার জায়গায় বসে আমার উপর হুমকি?

বিদ্যায়তনের প্রিন্সিপ্যাল আমি, এটা আমার বাসা। আপনাকে বলছি এই মুহূর্তে চলে যান এখান থেকে।

আচ্ছা, ক দিন আর প্রিন্সিপ্যাল থাকতে পারেন দেখে নেব।

শেখর দ্রুত পায়ে চলে গেল।

॥ আঠারো ॥

বিদ্যায়তনের জরুরি মীটিং। নতুন বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্ঘাটন কিছু পিছিয়ে দেওয়া হল। লতিকাকে সরিয়ে নতুন যিনি প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসবেন, তাঁকে দিয়েই সে কাজ হবে। মঞ্জুলার নামের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান—লতিকার মতো মেয়ের এখানে জায়গা নেই।

ব্যাপারটা বেশ খানিক চাউর হয়ে পড়েছে। হেন মুখরোচক কথা গোপন রাখা দায়। সত্যি যেটুকু তার বহুগুণ রটনা। এমন কি মুকুলেরও কানে গিয়ে উঠেছে। কাঁদো-কাঁদো হয়ে সে বলল, তোমায় বড্ড অপমান করবে নাকি মা? মীটিঙে তুমি যেও না।

লতিকা একটুও যে বিচলিত হচ্ছে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কৌতুক-স্বরে বলল, তবে কি করব রে খোকা?

পালিয়ে চল মা এদের এখান থেকে।

লতিকা গম্ভীর হয়ে বলল, পালানো তোর মায়ের স্বভাব নয়। এখান থেকে যাব ঠিকই, কিন্তু মীটিঙ হয়ে যাবার পরে।

ডক্টর রায়ের মতন মানুষ ঐ দলে রয়েছেন, তবে আর ভরসা কিসের বল?

ছেলের কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাল বলে, ছি-ছি-ছি, অত বড় মানুষ—এমন নোংরা মতিগতি তাঁর।

লতিকা বলে, সেই জন্যেই তোকে সামাল হতে বলি বড মানুষের কাছ থেকে। মীটিঙ অবধি থেকে স্বচক্ষে দেখে যেতে চাই, ঐ মানুষ কতদূর নিচে নামতে পারে।

মুকুলকে কাছে টেনে বুকের উপর তার মাথা চেপে ধরল। বলে, কী হয়েছে রে খোকা, অত মন ভারী করবার কি আছে? দেখ দেখ, মুকুলবাবুর চোখে জল। সকলকে আমি বলে দেব, পুরুষছেলে হয়ে কেঁদে ফেলে কথায় কথায়—

মুকুল লজ্জা পেয়ে চোখ মুছে ফেলে। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না, আগের কথারই জের ধরে বলে, তুমি পছন্দ করতে না মা, কিন্তু আজ তোমায় বলি, কাগজ খুঁজে খুঁজে ওঁর কথা আমি পডেছি। কী ভাল যে লাগত। বাইরে এত নামডাক, সে মানুষ এত ছোট হয়ে যায় কেমন করে?

লতিকা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলে, যে যেমন হয় হোকগে। আমাদের কি। যা তুই বলছিলি—চলেই যাবো এখান থেকে। তুইও যাবি। হস্টেলে থেকে পড়া আর হয়ে উঠবে না বাবা। খরচ পাব কোথায়? মাস্টার মশায়ের মাইনেও হয়তো দিয়ে উঠতে পারব না।

মুকুল বলে, হোকগে, হোকগে। মাস্টার মশায়ের কি দরকার? তুমি একটু-আধটু বলে দিও। খুব ভাল হবে মা, তোমার কাছে পডব আমি।

লতিকাও বলে, তবে দেখ্। ওরা কষ্ট দিতে গেল, উল্টে মজা আমাদের। এতদিনই তো কষ্ট গেছে—তুই এক জায়গায় আমি অন্য জায়গায়। এবার থেকে মায়ে ছেলেয় একসঙ্গে থাকব। উঁহু, বাবা আর মেয়েয়—কি বলিস?

মজার দিনের সম্ভাবনায় লতিকা উচ্ছ্বসিত হাসি হাসতে লাগল। মায়ের সঙ্গে মুকুল কিন্তু হাসে না। সে চুপচাপ।

খবরের কাগজের চাকরিটা গিয়ে উৎপলা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। খাটনির জন্য নয়। সারাদিন খাটাও তাকে, নাইটডিউটি দিয়ে সমস্ত রাত্রি খাটাও—অটুট স্বাস্থ্য, তাতে তার কষ্ট নেই। কষ্ট হল দুলালের মতো মানুষের অহরহ কাছাকাছি বসে থাকা। কারণে অকারণে তাকে আকাশে তুলে ধরা। অসহ্য, অসহ্য! কাজ ওখানে যা ছিল, কিছুই না। আরও ঢের ঢের কঠিন কাজের ভার দাও। কিন্তু কাজের বাইরে ঐ যে মোসাহেবি ও ভালবাসার ভাণ—তারই খাটনিতে হাঁপ ধরে যায়। সারাদিনের এই অদ্ভুত চাকরির পর নিরালা রাতে শ্রান্তিতে ঘুম পায় না, চোখ ফেটে কান্না আসে।

চুপচাপ ঘরে বসে থাকবার অবস্থা নয়—দাদা মারা গিয়ে সকল দায়-দায়িত্ব উৎপলার কাঁধে চেপে গেছে। আবার তাই চাকরি খুঁজতে হয়। এমন

জায়গা চাই, প্রবীণ পাকা লোক যেখানকার মুরুব্বি। যত খুশি খাটিয়ে নিক, কিন্তু তার বাইরে অপর কোন প্রত্যাশা না থাকে।

তেমনি এক চাকরিই জুটেছে। কনস্ট্রাকসন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম। বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করে নতুন লিমিটেড কোম্পানি ফেঁদেছেন। দেশ জুড়ে হাজারো পরিকল্পনা—আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সুদীর্ঘ চাকরিতে বিস্তর কেষ্টবিষ্টুর সঙ্গে দহরম-মহরম হয়েছে। তোড়জোড় করে কয়েকটি ভাল ভাল কন্ট্রাক্ট যে বাগাতে পারবেন, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ মাত্র নেই। চিঠিপত্র লিখতে উৎপলার অসাধারণ দক্ষতা—ইংরেজির খাসা বাঁধুনি। লেখার নমুনা দেখে তাকে চাকরি দিয়েছেন। পলিতকেশ, মানুষটিও ভাল—মা ছাড়া মুখে কথা নেই। সকাল ঠিক দশটায় অফিসে যাবার কথা, উৎপলা যায়ও তাই। সাড়ে-পাঁচটায় বেরুবে—ঠিক সেই মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাড়া পাওয়া যায়, আরও তিনটে চিঠি আছে মা, বড্ড জরুরি। লেট-ফী দিয়ে আজকেই পাঠাতে হয়ে। এগুলোর একটা গতি করে যাও। তার মানে, চলল এখন সেই সাতটা অবধি; কিম্বা তারও বেশি। এ হেন জরুরি চিঠির ব্যাপার একদিন দু-দিন নয়, প্রায় রোজই। কয়েকটা শনিবারে ডেকে বললেন, কাল যদি মা আসতে পার একটু—। রবিবার বেরুনোর লোকসান নেই অবশ্য· খাটনিটুকু টাকায় পুষিয়ে দেন। কিন্তু অফিস থেকে ফিরবার সময় রোজই উৎপলার মনে হয়, সে যেন আখের ছিবড়ে; সারা দিন ধরে জীবনের সমস্ত রসকষ নিংড়ে বের করে নিয়েছে। বাড়ি ফিরেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, ক্ষমতাও নেই বোধ হয়।

হরিদাস বলছিলেন, ত্রিদিব আসে না কেন রে?

ডাক্তার সাহেব, জবাবটা দিন—আসা হয় না কেন নীং? লজ্জা? বটেই তো। বয়স হোক আর পুরানো পরিচয় যতই থাকুক—বিয়ের বর, সে তো মিথ্যা নয়। সামনে দু-মাস অকাল, কিন্তু বাবার যেন সবুর সইছে না।

উৎপলা মনে মনে হাসে। সবুর সইছে না একা বাবারই বুঝি? অন্য সকলে নিতান্তই উদাসীন নির্বিকার—কি বল?

মনে পড়ে যায়, দিদি লতিকার সঙ্গেও দেখা হয় নি অনেককাল। সামনের রবিবার নিশ্চয় যাবে। বর দেখানোর তারিখটা ঠিক করে আসবে সেই সময়। দিদির বরের সঙ্গে তার বর ত্রিদিবের পরিচয় করিয়ে দেবে—সেই যে কথাবার্তা হয়েছিল। কথাটা তারপরে চাপা পড়ে গেছে।

এমনি সমস্ত ভাবছে উন্মনা হয়ে। খট করে দরজা একটু নড়ে উঠল। আরে, মুকুল এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে কেউ নেই একা চলে এসেছে? এ বাড়ি এসেছে মুকুল অনেকবার, একা একা এল এই প্রথম। এস এস,—মুকুলবাবু বড় হয়ে গেছে, একলা চলাফেরা করতে পারে—আর ভাবনা কি আমাদের? কে ন জায়গায় যেতে ইচ্ছে হলে মুকুলবাবু গার্জেন হয়ে নিয়ে

যাবেন।

কিন্তু মুকুলের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়। সুন্দর মুখে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন। ক'টা দিন দেখে নি, তার মধ্যে কত ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। কাছে গিয়ে হাত ধরে টেনে এনে খাটের উপর বসিয়ে স্নেহাচ্ছন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এমন চেহারা কেন মুকুল? কি হয়েছে—বল দিকি শুনি।

জবাব দেবে কি—মুকুল দেয়ালের ফোটোর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। ত্রিদিবের ছবি—সেই অনেক কাল আগে যখন সুবোধের সঙ্গে সে কলেজে পড়ত। উৎপলা ছবিটা সংগোপনে কাছে রাখত, এই কিছুদিন ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছে। আর কিসের পরোয়া- এই তো অকালের মাস দুটো গেলে ত্রিদিবের হাত ধরে সে ডঙ্কা মেরে বেড়াবে।

আজকের ত্রিদিব রায় অনেক তফাৎ ঐ ছবির সঙ্গে। চেয়ে চেয়ে তবু মুকুল চিনল। বলে, মাসিমা ডক্টর রায়ের ছবি নয়?

উৎপলা ঘাড় নেড়ে বলে, তখন ডক্টর রায় নয়—সামান্য এক ত্রিদিবনাথ। ঠিক তো চিনেছ, নিশ্চয় খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছ তাঁকে। নিজের চেষ্টায় কত বড় হওয়া যায়, তার জীবন্ত উদাহরণ। তুমিও জীবনে ঐ রকম হোয়ো মুকুল।

মুকুল আপন ভাবনায় ছিল, উৎপলার সমস্ত কথা কানে গেল না হয়তো। বলে, ডক্টর রায়ের বাড়িটা জানেন মাসিমা? কোন রাস্তায় কদ্দুর?

রাস্তার নাম বলে দিয়ে উৎপলা বলল, বাড়িটা চিনি আমি—নম্বর কে মুখস্থ রেখেছে। টেলিফোন-গাইডে আছে, ইচ্ছে হলে দেখে নিতে পার। নম্বরই বা লাগে কিসে? ওদিকটায় গিয়ে একটু লেখাপড়া জানা যার কাছে জিজ্ঞাসা করবে সেই বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

প্রশ্ন করে, তাঁর বাড়ির খবর কেন মুকুল, কোন দরকার আছে? খবরদার, এমন একা একা চলে যাবে না। অনেক দূর।

ফোঁটা কয়েক জল গড়িয়ে পড়ল মুকুলের চোখ দিয়ে। উৎপলা অবাক হয়ে যায়, কি হয়েছে—আমায় বলবে না?

মিষ্টি কথায় মুকুলের কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলে, মিথ্যে বদনাম দিয়ে আমার মাকে ওরা তাড়িয়ে দিচ্ছে। সেই জন্যে মাসিমা তোমার কাছে এলাম।

উৎপলা বিশ্বাস করতে পারে না সহসা। জানে তো, শেখরনাথ কি চোখে লতিকাকে দেখে। সকল জায়গায় তার প্রশংসা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত শুনল মুকুলের কাছ থেকে। মুকুল বলে, ডক্টর রায় রয়েছেন ওদের দলের মধ্যে। আমি ভাবতে পারি নে মাসিমা, অত বড় মানুষের এমন অধোগতি কি করে হয়।

উৎপলা বলে, ডক্টর রায় অনেক উপকার পেয়েছেন শেখরনাথের কাছে,

শেখরের সঙ্গে তাঁর বড় বন্ধুত্ব। হাত এড়াতে না পেরে সঙ্গে রয়েছেন হয়তো।

মুকুল তিক্তস্বরে বলে, ঠিক উল্টো মাসিমা। তিনিই উসকে দিচ্ছেন শেখরনাথকে।

সে যাই হোক তোমার এত কি ভাবনা মুকুল? মা মাসি দু-জনে আমরা মাথার উপর—যা করতে হয়, আমরাই করব। তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ?

মুকুল বলে, মা কিছু করবে না। যদি কিছু করতে হয়, সে করবে তুমি—একলা তুমি। মা আর আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তা-ও আগেভাগে নয়। সকলের কাছ থেকে ঝাটালাথি যা খাবার, খেয়ে নিয়ে তারপরে বেরুব।

উৎপলা ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবছে। হঠাৎ মুকুল উঠে পড়ে, যাই মাসিমা।

সে কি রে? যাবে কি রকম। চল রান্নাঘরে।

মুকুল কাতর হয়ে বলে, খেয়েদেয়ে বেরিয়েছি মাসিমা। আর আমি খেতে পারব না। দেরি হলে হস্টেলে বকাবকি করবে। আমি চললাম।

উৎপলা নীলমণিকে ডেকে: পাগলা ছেলে ক্ষেপে গিয়েছে নীলমণি-দা, তুমি সঙ্গে করে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে এস। ভাবনা কোরো না মুকুল। কলকাতা ছেড়ে কেউ তোমরা যাবে না—না তুমি, না তোমার মা। কেউ অপমান করবে না। কালকে ওরা মাউড করছে—দেখ দিকি, কিছু জানিনে আমি কেউ কিছু বলে নি। অফিসে খেটে কারো কোন খবর রাখতে পারিনে। লোকলৌকিকতা চুলোয় গেছে, অমানুষ হয়ে গেছি একেবারে।

হাত ঘড়ি দেখে উৎপলা উঠে পড়ল। আর বিশ্রাম চলবে না, হরিদাসের খাবার দেওয়ার সময় হল।

নীলমণি-দা আসছে, একটুখানি বোসো মুকুল। ডক্টর রায়কে আমি মানা করে দেব, শেখরনাথকেও দেখে নেব।

মুকুল গর্জন করে ওঠে, দেখব আমিও—

বুড়ো নীলমণির নড়তে চড়তে দেরি হয়। এসে দেখে মুকুল চলে গেছে। রাস্তায় নেমে খানিকটা এগিয়ে দেখে। পাওয়া গেল না। উৎপলা রাগ করবে—কিন্তু উপায় কি, বাচ্চা ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তড়বড়ি ছুটাছুটির সামর্থ্য আছে কি তার?

সকালবেলা উৎপলা ত্রিদবের কাছে যাচ্ছে। আদ্যোপান্ত তার কাছে সব শুনবে। কিন্তু ভুজঙ্গ এসে ভণ্ডুল করে দিলেন।

কি ব্যাপার? কি মনে করে হঠাৎ এদ্দিন পরে?

ভুজবাহাদুর বলেন, খবরাখবর নিতে এলাম দিদি। মনিবের সঙ্গে বনিবনাও হল না—চাকরি ছাড়লেন, বেশ করলেন। কিন্তু সে জন্যে আমরা পর হয়ে যাব কেন?

উৎপলা সোজাসুজি প্রশ্ন করে, মনিব পাঠিয়েছে?

জংবাহাদুর থতমত খেয়ে বলেন, নিজের আসতে বাধা কি?

বাধা কিছু নেই, কিন্তু আসেন নি। নিজে থেকে কোথাও যান না আপনি, কোন-কিছু করেন না। অন্তত আমি তা কখনো দেখি নি।

ভুজঙ্গ একটু বিরক্তভাবে বললেন, দেখেননি—তবে দেখুন এই আজকে। হিতকথা বলতে বাস-ভাড়া করে ছুটে এলাম। ঝগড়াঝাঁটি করে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। আপনার পরে আর একটা মেয়ে এসেছে, কিন্তু তার গ্রামার শুদ্ধ করবার জন্য আর একজনের দরকার। এমন মুখ্যু দিয়ে কাজ হয় না। যা বলতে এসেছি, শুনুন। বড় আহা-মরি মানুষ দুলালচাঁদ বাবু—অমন মানুষ হয় না। আপনি একটু নরম হয়ে তাঁর কাছে যদি ঘাট স্বীকার করেন—

অর্থাৎ ঘাট স্বীকার করে দুলালবাবু আপনাকে পাঠিয়েছেন। তাঁকে বলবেন—মারফতি মাপ চাওয়ার বদলে নিজে সামনে এসে করজোড়ও যদি করেন, তাঁর চাকরি আমি করব না।

জংবাহাদুরও নাছোড়বান্দা। সুস্পষ্ট 'না' বলার পরেও সন্দেহ রাখেন, কোন গূঢ় গভীর তলদেশে 'হাঁ' লুকিয়ে আছে, খানিক ঘোলাঘুলির পর ভেসে উঠবে। বললেন, অমন সোনার চাকরি—

অন্য চাকরি পেয়েছি আমি। সোনার নয়, কিন্তু সম্মানের।

জংবাহাদুর বলেন, যদি কোন অসম্মান হয়ে থাকে, মনিবের হয়ে মাফ চাচ্ছি। রাগ পুষে রাখবেন না।

দুলালচাঁদের উপর রাগ পুষে রাখব, অতটা অতটা দরের মানুষ তাঁকে ভাবি না। কোন রাগ নেই। নতুন চাকরি নিয়েছি বটে, সেটাও ছেড়ে দেব। চাকরিই করব না আর।

থেমে গিয়ে একটু হেসে বলে, বিয়ে হচ্ছে। অকালের মাস দুটো গেলেই।

বিয়ে আপনার?

পাংশু মুখে জংবাহাদুর বিস্তর উল্লাস প্রকাশ করলেন, বিয়ে? ভাল ভাল। তা পাত্রটি কে হলেন, পরিচয় শুনি।

উৎপলা বলে, ভাল পাত্র। আপনি তো চেনেনই. নাম করলে দেশের সমস্ত লোক তাঁকে চিনবে।

হাসি মুখে দেয়ালের ছবির দিকে, আঙুল দেখাল, ঐ যে—

আনন্দে গদগদ হয়ে জংবাহাদুর বললেন, তাই নাকি! ত্রিদিব আমার বড় আপনার।

সে তো জানিই। সেই যে নেমন্তন্ন করিতে গিয়ে ওঁরই বাড়ি বসে হচ্ছিল সে সব কথা।

জংবাহাদুর আগের কথারই জের ধরে বলতে লাগলেন, অমন পাত্র হয় না। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু পাত্রীর দিক দিয়েও আজকাল ঠানদিদি ঠাকুর-

মারা পাউডার মেখে কনে-পিঁড়িতে এসে বসেন। সত্যি, এ সম্বন্ধ জাঁক করে শোনানোর মতো—

উৎপলা বলে, কিন্তু এক দোষেই সমস্ত মাটি। কড়াই ভর্তি দুধের মধ্যে গোময়। আপনার সেই বিদ্যাধরীর সঙ্গে আমার কিন্তু খুব ভাব হয়ে গেছে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সে বলে অন্য কথা।

তখন ভুজঙ্গর মনে পড়ে যায়, যা সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল। তাঁরই কথা ফিরিয়ে বলে ঠাট্টা করছে। রাগ করে বললেন, বিদ্যাধরী সাফাই সাক্ষি দিয়েছে। চুলোয় যাকগে। কিন্তু বিয়ে-করা জলজ্যান্ত এক পরিবার আছে, তার সঙ্গেও পরিচয়টা তবে সেরে নিন।

তাকিয়ে আছে দেখে অধিকতর উৎসাহে জংবাহাদুর বলতে লাগলেন, এই কলকাতা শহরেই আছে সে। মিল-টিল হয়ে গেছে দু-জনায়। মাধবীলতা বউটার নাম। ঠিকানার খোঁজ নিয়ে আপনাকে দিয়ে যাব। সেই যা বলেছিলাম—বাইরেটা দেখে সকলে মত্ত হয়, কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়ে ত্রিদিবটা অতি ইতর।

উৎপলা তীব্র স্বরে বলল, কিন্তু আপনার মনিব দুলালের মতন নয়। যা বলবার বলা হয়ে গেছে তো—আমি উপরে চলে যাচ্ছি।

অপমানে ধৈর্য হারিয়ে কাজ নষ্ট করবার পাত্র জংবাহাদুর নন। উৎপলা চলে যায়, তখন বলে উঠলেন, ওদের পারিবারিক ইতিহাস আমি সমস্ত জানি দিদি। বউটাও কুলটা।

উৎপলা ফিরে দাঁড়িয়ে বোমার মতো ফেটে পড়ল, স্পষ্টাস্পষ্টি বেরিয়ে যেতে না বললে উঠবেন না বুঝি? এ সমস্ত করে কোন লাভ হবে না আপনার মনিবের, বিয়ে আটকানো যাবে না।

দুমদুম করে সিঁড়ি বেয়ে উৎপলা উপরে উঠে গেল। যাবার সময় দরজা দিয়ে গেল, চিৎকার করে বললেও ভুজঙ্গের কথা আর আর কানে ঢুকবে না।

ভেবেছিল, ত্রিদিবের বাড়ি গিয়ে লতিকার সম্বন্ধে কিছু বলে আসবে। কিন্তু মনটা খিঁচড়ে গেল। বেলাও হয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে ত্রিদিব। উৎপলারও অফিসে বেরুনোর সময় হল। যাকগে, অফিসে গিয়ে ফোন করবে ত্রিদিবকে, ফোনে সমস্ত বলবে।

॥ উনিশ ॥

ত্রিদিব বেরোয় নি, বাড়িতেই আছে। কি রকম অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, ভাল লাগছে না কোন-কিছুই। এর উপর একটা যন্ত্রণা উঠছে মাঝে মাঝে বুকের নিচের দিকটায়।

সুধার নজরে পড়েছে।

হয়েছে কি বল তো দাদা?

ম্লান হেসে ত্রিদিব বলে, নির্বিকল্প সমাধি। সকল আশা মিটেছে, যা-কিছু চেয়েছিলাম ভাগ্যবিধাতা কল্পতরু হয়ে দু-হাতে ঢেলেছেন। আর কিছু করবার নেই, শুয়ে বসে চেখে চেখে এখন শুধু উপভোগ করা।

এই হাসি এই কথাবার্তায় সুধার চোখের কোণে জল এসে যায়। আঁচলের প্রান্তে মুছে ফেলে ঝাঁঝালো সুরে বলে, রাত্রিদিন তোমার মুখের বড়াই—শুনতে শুনতে কান পচে গেল। আর যার কাছে পার, আমায় তুমি মিথ্যে ছলনায় ভুলোতে পারবে না।

ত্রিদিব বলে, উপভোগের কথাই বলেছি, সুখের কথা হল কখন? দুঃখের বুঝি উপভোগ হয় না! বিধাতাপুরুষের কাছে খ্যাতি-প্রতিপত্তি চেয়েছিলাম, সুখশান্তি তো চাই নি। এখন আবার নতুন আবদার ধরতে গেলে চলবে কেন?

সুধা নাছোড়বান্দা হয়ে বলে, ওঠ দাদা। উঠে খানিক বেড়িয়ে এস, শরীর-মন চাঙ্গা হবে।

বারবার তাগিদেও ত্রিদিবকে নড়ানো যায় না। শুয়ে শুয়ে বলে, একেবারে বেরুব রে। কলকাতা শহরের বাস উঠিয়ে দিয়ে। হতভাগা জায়গায় আর কোনদিন আসছি নে।

সুধা বলে, সে কি? আর-কিছু না হোক এত কষ্ট করে ল্যাবরেটারি গড়ে তুলছ—সমস্ত ছেড়েছুড়ে চলে যাবে?

জীবনের কোন বন্ধন কবে গ্রাহ্য করেছি বোন? দৈত্যের মতন সংসারটা দলেমথে বেড়িয়েছি। ল্যাবরেটারি কি এমন বস্তু যে এতকাল পরে পায়ে বেড়ি আটকাবে?

একটু থেমে বলে, ওদিকে কি বলা যাবে, সেইটে শুধু ভাবছি। ভারি বুদ্ধির মেয়ে। ভেবেচিন্তে বানিয়ে কিছু বলতে হবে। ঝগড়া করে বলব না মিষ্টি কথায় বলব, মনে মনে সেই মুশাবিদা করছিলাম। ফল অবশ্য একই।

সুধা বলে, কোথায় যাবে?

এখনো ঠিক করি নি। আর দশজনের মতো ছকে-বাঁধা জীবন আমার নয়। বেরুলেই হল। পৃথিবী ছোট্ট জায়গা—সব দেশ সকল মানুষের মধ্যে চেনা-জানা হয়ে গেছে। বেরুবার জন্যে আগে থেকে জোড়-জোড় হিসাবপত্তরের কিছু নেই। কোন এক সকালে উঠে বললেই হল, বাঁধ গাঁটরি—কেন টিকিট—

সুধা বলে, অনেক তো হল! বয়স হয়েছে। ভেবেছিলাম, শান্ত হবে এবার। উৎপলাকে নিয়ে সুখী হবে।

ত্রিদিব বলে, আমিও ভেবেছিলাম তেমনি খানিকটা। কিন্তু হতে দিল কই? সর্বনাশী রে-রে করে এসে পড়ল। হ্যাঁ সুধা, সুখসোয়াস্তির দিকে চোখ তুলে তাকাতে গেলেই সে দাঁত বের করে ভয় দেখায়।

ত্রস্তকণ্ঠে সুধা বলে, চুপ কর দাদা, চুপ কর—

কিন্তু ত্রিদিব থামে না।

সর্বনাশী বলে কি জান? সংসারই যদি করবে, তবে এক সাজানো সংসার একদিন খেঁতলে মাড়িয়ে এলে কেন? এ আমি দেখেছি সুধা, গৃহস্থালীর কথা ভাবতে গিয়েছ কি সে অমনি উদয় হবে কোথা থেকে। অন্তর্যামী—কেমন করে যেন টের পেয়ে যায়।

এমনি কথা সুধা আরও অনেক বার শুনেছে। চোখ ছলছল করে আসে তার। বলে, সকলের বড় সর্বনাশী আমি দাদা তোমার জীবনে।

ঠিক উল্টো। পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলের ভূতপূর্ব এক মাস্টার দুনিয়া জুড়ে এত হৈ-হৈ করে এল, তার মূলে রয়েছ তুমি। অসুখে পড়ে পড়ে ধুঁকি, অগণ্য ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একটি প্রাণী ও পাত্তা পাওয়া যায় না সেবা-যত্নের জন্য, বিছানার পাশে তখনো সেই তুমি। পৃথিবীতে একটি মাত্র আমার আপন মানুষ আছে, তার নাম সুধাময়ী।

সুধা প্রবোধ মানে না, আকুল হয়ে পড়ে। আকুল হয়ে কেঁদে ফেলে: দাদা, ভুল করেছি জীবনে। বাঁচতে আমার একটুও লোভ নেই। আত্মহত্যার ইচ্ছে হয়, কিন্তু মরণেও বড় ভয়। মরার পর যেখানে যাব সে যদি পৃথিবীর চেয়ে আরও খারাপ হয়, আরও নিষ্ঠুর হয়?

ত্রিদিব উচ্ছ্বসিত হাসি হাসতে লাগল। কোনটা ভুল আর কোনটা সত্যি, অঙ্ক কষে কে তা সঠিক বলে দেবে? সৃষ্টির আদিকাল থেকে সত্য আর নীতিনিয়মের মান কতবার বদলাল, পণ্ডিতেরা তার সাক্ষি দেবেন। এক জায়গায় এক সমাজের কাছে যা নীতি বলে মান্য পায়, ভিন্ন এক জায়গায় তারই সম্বন্ধে বিক্ষোভের অন্ত নেই।

সুধা বলে, এ তর্কে লাভ নেই দাদা। আমি ভাল করি কিম্বা মন্দ করি, এটা তো ঠিক—নির্দোষী তুমি কলঙ্কের ভরা মাথায় নিলে আমার জন্যে।

ত্রিদিব দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, আমার নিজের জন্য। সমস্ত জেনে-শুনেও কেন তুমি মন গুমরে বেড়াবে? আমার নিজের জন্যই সমস্ত। ঘটি-চুরি বাটি-চুরি না হলেও দুল চুরি করেছি। হাঁা, উৎপলার কানের দুল—তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। জাত-ভদ্দোরের মতো জোচ্চুরিও যে করিনি, এমন হলফ করে বলতে পারি নে। তারপরে একদিন অনুতপ্ত হয়ে অসাধ পথ ছেড়ে দিলাম। চুরি-ছ্যাচড়ামি আর নয়—বিক্রি। ঘড়ি-বই-ফাউন্টেনপেন বেচলাম, মেসের দেনা তবু শোধ হয় না। শেষটা সুনাম—স্বেচ্ছায় সুস্থশরীরে আমি সুনাম বিক্রি করে দিলাম। দামও মিলল ঢের। আমি জিতেছি—নার্ভাস হয়ে গিয়ে বাজার-ছাড়া দাম দিয়ে দিল আমায়।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সুধা বলে, তোমার জিত নিয়ে তুমি থাক দাদা। আমায় শোনাতে এস না, আমি সইতে পারি নে।

সুধা চলে গেল। বেরিয়ে গেল রাগ করে। গেল উৎপলার কাছে। হতভাগী, আপন চাকরি বাকরি নিয়ে বাপকে নাইয়ে-খাইয়ে অকালের মাস

কয়টা কাটাবার প্রতীক্ষায় আছ, তোমার সব স্বপ্ন পদতলে থেঁতলে গুঁড়িয়ে চলে যাবার মনন করেছে এদিকে। ছুটে এসে পড, কড়া হও। ভালমানুষির দিনকাল আর নেই।

ত্রিদিব শুয়ে পড়েছে, যন্ত্রণাটা বেড়েছে আরও। ক'দিন থেকে এইরকম। সুধাকে বিন্দুবিসর্গ বলে নি। কিন্তু আর না বলে চলবে না, মনে হচ্ছে। সেবার জেনেভায় যে রকমটা হয়েছিল, তারই সূচনা। বড কষ্ট পেয়েছিল, ডাক্তারে একটা গাল-ভংা নামও দিয়েছিল রোগটার। পলিক্লি-নিকে দেড মাস নিয়মিত ঘোরাফেরা করতে হয়েছিল। আবার যখন দেখা দিয়েছে অষুধে-পথ্যে তাডনা করতে হবে নির্ঘাৎ; আপোষে যাবে না।

অ্যাঁ, কে তার নাম করে? গোপালের কাছে কে যেন খোঁজ নিচ্ছে। মিষ্টি রিনরিনে গলা। উৎকর্ণ হল।

ডক্টর রায় আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

গোপাল ভাগিয়ে দেয়, যাও যাও—

আছেন কিনা তাই বল।

দেখা হবে না, শরীর ভাল নয়।

ত্রিদিব বালিশ পেটে চেপে উপুড হয়ে পড়েছিল। ধড়মড উঠে সে বাইরে ছুটল।

কে? আসতে দে গোপাল। ভাল আছি, খুব ভাল আছি আমি।

মুকুল এসেছে। এক গাল হেসে ত্রিদিব তার হাত ধরল। এক ঝাঁকিতে হাত ছাডিয়ে নেয় ছোট্ট ছেলে। কেউটে-বাচ্চা ফোঁস করে যেমন ফণা তুলে ওঠে।

ওরে গোপাল, কদ্দুর থেকে এসেছে মুকুল। কষ্ট হয়েছে বড্ড, তাই চটে যাচ্ছে। সন্দেশ নিয়ে আয় শিগগির। এল কেমন করে মুকুল? আয় রে, ভিতরে এসে বোস।

মুকুল ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তুই-তোকারি করছেন কেন? কিসের সম্পর্ক আপনার সঙ্গে?

ও, 'তুই' বলা চলবে না। 'আজ্ঞে' 'মশায়' বলতে হবে। তা তো বটেই—মুকুলবাবু যে বড হয়ে গিয়েছেন, প্রবীণ হয়েছেন। নইলে এতদূর থেকে একা-একা আসা হল কি করে?

গোপাল চলে গিয়েছে, হয়তো সন্দেশই কিনে আনবার জন্য। বাইরের দিকে কেউ নেই। ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলে, তা বেশ—আপনিই বলা যাবে এখন থেকে। ভিতরে আসতে আজ্ঞা হোক, পাখার তলে বসে ঠাণ্ডা হন একটু।

মুকুল বলে, ঠাট্টার দরকার নেই। শেখরনাথের সঙ্গে মিলে মাকে তাডিয়ে দিচ্ছেন—তা দিন গে, বয়ে গেল। মা-ই চায় না এই খারাপ জায়-

গায় থাকতে। কিন্তু তা বলে বদনাম দেবেন কেন?

ছেলেমানুষ তুমি, কে এ সমস্ত মাথায় ঢুকিয়ে ক্ষেপিয়ে দিল—

মুকুল বলে, আমি ছেলেমানুষ বলেই তো এত সাহস আপনাদের। মা আমার মুখ বুজে সমস্ত সয়ে যাবে, কাউকে কিছু বলবে না। আর আমি তো ছেলেমানুষই আছি। কিন্তু অত সহজে পার পাচ্ছেন না। বলুন, আপনার মতন এত বড় মানুষ কি জন্যে এমন ইতরতায় নেমেছেন?

কৈফিয়ৎ চাও নাকি? সে সব যদি তোমার শোনবার মতো না হয়?

ত্রিদিবের রাগ নেই, কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে। মুকুলের হাতে কাগজের মোড়ক—উত্তেজনার মুখে নাড়াচাড়ায় কাগজটা একটু খুলে গিয়েছে—কাগজে মুড়ে নিয়ে এসেছে ঘোড়ার সহিসের হাতে যে ধরনের চাবুক থাকে, সেই বস্তু।

শাস্তি দিতে এসেছ? ত্রিদিব একেবারে কেমন হয়ে গেল। আর্তনাদের মতো বলে ওঠে, তাই দাও মুকুল, শাস্তি দাও। শাস্তির আমি যোগ্য, চাবকাও আমাকে।

মুকুলও থমকে গেছে। চাবুক বয়ে এনেছে এদ্দূরে, কিন্তু আসল সময়টিতে চোখে জল বেরিয়ে এল।

আমরা গরিব, সহায় সম্বল নেই। বোর্ডিং ছেড়ে দিয়ে মা-মণির সঙ্গে চলে যাচ্ছি, পড়াশুনো বন্ধ। আমাদের আপন কেউ নেই কিনা, তাই বুঝে আপনারা পিছনে লেগেছেন।

আছে তোমার আপন-জন মুকুল। যেমন তোমার মা, তেমনি বাপও আছে।

বাবা? কচি ছেলের মুখ ঘৃণায় বীভৎস হয়ে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, নেই—

আছে, আছে—তুমি হয়তো জান না।

জানতে চাইনে আমি। আমি যখন এক বছরেরটি তখন বাবা আমার—

আর বলতে পারল না। আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে। ত্রিদিবের চোখও শুষ্ক নয়। বলে, জান মুকুল তোমার বাবা কে?

হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে মুকুল বলে, আপনি চেনেন তাঁকে?

একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগল, সকলের বাবা থাকে, আমার নেই। কিন্তু যা শুনেছি, ভয় করে বাবার নামে। ঘৃণাও হয়।

ত্রিদিব আর সামলাতে পারে না: আমি তোমার বাবা—সেই পাষণ্ড।

আপনি এত বড়লোক—ডক্টর রায়—

হ্যাঁ, দেশবিখ্যাত সকলের হিংসার পাত্র ডক্টর ত্রিদিব রায়। কিন্তু নিজের ছেলে পিতৃ-পরিচয়ে ঘৃণা পায়।

মুকুল সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট ঐ ছেলে—কিন্তু কী হয়ে যায় আজ সর্বমান্য ত্রিদিবনাথের, কাতর হয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করছে তার কাছে। বলে, বড় হতে চেয়েছিলাম মুকুল। উঁচু আশা ঘরে টিকতে দিল না, আমায় জগৎময় ঘুরিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। বড় ক্লান্ত। ঘর খুঁজছি আজকে, কিন্তু কোথায়? ঘর মরীচিকা হয়ে যাচ্ছে পা বাড়াতে গেলেই। আমায় ক্ষমা কর।

এই এক বাচ্চা ছেলেই শুধু নয়—অলক্ষ্য কোন সুদূরবর্তিনীকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা লুটোপুটি খাচ্ছে যেন। কিন্তু ঘৃণার কৃষ্ণ-ছায়ায় মুকুলের মুখ আবার কালো হয়ে উঠল।

আমি ভেবেছিলাম, আমার বাপ মুখ্যুসুখ্যু এক সামান্য লোক। এত বড় হয়েও আপনি এমন? ছি-ছি-ছি।

ত্রিদিব হাত বাড়িয়েছিল মুকুলকে বুকে নিতে। সে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ছুটে বেরুল, মুখ ফিরিয়ে তাকাল না আর একটিবার।

কতক্ষণ আছে আছে দাঁড়িয়ে ত্রিদিব সেই বারাণ্ডায়। সুধা ফিরে এল। উৎপলার দেখা পায় নি নীলমণির কাছ থেকে জানা গেল, সে আজ অফিসে যাবে না—লতিকার ইস্কুলে মীটিং হচ্ছে, সেখানে গেছে। ফিরে এসে ত্রিদিবকে দেখল যেন এক বজ্রাহত মানুষ।

একনজরে পথের দিকে কি দেখছ দাদা?

ধরণার বাইরে এক ভিন্ন লোকে ছিল বুঝি ত্রিদিব। সুধার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পায়। বলে, সাপ এসেছিল সুধা। ছোট্ট—কিন্তু ফণাভরা বিষ।

ওদিকে গোপাল এসে বলছে, মীটসেফের উপর খাবার রেখে এলাম দিদিমণি।

সুধা অবাক হয়ে বলে, খাবার! দোকানের খাবার আনবার কি গরজ হল?

এক বাবালোক এসেছিলেন, সাহেব তাই বললেন—

নিশ্বাস ফেলে ত্রিদিব বলে, খাবার তুই খেয়ে ফেলগে গোপাল, সে চলে গেছে।

ধ্বক করে আর এক দিনের একটা ছবি ফুটল ত্রিদিবের মনে। বর্ষারাত্রে ছেলে কোলের ভিতর চেপে নিয়ে ঐ ঘর এই বারাণ্ডা দিয়ে ওর মা সেই যে নেমে চলে গেল! অমনি করেই ছুটে বেরিয়েছিল ঝুমা, মুখের উপর অমনি চেহারাই ফুটেছিল। মা আর ছেলে দু-জনে ওরা এক।

॥ কুড়ি ॥

বিদ্যায়তন কাউন্সিলের সভা। বিষয়টা গোপনীয়, তা হলেও এমন মজাদার বস্তু চেপে রাখা যায় না, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ফুসফুস-গুজগুজ নিয়ত চলেছে এই সমস্ত নিয়ে। দোতলার ঘরে মিটিং। সিঁড়িতে দারোয়ান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাউন্সিলের লোক ছাড়া আর কাউকে উপরে উঠতে না দেয়।

সভাপতি বুড়া মানুষ। শেখরনাথ যখন ইস্কুলে পড়ত, সেই ইস্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন তিনি। রিটায়ার করবার পর শেখর এনে বসিয়েছে কাউ-ন্সিলের সভাপতি করে। চিরকাল মাস্টারি করেছেন, অতিশয় নিরীহ মানুষ। সাতেও থাকেন না পাঁচেও থাকেন না—কে কি বলে চুপ করে শোনেন, শেখরের কথায় 'হাঁ' দিয়ে যান শেষ অবধি। আজকে কিন্তু গোড়াতেই তিনি ভূমিকা ফাঁদছেন।

মঞ্জু বিদ্যায়তনের কেবল নতুন বাড়িই হচ্ছে না, পড়াশুনোর ধাঁচও একে-বারে নতুন এবার থেকে। তাই কথা হয়েছিল কয়েকজনকে বাদ দিয়ে তাঁদের জায়গায় বিশেষজ্ঞ নতুন শিক্ষিকা আনা হবে। শেখরনাথকে জানি আমরা সবাই—কারো অন্ন যায় সে তা কিছুতে হতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজি হয়েছে—না হয়ে উপায় নেই, দেশে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা তো সকালের আগে।—

তিন চারটি বেয়াড়া লোক আছে কমিটিতে—বিশেষ করে এটর্নি অনি-মেষ। ঠেকানো যায় নি, অভিভাবকদের তরফ থেকে ইলেকশনে ঢুকে পড়েছে এরা। কিন্তু এই ক'জনে কি আর করতে পারে, ভোটে হেরে যায়, কায়দা পেলে কড়া কড়া বচন শোনায় শুধু।

অনিমেষ হুমকি দিয়ে ওঠে, আমরা ব্যস্ত মানুষ। কাজের কথায় আসুন। শেখরবাবু অত্যন্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তি—শুনে শুনে কান ঝালাপালা। আজকে নতুন করে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন কি হল?

সভাপতি বলে উঠলেন, কাজের কথা হল—কয়েকজনকে আমরা বিদায় দিচ্ছি, তার মধ্যে হেড-মিস্ট্রেসই যাচ্ছেন সকলের আগে। গুরুতর কারণ ঘটেছে।

অনিমেষ বলে, সেই তো তাজ্জব। বরাবর গুণগান শুনে আসছি—রাতা-রাতি এমন কি ঘটল যে আজকে তিনি বিশেষ সভায় আলোচনার বস্তু হয়ে উঠলেন?

সভাপতি বলেন, আমিও তাঁকে মা-জননী ছাড়া ডাকি নে। কাজের মেয়েও বটে। কিন্তু সবনেশে ব্যাপার বেরিয়ে পড়ল যে। আমাদের বিদ্যায়তন সাধারণ একটা ইস্কুল নয়, বিরাট আদর্শ এর পিছনে। এর যিনি কর্ত্রী হবেন—

অনিমেষ অধীর হয়ে বলে, সে জানি, সে জানি। হিমালয় গোছের একটা কিছু হবেন তিনি। হেড-মিস্ট্রেস সম্বন্ধে কানাঘুষা কিছু কিছু ——

কানে এসেছে। আপনি প্রাচীন মানুষ সঠিক খবর জানতে চাইছি আপনার কাছ থেকে।

শেখর বলল, বিস্তারিত রিপোর্ট রয়েছে, পড়ে বুঝতে পারবেন।

সভাপতি বলেন, মহিলার চরিত্রঘটিত ব্যাপার—যত সত্যই হোক, মুখে বলতে ভদ্রতায় আটকায়।

অনিমেষ হেসে বলে ভদ্রতা কাঁটাগাছ কিনা, আটকে আটকে যায়। ওটুকু আর কেন শেখরবাবু? আপনি বীরপুরুষ, উপড়ে ফেলে দিন না।

চট করে কাগজখানার উপর নজর বুলিয়ে আবার বলে, এই ভুজঙ্গ মুখুজ্জে কে মশাই? তার কথা আমরা বেদবাক্য বলে মেনে নিচ্ছি কি জন্যে?

শেখর বলে, ডক্টর ত্রিদিব রায়ের চেনা লোক ভুজঙ্গবাবু। ডক্টর রায় তার নাম বলে দিলেন, অনেক খবর সে জানে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ডক্টর রায় মীটিঙে আসছেন, এক্ষুণি এসে যাবেন। ভাল করে জিজ্ঞাসা করবেন, মনে কোন সন্দেহ রাখবেন না।

লতিকা ছিল না সে এসে ঢুকল এইবার। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অনিমেষ থাকতে পারে না। সোজাসুজি প্রশ্ন করল, আপনি এলেন—

কি শক্ত মেয়ে। চোখে মুখে উদ্বেগের লেশমাত্র নেই, বরঞ্চ যেন হাসির ভাব। বলে, চাকরিতে আছি তো এখন অবধি। যতক্ষণ আছি বিদ্যায়তন-কমিটির মেম্বার আমি।

সভাপতি তাড়াতাড়ি বলেন, সে তো বটেই। তবে কথা হল যে, কেউ কেউ হয়তো বিরূপ মন্তব্য করবে—শুনে কষ্ট পাবে তুমি মা।

সভাপতিকে লতিকা কাকাবাবু বলে ডাকে। বলল, মস্ত বড ব্যাপার শুনতে পাচ্ছি কাকাবাবু। ডক্টর রায় নিজে নাকি আসছেন সামান্য এক মাস্টারনি তাড়াতে। অত বড মানুষটা কি বলেন, শুনতে এসেছি। লোভ সামলানো গেল না। আজকেই তো তাড়াচ্ছেন—এর পরে আপনাদের সঙ্গে বসবার আর কোন সুযোগ পাব না। সেইজন্য এসেছি।

অনিমেষ গজর-গজর করে, লোক-দেখানো ম্যানেজিং কমিটি। একজন-দু'জনের মরজির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনদিন কাউকে আকাশে তুললেন, পরের দিন ধপাস করে আবার পাতালে ডোবালেন। আজকে তা বলে সহজে নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

লতিকাকে বলে, আগে থেকে ধরে নেবেন না যে তাড়ানোই হবে আপনাকে।

লতিকা বলে, আপনারা তাড়ান না তাড়ান, আমি যাবই। পদত্যাগ করে চিঠি দিয়েছি সেক্রেটারির কাছে।

অনিমেষ বলে, আমিও সেটা আন্দাজ করেছিলাম। আত্মসম্মান নিয়ে এ জায়গায় কেউ থাকতে পারে না। আমার মেয়েরা এখানে পড়ে, তাদের

মুখে শুনে থাকি আপনার কথা। আর বলতে কি, আপনার জন্যেই মেয়ে পাঠাই আমরা এখানে। এঁদের অভিযোগ সত্যি কি মিথ্যে, সাক্ষিসাবুদ এসে পড়লে খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। আমি আজ সহজে ছাড়ব না। কিন্তু সে সব বাদ দিয়েও কমিটির কাছে বলতে চাই, হেড-মিস্ট্রেসের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের আলোচ্য নয়, মানুষ মাত্রেরই দোষক্রটি থাকে—

সভাপতি তারস্বরে প্রতিবাদ করে ওঠেন, তোমার এ কথাটা মানতে পারলাম না অনিমেষ। শেখরনাথের সামনে বসে এমন কথা বলছ কি করে?

আর একজন ফোড়ন দিয়ে ওঠে, তা সত্যি, সম্রাট শাজাহানের সঙ্গে তুলনা চলে শেখরবাবুর। মঞ্জুলা দেবীর স্মৃতিতে অপরূপ এক তাজমহল বানিয়েছেন—এই মঞ্জু-বিদ্যায়তন।

সভাপতি বললেন, আমি বলব তারও চেয়ে বড়। তাজমহল পাথরে গড়া—তার প্রাণ নেই। শেখরের গড়া এই বিদ্যাযতন থেকে কত শত মেয়ে জীবন-পাথেয় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন থাকব না, তখনো প্রতিষ্ঠান থাকবে এমনি। তার সঙ্গে মঞ্জুলা দেবীও জীবন্ত হয়ে থাকবেন।

অনিমেষ তর্ক করে, ধরে নিচ্ছি শেখরবাবু আদর্শ পুরুষ। কিন্তু সকলেরই যে ঠিক এই রকমটা হতে হবে—

শাজাহানের উপমা দাতা সেই লোকটি কথা শেষ না করতে দিয়ে বলে ওঠে, মানুষের চরিত্রই আসল। মঞ্জু-বিদ্যায়তন যিনি চালাবেন তাঁকে মঞ্জুলা দেবীর মতোই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হতে হবে।

সভাপতি বললেন, আমি ঐ সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দেব—মঞ্জুলা আর তার আদর্শ স্বামী শেখরনাথ। না না শেখর, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। পতিব্রতা স্ত্রীর কথা আমরা পুরাণে ইতিহাসে অনেক শুনি, কিন্তু তোমার মতো পত্নীব্রত মহৎ স্বামী অত্যন্ত দুর্লভ।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—

বলতে বলতে উৎপলা এসে ঢুকল। নাটকের মোক্ষম সময়ে যেমনধারা হয়ে থাকে। মীটিঙের ঘরে বাইরের লোকের আসতে মানা—সিঁড়িতে দারোয়ান মোতায়েন। দারোয়ানের কথা না শুনে জোর করে সে চলে এসেছে। বলে, মহৎ স্বামী শেখরনাথ, তাতে আর সন্দেহ কি। মাহাত্ম্যের কতটুকুই বা আপনারা জানেন? কিছু নতুন খবর পাবেন এই চিঠিখানায়।

সেই সবুজ চিঠি বের করে ধরল।

সভাপতি বললেন, তুমি কে মা? তোমায় তো চিনতে পারছি নে।

বিদ্রূপের কণ্ঠে উৎপলা বলে, পাপীয়সী লতিকার সম্পর্কে বোন হই আমি। এ চিঠি মহাত্মা শেখরনাথ ত্রিদিবকে লিখেছিলেন নিদারুণ বিপদের সময়। ত্রিদিব যত বড় নরাধম হোক চিঠি বেহাত করে নি। চুরি নামক পাপকার্য করে এটি আমাকে জোগাড় করতে হয়েছে। ভাগ্যিস করেছি, নয়তো শেখরনাথের সবচেয়ে বড় কীর্তিটা ধরাধামে অপ্রকাশ থেকে যেতো।

শেখরের দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে, লজ্জা পাচ্ছেন আপনি। মুখ দেখে বুঝতে পারছি। দশে ধর্মে কীর্তি জানুক, এ আপনি চান না। কিন্তু এঁরা পরম অন্তরঙ্গ—এখানে অন্তত চিঠিখানা পড়া উচিত।

শেখরনাথ বলে, চিঠি আমার? কই, আমি তো—মানে, আমি লিখেছি বলে তো—

মনে পড়ছে না? পড়ে যাই তা হলে। তখন যদি মনে পড়ে।

শেখরের পাংশু মুখের দিকে চেয়ে অনিমেষ উল্লাস ভরে বলে, চিঠিটা দিন তো আমার হাতে। দেখি।

শেখর গর্জন করে ওঠে, জরুরি মীটিংঙের মধ্যে কে ঢুকতে দিল? ভাওতা দিয়ে কাজ পণ্ড করবার মতলব। দারোয়ান—

উৎপলাও কঠিন সুরে বলে, দারোয়ান ডেকে বের করে দেবেন? কিন্তু সবুজ চিঠি যে মুঠোয় নিয়ে বেরুব। আর যতক্ষণ এ চিঠি আছে আপনি আমার গোলাম।

অনিমেষ ভালমানুষের ভাবে বলে, কি ব্যাপার বলুন দিকি শেখরবাবু? এত মুশড়ে যাচ্ছেন কেন?

উৎপলা বলে, সাধু মহাত্মার গোপন কীর্তি। এক সরলা উদ্বাস্তু মেয়ের সঙ্গে প্রেম জমিয়েছিলেন। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হল, চোখে অন্ধকার দেখলেন তখন! এঁর যত বড়মানুষি আর মহাত্মাগিরি স্ত্রীর পয়সায়। স্ত্রীকে বাঘের মতন ডরাতেন। কুম্ভমেলার নাম করে বেরিয়ে পড়লেন, মেয়েটিও গেছে। নানারকম চেষ্টা করে দেখে শেষটা পরম বন্ধু ত্রিদিবের কাছে কাকুতি-মিনতি করছেন. পাপের দায়িত্ব নিতে বলছেন তাকে, প্রলোভন দেখাচ্ছেন—

লতিকা উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে। এগিয়ে এসে উৎপলার হাত থেকে ছোঁ মেরে চিঠি নিয়ে নিল।

সবাই অবাক হয়ে শুনছিল। সভাপতি প্রশ্ন করলেন, এমন বিদঘুটে দায়িত্ব কে নিতে যায়?

উৎপলা বলে, তাই নিলেন ত্রিদিব রায়। সুনাম-সম্ভ্রম বিক্রি করে দিলেন টাকার দামে। দেশে থাকা তারপর অসম্ভব হয়ে উঠল। আর ত্রিদিবও চান তাই। ছোট্ট বয়স থেকে বিদেশের শিক্ষা নিয়ে বড় হওয়ার লোভ—শেখরনাথের টাকায় সে আশা পূরণ হল। শেখরনাথেরও লাভ। প্রতিভা-শালী এক বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য তার নামে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। আপনারা কেউ জানেন না—দান নয়, সেটা মূল্য-শোধ।

সবুজ চিঠি আদ্যোপান্ত পড়ে লতিকা হতভম্ব,—মুখ দিয়ে কথা বেরোবার অবস্থা নেই। শেখরনাথ মীটিং ছেড়ে সরে পড়েছে। ভুজঙ্গ এমনি সময় হেলতে দুলতে এসে পড়লেন। চতুর্দিকে একবার নজর বুলিয়ে লতিকার দিকে চেয়ে বললেন, এই যে, মা-লক্ষ্মী রয়েছ এখানে—বেশ, বেশ! শেখর বাবাজিকে দেখছিনে। আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ত্রিদিবের বাড়ি

হয়ে এলাম। সে আমার অতি আপন। তাই ভাবলাম, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তার গাড়িতে আসব। তা বড্ড অসুখ বেচারির, অসুখে ছটফট করছে।

লতিকা ব্যাকুল হয়ে বলে, কি হয়েছে?

জবাব না দিয়ে ভুজঙ্গ হেসে উঠলেন। উৎপলা ধমক দেয়: আপনি মানুষ না কি। হাসতে পারলেন এমন অবস্থায়? আব বলছেন, ত্রিদিববাবু আপন লোক।

ভুজঙ্গ বলেন, মা-লক্ষ্মী আজকে বড্ড উতলা। ভিতরের কথা জানা নেই, তা হলে তোমরাও হেসে উঠতে। হেসে গড়িয়ে পড়তে। ত্রিদিবের পেটের ভিতরে একটা যন্ত্রণা উঠেছে। শূল বেদনা-টেদনা হবে। ডাক্তার এসে পৌঁছয় নি। একবার ভাবলাম, থেকে যাই ততক্ষণ। তা সেই বিদ্যা-ধরীটি এসে বসল শিয়রে। ভদ্রলোকে তা হলে আর থাকে কেমন করে?

উৎপলা গর্জন করে ওঠে, এতখানি বয়স হয়েছে, চুল পাকিয়ে ফেললেন —ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন। সুধাময়ী বিদ্যাধরী কিংবা আর কিছু, জিজ্ঞাসা করুন গিয়ে শেখরবাবুকে। যাঁর সঙ্গে দল পাকিয়ে ভাল মেয়ে-দের নামে কুৎসা ছড়াতে এসেছেন, একখানা চিঠি দেখে লাঠি খাওয়া কুকুরের মতো তিনি পালাবার দিশা পেলেন না।

লতিকা সভাপতিকে বলল, আপনাদের বিচার দেখবার জন্য এসেছিলাম। সে তো আর হয়ে উঠল না কাকাবাবু। আমি চললাম।

অনিমেষ বলে, চলে যাচ্ছেন—মজা বড্ড জমে উঠেছে।

লতিকা বলে, আমার অসুস্থ স্বামী ছটফট করছেন, বসে বসে প্রহসন দেখি কেমন করে অনিমেষবাবু। একা সুধা কি করছে জানি নে, আমি চললাম।

সভাপতি অবাক হয়ে বলেন, ত্রিদিব রায় তোমার স্বামী?

উৎপলাও বলে, দিদি, তোমার বরের কথা বলেছিলে—সে ঐ ত্রিদিব?

লতিকা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, আমার স্বামী—মুকুলের বাবা।

শেখরনাথ বাড়ি চলে গিয়েছিল। ভুজঙ্গ সেখানে গিয়ে প্রবোধ দিচ্ছেন, ঘাবড়ে যান কেন? এমন একটু-আধটু হয়েই থাকে, নইলে আর মরদ কিসের? চুপচাপ এখন নিজের কাজ নিয়ে থাকুনগে, দুটো-চারটে মাস পরে আপনা আপনি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আবার সবাই মাথায় করে নাচবে। কত তা-বড় তা-বড় নেতা দেখলাম, নাম করে বলতে পারি—কলিযুগে কেউ সাচ্চা নয়।

ক'দিনের আসা-যাওয়ায় ভুজঙ্গ বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। হাতে পয়সা পড়েছে এবং প্রতিষ্ঠা চাচ্ছে—এসব মানুষকে পটিয়ে ফেলতে তাঁর জুড়ি নেই।

বললেন, ঐ যে শ্রীমতী মাধবীলতা—লতিকা হয়ে আপনার ইস্কুলে ঘাপটি মেরে ছিল, সকলের চোখের উপরে সতীসাধ্বী হয়ে ড্যাং-ড্যাং করে স্বামী-সেবায় বেরিয়ে গেল—শুনবেন তবে ওর কীর্তিকলাপ? আপনি ছিলেন না, অন্য সকলে রে-রে করে উঠল—মীটিঙের মধ্যে তাই হাটে-হাঁড়ি ভাঙতে পারি নি।

মজাদার কাহিনীর ভূমিকাটুকু ধরতেই শেখর জিভ কাটল, ছি-ছি—ভুল জেনে বসে আছেন আপনারা। লতিকার পরিচয় না জানি, স্বামীজিকে জানি আমি ভাল করে। আমার মতন কেউ জানে না।

প্রতিবাদের বহরে ভুজঙ্গ হকচকিয়ে গেলেন।

জানেন? বেশ কি জানেন, বলুন তো শুনি।

জীবন পণ করে ওঁরা স্বাধীনতার আয়োজনে নেমেছিলেন। দলের মধ্যে আমারও একটু-আধটু ঘোরাফেরা ছিল। টাকাটা-পয়সাটা দিতাম, তার বেশি কি আমার ক্ষমতা! স্বামীজি দেব-চরিত্রের মানুষ। কাজের গতিকে কিছুকাল লতিকার সঙ্গে এক বাড়িতে ছিলেন। অপবাদটা ছড়াতে দেওয়া হয়েছিল ইচ্ছে করেই—পুলিশ যাতে সন্দেহ না করে, নিন্দা-ঘৃণায় ওঁদের আসল লক্ষ্য সাধারণের চোখে যাতে চাপা পড়ে যায়।

নাছোড়বান্দা ভুজঙ্গ বকবক করে যাচ্ছেন তবু। শেখরের কতক কানে যায়, কতক যায় না। ভাবছে সে নিজের মনে। তারই জন্য ত্রিদিবের ঘর ভেঙেছে, কোলের ছেলে নিয়ে স্ত্রী দুর্যোগ-রাত্রে বেরিয়ে পড়ল। ত্রিদিবের কাছে সমস্ত শুনেছে। খরচপত্র করে ত্রিদিবকে বাইরে পাঠাল মনের অনুশোচনায়। তারপরে লতিকা এল বিদ্যায়তনে—সেখান থেকে ধীরে ধীরে মনের রঙিন কুঠুরিতে মঞ্জুলার আসনে নিয়ে তাকে বসাল। তা-ও নয়—মঞ্জুলাকে নিয়ে বাইরে যত উচ্ছাস দেখাক, আসলে তাকে সহ্য করা দায় হয়ে উঠেছিল। বড়লোকের অহঙ্কার—মঞ্জুলার জন্যই গরিব শেখরের ধনসম্পদ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি—এমনি একটা ভাব কথাবার্তায় চালচলনে। ত্রিদিবের ঘর ভেঙে গেল, আর শেখরের ঘর ছিলই না কোন দিন। বেশি দুর্ভাগা শেখর। মঞ্জুর অট্টালিকায় সোনার খাঁচায় বসবাস করত সে। লতিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছিল। স্বামীজির দলের মেয়ে তাঁর পরম বিশ্বাসের পাত্রী। সে-ই যে আবার পরম বন্ধু ত্রিদিব রায়ের স্ত্রী, এমন সম্ভাবনা মনে আসবে কি করে?

॥ একুশ ॥

পরের দিন উৎপলা ত্রিদিবের বাড়ি গিয়েছে। জমজমাট সংসার! সুধা কলকণ্ঠে আহ্বান করে, এস—এস। গোপাল যাচ্ছিল তোমার কাছে। তুমি না থাকলে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে যায়, আনন্দ ষোলকলায় ভরে না।